লাজপসন্দ

অশোককুমার রায়

প্রকাশক

যোগব্রত গুপ্ত

ডিরেক্টার

এস, গুপ্ত ব্রাদার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

৫২-এ, কলাবাগান লেন

কলিকাতা-৩৩

প্রথম প্রকাশ—ডিসেম্বর ১৯৬৫

মুদ্রাকর

শ্রীভোলানাথ হাজরা

রূপবাণী প্রেস

৩১, বাদুড়বাগান স্ট্রীট,

কলিকাতা-৯

প্রাপ্তিস্থান

এস্ গুপ্ত ব্রাদার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫৮, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট

কলিকাতা-৬

এবং

মৌলিক লাইব্রেরী

৮-ডি রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট

কলিকাতা-৯

বাঁধাই

ইউনিভার্সাল বুক বাইণ্ডার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১২৩, লোয়ার সারকুলার রোড

কলিকাতা-১৪

'He for God only, and she for God in him'.

--Milton.

'The highest, most expressive, strongest, and most attractive human love is that between man and woman.'

—Swami Vivekananda to Sister Nivedita.

'It is amazing to what extent a married couple, living, after all, the same life, can remain strangers to one another.' *—Nobel Lauriate André Gide.*

'তোমায় যদি কেউ ভালো না বাসে,— তোমার যদি ভালোবাসার পাত্র না থাকে,— তবে তোমার জীবন হোল বৃথা। ভালোবাসাবাসিটাই যে জীবন।'— *নোবেল্ লরিয়েট্ আল্‌ব্যেয়ার ক্যামু।*

অশোককুমার রায়
জন্ম—২২ অক্টোবর, ১৯৩৮

অন্যান্য বই

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

ভালবাসার শিল্পকথা
দুই বিভূতিভূষণ
মোর উত্তরীয়ে রঙ্ লাগায়েছি প্রিয়ে
তুমি সন্ধ্যার রভস
দু'জনে নির্জনে
Tagore, the Worlds Unparallal
Swamiji, the Socialist
শ্রীমতী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের সাথে জন কীটস্ ও ফেনী ব্রন
কবি-জায়া আর কবি-পতি দ্য ব্রাউনিঙস

ভূমিকা

'লাজপসন্দ'-এর নতুন মুদ্রণের জন্য কিছু কথা জানানোর আছে। ও সব লেখার তেতাল্লিশ বছর পরে এই জীবনের সুমধুরীন সন্ধ্যালগ্নে ভাব ও কাব্যের খুশীয়াল সন্ধ্যার কুলায় আজও— আছি মাচ্ মোর্ য়্যাড্ভান্টেজে— হোয়ে রোমান্টিক। অস্যার্থে চিন্তে ও বিন্তে খুবই স্বাতন্ত্রিক। একা ও নিঃসঙ্গে।

সন্ধ্যাবাসরে আসর সাজাই আজও এই বয়সেও, য়্যাট্ সিক্স্টি সিক্স—স্যোয়ান্ সঙ্ গাই, মানে এখনও যুবতীকে যুবতীই দেখি। এখনও গাই তারই প্রশস্তি। আজও বলি—না সো রমণ না হাম রমণী, দুহুঁ মন মনোভাব পেশল জানি। আমি আর সে। তুমি আর এ। আজ সাজুই-বাবুই দ্য জাক্স্টাপজিশনে।

জানাই— অশোক নামটি বিশ্বকবির দেওয়া। উনচল্লিশের অক্টোবরে একটি বছরের আমি কিছুক্ষণের জন্য রবীন্দ্রনাথের কোল পেয়েছিলাম— দ্য মোস্ট রীচেস্ট্ য়্যামব্রেস্। সামনে মা ছিলেন, বাবা ছিলেন, আর ছিলেন রথী ঠাকুর, প্রশান্ত মহলানবীশ, এলম্হাস্ট্ ও চার চন্দ ভায়েরা। বলি, সজোরী সানন্দায় এটা আমার পাওয়া যেন সেই উন্মেষী শিশুত্বেরই ঘরে বিরাটতম পুরস্কার—এই এই সব লেখালেখিরই কী! আর, তাই আর নাই কোন বেদ মোর রীগ্রেটস্— কী পাইনি তার জন্য।

আমার টেক্নো-ব্যুরোক্রেট্ বাবা রবীন্দ্রনাথের খুবই স্নেহের পাত্র ছিলেন— ভারতের প্রথম টেলি-কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার বলে ছিলেন— রাজ সার্ভিস্— ঐ ইম্পিরীয়াল্ সার্ভিস্ অফ্ ইঞ্জিনিয়ার্সের মেম্বার। পৃথিবীর বহু ব্রিটিশ পকেটে ওনাকে ঘুরতে হয়েছে। থাকতে হয়েছে। সেই বিনয়কুমার রায় রবীন্দ্রনাথের এক কথায় মান্য করে— রিজাইনড্ ফ্রম্ দ্য কোভেটেড্ ঐ সার্ভিস-শন চল্লিশে।

বলতে চাই এমন বাবার ছেলে হয়ে আমি গর্বিত। যে সব লেখা নিয়ে এই গ্রন্থ-তার সূচনায় আমার বাবা। যখন এসব লেখা লিখছি, পড়ার টেবিলে থাকতো। একদিন দেখি—বাবা এরই শুরুর শুরুতে লেখা দ্য সিম্পল্স্কিব্লিঙ্ পড়ে কমেন্ট লিখে গিয়েছিলেন 'এসব লেখার মূল্য কোনো দিনও হবে না মূল্যহীন থাকবে অমূল্য।'

আমার লেখক জীবনের এটাই প্রথম— শিরোপিত পুরস্কার।

আর একটা কথা। সন্ধ্যার রাগ আর অনুরাগ আমার জীবন ও যৌবনেরই জয়টীকা। যৌবনের সবুজ চোখে পলাশ ফুটিয়ে আরতি করে যেন মিত মিতাল্

হই—শুচিস্মিতা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের, যার সান্নিধ্য ও সহযোগিতা না পেলে— আমি লেখক হতে পারতাম না। রাজ্যপাল ডা. হরেন্দ্রকুমারের এবং প্রধান বিচারপতি স্যার সৈয়দ নাসিম আলির অতি স্নেহধন্য— এই সন্ধ্যার অবদান, আজও প্রতি পলে পলে অনুভব করি।

আমার জীবন-সন্ধ্যাময়। পরবর্তীকালে আমার ঘরণী হলেন— রুচিস্মিতা সন্ধ্যা। আমারই অনুরক্তা পাঠিকার— আয়োজী যোগাযোগে। জায়া সন্ধ্যা, না লিখলেও দেশের মান্যগণ্য ব্যক্তিত্বদের স্নেহের পাত্রী। অন্নদাশঙ্কর রায় ও লীলা রায় মেসোমশাই ও মাসীমার কাছে ওর পরিচিতি ছিলো— মেয়ে কাম বৌমার।

আর, আর কিছু বলার নেই। এখানেই ইতি।

—অশোককুমার রায়

এই গ্রন্থের রচনাকাল-১৯৫৫ থেকে ১৯৬২

উৎসর্গ

শ্রী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
করপদ্মে।

মেজকা'—

আমি জানি আমার এই গ্রন্থের ভাবধারা ও বিষয়বস্তুর সাথে তোমার অনন্যসাধারণ শিল্পসৃষ্টির আসমান জমিন ব্যবধান রয়ে গেছে। তুমি যত উঁচুতে কথাসাহিত্য পৌঁছে দিয়েছো, সে রকম কোথাও যে আমার লেখা নিয়ে পৌঁছুতে পারবো—তেমন আস্পর্ধা রাখি না মোটেই। তবু আমার এই প্রথম গ্রন্থটি তোমার প্রতি অশেষ শ্রদ্ধার মধ্যে উৎসর্গীকৃত হ'ল এ জন্য, যে, —আজ থেকে অনেক দিন আগে—স্কুলের শেষ শ্রেণীতে পড়ার সময়—এক রোগশয্যায় শুয়ে-শুয়ে তোমায় পেয়েছিলাম—দু'টি উপন্যাস, "দৈনন্দিন" আর "নীলাঙ্গুরীয়" ও একটি ছোট গল্প "হাসির অশ্রু"র সহযোগিতায়। সেদিন অসুখের দারুণ অস্বস্তির মধ্যে বাড়ীর লোকের মানা সত্ত্বেও পড়ে পড়ে শেষ করার পর পরম স্বস্তি পেয়েছিলাম। জ্বর তখন কমের পথে নামছে। এটি আমার কাছে আজও ছোটখাটো অঘটনের মতো মনে হয়। এই একটা কারণ।—আরেকটি আছে। আমি আমার লেখায় যে ধরনের ভাষা ব্যবহার করি তাই নিয়ে সাক্ষাতে তোমার সাথে অনেক আলোচনা হয়েছে, ও হয়। তাই এই সব মনে রেখে আর ভালো ভাবে জেনে যে,— তোমার ভাবলোক ও রূপলোকের সঙ্গে আমার গ্রন্থের মিল কিছু না থাকলেও তোমাকেই তা অর্পণ করলাম। এই আস্পর্ধা তুমি ক্ষমা ক'রো।

—ইতি

তোমার 'অশোক'।

সূচিপত্র

'It is characteristic of the male to desire the woman who is not too readily attained—the obstacles of amorous pursuit stimulating the ardour of the lover. Modesty and reluctance therefore become an asset to woman as the love object.

The incident of the pursuer and the pursued is an essential element in courtship. The coyness of the female is a phenomenon noted throughout nature, and in the human sphere it is cultivated with all the arts of feminine ingenuity.

Montaigne, the great French essayist pertinently asks : 'What is the object of that virginal shame, that sedate coldness, that severe countenance, that pretence of not knowing things, which they understand better than we can teach them, except to increase in us the desire to conquer and curb...?"

Even the woman of easy virtue may assume the defensive mantle of modesty, and indeed may do so quite naturally and legitimately, as modesty is a valid expression of the feminine erotic impulse. The spontaneous modesty of the young, unsophisticated girl, however, has a quality of its own, a charm that her more worldly-wise sister can hardly affect convincingly."

—Dr. William J. Fielding

"It is particularly important to remember that no matter how deeply a marriage may have been desired, it will always be rather difficult for a man and a woman to find their equilibrium. No matter how deeply in love and how intelligent they may be, they will find themselves, at least during the first days, each in the presence of a stranger who is going to be infinitely surprising... However, the first weeks of a marriage have for a long time been called the honeymoon; and actually, if a close union is formed, every difficulty will be forgotten in the intoxication of the first nights; the man will give up his friends and the woman her personal tastes."

—André Maurois

'Don't forget that 'beauty' stays only a few years, and that we have to spend a long life together. Once the smoothness and freshness of youth is gone then the only beauty lies where goodness and understanding transfigure the features, and that is where you excel.'

—Dr. Sigmund Freud to his loving wife—Martha.

ছন্দ চিরন্তনী

আমার একমাত্র অনুজা—কল্যাণীয়া জয়ন্তী, আদরণীয়াসু।

[১]

জেলার সদর। তার শেষ প্রান্তে প্রধান সড়কের ধার ঘেঁযে দাঁড়িয়ে আছে জেলা হাকিমের ছবির মতন বাংলো বাড়ী। লাল টালি দিয়ে ছাওয়া দোতলার ঢেউ খেলানো ছাদ। বাংলোর দুটি তলারই সামনে প্রশস্ত বারান্দা। সবুজ রঙ লাগানো কাঠের জালি দিয়ে রেলিঙ্ দেওয়া।

সকালে ওপর তলার খোলা বারান্দায়—তরুণ জেলা হাকিম অভিজিতকুমার রায় ও তার স্ত্রী সুচিত্রা রায়—দুটি আরাম চেয়ারে বসেছে মুখোমুখি ভাবে। শরতের সোনালী রঙ্ মেখেছে আজকের সকাল। বড় সুন্দর মতন লাগছে তার রূপ। আর মিষ্টি রোদের নরম আলোর রশ্মিজাল তাদের দু'জনার চোখে-মুখেতে ছিটকে পড়ে—লুটোপুটি খেলায় মেতেছে। মাটি থেকে কয়েকটি যুঁই ফুলের গাছ ওপরের রেলিঙ্ পর্য্যন্ত উঠে এসেছে—লতিয়ে লতিয়ে।—আগের দিনকার সাঁঝের বেলাতে ফোটা— সে সব ফুলের মৃদুমন্দ গন্ধে এখনো জায়গাটা মুখর রয়েছে।

দুটি চেয়ারের মাঝখানে ছোট টিপয়ের ওপরে রাখা চায়ের সরঞ্জাম। পটে চা ভিজতে দিয়ে একটু সময়ের জন্য সুচিত্রা চেয়ারের পিঠেতে আরাম করে ঠেসান দিয়েছিল। মিনিট পাঁচেক পরেই সোজা হয়ে বসলো। অভিজিতের কাপে চা ঢেলে, চামুচে ক'রে দুধ তুলে দিতে দিতে বলল—"ওগো পড়ুয়া, শুনছো। বই বন্ধ কর এবারে। দেখ, আরো দুধ লাগবে কিনা। আমরই মতন তুমিও দুধ-চিনি কম হ'লে চা খেতে পার না যে। চিনি বেশী খাই বলে বাড়ীর অনেকেই ভয় লাগাতো একটা বিশেষ অসুখ হবার নাম ক'রে। বাব্-বা, আজ তোমার সব রকম নিষেধকেই মেনে চলি। কিন্তু তার আগে কারুর মানা না মানাই ছিল আমার ধাত। বড় আদুরে ছিলাম কিনা। ঐ দেখ, এখনো তোমার বই পড়া শেষ হ'ল না। বলি হাকিম সাহেব, একবার শুধু দয়া করুন।"—বলে চামুচের আর পেয়ালার যোগাযোগে জলতরঙ্গ তুলে—হাসির ঝরনায় মুখর হ'ল সুচিত্রা। তার সমস্ত শরীরেই হাসির ছন্দ—নাচতে লাগল দোদুল মতন। দেহের জায়গায় জায়গায়

যৌবনরেখা প্রগল্‌ভ হ'ল। সোনালী রঙ্ মাখানো রূপ ঝরালো। বরনারীর বরঅঙ্গের বেশী লাজ—মাধুর্য্য ছড়ালো। পেশল সৌন্দর্য্য হাসির মূর্চ্ছনায় রভ্‌সিত হোল।

সুচিত্রা শেষে নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠলো অভিজিতের চা হাতে নিয়ে। কোন রকমে স্বামীর চেয়ারের একধারে কায়দা ক'রে বসেই—পেয়ালাখানা অভিজিতের মুখের সামনে ধরে রেখে বলল—"এই। বলি, আমায় নিজের হাতেই খাইয়ে দিতে হবে বুঝি? ও, এবারে বই পড়া ছাড়লেন দেখছি শেষ পর্য্যন্ত।"

মুখের হাসিতে বিভোর হ'য়ে চা গ্রহণ কোরল অভিজিত। বলল —"এবার।"

—"এবার আমি খুশী।"—তবে তৃপ্তি ভরা চাহনি ছড়িয়ে সুচিত্রা নিজের চায়ের কাপটি কয়েক চুমুকে শেষ ক'রল।

মধুর হ'য়ে উঠলো সুচিত্রা চা পান করার উষ্ণতায়। স্বামীর কাঁধেতে আরাম ক'রে মাথা রেখে বলল—"এই অভিজিত, বুঝলে, আজকে আমাকে তোমার কাছের মধুর সঙ্গ থেকে কিছু সময়ের জন্য ছুটি দিতে হবে কিন্তু? লক্ষ্মীটি আমায় ছুটি দেবে কিন্তু, বুঝলে? বেশী না, এই ঘণ্টা তিনেকের জন্য। হাসপাতালে আজ একটি বাচ্চা শিশুর কেস্ আছে। খুবই সিরিয়াস্। আমাকেই তা দেখতে হবে। কেস্‌টার যা ব্যবস্থা করার আছে তা দুপুরের মধ্যে সেরে এসে—বিকেলের দিকে তোমার সঙ্গে গাড়ী করে বেড়াতে যাবো, কেমন? কি খুশী ত?"

সুচিত্রার মাথার সুবাস ভরা স্তূপ স্তূপ চুলের মধ্যে মুখ ঘষে নিয়ে বলল অভিজিত—"নিশ্চয়ই যাব। কিন্তু মনে থাকে যেন, আজ রবিবার। ছুটির দিন। এখানকার আদিবাসীদের এলাকায় বেড়াতে যাবার কথা আছে, তা মনে থকে যেন।"

ঘাড় নেড়ে বিনুনী করা চুলের গোড়ায় বাঁধা—লাল রিবনের ফুল-খানা দুলিয়ে—সুচিত্রা তার কথায় সম্মতি জানালো। এর পর আর বেশী কথা হ'ল না। একটু পরে সে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে বলল—"আজ কোন্ রান্নাটা খেতে ইচ্ছা তোমার বল? মালাইকারি খাবে?""

স্বামী অভিজিতের মুখের হাসিতে তৃপ্তি ভরা। বলল—"ভারী দুষ্টু কোথাকার। আমার 'বুবুলা' যা রাঁধবে তাই আমি খাব।"

—'বুবুলা'— হোল সুচিত্রার ডাক নাম।

—" তোমার বুবুলা ত' ডাক্তারী করতেই জানে! তা ছাড়া কি আর তার রাঁধা-বাড়ার কোন গুণ আছে? রান্নার কিছুই সে জানে না! অন্ততঃ জেলা হাকিমের বৌদের পক্ষে ঘর সংসারের কাজ না জানাটাই ত' হল—তাদের মস্ত

বড় গুণের পরিচয়! তোমার বুবুলাও ওদেরই দলে, তাই না?"—কথার শেষে সুচিত্রা তীব্র হাসির ঝরনা হোল।

[২]

অভিজিত সুচিত্রার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থেকে ভাবল—সত্যি এই বুবুলা অন্য জগতের মেয়ে। তারই সমান পর্য্যায়ের অন্যান্য বন্ধুদের ঘরণীর মতো ও মোটেই নয়। বুবুলা স্বাধীনচেতা। ততটুকু স্বাধীনতা নিয়েই সে চলতে চায়—যার দরুণ নিজেদের ভালোবাসার ওপরে কোন রকম ছাপ না পড়তে পারে। তার স্বাধীনচেতনা অন্যান্য বন্ধুজায়াদের মতন বিকৃতধরনের নয়। তাই বুবুলা নিজের কাজে কোনখানে যাবার থাকলেও, আগে থেকে তাকে না জানিয়ে যায় না। আর জেলা শাসকের বৌ হ'লেও—সে নিজে থেকেই মনের খুশীতে ঘর-সংসারের কাজ শেষ ক'রে নেয়। অবশ্য জনা দুয়েক পরিচারিকা থাকা সত্বেও নিজের হাতে কাজ ক'রতেই তার সুখ বেশী। নিজের হাতের রান্না অভিজিতকে তৃপ্তি ভরিয়ে খাওয়াতে পারে বলে—বুবুলা এত সুখী!—মাঝে মাঝে তাই অভিজিত আদর ক'রে বুবুলাকে আলিঙ্গনে বন্দী রেখে—নিজেরই হাতে খাইয়ে দেয় প্রিয়ারই তৈরী করা খাবার। বুবুলার শরীরে তখন লজ্জারাগ আনচান ক'রে ওঠে। কিন্তু বাধা দেয় না অভিজিতকে। প্রিয়া উপরন্তু হ'তে থাকে লাজবতী।

ডাঃ সুচিত্রা রায় আধ বছর হলো এখানে এসেছে। তার স্বামী এখানকার জেলা শাসক ও কালেক্টার হ'য়ে আসে এক বছর আগে। স্ত্রী সঙ্গে আসতে পারেনি তখন। সে সময়ে 'স্যার নীলরতন সরকার' থেকে সবে ডাক্তারী পাশ করে বেরিয়েছে সুচিত্রা। পাশ করার পর হাসপাতালে ছ'মাসের কড়ারে নির্দিষ্ট করা ডিউটি দেবার জন্য—কলকাতার শ্বশুরবাড়ীতেই থাকতে হয়। ডিউটির নির্দিষ্ট সময় শেষ হতেই স্বামীর কাছে চলে আসে। অভিজিত জানতে চেয়েছিল—"বুবুলা, পাশ ত তুমি করেছ, তা এখন থেকে ডাক্তারী ক'রবে না?"—উত্তরে সুচিত্রা ভালোবাসার কথা হ'য়ে ঝরে পড়েছিল—"ধ্যাৎ। ডাকতারী ক'রব না, আরো কিছু! এতগুলো বছর ধরে গাদা গাদা বই পড়ে আর মুখস্থ করে করে আমি এখন বড় ক্লান্ত। এর পরে আর কিছুটি করা নয়। তোমার কাছে কাছে থেকে তোমায় ভালোবেসে, তোমার আদর খেয়ে যে সুখ পাব, তা কি আর ডাক্তারীর মেহনতিতে মিলবে কণামাত্র?"—এমন মিষ্টি মনেরই সরল সুস্মিতা মেয়েটির সহপাঠী ছিল কয়েক বছর আগে—আজকের এই আই. এ. এস.।

অভিজিতকুমার রায়। দু'জনে সমবয়েসী হ'লেও অভিজিত মাস তিনেকের বড়। আজকের জেলা শাসকের বৌ সুচিত্রা সাতাশ পার হতে চলেছে এই মাসখানেক পরে। আর অভিজিত সবে আঠাশে পা দিয়েছে মাস দুই হ'ল।—অবশ্য বলতেগেলে খুব অল্প বয়েসেই সে জেলা শাসক হয়েছে। চেনা-শোনা মহলে তাই তার নাম হ'ল —ছোকরা ডি. এম. বলে।

ইণ্টারমিডিয়েটে দু'জনেরই ছিল বিজ্ঞান। পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে তারা ধরা দিলে নিজেদেরকে—ভালোবাসারই লাজ-মধুর ছন্দে ছন্দে, গাঢ়ভাবে একে অপরের মনেতে—জড়িয়ে জড়িয়ে। পাশ ক'রে শরীর হঠাৎ খারাপ করার জন্য পড়া বন্ধ রাখতে হয়েছিল সুচিত্রাকে বছর চারেকের জন্য। আর এখান থেকেই তখন দু'জনে শিক্ষার আলাদা আলাদা পথটি ধরে। অভিজিত আর্টস গ্রহণ কোরেছিল ইকনমিকসে অনার্স নিয়ে। আর সুচিত্রা বেছে নিয়েছিল ডাক্তারী।

এখনকার পরিচয়ে জেলা শাসকের বৌ। তাকে স্বামীর পদমর্য্যাদা অনুযায়ী—নিজেদের সুন্দর-সরল-রুচিশ্রী ভরা আভিজাত্য বজায় রেখে চলতে হয়। তাই কোথাও ডাক্তার হিসাবে কোন বাধ্যবাধকতার কাজ নেয়নি। তবে জেলার বিভিন্ন সমস্যায়, বিশেষ ভাবে মেয়েদের ব্যাপারে কর্তৃস্থানীয়া সে। স্বামীর সম্মানকে আরো গৌরবযুক্ত করার জন্য—সুচিত্রা এখানকার সদর হাসপাতালে·কাজ নিয়েছে—বিনা বেতনে। এ দেশে ডাক্তারের বড় বেশী অভাব যে কোন জেলা হাসপাতালেই থাকে। সে অভাবের প্রয়োজন মেটাবার অভিলাষও তার আছে। এর জন্য সকালে ঘর-সংসারের কাজ শেষ করার পর— যে সময়টুকু পায়, মানে অভিজিতকে খাইয়ে-দাইয়ে কোর্ট কাছারিতে পাঠাবার পর—তবে নিজের কাজে বেরোয়। অবশ্য বেশীর ভাগ দিন একই সঙ্গে ওরা দু'জন নিজের নিজের কাজে বেরোয়।

গ্রামের সব গরীব-দুঃখীর জন্য— জেলাশাসকের স্ত্রীর দয়া ও সহানুভূতি হ'ল অপরিসীম। কোন দুঃস্থ জনের পর্ণকুটীরে কারো অসুখ হওয়ার খবর পেলে—তার কিছু পরেই দরকারী ডাক্তারী জিনিসপত্র নিয়ে—নিজেই গাড়ী চালিয়ে বেরিয়ে পড়ে। সঙ্গে পেছনের সীটে বসিয়ে নেয় একজন চাপরাশীকে।

জেলা শাসকের একটাই গাড়ী। গাড়ীখানা বিয়েতে যৌতুক পাওয়া। একমাত্র আদুরে মেয়ের বিয়েতে তার মা-বাবার এটা আশীষ দেওয়া। সমস্ত জেলার মধ্যে অত দামী—আর অত বড় 'বুইক' কারো নেই। তাই ক্রীম রঙের গাড়ীখানাকে অনেক দূর থেকে আসতে দেখলেও বোঝা যায়—কে আসছে। কে যাচ্ছে। —তারা দু'জনে নিজের নিজের কাজের জন্য নিজেদের মধ্যে একটা ব্যবস্থা ক'রে

নিয়েছে।—সকালে কাছারিতে যাবার পথে অভিজিত নিজে গাড়ী চালায়। পাশে তার মিষ্টি বুবুলা বসে থাকে। নিজের জায়গায় পৌঁছে—অভিজিত তার হাতে বুইকখানা ছেড়ে দেয়।—সুচিত্র তখন নিজে নিজে গাড়ী চালিয়ে হাসপাতালে যায়। তারপর সেখানকার কাজ সেরে—অন্যান্য গরীব দুঃস্থ জনের বাড়ী ঘুরে—অসুস্থ জনকে দেখে—ঠিক পাঁচটার আগেই কাছারিতে এসে দাঁড়ায়—স্বামীকে ছুটির পর বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্য। অবশ্য তার আগেই একবার বাড়ীতে এসে পোশাক বদল্ করে—গা-হাত ধুয়ে বিকেলের জলখাবার তৈরী ক'রে রাখে। শেষে শাড়ী ব্লাউজ বদলে—সামান্য একটু সেজে স্বামীকে গড়ীটি পৌঁছে দিতে বেরোয়। সেখান থেকে ছুটির সঙ্গে সঙ্গেই অভিজিত নিজে ড্রাইভ ক'রে—ক্লান্তিতে-খুশীতে বিভোর বুবুলাকে নিয়ে বাড়ী ফেরে। গাড়ী যে সময়টুকু কাছারিতে না থাকে—তখন বাইরে ঘোরাঘুরির ব্যাপারে তার জন্য নির্দিষ্ট করা—স্টুডিবেকার ষ্টেশন ওয়াগনখানা ব্যবহার করে অভিজিত।

নিজেদের জনপ্রিয় জেলাশাসকের রূপধন্যা সুস্মিতা স্ত্রী—এই সুচিত্রার জেলার সব গরীব দুঃস্থ জনের প্রতি এমন মহৎ ও উদার যত্ন ও সেবাপরায়ণতা দেখে—সদরের আবালবৃদ্ধবনিতার সকলেই এক কথায় তাকে অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রীতি ভরিয়ে 'মা' বলে ডাকে। —এতে সুচিত্রা নিজেকে সুখী মনে করে। তার মেয়ে হয়ে জন্মানোর সার্থকতা—এর মধ্যেই আছে মনে মনে ক'রে খুশী হয়ে ওঠে। প্রিয়া বুবুলার সুখ্যাতিতে অভিজিত নিজেও খুব বেশী সুখী। তেমনি খুশীবিভোর। আর গর্বিতও। বেশী রকমেই।

[৩]

সদর হাসপাতালে সুচিত্রা যে বাচ্চা শিশুটির কেস্ আজ পরীক্ষা ক'রবে, তার বয়স বছর তিনেকের মতো। দিন চার পাচ হল ভর্তি হয়েছে এখানকার শিশু বিভাগে। রোগটি তার টিউবারকুলার মেনিনজাইটিস। রোগটি সাধারত এ বয়েসের বাচ্চা শিশুদের মধ্যেই হ'তে দেখা যায় বেশী। এতে আক্রান্ত হওয়ার ফলে ঐ বাচ্চাটির মাথার ভেতরে জল জমে গেছে। সুচিকিৎসার প্রয়োগে সেকানকার জমা জল বার ক'রে দিয়ে— রোগীকে কঠোর যন্ত্রণা ও অকাল মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো যায়। তবে সবখানেই যে ঐ চিকিৎসায় সফল হওয়া যায় তা মোটেই নয়। অনেক সময় হয় ত আনাড়ী ডাক্তারের অজ্ঞতা, বা খুব বিশিষ্ট ডাক্তারের সামান্যের জন্য ভুল হওয়ার ফলেও—রোগীর মৃত্যু হবার সম্ভাবনা খুব বেশী। এই রোগের চিকিৎসা বেশ কঠিন মতন।—প্রথমে রোগীকে অপারেশন টেবিলে শুইয়ে অজ্ঞান করা হয়। সে অবস্থায় তার শরীরটিকে দু'একজন সহকারী

ডাক্তার মিলে ধরে বেঁকাতে বেঁকাতে—মাথাকে হাঁটুর সঙ্গে লাগায়। এর কারণ শরীরের শিরদাঁড়ার সঙ্গে মাথার ভেতরের যোগাযোগ রয়েছে। কাজেই মাথার মধ্যে জমা ঐ জলকে শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে বার করা ছাড়া—আর কোন উপায় নেই। শিরদাঁড়ার নীচের দিকে শেষ প্রান্তে—প্রায় ইঞ্চি খানেকের মত খালি জায়গা আছে। সেখানকার ফাঁক দিয়ে সিরিঞ্জের ইঞ্চি তিন চার লম্বা সূচটিকে শিরদাঁড়ার ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তার ফলে মাথার জমা জল সূচের ভেতর দিয়ে আস্তে আস্তে চুইয়ে চুইয়ে এসে বাইরে পড়তে থাকে। এভাবে সমস্ত জল বেরিয়ে গেলে পর রোগী সম্পূর্ণসুস্থ হয়ে ওঠে। সূচ যখন ওভাবে শিরদাঁড়ার ভেতরে ঢোকানো হয় তখন রোগীর শরীরটি হয়ে যায় শক্ত পাথরের মতো।

এই উপায়েই চিকিৎসা ক'রে আজ ঐ বাচ্চা শিশুটির রোগ সারাতে হবে—ডাঃ সুচিত্রা রায়কে।

[৪]

বেলা এগারোটার সময় নিজের হাতে বুইকখানা চালিয়ে হাসপাতালে এলো সুচিত্রা রায়। এসে দেখলো তার কাজের সুবিধা ক'রে—সব ব্যবস্থাই আগে থেকে ঠিক ক'রেই রাখা হয়েছে।

তাকে আসতে দেখে হাসপাতালের একজন ডাক্তার বলল—"দেখুন আপনি বরং বাচ্চাটির ওপরে এই ব্যবস্থা প্রয়োগ না করেন তাই ভাল। কারণ আপনার রোগীর ব্যবস্থা এখন ভয়ানক খারাপ যাচ্ছে। চিকিৎসা ঠিক মত ক'রলেও বাঁচবে না বলেই মনে হচ্ছে। কি দরকার শুধু শুধু ঐ নিয়ে ঝামেলা বাড়িয়ে?"

তাদের সামনেই বাচ্চাটির গরীব মা দাঁড়িয়েছিল। সে ডাক্তারটিকে এমনতর কথা বলতে দেখে—সুচিত্রার পা জড়িয়ে ধরে মাটিতে বসে পড়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল—"মা, তুমি আমার এই একটি মাত্র ছেলেকে বাঁচিয়ে দেও। আমার আর কেউ নেই। ওই হচ্ছে একমাত্র আশা-ভরসা। ও ছেড়ে চলে গেলে আমার সব অন্ধকার হ'য়ে যাবে। তুমি সত্যি আমার মত গরীবদের মা। আমরা হচ্ছি সব তোমার ছেলেমেয়ে। দয়া করে আমার ছেলেকে বাচাও, মা। তুমি দয়ার অবতার। ভগবান তোমার ও তোমার স্বামীর মঙ্গল করুন।"—এই বলে সে কান্না নিয়েই তার পা ছেড়ে উঠলো।

সান্ত্বনা দিয়ে সুচিত্রা তাকে বলল—"কথা দিলাম। ভয় নেই তোমার। আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব তাকে বাঁচিয়ে তুলতে? কিন্তু ওর যদি যাবার সময়

হয়ে থাকে তা হলে যাবেই! ওকে কেউ আটকে রাখতে পারবে না। সেখান থেকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে আমার কেন, কোন ডাক্তারেরই হাত নেই। তবে তাকে বাঁচাবার জন্য অন্ততঃ ভাল ক'রে একবার চেষ্টা করা উচিত। তুমি আপাততঃ বাইরে গিয়ে বোস। চেষ্টা করে দেখতে দেও আমি কি করতে পারি।"

কতকটা আশা পেয়ে বাচ্চাটির মা সেখান থেকে সরে বাইরে গেল। তখন সুচিত্রা ঘরে ঢুকে দেখলো তার রুগীকে অপারেশন টেবিলের ওপর শুইয়ে রাখা হয়েছে। তাই দেখে আর দেরি না ক'রে কয়েকজন নার্সকে ডেকে বাচ্চাটিকে নিয়ম অনুযায়ী চেপে ধরতে বলল। তারা সে ভাবে ধরলে পর সুচিত্রা ঠিক হয়ে হাতে সিরিঞ্জখানা তুলে নিল। অন্য একজন ডাক্তার সামনে রইল।

খালি সিরিঞ্জের লম্বা সুচখানা রোগীর শিরদাঁড়ার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে বেশী সময় লাগল না। কিছু সময় পরে দেখা গেল আস্তে আস্তে জল চুইয়ে চুইয়ে বাইরে বেরিয়ে আসছে।—তাই দেখে সুচিত্রা ভাবলো—এবার তা হলে বাচ্চাটি সত্যি মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাবে। কিন্তু একি! একটু পরেই তার নিজের কেমন যেন একটা সন্দেহ হ'তে লাগলো। বাচ্চাটির শরীর থেকে প্রাণের স্পন্দন যেন—আস্তে আস্তে কমে কমে মিলিয়ে যাচ্ছে। এই দেখে সুচিত্রা তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ডাক্তারকে ডেকে বলল— "দেখুন ত পরীক্ষা করে, কি যেন হ'ল সন্দেহ হচ্ছে। সত্যি কেমন কেমন ঠেকছে।"

অন্য ডাক্তারটি তার কথা মতো ভাল করে পরীক্ষা করে দেখবার আগেই সুচিত্রা কাঁপানো গলায় ধীরে ধীরে বলে উঠল—"ও, থাক। বুঝেছি। সব শেষ। ওকে আর বাঁচাতে পারলাম না। চলে গেল সে আমাকে পরাজিত করে।"

ওদিকে বাচ্চাটির মা ছেলের জন্য আকুল মনে বন্ধ দরজার বাইরে কান পেতে বসে ছিল। সুচিত্রার মুখ থেকে এ কথা শোনা মাত্র সে সজোর ধাক্কায় বন্ধ দজা খুলে ফেলে— ভেতরে পাগলের মতো ছুটে এলো। টেবিলের ওপরে শোয়া মৃত সন্তানের শরীরের ওপরে আছড়ে পড়ে চিৎকার করে বলতে লাগল— "কিরে, তোকে আমাদের মা বাঁচাতে পারল না? তুই শেষে কিনা আমায় ফাঁকি দিয়ে চলে গেলি?"—তার কান্না ক্রমে ক্রমে বেড়েই চললো।

এমন অবস্থা দেখে সুচিত্রা আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। অন্য ডাক্তারটিকে ডেকে বলল—"আমি চললাম, ডাক্তার দত্ত। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। ক্ষমা করুন। মাথা কেমন যেন ঘুরছে। এবার যা ক'রবার দরকার তা আপনি দয়া ক'রে করবেন। অনুরোধ জানাচ্ছি।"

ডাক্তারটি বুঝতে পারল সুচিত্রার মনের অবস্থাকে। সহানুভূতির গলায় বলল—

"আপনি অযথা ভয় পেয়ে নিজেকে কষ্ট দিচ্ছেন। কিচ্ছু ভাবনা-র নেই। আপনি এখনি বাড়ী গিয়ে বিশ্রাম করুন।"

—"আচ্ছা। চলি।"—বলেই সুচিত্রা ঘরের বিষণ্ণ পরিবেশ কাটিয়ে বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এল। সেখান থেকে কলঘরে গিয়ে ওষুধের জল দিয়ে হাত ধুয়ে-মুছে সোজা নীচে নেমে এলো। লনের একধারে তার 'বুইক' পার্ক করা ছিল। কোন দিকে না তাকিয়ে সোগা এগিয়ে এসে দরজা খুলে ঝুপ করে চালকের আসনে বসে পড়লো।

গাড়ীতে উঠে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই—একটা খুব ভয়ে-আতঙ্কে সুচিত্রার সমস্ত দেহমন রোমাঞ্চি ত হয়ে উঠলো। একটা অজানা ভবিষ্যতের ভয়ের কথা জানিয়ে দিয়ে—এর শিহরণ তার শিরায় শিরায় রক্তস্রোত কাঁপিয়ে তুলল।—এই ভয় জড়ানো কাঁপনের বেপথুমন দোলায় দোদুল থেকে সুচিত্রা নিজের পেটের মধ্যে হঠাৎ ক্ষণিকের জন্য কিসের যেন একটি ব্যথার অনুরণনের টের পেলো। আর তখনি বড় বেশী রকমের ভয় পেয়ে বলে ফেলল আপন মনে নিজেকে শুনিয়েই—"ওগো অভিজিত, আমার এখন কি হবে? আমি যে আজ সত্যি তোমার তৃপ্তির, তোমার হাজার সুখের ছোঁয়াচ থেকে—নিজের দেহে খুশীর আরামে-আবেশে সৃষ্টির উপকরণকে ফুটিয়ে তুলেছি। আমি যে, হ্যাঁ, আমি গো আমি, তোমার বুবুলা আজ প্রজাবতী। সে মা হবে। ওগো, তুমি ত জান আমার এখন এ অবস্থায় তিন মাস পুরো হয়ে চার মাসে পড়েছে। আর কয়েক মাস পরে যার প্রাণকে ফুলের মত নয়নাভিরাম ক'ষরে আলোর রাজ্যে, বাতাসের রাজ্যে সৃষ্টি করাবো,যদি, যদি ওগো অভিজিত, তার কোন অনিষ্ট হয়। কেন জান—আমি ঐ গরীব মায়ের শিশুকেও তাঁর মা'র শত কাতর প্রার্থনার পরও—বাঁচাতে পারলাম না। এখন যদি ওর মা এর জন্য আমাকেই দায়ী মনে ক'রে এমন কোন অভিশাপ দেয়, যে,—প্রেমময় অভিজিতকে উপহার দেওয়া তারই মিষ্টি বুবুলার সন্তানেরও—জন্ম পেয়েই পরিণতি হ'য়ে ওঠে, সহায় সম্বলনহীন মৃত্যুপথযাত্রী ঐ বাচ্চা শিশুটির মতন! তা হ'লে?—তা হ'লে আমার কি হবে মা, ও মাগো! আমি, আমি ত আর ওকে ইচ্ছে ক'রে মরতে দেই নি।"

আপন মনেতে নিজেকেই কথাগুলো শোনালো। আর কিছু ভাবতে না চেয়ে সুচিত্রা গাড়ীর স্টিয়ারিঙ হুইলের ওপরে মাথা রেখে ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেললো। দু হাত দিয়ে মুখ ঢাকলো কান্না লুকোতে। এ রকমে কিছু সময় তার কাটল। সময়টুকুর সবটাই যেন তার চোখে— কেমন আবছা আবছা ঠেকলো।

সামনেই সেখানে একটু তফাতে—একজন বুড়ো মতন আরদালী দাঁড়িয়েছিল।

সে এ অবস্থায় তাকে দেখে গাড়ীর কাছে এসে হাত জোড় করে বলল বিনীত ভাবে—"মা! আপনি কাঁদছেন কেন? বাড়ী যাবেন না?"

আরদালীর কথায় সংবিৎ ফিরে আসায় সুচিত্রা চমকে উঠে বলল—"ও কিছু না। এমনি। এই যাচ্ছি।"—বলে নিজেকে কতকটা সামলে নিয়ে গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে হাসপাতালের ফটক পার হয়ে এলো। সদর রাস্তায় এসে বাংলোর দিকে দ্রুতগতিতে গাড়ী চালাতে লাগল। হাত দুটি তার কাঁপছে অজানা ভয়ের আশঙ্কায়। শক্ত ক'রে তাই ধরে রাখার চেষ্টা করছে স্টিয়ারিঙ হুইল। এখনো সেই ভয়ের শিহরণ তার দেহের কানাচে কানাচে দোলা লাগিয়ে যাচ্ছে। দু হাতের সোনার চুরি আর মোটা মতন পাথরের কাজ করা বালা দুটি—একটি আর একটির সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়ে—একটা সুন্দর রকমের মিষ্টি আওয়াজের ধবনি তুলে চলেছে একনাগারে। জলতরঙ্গেরই মতো।

ডাক্তার সাহেবের গাড়ীকে ফিরে আসতে দেখে—বাংলোর দরোয়ান ফটক খুলে দিয়ে এক ধারে সরে দাঁড়াল। সরে দাঁড়িয়েই বুটে বুট ঠুকে—হাত তুলে সেলাম জানালো। সুচিত্রা কোন দিকে না তাকিয়ে গাড়ী নিয়ে সোজা ভেতরে চলে এসে—গাড়ী বান্দার নচে থামালো। একটানে দরজা খুলে ফেলে, লাফিয়ে নেমে বন্ধ করেই—ছুটতে ছুটতে সিঁড়ি দিয়ে দোতলার বারান্দায় উঠে এলো। বারান্দায় একটু দাঁড়িয়ে হাফ ছেড়ে—পিঠ থেকে শাড়ীর আঁচলটা তুলে নিয়ে মাথার ঘোমটা টেনে—লাজুক লাজুক রভসিতার মতন—শোবার ঘরে ঢুকেই দেখল—কোণের জানালার কাছে অভিজিত চেয়ারে বসে একটা বাংলা গল্পের বই পড়ছে।

চুপ কোরে দাঁড়ালো একটু। একটা রহস্য-রোমাঞ্চে তার অবস্থা এখন বাকশূন্য হোয়ে পড়েছে। বেপথুমন চোখের সজল চাহনি—করুণ এক মূর্চ্ছনা তুললো।

ও অবস্থায় তাকে অভিজিত তখনি দেখলো। আর তখনি বই বন্ধ কোরে হাসি বিভোর হয়ে ডাকলো—"এই বুবুলা। তোমার কিছু শরীর খারাপ লাগছে না কি? কি হ'ল, ঘরে না ঢুকে অমন ভাবে দরজার কাছেতে দাঁড়িয়ে আছ কেন? কাছে এসো, বুবুলা। একি তোমার চোখে জল! কি হ'ল শরীর খুব খারাপ লাগছে না ত?"

কথা বলে অভিজিত উৎকণ্ঠায় চেয়ার ছেড়ে ওঠার চেষ্টা ক'রতেই—সুচিত্রা তার কাছে ছুটে এলো—ঝড়ের বেগে। হঠাৎ ঝুপ করে তার পায়ের কাছে কার্পেটের ওপরে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে—সুচিত্রা তার কোলের মধ্যে মুখটি লুকিয়ে ঝরঝরিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। নিজের হাতে অভিজিত তাকে নিজের

বুকের মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা কোরল।

এমন্ করার জন্য প্রথমটায় অভিজিত কিছুই ঠিক ক'রতে পারল না—কি হয়েছে তার। একটু পরে সে নিজের হাতে বুবুলার মুখ তুলে ধরে বলল—"বুবুলা, লক্ষ্মী মেয়ে। তোমার এত কান্না কেন? ব্যাপার কি? বলবে না আমায়? বল, লক্ষ্মীটি আমার।"

সুচিত্রা তখন কোন রকমে কান্না থামিয়ে বলল—"ওগো, আমার বড় ভয় ক'রছে।"

তার এই ভয় পাওয়ার ব্যাপারে অভিজিত কিছুই ঠাহর ক'রতে পারলো না। জিজ্ঞাসা ক'রল তাই—"ভয় কিসের বুবুলা? আমাকে তা খুলে বল।"

কাঁদ কাঁদ গলায় সুচিত্রা বলল—"ওগো, আমাদের ভাবী সন্তানের যদি কোন ক্ষতি হয়?"

প্রেমময় অভিজিতের এ কথায় চোখ ছল্ছলিয়ে উঠলো। বলল—"আঃ বুবুলা। ভাল ক'রে খুলে বল ব্যাপারটা। আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না।"

জোর দিয়ে এবার সুচিত্রা বলল—"অভিজিত। আজকে আমি যে গরীব বাচ্চা শিশুটিকে বাঁচাতে গেছ্লাম, তাকে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আর বাঁচাতে পারলাম না। মরে গেল সে। তার গরীব মা সামনেই ছিল। তাকে কথা দিয়েছিলাম, যে কোরেই হোক তার ছেলেকে আমি বাঁচিয়ে তুলবো। কিন্তু এখন যদি নিজের একমাত্র সন্তানের শোকে সেই মা আমার সম্ভাব্য মাতৃত্বের ওপরে অভিশাপ দেয়, আর তা হলে আমার কি হবে বল? আমার যে বড় ভয় ক'রছে। আমাদের সন্তানের যদি কোন অনিষ্ট হয়?"—বলে আবার অভিজিতের কোলে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে লাগলো সুচিত্রা। নিজে ডাক্তার হয়েও ভুলে গেল—যুক্তি-তর্কের অতি আধুনিকতার কথা!

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে অভিজিত তখন সুচিত্রাকে তুলে ধরে—বুকের মধ্যে জড়ালো কঠিন ভাবে। তার মাথায়-পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে বলল—"বুবুলা, লক্ষ্মী মেয়ে। ভয় পেয়ো না এর জন্য। তুমি ভয়ানক রকম ভীতিবিহ্বলা হয়ে উঠেছো। এতে ত আমি দেখছি তোমার কোনই দোষ হয় নি। আর যদি কোন দোষই হয়ে থাকে, তবে চল এখানকার লোকের বিশ্বাসপূত—সেই জাগ্রত দেবীর মন্দিরে। সেখানে গিয়ে আমাদের মনের প্রার্থনা জানিয়ে—তা কাটিয়ে দিয়ে আসি, কেমন?"

উত্তরে সুচিত্রার মুখ মৌনতার মধ্যেই মুঠো মুঠো রভস মাখলো। কোন কথা বলতে চাইল না। শুধু আবেশ ঝরালো।

এ পর্য্যন্ত বলে অভিজিত সুচিত্রার আঁচলা টেনে নিয়ে তার চোখের জল মুছিয়ে দিল। তারপর হঠাৎ দুষ্টুমি করার অভিলাষে—নিজের হাসি মাখানো অধর দিয়ে—মিষ্টি ববুলার নরম সুস্মিতা ঠোঁটের ওপরে পরশ চেপে ধরলো। চুমার কয়েকটা ভেজা ভেজা দাগ—লম্বা ক'রে টেনে টেনে এঁকে দিল। একটু পরে অভিজিত বুবুলার দুটি তুলতুলে গালের পেশলতাকে রাঙিয়ে তুললো—লজ্জার সুখে। লজ্জারই তৃপ্তিতে। বলল—"বুবুলাঃ। তুমি?"

বুবুলা নিজে তখন অভিজিতের কাজল কালো চেখের মধ্যে অধরাভিসার চালালো। প্রেমময় স্বামীর অধরকে তখনি সুধা ঢেলে সাজিয়ে তুললো—অধর দিয়ে টেনে টেনে আঁকা—এক একটা গভীর পরশে।

অভিজিত বলল—"এই বুবুলা। যাও তৈরী হয়ে নেও। এখনই ত' বেরুতে হবে। তুমি তোমার জন্মদিনের জন্য আমার দেওয়া লাল রেশমী শাড়ীখানায়—আমার মনের মতো ক'রে সেজে এসো। আর আমি এদিকে নিজের কাপড়-জামাটা বদলে ফেলি। যাও, দেরি করো না বুবুলা। সেখান থেকে আমাদের আবার আদিবাসীদের এলাকায় যেতে হবে। আজ আমার পরিদর্শনের কথা আছে।"

রূপবতী বুবুলার মুখে এখন লাল ঠোঁট দুটি উপছিয়ে মিষ্টি হাসিতে লুটোপুটি ক'রছে। তাই দেখে বলল অভিজিত—"বুবুলা। আমরা দেবীর মন্দিরে যাচ্ছি। এখন যদি আবার ভীতিবিহ্বলা হ'য়ে পড়—তা হ'লে দেবী সত্যি আমাদের ওপরে রাগ ক'রবেন। বুঝলে কি, দুষ্টু?"

তাই হাসির কাকলিতে রভসিতা বুবুলা অভিজিতকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলল—"বুঝেছি। আমি বুঝেছি। আর ভয় পাব না।"

অভিজিত বলল তখনি—"বুঝলাম তুমি ঠিকই বুঝেছো। কিন্তু নির্ভাবনায় যাবো কি কোরে বল? তুমি যে বুঝেও ভুল কোরে অবুঝের মতো একটু আগে পেয়েছিলে ভয়? তা হোলে? আচ্ছা, তুমি ত নিজে ডাক্তার! জানি ডাক্তাররা মনের দিকে থেকে কঠোর হয়! আর কিনা তুমি কেঁদে ফেললে এই ব্যাপারে! দ্যুৎ। কী যে তুমি!"

প্রিয়র কথার মায়ারাগে না ধাঁধিয়ে—তখনি সুচিত্রা জানালো মধুবাতায় কাঁপা কাঁপা কথায় খুশীয়ালিনী থেকে—"আচ্ছা অভিজিত। এত বেশ, আমি ডাক্তার বলে বুঝি অভিমান কোরতে পারি না? আর ডাক্তার বলে বুঝি কাঁদতে পারি না, না? আমাদের মেডিকেল্ জুরিস্প্রুডেন্সে এমন কোন নিষেধ আরোপ করা হয়নি, যে, কোন মেয়ে ডাক্তার হওয়ার পর তার যুবতী সুখের কারণ ধরে

অভিমান কোরলে পর, বা কাঁদলে পর তা অপরাধ বলে ধরা হবে। বুঝলে গো, তেমন কিছুটি বিধির কোন কড়া হুকুম নেই। এই, তুমি যে দেখছি কথা তুলে যাওয়ার ব্যাপারে দেরি কোরছ। চল এবার।"

—"সত্যি, সত্যি। তোমার সাথে কথায় পার পাওয়া আমার মতো জেলাশাসকের পক্ষেও সম্ভব নয় দেখছি। ওগো দুষ্টু। হার মানলাম তোমার কাছেতে।"—বলে প্রিয়ার অধরে লাল রঙ্ ধরে জানালোই আপন অধরের ছোট্ট এক আদর। এক টুকরো আবেশ।

—৪ঠা মার্চ, ১৯৫৫।

বনানীর মাঝে

প্রিয়দর্শন ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুন্দরমনেষু

সোনালী আভায় মেশানো শরতের ঝিলমিলে রোদ। তার রিমঝিম আলোতে, ঝলমলে পাহাড়ী উপত্যকার নীচে আমাদের ভায়োলেট ক্রাইসলারখানা তমাল-তালি-বনরাজি-নীলার ধারটি ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ল—কাঁকন-চুড়িরকিঙ্কিণী রব তুলে। সে জোড়ালো রবারের তানে বন্য-হরিণেরা একবারের মতো একটি ক'রে বীড়াবনতার চাহনি ছড়িয়ে দিয়ে পালিয়ে গেল—বনেরই গহন তলে। হরিণেরা সে রবাব শুনে শুনে মুগ্ধই হয়েছিল। আনন্দ পেয়েছিল তা থেকে। সে কথা তারা জানালো তাদের প্রকাণ্ড বড় বড় সিং নাচিয়ে— খেয়ালী খেলার মধ্যে মাতামাতি ক'রে। তারপর চোখের পলক পড়তে না পড়তেই—তারা ছুটলো হরিণীদের সঙ্গে শখ্ মিটিয়ে মিলনের ছন্দ ফুটিয়ে তুলবে বলে—বনেরই কোন প্রান্ত ভাগে। তারা ছুটে গিয়ে একে অন্যের সঙ্গে মিতাক্ষরের ছন্দকে গঠন ক'রে তুলবে। ওরা হরিণীদের সাথে মিলবে—সবুজ বনানী আর কাকলি মুখর নদীরই সঙ্গমে।—তাদের মিলনের সেই সাঙ্কেতিক লীলাভূমিতে। যাবার আগে হরিণেরা আমাদের ভায়োলেট রঙের ক্রাইসলারকে—মাথার ওপরে সাজানো মুকুটগুলোকে অবনত ক'রে —অভিবাদন জানিয়ে বলে গেল—মৃদু-মধুর গুঞ্জনেরই মধ্যে দিয়ে নাচতে নাচতে—"ভিনদেশী ছেলে-মেয়ে। তোমরা এসো। তোমাদের জানাই সুস্বাগতম!"

সঙ্গে সঙ্গে সবুজ বনানীর মধ্যে ঝিলমিল কোরে উঠলো রিমঝিম রোদ। মিষ্টি আভা ছড়ানো আলোর সঙ্গে খেলায় মাতোয়ারা— সেই কাঞ্চন বর্ণা আভার তীক্ষ্ণ রশ্মিচ্ছটা। মিষ্টি রোদের স্বর্ণাভা—গাছ-গাছালির ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারা টুকরো টুকরো আলোগুলোকে নিয়ে নিয়ে— কোন মায়াবিনী যেন তখন তার বিস্তৃত আঁচলখানা পেতে বসে—রং-বেরঙের প্রকাণ্ড এক জাল বুনে বুনে চলেছে। সে জাল-বোনা আলো-আঁধারির লুকোচুরি খেলার মধ্যে হচ্ছে। তাই মায়াবিনী সেই জাল বুনতে বুনতে—হাসিরই শত-ধার মূর্চ্ছনার মধ্যে ভেঙে পড়েছে। তমালতালি বনরাজি-নীলা পর্য্যন্ত—সে হাসির মায়াজালে আটকে গিয়ে প্রগল্‌ভাদের মতো—মনেরই গোপনতম আনন্দ-প্রকাশনার ব্যঞ্জনায় ব্যঞ্জনায়

লুটো-পুটি হুটো-পুটি কোরে চললো। আমাদের ক্রাইসলারও সে ব্যঞ্জনার মধ্যে মিতালিতে—নিজের ভায়োলেট রঙের আভা ম্লান ভাবে ছড়াতে লাগলো।

একটা বাজনার মতো টুং-টাং শব্দ তুলে দু'ধারের দরজা দুটো খোলা হোল। প্রথমে পাহাড়ী পথের ওপরেতে পা ছোঁয়ালাম আমি নিজে। বনের রোমাঞ্চ যেন আমার মতো মানুষটিকে পেয়ে ভয় লাগাতে চেষ্টা কোরল। মৌন বনের ভাবটি বড় গাম্ভীর্য্যপূর্ণ। অবশ্য বাইরে থেকে তাই মনে হয়। ভেতরে একেবারে অন্য রূপ। সেখানে প্রকৃতির আদি ও অকৃত্রিম সমস্ত রূপ ও অরূপের সন্ধান মেলে। কিন্তু বাইরেই তার যত গম্ভীরা মূর্তি।—আর সে মূর্তির সঙ্গে মিশেছে নির্জন এই পাহাড়ী পথের—থমথমে ভাবতরঙিগমাগুলো।

অন্যভাবে আর একটা শব্দে হোল খটাস্ কোরে। আমার দিকের দরজাটা বন্ধ হোল। লম্বা সরু চেনের রিঙ্ থেকে ঝোলানো গাড়ীর চাবি দোলাতে দোলাতে সামনে সরে এসে দাঁড়ালাম—অপর দিকের দরজার কাছে। পা-দানির ওপরে একখানা পা তুলে দিলাম। এক হাতে দরজাখানা ঠেলে ধরে গাড়ীর ছাতে অন্য হাতখানা রাখলাম। মিষ্টি হাসির লহমা ছড়িয়ে—কতকটা শরীর হেলিয়ে ঝুঁকে পড়লাম গদিতে সুখাসীনা লালবসনার প্রতি। খুশীয়ালিনী মধুরিকার প্রতি।

আমার চোখের চাহনি বোধ হয় কোন রকম মধুরিমা যোগালো লালবসনা সুজাতার চঞ্চ লিত মনোরাজ্যের—ছল্‌ছল্ গতিপথে। মনের প্রতিটি স্পন্দন-রেখার সমতা রেখে তার কমনীয় কান্তির কাঞ্চ ন সাদৃশ্য আভাকে আবরণে ঢেকে দিয়ে—থম থম কোরে কেঁপে উঠছে লাল রেশম। লৌ-ধ্ররেণুতে সুবাসিতা সুজাতার গোলাপী গালেতে টোল খেয়ে যাচ্ছে।—তারই রক্তিমাভা লাগানো পদ্মমুখের রভস হাসির মূর্চ্ছনা। সে হাসির মূর্চ্ছনা সমস্ত অঙ্গে সৌষ্ঠবের মধ্যেই আনাগোনা কোরছে। বিশেষ কোরে রূপ-তরঙ্গের দোলায় নাচিয়ে তুলে ধরেছে গাড় ক্রীম রঙের ব্লাউজেরই ভেতর থেকে—নরম বুকের নিটোল রূপ দুটিকে। সেখানেও প্রাণের লুকিয়ে থকা সরল হাসিখানা খেলে বেড়াচ্ছে যৌবন-মধুরিমার পরশ-লাভে। পঞ্চ বিংশতীয়া কন্যা সুজাতার ক্রীম রঙের আবরণের মধ্যে—বুক থেকে ভাসমান তরীর মতন রূপ দুটিকে আরো স্পষ্টভাবে প্রতীয়মানা কোরে ব্যঞ্জনা দিচ্ছে—তুল তুলে রেশমী শাড়ীরই টকটকে লাল রঙ্। বুকের যে রূপ প্রাণ-চঞ্চ লতার কেন্দ্র। ভালবাসার আধার। সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার। অভিসারে যাবার সংকেত কুঞ্জ। লজ্জা হরের লাজুকতা। জীবন দেবতার অভিষেক স্থল। প্রণয় উপাসনায় বন্দীর রূপেতে প্রিয়তমকে সেখানে স্থাপন করে। সকলের ওপরে সে ব্যঞ্জনাময় রূপ জীবনের দৃপ্ত ভাবটিকেই প্রকাশ কোরে চলে।— চোখ ঠাণ্ডা

হ'য়ে জড়িয়ে এলো আমার—তাই দেখতে দেখতে। রূপ-দর্শনে বিভোর হোয়ে পড়েছিলাম। তা কাটিয়ে দিল আমারই প্রারের শুকতারা। এই লালবসনায় সুন্দরী হোয়ে থাকা—পঁচিশটা একটানা বসন্তের—স্ত্রী-সুজনা সুজাতা।

পাহাড়ী পথের থম ।মে গুমোট ভাবটিকে প্রথমেই ভেঙ্গে দিল—খান খান কোরে কথা বলে—সুজাতা নিজে। কোলের ওপর থেকে ডান হাতটি আমার দিকে তুলে ধরলো—হাতেরই বালা-কঙ্কনের এক যোগে সৃষ্টি হওয়া—রিনি-থিনি-রিনি-থিনি শব্দ কোরে।—বলল—"ধর"।—কথা বলে মুখ থেকে রঙীন হাসি ঝরিয়ে দিতে লাগলো। অপূর্ব সে হাসির স্ফূর্ততায় ঝরানো—তারই সুন্দরী ঝরনারূপটি দেখতে। সুজাতার সমস্ত হাসিটাই রঙীন বিহ্বলতা দিয়ে যেন তৈরী।

হাত বাড়িয়ে দিয়ে মুঠোর মধ্যে ধরে নিলাম তারই দুধে-আলতায় রাঙা নরম হাতখানা। ধরেছি বলে তার মধ্যে আনন্দের ভাবটি আরো নেচে উঠল। কল্‌কল্ ছল্ ছল্ মনেরই মূর্চ্ছনায়। রূপবতী সুজাতা আপন শরীরময়তায়—রিদ্‌মাস লহরে লহরে—মুঠো মুঠো মেঘমেদুর মাদকতায় সাজালো। আর নাচালো নিজের লালবসনা দেহী-রূপকে।

একটু টান দিল আমার হাতেতে সুজাতা। বলল—"এই, শোন।"

"বল। আমি শুনবো।"—বলে ডান্‌লোপিলোতে আরাম ক'রে বসা সুজাতার দিকে আরো খানিকটা ঝুঁকে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে হাতের মুঠোতে ধরে থাকা নিজের হাতখানা ছাড়িয়ে নিল অনায়াসে। তারপর আমার কাঁধের ওপরে হাত দু'খানা রাখলো। রেখে নিজের দিকে একটু টেনে নিতে চেষ্টা কোরল আমাকে। তাই ওর ওপরেতে আরো একটু ঝুঁকলাম আগের চেয়ে। শেষে সুজাতা প্রাণ জুড়ানো আর মাতাল করানো সেই মিষ্টি হাসি ছড়াতে ছড়াতে আমার কানের কাছটায়—নিজের মুখটা এগিয়ে এনে গুন গুন ক'রে গানের সুরে শোনালো 'টেম্পেস্টে'র এরিয়েলের কথা—"মেরিলী মেরিলী শ্যাল্ আই লিভ নাও, আণ্ডার দি ব্লজম্ দ্যাট্ হ্যাংস্ অন দি বাউ।"

একথাশুনে আমার মন কাকলি মুখরে নেচে চললো। আমরা দু'জনেই বড় ভালবাসি এই কথা কয়টি। এরিয়েল বলেছিল—"আই লিভ।" আমার সুজাতা বলল—"আই প্লে।"—আনন্দের আতিশয্যে আমি হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম আদর করার মতো ক'রে।

আচমকা আমার কাছ থেকে খানিকটা আদর পেয়ে সুজাতার ভেতরটি একটি ছোট্ট শিশুর মতো খিল খিল হাসিতে মুখর হোয়ে উঠলো। শত ধারায় তা উপ্‌ছে পড়তে লাগলো। আমি বলাম—"তুমি শুধু খেলা করবে? শুধু খেলা?

আর আমি সে খেলার মধ্যে যোগ দিয়ে আনন্দ লুটবো। সুজাতা, বল, কেমন মজা হবে তখন?"

নীল ভেলভেটের চটি পরা, আলতায় রেখা টানা একখানা পা বাইরে এনে মড্‌গার্ডের ওপরে রেখে সুজাতা বলল—"এই, মজাটা কি?"

হেসে ফেলে বললো—"মজাটা তখনি হবে যখন তুমি এই পাহাড়ী পথ ধরে ছুটে যাবে কোথাও। আমায় পেছনে ফেলে রেখে জব্দ ক'রবে বলে। এগিয়ে গিয়ে নিজেকে লুকিয়ে রাখবে কোন ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে। আর তোমাকে খুঁজে বেড়াব আমি। একবার এ-ধার আর একবার সে ধার ঘুরে ঘুরে দেখে, শেষে হয়রানির চোটে ক্লান্ত হোয়ে মাটিতে বসে পড়া আর কি! আমার অবস্থা দেখে তুমি নিজে থেকেই তখন এসে ধরা দেবে। সামনে দিয়ে ত' আসবে না। পেছন দিয়ে আতি সন্তর্পণে এসে হাজির হবে। তোমার উপস্থিতির কোন টেরই পাব না। তুমি তখন অতর্কিত ভাবে ঐ পেছন থেকেই আমার চোখ দুটো টিপে ধরে আস্তে আস্তে নিজেকে এলিয়ে দিতে থাকবে আমার দুষ্টুমিতে মাতা যৌবন দেহের ওপরে। জান সুজাতা, আর তখন সুযোগ পেয়ে—"

কথার মধ্যে সুজাতা বাধা দিল। বলল—" ঢের হয়েছে। অনেক হয়েছে। আর বলে না। কিন্তু জানতে পারি কি এই মজার ভাগীদার কে? তুমি?— মোটেই না। আমি! বুঝলে আমি!"—দুষ্টুমির ভাগ তার কাজল দিয়ে সুন্দর ক'রে আঁকা চোখের পাতার মধ্যে মদালসা হোয়ে নেচে গেল।

আমি বললাম— " তোমার নয়। ভুল বলছো। মজার আনন্দটা হবে আমার। শুধু আমারই। এই, বুঝলে গো দুষ্টু।"

সুজাতা দুষ্টুমির সেই ভাব কজ্জলিত চোখের মধ্যয় নাচিয়ে নাচিয়ে বলল — অপাঙ্গের চাহনিতে তাকিয়ে থেকে—"তার মানে? এই?"

তখনি বললাম—"মানে খুব সোজা। এটা ত তোমার আর কোন চেনা জায়গা নয়। এই সবে নতুন আসা হয়েছে। কাজেই এখানে একটু সাবধানে চল। কোন দুষ্টুমি বুদ্ধি খাটাতে যেয়ো না। লক্ষ্মী মেয়েটির মতো চলবে। আমাকে জব্দ কোরেতে গেলে নিজেই বিপদে পড়বে। আমাকে ছেড়ে একলা নিজে কোথাও যাবার চেষ্টা করো না। একে পাহাড়ী পথ। তায় অচেনা। আর অজানা সব জায়গা। কাজেই রাস্তা হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা খুব বেশী। কোন দিক দিয়ে এসেছো, ফেরবার সময় তা কিছুতেই আর মনে পড়ছে না। শেষে পথ হারাবে ঠিকই তুমি। আর আমাকে তখন সব—"

এবারও কথা শেষ হোল না। আগের মতোই সুজাতা থামিয়ে দিল—"হয়েছে গো, হয়েছে। কথা অনেক বলা হয়ে গেছে।"—বলতে বলতে এক লাফে গাড়ীর আসন ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ালো। আমার সামনেই। লাল রেশমের শাড়ী ঝিকি-মিকি খেলা আরম্ভ ক'রল— মিস্টি রোদের রিমঝিম আলোর সঙ্গে মিলে গিয়ে। আর নেচে উঠে।

বধূ সুজাতাকে সোনালী শরৎ বরণ কোরতে এসে— নিজেই প্রকৃতির কোলে তুলে নিল অভাবনীয় রূপে। ওর মাথার সিঁথিতে টানা সিঁদুরকে নিজের আভায় মোহনীয় কোরে তুললো। বধূ জীবনের গৌরমবয় পরিচয়-টীকা এই সিঁদুর রেখাকে মুকুট পড়িয়ে দিয়েছে সোনালী আভার আবরণে। তার বধূ জীবন সার্থক হোল শরৎ ঋতুর এইঝলমলে দরবারেতে। সুজাতার নতুন কোরে আজ এই মুহূর্তে আবার অভিষেক হোয়ে গেল— নতুন বিবাহের অভিষেকের পবিত্র মালাকন্না আমার গলায় শোভা পেল। সুজাতা নিজের হাতে পরিয়ে দিল। শরৎ ঋতু শুভাশীষ বর্ষণ ক'রলো আমাদের ওপরে। সবই যেন সম্পন্ন হোল প্রকৃতিরই যাদুকাঠিরর সংস্পর্শ পেয়ে।

সুজাতা ক্ষণিকের জন্য থাকলো চুপ ক'রে। আমিও থাকলাম তেমনি বাক্‌শূন্য হোয়ে। কোন কিছু বলতে পারলাম না। তার বধূ থেকে প্রজ্ঞাময়ী বধূতে রূপান্তরিতা হওয়ায়। আমার সুজাতা তার রূপ খুলে খুলে আজ হয়েছে— প্রজ্ঞাময়ী।—তাই ভেবে আমার খুশীয়াল মন নাচলো। প্রাণ দুললো। অভিব্যক্তি হাসলো উজ্জ্বল হ'য়ে। কল্ কল্ করে জেগে উঠলো আমার মুখে হাসির বৃষ্টিধারা। চোখের মধ্যে আনন্দের হিল্লোল। আবেশ এলো। বিহ্বলতা গেল। চঞ্চ লতা পালালো। স্থিরতা ফুটলো। আমার ভেতরে আর্তি শত ধারায় সৃষ্টি হ'য়ে— ভালবাসার ব্যঞ্জনা দেখাতে প্রয়াসী হোল।

মৃদুভাবে সুজাতাকে কাছে টানলাম। আমার বুকের মধ্যে ধরা দিয়ে খিলখিল ক'রে বার কয়েক তীব্র হাসির মূর্ছনা তুলে—পাহাড়ী পথের একঘেয়ে নীরবতাকে সরগমরম ক'রে তুললো। শেষে ভোর বেলাকার শিউলি ফুলের মতো নরম হাসি মুখে নিয়ে বলল—"আমি দুষ্ঠু মেয়ে। তা দুষ্টুমি না করে কি পারি? বল তুমি, আমি কি দুষ্টুমতী নই?"—বলে আমার কাঁধেতে নিজের মাথা আলতো ভাবে শুইয়ে রাখলো। রাশি রাশি করা কালো কেশ থেকে সুবাস ছড়ালো।

আমি বললাম—"তুমি লক্ষ্মী মেয়ে। বড় লক্ষ্মী। তবে মাঝে মাঝে ইচ্ছে ক'রেই তুমি দুষ্টুমি কর। বল, ঠিক বলি নি?"—এই বলে তার পিঠেতে হাত বুলোোলাম আদর ক'রে।

কাঁধ থেকে মাথা তুলে তখন আবদারের ভঙ্গিতে সুজাতা আমার জামার বোতাম আঙুল দিয়ে টিপতে টিপতে বলল—"আমার দুষ্টুমি বুঝি তোমার ভাল লাগে না, না?"

বললাম—"খুব ভাল লাগে।"—আগের মতোই হাত বুলোলাম তার ঝপঝরা গায়ে। মাথায়। মুখে। গলায়। রূপসায়র হওয়া সুজাতার বুকেতে। ওরই গালেতে নিজের গাল ছুঁইয়ে লাগিয়ে রাখলাম।

আনন্দেয় প্রায় নেচে উঠে সুজাতা বলল—"আমি দুষ্টু মেয়ে। আবার আমি লক্ষ্মী মেয়েও। বুঝলে, দুটোই আমি। এখানে আর দুষ্টুমতীকে পাবে না। পাবে শুধু লক্ষ্মী সুজাতাকে।"

উৎফুল্ল হৃদয়ে নেচে উঠে প্রগাঢ় আলিঙ্গনের মধ্যে জড়িয়ে ধরলাম—বধূ সুজাতার দেহী-তাপঝরারই রূপঝরনায় ফোটা সুষম ব্যঞ্জনাখানাকে।

সুজাতা আলিঙ্গনের মধ্যে এলিয়ে পড়ে চোখ দুটো বন্ধ কোরল। মৃদু-মৃদু আবেশ ঝরা রূপ, আর আকুল করা শুধু কাকলি-মুখরতায়। আরামের ছবি হ'য়ে ফুটে উঠলো তার বন্ধ করা চোখের কাজল আঁকা পাতায়। স্নিগ্ধতায় জড়িয়ে আসছে মোহনীয় হোয়ে। চাপা অধর যুগলের ফাঁক দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে আরো কিছুটা নরম হ'য়ে ভোর বেলায় ফুটে ওঠা শিউলি ফুলের সৌরভ মেশানো হাসির—ছোট ছোট টুকরো। গোলাপী গালে টোল খাচ্ছে। ছোট ছোট কাচ্চিলের মতো দেখতে দেখতে গড়িয়ে ম্লান হয়ে মিশে যাওয়া সে সব টোল খাওয়া। অপলক চোখে সে দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে সুজাতার বন্ধ চোখ দুটিতে—পর পর দুটি চুম্বনের রেখা এঁকে দিলাম। বধূর সুস্মিত অধরেরই লাল রঙ্ বরাবর।

বনানীর অতি নিঝুমতর নিরালা রূপখানাকে লাজহর করার মধ্যে দিয়ে—তৃপ্তা হ'তে হ'তে, আর দীপ্তা হ'য়ে হ'য়ে—সুজাতা একটু তফাতে একটা তৃণে তৃণে সমাচ্ছন্ন সবুজ মখমলের মতো দেখতে জায়গাটুকুর দিকে—আমার দৃষ্টি টেনে আনালো। বলল হাসিতে ঝলমলিয়ে আর আনচানিয়ে—"এই। চল, একটা সুজনি বিছিয়ে একটু বসা যাক ওখানটায়। বসে বসে বেশ সূয্যিমামার শরীরের থেকে তাপ গ্রহণ করার মধ্যে দিয়ে পাওয়া যাবে মজা। এসো। চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকলেই চলবে বুঝি! এসো, লক্ষ্মীটি আমার।"—কথা বলার মধ্যে বোঝা গেল—আমার মুখ থেকে নির্ঝরিত দুষ্ট প্রভাবটির রেশখানা এখনো পর্য্যন্ত ওর নরম নরম লাল ঠোঁট দু'খানার ওপর ওপর—শিহরটিকে ধরেই রেখেছে। এখনো আবেশ ফুটে রয়েছে বলেই ওর হাসিটি কাঁপছে থরে থরে খুশীর মন-মাদকতা নিয়ে। আর সুখের অুসন্ধনানী শরীরময়তা নিয়ে।

কথা বলে কোন দিকে আর না তাকিয়ে সুজাতা গাড়ীর ভেতর থেকে মোটা সুজনিখানা হাতে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। ঝুঁকে পড় সবুজ মখমলের মতো ঘাসের ওপর ওখানা পাততে গিয়েও কী যেন মনে হওয়ায় আবার ওটা হাতে নিয়ে সামনে চ'লে এলো। বিস্ময় নিয়ে বলল—"এই, কৈ তুমি ত বললে না কিছু? ওখানেতে বসাটা ঠিক হবে কিনা তাই নিয়ে? না, না, না। তুমি যদি হ্যাঁ বল তা' হোলেই ওখানে বসবো। তা না হ'লে নয় আর কি!"

আমি সুযোগ বুঝে বললাম—"আচ্ছা, শহর ছেড়ে এই বনের শাল-মহুয়া দিয়ে ঘন হ'য়ে ঘেরা এমন এক নিঝুম পথটিতে ঢোকবার আগে বল ত' কেন ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে নিয়েছিলাম ইঞ্জিনের খুঁটিনাটি নিয়ে? আর কেনই বা সব দরজা এই দিনমানেতেও ভেতর থেকে লক্ ক'রে দিয়েছিলাম, তা কি তুমি অনুমান কর নি? এমন একটা পথে চলতে চলতে একটু অল্পক্ষণের বিরতি দিয়ে গাড়ী থামিয়ে বাইরে নেমেছি ঠিকই। তবে সতর্ক আছি। এই গাড়ীরই আশ্রয়টির মধ্যে। অঘটন এলে সঙ্গে সঙ্গেই নিজেদের রক্ষা ক'রতে পারবো। বলি, এইমেয়ে, সাহস থাকে ত' তুমি নিজেই না হয় গিয়ে বসো। আবার আমায় নিয়ে টানাটানি কেন বাপু? থাকো তা' হ'লে তুমি এমনি ক'রেই এক বিলোলিতার মতো ষ্ট্যাচু হ'য়ে। আর আমি কিন্তু উঠে বসলাম গাড়ীর মধ্যে। বুঝলে মেয়ে?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি। নিজে ত' আত্মরক্ষা ক'রলে এখনি ভেতরে ঢুকে! আচ্ছা বীরপুরুষ তুমি! নিজের স্ত্রী থাকালো বাইরে, আর ওকে কিনা ঠেলে দিচ্ছ আরো বাইরেতেই! ভারী দুষ্টু তুমি। এই, এই সরে বসো। আমায় আসতে দেও। ও কি হচ্ছে? সর। এই, ঢুকবো কি ক'রে, এইটা ছাড়া ত' সব দরজাই ভেতর থেকে লক্ করা। এই সরো না। লক্ষ্মীটি আমার।"—মিনতি ভরিয়ে আনত চোখের দৃষ্টি নিয়ে তাকালো বধূ সুজাতা।

আমায় তখন দুষ্টুমিতে পেয়ে বসেছে। তাই পথটিকে আরো ভালো ক'রে আগলে নিয়ে বসেছি—যাতে জারিজুরি ছাড়া সুজাতা ভেতরেতে না ঢুকতে পারে। আমার চোখেতে দুষ্টুমির রঙ্ ঠিকরিয়ে বললাম—"এই। এই সুজাতা। এমন বনের মাঝখানটিতে রয়েছো দাঁড়িয়ে, আবার পেয়েছো ভয়, তাই বলি কি এমন সুযোগ ছাড়তে আছে না কি! ওমর খৈয়াম ত' বলেই গেছেন —যৌবনের ভালোবাসাবাসিতে এমন সুযোগ একবারই আসে। দু'বার নয়। তাই সময় থাকতে থাকতে করো এর সদব্যবহার।"

একটু থামলাম। বেশ মধুরতা ছড়িয়ে আর ছিটিয়ে হাসলাম। ওকেও হাসালাম। লাগলো ভালোই। লাগলো মঞ্জুলা সুজাতাকে নিখুঁত এক মধুছন্দারই মতো। এক

বিপ্রলব্ধার মত। শেষে হৃদয়াকুলতার ঝড় তুলে আনচানিয়ে বলে ফেললাম—
"ওগো। আমি তোমায় আদর করেছি। এবার তুমি নিজে থেকে আমায় এমন ভয়-ভয় জড়ানো বনানীর মধ্যে থেকে আদরখানা জানাবে না? এই, কি? আমার খুশী, আদর জানাও।"

সুজাতা জানালো—"না। না। কখনোই তা পাবে না। মোট কথা, তা আমার কাছটি থেকে পেতে দেবো না তোমার মতো দুষ্টুকে —যে আমায় এই বনানীর মধ্যে গাড়ীর বাইরে রেখে ইচ্ছে ক'রে ভয় দেখাতে চায়। বুঝলে, না, না, না। এই তিনবার বললাম কিন্তু।"

আমি তখনি বললাম—"না বলেছো ত' কি হ'য়েছে! তোমাদের এই মানা জানানোর না-য়ের মানেটাই যে হ'ল হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাই না? সত্যি-সত্যি, সার্ভেন্টেসের ডন কুইক্সোটে ঠিকই বলা আছে। এই দুষ্টুমতী, জান ত' যে, "Between a woman's 'yes' and 'no'.... There is no room for a pin to go."—কিগো অনিন্দিতা, এমন সুভাষণের পরেও কি তুমি যুবতী স্ত্রী হোয়ে বলতে চাও, যে, মেয়েদের 'না' হোল 'হ্যাঁ' নয়? আসল কথাটি কি জান, তোমরা এত লীলারঙ্গ পছন্দ কর যার জন্য এই না, না বাচক সম্মতিটি জানিয়ে জানিয়ে চাও আর কি—যাতে ছেলেরা এই ব্যাপারে তোমাদের সঙ্গে জারিজুরি নিয়ে বেশ কিছুটা যুঝতে পারে, তাই না? এইভাবে তোমরা সহজকে কোরে তোল দুর্লভ! বাব্বা। এ ব্যাপারে সত্যি তোমাদের জুড়ি পাওয়া মুস্কিল।"

"বেশ ত' জোর ক'রে পার ত'—তা আদায় কোরছ না কেন? এত সুন্দর সুন্দর কথা জানাবারই বা কি আছে। জোর করই না, তারপর পাও কি না পাও সেটা দেখা যাবে। এই সরে বসো। কি যে কর না সত্যি ভালো লাগে না।"—কথা বলতে বলতে সুজাতা তার স্বভাব স্নিগ্ধ সেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সজল দিঠিতে ভরা অভিমান নিয়ে তাকাচ্ছে আমারই দিকে। আমাদের ক্রাইসলারের পেছনের থেকে একটা ক্যাঁচড় কাঁচড় শব্দ কানে ভেসে আসতেই—আর যাবে কোথায় সুজাতা। হঠাৎ ভয় পাওয়ারই মতো কোরে ও একটানে নিজেকে সরিয়ে ঝুপ ক'রে বসে পড়লো আমার কোলের কাছটিতে ; একরকম কোলের ওপরেতেই বসে—সজল অভিমান ভরা চোখেতে তাকিয়ে বলল— " দোহাই তোমার। অসহায়া আমাকে নিয়ে সত্যি এত মজা তোমার ভালো লাগছে? দ্যুৎ। সরে বসো। আমার, হ্যাঁ, আমার সত্যি ভয় কোরছে। এই, তুমিই যে দুস্টুমি কোরে ভয় পাইয়ে দিয়েছো সেটা কেন ভুলে যাচ্ছ। এই, কথা শোন।"—সত্যি-সত্যি ঐ কথা বলার মধ্যেই সুজাতার মায়ারাগ নিয়ে ভরপুর থাকা চোখ দুটোতে

মুক্তার মতো শুভ্রা জলকণা জমা হ'য়ে এলো। এই আর কি একটু বেশী মাত্রায় অভিমান ছাড়ালে পরেই—মুষলধারাতে নামবে বৃষ্টির ঝরঝরানি। দুই কপোলের প্রসাধনী পরাগ থেকে কাঁপন ধরা টোল আস্তে আস্তে গড়াচ্ছে তখন। তারই মধ্যে সুজাতা নীচের দিকে রাস্তার গড়ান দেখছে দৃষ্টি ঘুরিয়ে। তখনও কাঁচড়-ক্যাঁচড় শব্দটি উঠে আসছে অবশ্য ম্লান হোয়ে।

আমার বরকন্যার ভয়-ভয় জড়ানো দৃষ্টিকে অনুসরণ কোরে ভালো ভাবে তাকিয়ে দেখতে পেলাম—গাড়ী থেকে কিছুটা দূরে—রাস্তার নীচেকার ঢালু অংশ দিয়ে একটা সজারু হেঁটে চলেছে। বেশ রাজসিক তার এখনকার চলার ভঙ্গি। নারকোলের সরু সরু কাঁঠির ফোলা ঝাঁটার মতো ঐ জন্তুটির সমস্ত শরীরখানা রয়েছে ফোলানো। তাই দেখতে দেখতে আমার বরকন্যার যুবতী সায়রের ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে গভীর বাঁধন সৃষ্টি করার জন্য গাড়ীর ভেতরে সরে এসে সুজাতাকে স্বস্তিতে বসিয়ে—সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে বন্দী করালাম। বললাম দুষ্টুমি কোরে দরজাখানা সশব্দে বন্ধ কোরে দিয়ে— "এবার বেরিয়ে গিয়ে ঐ মখমলের মতো জাজিমখানায় বসবো না আর? খুব ত' তখন আমায় কিছুটা না বলার মতো কোরেই ত' যাচ্ছিলে ওখানটায় সাহস নিয় বসবার জন্য। তা সে সাহসখানারই এমন ভাবে ঘটলো কেন অপমৃত্যু? যাক, যাক। বেশ ভয়ই পেয়েছো দেখছি। থাক্, আর তোমার বিরক্ত করছি না।"

একটু থামলাম আমি কথা নিয়ে। আমারই পাশেতে ঘন হ'য়ে থাকা সুজাতাকে আদর কোরে বুকের মধ্যে কাৎ ভাবেই আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রাখলাম। ও ওর অভিমান ভরা মুখখানা আমার কাঁধেতে আরাম কোরে ধরে রেখেছে। আমি ওর চোখে-মুখে আঙ্গুলের পরশ বুলোতে বুলোতে বললাম সুন্দর কোরে—"সুজাতা, আমার খুশী। কৈ, তুমি নিজে থেকে আমার অধরেতে তোমার অধরখানা দিয়ে আবেশের আলপনা ফুটিয়ে ফুটিয়ে পাতাবে না,— সেই 'রাঙা হাসির বাসর শয়ন'? এই মিষ্টি। বলি, দুষ্টুমি না কোরে জানাও তোমার এই—সুন্দরী অভিষেকটিকে।"

কথা থামলো আমার। আর তখনি ঝল্‌মলানো হাসির গমক ধরে ধরে আমার মুখের বিভাসটি টুকরো টুকরো হোয়ে উঠলো। তারই মধ্যে দু'হাতের মুঠোতে আপন প্রিয়ার সুন্দরী মাধুর্য্য নিয়ে ধ্যানস্নাত মুখখানাকে তুলে ধরে অপলকে দেখতে লাগলাম—এমন এক নিঝুম প্রাকৃতিক পরিবেশেরই সেই মহাকবি সুভাষিত—সেই তমাল তালি বনরাজি-নীলাতে। দেখলাম শুধু পিয়ামুখচন্দা। দেখতে দেখতে বললাম—"কৈ গো অনিন্দিতা। ওগো বন্দিতা। বলি, করাবে না

এই অভিষেকটিকে সার্থক—এমন বনানীরই মাঝেকার গাছে-গাছে আর পাতায়-পাতায় শুধু হামলাহামলি আর জড়াজড়ি করারই ছন্দময়তার সাথে—মিল ও যতি রেখে?”

সুজাতা বলল সুন্দর কোরেই—“আমি কি বলেছি তা হবে না? তা হোতে দেবো না? শোন, আমি ত' ঝড় হোতেই চাই। মানা মানতেই চাই। তা না হোলে যে আরণ্যক মাহাত্ম্যকে আমরা করাবো—ম্লান। ' টেম্পেস্টের' পরিবেশ নিয়ে, তারই মধ্যে তোমার দুষ্টুপনায় উতাল আর মাতাল বুকের বাঁধনে নিজেকে সঁপিয়ে দিয়ে ঝড়ের তাণ্ডবে ভাসতে ভাসতে বলবো “Merrily, merrily shall I live now,...Under the blossom that hangs on the bough.”—বল' তা হোলে সত্যি কেমন হয়, এই?”

আমার মুখে শুধু অফুরান হাসি ঝলমলিয়ে থাকতে দেখে—সুজাতা আমার মুখের একটি ধারেতে তার একধারের কোমলতা ঝরানো কপোল ঘষতে ঘষতে বলল—“এই। তুমি যা চেয়েছো, তা কি তুমি এই মুহূর্তে না পেলেই নয়। প্রিয়ার অধরের করা আদর কি ভাসিয়ে নিতে চাও আমাদেরই যৌবনের মতো দুর্বার দুর্দমতায়? না, না, এত দুস্টুপনা সত্যি আমায় কোরে তোলায় হয়রান। এই, এই। এমন বনে বনে ছাওয়া শুধু সবুজের দেশেতে, যেখানে বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরণ্যক-দর্শন শুধু 'কানে কানে চুপি চুপি কথা' বলে,—সত্যি তেমন এক ধ্যানের জগতে কি আমাদের শহরের কোন এক তে' তলা আবাসের নির্জন একাকীত্বে ঘেরা—মস্ত নিরপেক্ষ ঘরখানায় থাকবারই মতো বেহায়া লাজহীনা হোতে ভালো লাগে? দ্যুৎ। এখন না হয় দুষ্টুমিকে জমা কোরে রাখ শহরে ফিরে গিয়ে হাজারবার কোরে পাওয়ার জন্য। দেওয়ার জন্য। কেমন?”

এর পরেও আমার মুখে-চোখে সম্মতির কোন আভাস—মুখেরই সরল রেকায় জগতে না দেখায়—আমার শ্রীমতী অভিমান নিয়ে একবার রাঙাবার চেষ্টা কোরল। ওর “বুকের বীণা”য় যেন মান অভিমানের পালাবাদল ঝঙ্কৃত হওয়ার চেষ্টা কোরল। তাই “বুকের বীণা”রই সুললিত রিদম্ নাচিয়ে নাচিয়ে—দাম্পত্য-যৌবনের লীলা বাসরের কারুকাজ সম্পর্কে যথাযথ কাব্যিক রুপদাত্রী—কবি অপরাজিতা দেবীর কবিতামহালের—অতি নীল নির্জতারই স্বাক্ষর নিয়ে আমরাই দুষ্টুকা শ্রীমতী সুজাতা—অসম দুষ্টুমিরই রঙে রঙে রেঙে উঠে জানাতে লাগলো—

“পাবে নাকো চুমু! কক্ষণো নয়! যখন তখন জুলুম নাকি?
ভেবেচো কি এটা মগের মুলুক?—চলবে না আর ও সব ফাঁকি!
সকাল সন্ধ্যে জ্ঞান নেই কিছু, সামনে পেলেই চুমুর দাবী!
বিয়ের আগে যে কাটাতে কি কো'রে, আজ শুধু সেইটে ভাবি।
আধখানি 'কিস্'ও পাবেনাকো! ঈষ্! জানত এখানে আমি রাণী!
স্পর্ধা তোমার বেড়ে গেছে বড়! ও'রোগের আমি ওষুধ জানি!
সাধলে কাঁদ্‌লে 'ভবী ভুলবে না'! অনেক শাস্তি রোয়েচে জমা;
রাণীর রাজ্যে আইন কঠিন, বিদ্রোহী কেউ পায় না ক্ষমা!

সরো, আমি যাই! রাগিয়ো না আর! আছে ঢের কাজের তাড়া!
কি যে খুনসুড়ী কর বোসে খালি! ছেলেমানুষেরও হয়েছো বাড়া।
দাও ছেড়ে দাও! দোর খোল, যাই! আটকে রেখোনা কাজের বেলা, বোস্‌বোনা আমি তোমার চেয়ারে, তবু কী যে কোর! কেবলি খেলা!"

প্রিয়ার রঙীন অধরাধার থেকে সুর ধরে, যতি মিলিয়ে বেরিয়ে আসা এই কাব্যিক মূর্চ্ছনারই স্মৃতিচারণা দেখে দেখে—আমি অসম খুশী হোয়ে উঠলাম। সুতৃপ্ত হলাম। আমাদের গাড়ীর ওপর নুয়ে পড়া গাছের ডাল-পালা—আর নীচেকার মাটিতে শুয়ে থাকা পরম নিশ্চিন্তির লতা-গুল্ম একাকার ভাব নিয়ে একধারারই জড়াজড়ির আর হামলাহাম ালির রূপটিকে সরেজমিনে ফুটিয়ে রেখেছে। এই নামধেয় অপার নিঝুমতার মধ্যে, নিশ্চিলত নিশ্চয় আর নিঃশব্দ দিয়ে সাজানো এই নিরালা কোণটিতে সূর্য্যসাক্ষী রেখে—মনের অলিন্দে ভাব দোল দিতে দিতে জানায়—"দুই থেকো না। এক হও। যুক্ত হও সঘন সন্নিবদ্ধতায়। হ্লাদিত হও। দুর্বার হও। অনিবার থাকা জাগতিক লাজ থেকে মুক্তি গ্রহণ কর—প্রিয়তে-প্রিয়াতে সাধিও লাজক দাম্পত্যিক রীতির ঋতুচয়নে। মিথুনায়নে। যৌবনিক জীবনায়নে।"...ও কথা ভাবতে ভাবতে আমি বাইরের রাজসিক সাজেতে সালঙ্কৃতা প্রকৃতিকে দু'চোখের রূপের তৃষ্ণা ভরিয়ে দেখছিলাম। কাঠবিড়ালিরা চিকির-মিকির করা ছোট ছোট শরীরে বড় বড় ফোলানো ল্যাজ নাচাতে নাচাতে তরতরিয়ে ওঠা-নামা ক'রছে—এক গাছ থেকে আরেকটিতে। গাছের ঘন হ'য়ে থাকা ঝোপ-ঝাড়েতে খড়-কুটো দিয়ে বাসা করা—নানান পাখীর কিচ-কিচানিতে সরগরম রেখেছে। মাঝে দোয়েলের শিষ্ মনমদির হোয়ে উঠছে ফুটে। তারই মাঝে বসন্তের কোকিল ডাক দিয়ে চলেছে—কুক-উ। পর পর ধীরে লয়ের দুটি ছোট্ট শব্দ। একখানা নোট নয়। দুইখানা কোরে নোট! রিদম!—শহরে এমনটাহোলে পর—সেখানকার 'din and bustle'—একটাকে আলাদা কিছু যোগাযোগ বলেই মনে করায়। তার স্বায়ত্বকীয় থাকে পুরোপুরি হাজার হট্টগোলের গোলকধাঁধায় বন্দী হোয়েও। আমার মনে হোচ্ছে এই মুহূর্তটিতে—আমার প্রিয়া সুজাতাকে বুকেতে বন্দী রেখে আদর জানানোর মধ্যে—সেই ছেড়ে আসা শহরেরই "far from the madding crowd" থেকে মুক্তি পাওয়ার এই "under the greenwood trees"-এর ছায়ায় ছায়ায় বসে বসে—এই প্রিয়া সুজাতারই রূপের কৃত্রিম হওয়া "a pair of blue eyes" ও "scarlet stained lips" পর্যন্ত— যেন সেজে উঠেছে প্রাকৃতিক পবিত্রতা। অনাবিলতা। স্বতঃস্ফূর্ততা।—তাই এই সবুজ বনানীর আরণ্যক বিলাস এটাই বুঝাতে পাবে, যে,—এখানে সব একাকার হোয়ে থাকে। এখানে আলাদা হওয়ার নেই কোন সুযোগ, সুবিধা। দুই কেন, শতেক-ধারার বৈশিষ্ট্যও—এখানে নিঝুম দুনিয়ায় একাকার হোতে বাধ্য। আজ আমি তাই বুঝলাম। আমার প্রিয়াও তাই নিশ্চয় কোরে বুঝেছে। অনেক, অনেক দিন আগে— সেই রূপকথার আরব দেশেতেই—ওমর খৈয়াম নামী এক দামী গাণিতিক—তার চাইতেও অনেক বেশী দামী কবি হোয়ে এমন ধ্যানকুট্টিমতাটিকেই সাহিত্যিক বিভূতিতে চিরন্তন করাতে পেরেছিলেন। তাই আপন

পরিণীতা এই সুজাতার ছবির মতো আরক্তিমা ভরা মুখে-চোখে—আঙুলের আদর করানো পরশে পরশে—দীপ্তা আর দৃপ্তা করাতে করাতে এই মুহূর্তেই আমার মনে হোল—অস্ফুটে গুনগুনানো থেকে—

"সেই নিরালা পাতায় ঘেরা বনের ধারে শীতল ছায়
খাদ্য কিছু পেয়ালা হাতে ছন্দ গেঁথে দিনটা যায়।
মৌন ভাঙ্গি মোর পাশেতে গুঞ্জে তব মঞ্জু সুর,
সেই ত সাকি স্বপ্ন আমার সেই বনানী স্বর্গপুর।"

এ হোল অনন্য। শুধু অনন্য। মার্ভেলাস্। এ ধ্যান জীবন-যৌবনের শোণিত থেকে চয়ন করা—ভালোবাসা 'বাসতে 'বাসতে। তাই এর অনুভব অনিন্দ্য। তা স্নিগ্ধ Splendid! ফুল উইথ্ আন্প্যারালালা গ্র্যাঞ্জার!

এত কিছু মুক্ত থাকা ভাবনায় ভাবতে ভাবতে, আর দু'চোখ মেলে দেখতে দেখতে—হঠাৎ আলোর ঝলকানি দেওয়ার মতো কোরেই চমকিত হোয়ে উঠেছে অধরের হাসি-হাসি স্ফূর্ততাটি। চমকটিকে শুধু অণুতে অণুতে অনুভব কোরলাম। প্রিয়ার মুখটি একটু আড়াল করালো আমারই চোখের দৃষ্টিকে—নিজেরই পবিত্রতায় আনচান করা মুখটিকে একেবারে আমার মুখের ওপর নিয়ে, ওরই আধরটিকে আমার দুষ্টু-দুষ্টু অভিলাষ ভরা হাসির মধ্যে লুটিয়ে দেওয়ায়। প্রিয়ার অধরের লাল প্রজ্জ্বলিত দ্যুতির মধ্যে—আমার অধর পথরুদ্ধ হওয়ায়—ক্ষণেকের জন্য পারলাম না কথার কোন ফুলঝুরির প্রথম ঝকমকানিটি ফোটাতে।—কিন্তু একটু পরে—সেই সময়েতেই বসন্তের দূতী কোকিলাদের কুক্-উ কুক্-ই তান-মান-লয়ের সাথে সাথে—প্রিয়া সুজাতা নিজেকে মিশিয়ে দেওয়ার মতো কোরেই গুনগুনিয়ে উঠলো—শ্রীমতী অপরাজিতা দেবীর কাবিব্যক-কথায়—অধরেরই দু'ধারার সঙ্গমেতে করা নিলাজ দুষ্টুমিপনারই খুশীতে ভিজে ভিজে ওঠা—লাল লাল ঠোঁটে ভরা সুখের কাঁপন ধরেই—

"সুড়সুড়ি লাগে বড়ো, ছাড়ো পড়ি পায়!
কাতুকুতু দিয়ো না গো!— দোহাই তোমায়।
বেড়ায় জুলুম বাপু!—নাও চুমু...হ'লো?....
....যাও, ভারী দুষ্টু—হুঁ!.... ঘরে যাই চলো।"

এ কথা জানাতে জানাতে প্রিয়া সুজাতা আমার কাঁধেতে মাথা রেখে আরো খুশীয়ালিনী হোয়ে থাকলো। আমি তখন চোখ দুটো আরামের ছটায় বুজিয়ে রেখে—প্রিয়ার কালো কেশের অপর্য্যাপ্ততায় ফুলে-ফেঁপে থাকা মেলায়েম রূপের সমস্ত পিঠময় ধরে—দুষ্টুমিতে খোঁপা ভেঙ্গে খুলে সুবিস্তারে ছড়িয়ে থাকার মধ্যে—হাতের আঙ্গুল বুলিয়ে আদর কোরে কোরে জানালাম—জন কীটসেরই—আপন প্রাণাধিকা শ্রীমতী ফেনী ব্রনেকে জানানো সুভাষণটি—

"Save it for me, sweet love! though music breath...
Voluptuous visions into the warm air,...
Though swimming throught the dance's dangerous

wreath, ... Be like an April day...Smiling and cold and gay, ...A temperate lilly, temperate as fair... Then Heaven! there will be...
A warmer June for me."

এই বনের একাকীত্বে ঘেরা নিঃশব্দ নির্জনতার মধ্যে, মোটর চলার সরু পথের ওপরেতে প্রায় সবটা রাস্তা জুড়ে—এই ক্রাইসলারের বড়-সড় আকারখানায় অবরুদ্ধ রেখে চারধারের গাছ-গাছালির শুধু জড়াজড়ির আর হামলাহামলির মধ্যে, নানান বন্য পাখীর শতেক সুরের মিশ খাওয়া এক অপরূপ কলতানের মধ্যে—ঠিক এই ছায়ায়-ছায়ায় নিবিড় আকর্ষণে জাগা উর্ম্মি আহ্বানেতে সাড়া দিয়ে—সত্যি আজ এমন রোমাঞ্চে-রোমাঞ্চে ঘেরা মুহূর্তটিতে আমারই হ্লাদিত শক্তির উৎস—এই বধূ সুজাতাকে একান্ত পাশেতে টেনে নিয়ে যুবকের যৌবনতাপে আবরিত করাতে করাতে শুধু মনে হচ্ছে—মহাকবি জন কীটস্ বাস্তব জীবনেতে—শ্রীমতী ফেনী ব্রনেকে নিয়ে ইতিহাসের এক মহাপ্রেমিক হোয়ে আছেন। এই কীটস্ ঠিকই দৃপ্ততার সাথে বলে গেছেন, "Love is my religion. I can die for that."—আজ আমারই প্রিয়াকে বুকের কবোষ্ণ তায় বন্দিনী কোরে—মুষল ধারে ঝরা আদরের ঝরনায় ভাসাতে ভাসাতে আপনার বিবাহিতা যুবতীকে ভালোবাসাবাসির প্রসঙ্গে—সেই শুচিস্মিতারই মনের খুশী-রূপী যুবক হোয়ে—আমারও মনেতে ভাবকুট্টিম হোয়ে উপলব্ধি করালো "Love is my religion." আর সেই সঙ্গে ফরাসী মনীষার বিশিষ্ট জহুরী—স্তাঁদালের কথাও মনে পড়লো। বধূ রত্নারূপিণী আমার সুজাতার দীপ্তা মুখ ও চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হোল—এমন যে মধুর আর সুন্দরী আর শুচিস্নিগ্ধা যুবতীকে বিবাহের পুণ্যশ্লোক-মন্ত্রোচ্চারণায় পাওয়া গেছে— তেমন তাকে ভালোবেসে ও তার ভালোবাসা পেয়ে, সেই সানন্দা হ্লাদিনীকেই বলা যায় কানে কানে—মনীষী স্তাঁদালের কথাকে ভাষান্তরকরণে—"ওগো মধুমিতা। ওগো আনন্দিতা। শোন, 'আমার জীবনেতে ভালোবাসাই ছিল সব সময়েতে মহামূল্যএক স্থিতি। তাছাড়াও বলা যায়, ঐ ভালোবাসাই ছিল আমার জীবনের এক ও অদ্বিতীয় উপলব্ধির বিষয়।"

বেশ কিছুটা সময় ধরে অভ্যন্তরের অতি নিঝুমতাকে পরম আশ্লেষেতে উপভোগ করার পর—বধূ সুজাতাই প্রথম ফোটালো কথার ফুলঝুরি। ওরই প্রণয় রাঙা কথার আলপনা থেকে।

সুজাতা আমার কাঁধেতে পরম তৃপ্তিতে আবেশ নিয়ে আকুল থাকা মাথাটিকে ন্যস্ত ক'রে অতি আদুরে গলায় কাটা কাটা ভাবে জানাতে চাইল—"আচ্ছা, আজ আমি তোমায় এমন কিছু জানাবো, ওবো মধুর, তাতে তুমি জগতে নিজেকে আরো সুখী, আরো গর্বিত বলে মনে ক'রবে। ঠিক-ঠিকই। আগে বল, এখনি তুমি তা জানতে চাও, না পরে লোকালয়ে ফিরে গিয়ে তা জানবে? বল?"

যুবতীর পরম রহস্যময় মদিরতায় নিজের চোখের কালো কালো কুট্টিম ধরে

পরম এক খুশীযময়তার ছবি নাচিয়ে, আমার মুখের দিকে তাকালো সুজাতা—পরম আয়েসের মুঠো মুঠো করা তৃপ্তির রভস নিয়ে। আর তখনি সুজাতা কাঁধ থেকে মাথা পুনরায় তুলে নিল।

দু'হাতের মুঠোয় ওর ছবির মতো মুখখানাকে আদর কোরে ধরে নিয়ে বললাম— "সুজাতা। এই, পরে কেন এখনই জানাও।"

সে কথায় বসে থেকেই সুজাতা আমার বুকরে ওপর পাশ থেকে কাৎ হ'য়ে আরো বেশী রকমে ঝুঁকে পড়ে—আমার হাত দুটিকে নিজের নরম নরম হাত দু'খানার মুঠোঅতে ধরে নিয়ে—আর আমারই হাসিতে খুশীতে ডগমগানো অধরেতে ঘন কোরে নিজের একধারের কপোল শক্তভাবে ছুঁইয়ে রেখে—আদুরে গলায় জানালো—

"জান, তোমার এই সুজাতা কিছু দিন হোল আবিষ্কার করেছে এক চরম সত্যকে। সেট আবিষ্কার করার পর থেকে রোজই ভাবি, তোমায় এইটি এখনই জানানো উচিত। কিন্তু আমারই যুবতীকায় ঝলমলানো লজ্জার রাগে আবরিত থাকায়, তা তোমায় জানাতে পারিনি। আজ জানাচ্ছি। শোন, তুমি এতদিনে সত্যিই হোয়ে উঠতে চলেছো—স্রষ্টা! জনক! হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমার মধ্যে তোমারই দুরন্ত যৌবনের অপার দুষ্টুমিষ্টিপনার ভেতর দিয়ে— তোমারই সন্তানের প্রাণ সম্ভাবিত হ'য়ে উঠেছে সার্থক ভাবে।"

আমি সে কথা শুনতে শুনতে তবু প্রশ্ন না ক'রে পারলাম না আমারই প্রিয়াকে— "সত্যি? তাই ঠিক, এই মধুমিতা?"

নিজের মুখ সরিয়ে নিয়ে—আমারই মুখের নীচেতে নিজের মুখখানা নিয়ে সুজাতা বলল লাজহরার মতো—"আগে আমায় তুমি শুধু চুমায় আদর কর অফুরানো ভাবে। হ্যাঁ, তারপরে আবার বলবো। হ্যাঁ, তোমার সন্তান সত্যিই আগামী কয়েক মাসের মধ্যে এসে যাচ্ছে এই পৃথিবীরই আলো-বাতাসের আঙ্গিনায় অভিষিক্ত হবার জন্য।"

—"ওগো, সত্যি-সত্যি।"—বলতে বলতে আমি আমার সুজাতাকে তারই কথা মতো আদর জানালাম—তারই কুন্দশুভ্র দেহের নানা যৌবনরেখায়। ঝড় হ'য়ে। তুফান হ'য়ে। দুর্দম আর দুরন্ত হ'য়ে। দু'ধারার অধরে অধর স্থাপন করা 'রাঙা হাসির বাসর শয়ন' শুধু কবিতার মতো ছন্দে নিয়ে যতি নিয়ে মিল ধরে ধরে—হ'ল নির্ঝরিত।

তারপরে—আমি আমার প্রিয়া-বধুর ছবির মতো মুখখানায় করা সাজ-প্রসাধনী কাজল-ওষ্ঠ রঞ্জনী-কুঙ্কুম-সিঁদুর-লোধ্ররেণু—সব কিছুকে ওরই অভিলাষ মতো আমারই অধরের অতি দুরন্ত দুষ্টুপনায় এলোমেলো, একাকার করাবার পর— দু'হাতের আধারে তুলে ধরে শুধু অপলকে দেখতে লাগলাম—তারই ভাবী মাতৃত্বকে। তারই জন্য স্ফূর্ত থাকা ওর খুশিয়ালিনী রূপসুষমাকে। প্রিয়াকে ও ভবে দেখতে দেখতে রঙীন নিঃশব্দতা ও নির্জনতা ছাপিয়ে এই বনানীর মধ্যে মনে হোল— আমার প্রিয়ার ভাবী জননীর স্বত্বায় রণিত হওয়া এই মুখেতে ফুটে উঠেছে—

উত্তাল সমুদ্রেরই মতো বিরাট উদারতা। তাই দেখতে দেখতে প্রিয়ার মুখের মধ্যে পাওয়া সমুদ্র দর্শনে মনে পড়লো স্যার ওয়াল্টার স্কটকে। তারই লেখা "ব্রাইড্ অফ্ ল্যামারমুর" থেকে—

"The morning which had arisen calm and bright, gave a pleasant effect to the waste moorland view which was seen from the castle on looking to the landward : and glorious ocean, risped with a thousand rippling waves of silver, extended on the other side in awful yet complacent majesty to the verge of the horizon. With such scenes of calm sublimity the human heart sympathizes even in his most disturbed moods, and deeds of honour and virtue are inspired by their majestic influence."

—১৬ই নভেম্বর, ১৯৫৬

রাঙা অধর ও প্রথম চুমা

পরম আদরণীর দুই ভাই—শ্রীমান গৌর রায়চৌধুরী ও শ্রীমান অভিককুমার বসুকে

সন্ধ্যাকারদের বাড়ীতে আজও বেড়াতে আসার কথা আছে তার। এই 'তার' মানে হোল—শ্রীমতী অজন্তার। এই বছর চারেক আগেকার খ্যাতনাম্নী ছাত্রী হিসাবে রূপে ও গুণে—উভয় দিকক্কারই এক দামী বরকন্যার মতো—এই শ্রীমতী অজন্তা পালিত ছিল খুবই নামী—ঐ লেডী ব্রেবোর্ন কলেজেতে। আর সেই দীর্ঘ চার বছর বাদে আজ ও হোল বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ স্কলার। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের। এখানেও ও নামী। এখনাতেও যুবতী রূপে— দামী। আগেরই মতো।

এই সন্ধ্যাকরের বাড়ীতে—বিশেষ ভাবে সন্ধ্যাকরেরই জন্য এই অজন্তা পালিত হোল বাগদত্তা।—যদিও বিস্ময়ের কথা এই যে, ওরা কিন্তু কেউই তা জানে না। বাড়ীর বড়রা যা জানেন—তা ওরা না জানলেও—বরং একদিক থেকে বিস্ময় আরো এগিয়ে নিয়েই রেখেছে—ওদের। কেন না যখন ওরা তা জানবে—তখন বিস্ময়ের আর কিছুটি থাকবে না অবশিষ্ট। থাকবে না বিস্ময়েরই কণামাত্র অজানা।

এখন দুই না হোলেও—এক ও অপর আরেকটি এক হিসাবে—সন্ধ্যাকর ও অজন্তা যদিও জোড় নয়,—তবু তাই বলে কিন্তু বেজোড়ের সুরও নেই—ওদেরই পারস্পরিক পরিচিতির মহলে মহলে। জোড়ের একটু রেশ লাগানো আছেঁ এই জন্য, যে,—ওদিকে সন্ধ্যকরেরই নিজের দিদি শ্রীমতী সুজাতার ছোট ননদ হোল—এই শ্রীমতী অজন্তা পালিত। মেয়ে হিসাবে যে হ'ল অশেষ দামী যুবতীত্বের অধিকারিণী—আপনারই রূপঝরা চেহারার মধ্যে সেই হলুদে-সোনায় সিঁদুরেতে জমকালো ত্বক্- যৌবনায়ন ধরে রাখায়। সাজিয়ে নিয়ে। আর ছাত্রী হিসাবে যে হোল·· নামী। অতি বিশেষণটির সঙ্গে যুক্ত হোয়ে।

সত্যি এমনতর, মানে সেই নামী ও দামী যৌবন ও জীবনের মিলিত লিরিক্যাল ব্যালাড়—এই অজন্তার আসার প্রতীক্ষায় পল-অনুপল গুণে গুণে জানালার ধারটিতে এসে বসেছি—সন্ধ্যাকর চৌধুরী। ওর অতি ছিমছাম চেহারার ওপরে করা পরিপাটি বেশবিন্যঅস দেখলে পর মনে হবে—ও বোধ হয় ভাববিহ্বল এক কবি। কিন্তু তা নয়। দীর্ঘ চবিবশ বছরের এতগুলো শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা ও বসন্ত ক্রমান্বয়ে পার হয়ে আসা—এই সন্ধ্যাকর হোল একজন আনকোরা ইঞ্জিনীয়ার। সবে পাশ ক'রে বেরিয়েছ। তবে একেবারে ছক্ কষা বিষয়ের বাস্তুকার ও নয়। ওর যা বিষয়—তাতে কল্পনা ঘেরা নিয়মনিষ্ঠ পরিকল্পনার প্রভাব আছে খুবই বেশী। ও হোল আর্কিট্যাক্‌চারাল ইঞ্জিনীয়ার। সুতরাং ওর বাস্তুকারবৃত্তির মধ্যে সুযোগ ও সুবিধা রয়ে গেছে—শিল্পগত দিকটির। সেই নিরিখেতে—সন্ধ্যাকর এখনই একটু ভাববিহ্বল হোয়েও উঠেছে। মনে হয়,—উঠেছে তা অন্তরেরই তাগিদে। সর্বোপরি আর্টের দাবীতে।

আর তাই সত্যি বলে—এই সন্ধ্যাকর ভাবছিল অন্য কথা। তারই আশে পাশে থেকে বেরিয়ে আসা—নানা কথা-পরম্পরাকেও ভাবছিল বসে থেকে। জানালা থেকে বেশ অনেকটা দূরের ব্যবধানে, বাগানের শেষে দু'ধারে দু'টি ফটক। ভেতর ও বাহির। ভেতরে ঢেকার ফ টকটির দিকেতে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছিল—সন্ধ্যাকর কোন সুদুরের অচিন দেশের পিয়াস ধরানো কথাটি অবশ্য নয়। এ সব কথার সালতামামি সবাইকে নিয়েই প্রায় জড়ানো। ছড়ানো। তার মধ্যে ওরাও রয়েছে। ওরা—অর্থাৎ সন্ধ্যাকর অজন্তাতে এই ঘনিষ্ঠতা আজ তিন বছরের ব্যাপার। সেই তিন বছর আগে সুজাতাদির বিয়ের সময় থেকে। আর তা পরিচিতি নিয়ে চলেও এসেছে শত শত হাজার পল ও অনুপল দিয়ে সাজানো—পথখানা পরিক্রমণ ক'রে ক'রে।—এই সন্ধ্যাকর থেকে বয়েসের পরিমাপে—মাত্র দুই কি তিনটি মাসের ব্যবধানে পিছিয়ে পড়েছে—শ্রীমতী অজন্তার চলমান চবিবশের বসন্ত।

উঁচু ও সেই অনুপাতে চওড়া জানালার গ্রিলে হাত রেখে—বাম ধারের কাঁধেতে একটু মাথা নুইয়ে কপোল ধরে রেখে এই মুহূর্তে সন্ধ্যাকর সবাইকে নিয়ে ভাবতে ভাবতে পিছিয়ে গেছে— সেই তিন বছর আগেকারই নিজেদের যৌবন ঘেরা কুমার-বিস্ময়-হরণের কথায়—

বিয়ের পর সুজাতাদি যেদিন এবাড়ী ছেড়ে শ্বশুরবাড়ী চললেন, সেদিন প্রায় ক্রন্দসী দিদিটিকে বুকের আশ্রয়ে ধরে রেখে মা বলেছিলেন—"সুজাতা মা, তুমি ত' চললে। আমার ত' তুমি ছাড়া আর মেয়ে মেই। শেষে সত্যি আজ কিন্তু আমায় মেয়ে-হারা হ'তে হোল।"

মায়ের শান্তির নীড় বুকের মধ্যে চোখের জলে ভেজা নিজের মুখখানা চেপে রেখে আদর খেতে খেতে—সুজাতাদি অভয়ের সুরে বলেছিলেন, "মিছে মিছি অত ভাবনা ক'রছো কেন, মা? ঠিক দু' দিন বাদেই দেখবে তোমার ঘর আলো ক'রে সাজাতে আসবে—আমাদেরই বাবুলের বৌ।"

বাবুল হ'ল শ্রীমান সন্ধ্যাকরের ডাক নাম। বাড়ীর সবাই এই নামেই ওকে সম্বোধন করে। বিশ পেরিয়ে গেছে বয়েসের দিক থেকে। তবু কিন্তু এই ডাকনামটি মুছে যায়নি। সন্ধ্যাকর নিজেও চায় না, যে, সবাই তার বড় হ'য়ে ওঠারই দরুণ—ডাকনামটি ছেড়ে আসল নাম নিয়ে ডাকুক। বিশেষ ক'রে এই "বাবুল" ডাকনামটি মুখে এনে আহ্বান করার মধ্যে বেশ মাধুর্য্য ঝরে পড়ে। সন্ধ্যাকরও তাই ভাবে—নিজের এই ডাকনামাটি সম্পর্কে। যাক্ সে কথা!

সুজাতাদির এমনতর কথা শুনে মা তখন হেসে-হেসে লুটোপুটি খেলেন—এই নব-পরিণীতা আত্মজাকে একরকম কোলে রাখার মতো ক'রে। মেয়েকে আদর ক'রতে ক'রতে মা বলেন, "সত্যি সুজাতা। তুমি ঠিকই বলেছো। বাবুলের জন্য যত তাড়াতাড়ি পারি সেই ভাবে এক রূপবতী বৌ এনে অচিরে এই ঘর সাজাবো। আর তার পর ঠিক এই এখনকার মতো ক'রেই সেই মেয়েকে কোলে নিয়ে আদর জানাবো ঠিক তোমায় যে ভাবে জানাচ্ছি। কেমন, বলি ভাল হবে নিশ্চয় এর জন্য?"

সুজাতাদি তখন মায়ের আদরে ভেসে গিয়ে—মা'র গলা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে

বলল—" শোন মা, আমি তা হ'লে আজ থেকেই আমার ওখান থেকে রাজকন্যাটির জন্য সন্ধান আরম্ভ ক'রে দেবো। বাবুলের সেই রাজকন্যা যত দূরেই থাকুক না কেন, আমি তাকে খুঁজে পেতে এ বাড়ীর জন্য ধরে আনবোই।"

এ সব সেদিনকার কথা—পর্দার আড়ালে থাকায়—মা আর সুজাতাদির সমস্ত কথালাপ সন্ধ্যাকর শুনেছিল চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে। সুজাতাদি ওর রাজকন্যা অনুসন্ধানের পথটি পেয়ে যাওয়ায়, আর তারই জন্য মায়ের মনে স্বস্তি দেখা দেওয়ায়—এবার ঘরের মধ্যে ঢুকলো ও। মা আর দিদি দু'জনেই হেসে ফেললেন ওকে ঢুকতে দেখে। সন্ধ্যাকর সোজা মা'র কাছটিতে এগিয়ে এসে অভিমান নিয়ে বলল—"খালি দিদিকে আদর করা? এত বড় মেয়ে, লজ্জা ক'রে না ওর, না? পর হ'য়ে যাচ্ছে যে, তাকে আবার এত বেশী আদর করা কেন? কৈ, আমি ত দিদির ছোট, তা আমায় ত' কর না।"

একমাত্র ছেলের দুষ্টুমি ভরা কথায় ঝরা অতি ছেলেমানুষিপনা দেখে মা হেসে ফেলে বললেন—"মন খারাপ ক'রছো কেন? এসো বাবুল। সুজাতা চেয়ে দেখ, আমাদের লক্ষ্মী ছেলে অভিমান করেছে, ওকে আদর করি না বলে না কি!"

মা'র কথায় ঝলমল করা হাসিতে ঝক্‌মকিয়ে উঠে সুজাতাদি সামনে এগিয়ে এসে আদরের ভাইটিকে হাত ধরে কাছটিতে টেনে নিয়ে বলল—"অভিমান ক'রছো? কার জন্য? কার ওপরে? কবে না, লক্ষ্মী ভাইটি আমার? এই আমার জন্যে কি? না, অনাগত পথেতে এখনো পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা সেই রাজকন্যাটির জন্য? বল, লক্ষ্মী বাবুল।"

ঠিক এমন সময়টিতে সুযোগ বুঝে—মা আর দাঁড়িয়ে না থেকে সরে পড়লেন। যাক্, তিনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে গেলেন এই ভেবে, যে, এবার তা হলে সত্যি-সত্যি ভাই আর বোনে একটা কিছু বোঝাপড়া নিশ্চয় হবে। ওরা তিন বছরের ছোট-বড়। তাই ব্যবধান যৎ-সামান্য থাকায়—ওরা দু'জনে হ'ল দু'জনরাই পরম বন্ধু। স্নেহ-প্রীতি-ভালেবাসা-সহানুভূতি ও সহনশীলতা নামী— যে সব মানবিক অতি কোমল বৃত্তিগুলো সমাজের আকর—তাই দিয়ে তৈরী ওরা দু'জনা।—দিদি সুজাতা ও ছোট ভাই সন্ধ্যাকর।

আস্তে আস্তে তখন সুজাতাদির স্নেহালিঙ্গনের মধ্যে সন্ধ্যাকর ধরা পড়েছে ছোট্ট এক ছেলের মতো। ঠিক এই মুহূর্তটিতে ছোট ভাইটিরও কাছ থেকে বিদায় নিতে হোচ্ছে—তার আদরের দিদিটিকে! আর ওকেও বিদায় দিতে হোচ্ছে এমন মধুর সুজাতাদিকে!—"দ্যুৎ এ সব ভাবা যায় না। ভাবতে ভালো লাগে না কখনো— কোন ছাড়াছাড়ি হওয়ার কথাকে!"—ওরা দু'জন এমনটাই ভাবলো এই সময়টিতে। ভাই ও বোন—দু'জনারই চোখ উপছিয়ে জলের রেখা ছলছলিয়ে উঠলো এমন এক করুণ মুহূর্তে। সুজাতাদি বড় হওয়ায় নিজের চোখের টইটম্বুর হওয়া জলধারার রাশ টেনে, কান্নাকে বাধা দিতে পারলো অনেক চেষ্টার পর। সন্ধ্যাকর কিন্তু তা পারলো না। ও চেষ্টাই ক'রলো না। অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মহলের মধ্যে সন্ধ্যাকর সব চাইতে বেশী ভালোবাসতো এই বড় বোনকে।—এই হাসি-খুশীতে আদরে যত্নে সব সময় সজাগ

থাকার সুজাতাদিকে।—আজ, হ্যাঁ, আজ সেই দিদিটিই কিনা তাকে ছেড়ে থাকতে চললো—অন্য আরেক ঘরেতে! অন্য আরেক বাড়ীতে! বহুদূরের এক শহরেতে!—তাই এমন ভাবনায় অতি ব্যাকুল চিত্ত নিয়ে— শেষাশেষি ছোট্ট এক ছেলের মতো অবুঝ পরিচিতি দেখাতে দেখাতে কেঁদে ফেললো সন্ধ্যাকর ঝরঝরিয়ে। কেন না, আর ত' সে এরপর থেকে এই বোনটির সান্নিধ্যে বৈকালিক অবসরে—এত বড় বাড়ীটির প্রায় গোলকধাঁধার মতো বিরাট চৌহদ্দির সর্বত্র—ঘুরে-ফিরে লুকিয়ে-চুরিয়ে খেলতে পারবে না—দু'জনারই সেই অতি প্রিয় খেলা—"লুকোচুরি"। ওরই দু'একজন বন্ধু থাকতো। আর থাকতো দিদিরও। বয়েস এগিয়ে গেলেও—ওদের ভেতরের শিশুস্বভাবের অকপট সলতার বিন্দুমাত্র মৃত্যু ঘটেনি বলেই—ছোটবেলাকার এই অতি মজার খেলাটিকে—বিশ পেরিয়ে যাওয়ার পরও কণামাত্র ভুলে যেতে পারে নি। আর ঐ খেলার মধ্যে করা ঝগড়া-ঝাটির কোনটাই আর চলবে না! শুধু এই বিরাট গাড়ীটির মধ্যে বিকালের আসঙ্গনিয়ে এখন থেকে তাকে একলা একলা থাকতে হবে। এ বড় অসহ্য ব্যাপার। এ বড় অস্বস্তিকর। তাই সন্ধ্যাকর আদর পাওয়া বোনটির স্নেহঝরা আলিঙ্গনের ভেতরেতে বন্দী থেকেই—অনুযোগ ক'রলো সজল চোখে, আর ভেজা ভেজা গলায়—"এই সুজাতাদি, তুমি এত নির্মম। বলি, তুমি চলে গেলে পর দুষ্টুমি না ক'রে আমি একলা একলা থাকবো কি ক'রে বল? না, তোমায় বলতে হবে।"

অভিমানী ছোট ভাইটির গাল আদর ক'রে টিপে দিয়ে সুজাতাদি বলল—"ছিঃ, বাবুল ভাই, এ সময় কি এমন ভাবে অশান্ত হ'য়ে চোখের জল ঝরাতে আছে? আমাকেও কি আমার যাওয়ার বেলায় এ সব কথা তুলে, আর চোখ সজল ভরা রেখে কষ্ট দিচ্ছ না? শোন লক্ষ্মীটি, একটুও অসুবিধা হবে না তোমার। তবু যদি হয়, তা হ'লে তখনি আমার কাছেতে চলে আসবে। যখন ইচ্ছা তখনি এসো।"—এমনতর কথা বলতে বলতে আরও গাঢ়ভাবে ভাইকে দিদির করা আদরের মধ্যে ভাসিয়ে রেখে জানালো সুজাতাদি—"আচ্ছা বাবুল, যখন এরপর কোনদিন যখন তোমার সুন্দরী বৌ আসবে, তখন কি আর আমাকে এত বেশী ভালোবসার জন্য হতে পারবে অভিমানী?আমার জন্যে কি তাই তোমার মন খালি আনচান ক'রে উঠবে? আমার কথা ভেবে ভেবে কি আর ছোট্ট এক ছেলের মতন এমন করেই কাঁদবে? ছিঃ, শোন, তখন কিন্তু আমার জন্য মনের উতলা অবস্থায় চোখের জল ফেলতে যেও না খবরদার। তা হ'লে আর কি, তোমার ঐ মিষ্টি-মিষ্টি বৌটির দুষ্টু-দুষ্টু স্বভাব তখন তোমাকে এমন....."

কিন্তু সুজাতাদিকে কথা শেষ ক'রতে দিল না। দুষ্টুমি ভরা হাসিতে ফুল্ল থেকে সন্ধ্যাকর—হাত দিয়ে দিদির সুন্দর রুচিরায় রাঙানো ও সাজানো লাল অধরেতে চেপে ধরলো। ছোট ভাইয়ের এমন ব্যবহারে দিদির মুখ থেকে তখন আনন্দের হাসি ঝলমলিয়ে উঠেছে। সন্ধ্যাকরের হাতের বাধার মধ্যে অবশ্য সে হাসির স্ফূর্ততা বাধা পেল। বাধা পাওয়ায় শুভ্র হাসির গমক যেন ফলে ফুলে উঠতে লাগলো। পুরোপুরি হাসির প্রভাস পেল না সত্যি স্বতঃস্ফূর্ততা। শুধু মধুময় আভাস পেল তার সুন্দর

বিভাস।

সন্ধ্যাকর দুষ্টু হাসিতে ঝলমলাতে থেকে বলল—"ধ্যাৎ। ও কথা বাদ দেও। লক্ষ্মীটি দিদি আমার। চুপ কর।"

"এই। দুষ্ট ভাই।"—বলে সুজাতাদি কথা আরম্ভ করলো হাসিতে ভরপুর মুখে—"বুঝলে গো, লজ্জা প্রথম হওয়া স্বাভাবিক। যাক্ আমার আসল কথা শুনে রাখ, লক্ষ্মী ভাইটি। এই দুষ্টু, বুঝলে, আমার এখন থেকে প্রধান কাজ হোল আমারই এই অতি আদরের বাবুলটির জন্য এক পরামাসুন্দরীর সন্ধানকে, খুঁজে-খুঁজে বার করা। এই বাবুল, বলি ঠিক-ঠিক ভালো বললাম ত' এইটা?"

সুস্মিতকান্তি সন্ধ্যাকর সে কথা শুনতে-শুনতে অল্প-অল্প ভাবে রাঙা হোয়ে উঠতে লাগলো—অকস্মিক লজ্জার অনুরণন ভরা আকুলতায়। লজ্জার গমকে গমকে কাঁপন ধরা হাসি ঝরাতে ঝরাতে সন্ধ্যাকর কতটকটা আবদার করার মতো ক'রে সুজাতাদির গলা ঘন ভাগে জড়িয়ে ধরে জানালো—"অনেক বলেছো। আর নয়। এবার একবারটি থামো।"

আর তারপরেই অন্য কথার অবতারণা ক'রে—প্রসঙ্গের মোড় ঘুরিয়ে নেয় তারা।

—হ্যাঁ, আজ ঠিক সে সব কথাই ভাবছিল সন্ধ্যাকর জানালোয় দাঁড়িয়ে। বাগানের ধারের দু'টি ফটকেরই দিকে তাকিয়ে থেকে।

হ্যাঁ, এটাও ত' অচিরেই সমাধান পেয়ে গেছিলো, যার জন্য সুজাতাদির করা প্রতিজ্ঞা ফলতে মুহূর্ত মাত্র দেরি হয় নি। কোন এক পরমাসুন্দরীর সন্ধানে বেশী দূর ত' দূরের কথা— কোন দূরের পথেতেই তাকে পাড়ি দিতে হয় নি। নিজের শ্বশুরবাড়ীতে পদার্পণ করার পরেই সুজাতাদি তার সাধের রাজকন্যাটির জন্য অনুসন্ধানী দৃষ্টিকে সমস্ত দিকে-দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে—মুহূর্তেরই পল ধরে—ধরে আসল কন্যারত্না-রূপী এক তিলোত্তমাকে খুঁজে-খুঁজে বার করেছিল। ঐ সেদিন খুঁজে পাওয়ার কন্যারত্নাটিই হ'ল আজকের —এই শ্রীমতী অজন্তা পালিত। সম্পর্কে যে হ'ল সুজাতদিরই ছোট ননদ। এত কথার সালতামামি হ'ল—ঠিক তিনটি বছরের পুরানো অনেক কিছুই। হ্যাঁ, ঠিক-ঠিক তিনটি বছরেরই—

তাই প্রশস্ত জানালার গ্রিলের সঙ্গে নিজের কপোলের একাধারকার ভার ন্যস্ত রেখে— বেশ অনেকটাই আনমনা আর বিবাগী ভ্রমরের মতোই শ্রীমান সন্ধ্যাকর চৌধুরী— সে সমস্ত পুরানো হওয়া কথারই ইতিকথা ও তারই পরের কথাকে ভেবে ভেবে—হাত-ঘড়ির দিকে তাকালো। দেখলো বাইরের বিকেল গড়ানো আকাশে দোল খাওয়া সন্ধ্যারই ঘন রোমাঞ্চ ঘেরা ম্লান আলোকের দ্যুতির মধ্যে—ছ'টা প্রায় বাজতে চলেছে। " কৈ, অজন্তা ত' এখনো এলো না। ঈষ্! কী দুষ্টু মেয়েরে বাব্ বা! ভারী দেরি কোরছে কিন্তু। এই অজন্তা, হ্যাঁ, ঠিকই যেন অজন্তা বা ইলোরারই মতা ও হ'লো অপার রহস্যময়ী।"

এমন কথাটি যখন মনেতে উতাল করিয়ে ভরিয়ে তুলেছে,—ঠিক তখনি ভেতর থেকে সন্ধ্যাকরকে—মা ডাকলেন। আর তখনি পর পর কয়েকটা ঘর অতিক্রম কোরে—মা যে ঘরটি থেকে ছেলেকে ডাক দিয়েছেন—ঠিক সেটিতেই এসে

দাঁড়ালো সন্ধ্যাকর।

ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়াতেই সন্ধ্যাকরকে মা বললেন—"এই বাবুল, দেখ ত' কখন থেকে তোমায় ডাকছি, তবে এতক্ষণে যা হোক্ সাড়া মিললো। শোন, অজন্তা তোমায় টেলিফোনে ডকেছে' ধর গিয়ে।"

প্রেমময়ী মায়ের অপরা স্নেহাশীষ ভরা চোখের সাথে—তারই আদুরে আত্মজের অপার শ্রদ্ধাশীলতায় আপ্লুত দৃষ্টিপাত ঘটলো—ভারী মনোরম পরিবেশ ও তারই প্রভাবে। মায়ের অধরের স্নিগ্ধতায় আনচানানো হাসি—আপন সন্তানেরই মুখে-চোখে ফুটিয়ে তোলালো—মুঠো মুঠো আনন্দকণিকার ফুল্ল হাসি। ও তারই লহরদল।

মায়ের হাসি-হসি ভরা চোখের সাথে একটা দীর্ঘ করা চাহনির মধুর মোকাবিলা শেষ কোরে সামনে এগিয়ে গিয়ে—কোণার দিককার টেবিলের ওপর থেকে ফোনের নামানো রিসিভারখানা হাতে তুলে নিল সন্ধ্যাকর। কথা বলার আগে একটিবার মায়ের মুখের দিকে ফিরে তাকালো— কেমন জানি কোন কিছু মনে উঁকি দেওয়ায়। মা তাই ছেলেকে কেমন যেন অনুনয় ভরা চোখ নিয়ে পেছন ফিরে তাকাতে দেখে—সুন্দর কোরে ঘর মাতিয়ে হেসে ফেললেন। আর তখনি বলে উঠলেন—"এই বাবুল, বলি লজ্জা কিসের? আমি এই সরে যাচ্ছি। এইবারটি বেশ ভালো ক'রে কথা বল অন্য দিককার সাথে, কেমন?"—এমনি ভাবে কথা বলতে বলতে, আর মুখের উৎফুল্লতার প্রকাশ চাপতে চাপতে—মা তখনি আর বিন্দুমাত্র দেরি না করে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

একটু মাত্র স্থিতির পর সন্ধ্যাকর স্থির হোয়ে, রিসিভার ঠিক কোরে ধরে মাউথপীসের ওপরে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল—"এই! বলি, কি খবর অজন্তা? কথা মতো এলে না ত? তা, কি বলবে বল। আমি কিন্তু অনুরাগ পাল্টে রাগ করার চেষ্টা ক'রেও—পারছি না কিন্তু তোমার ওপরে রাগ ক'রতে। বুঝলে দুষ্টু? কি যে তুমি না, বোঝা সত্যি মুস্কিল ব্যাপার।"

কথা থামতেই রিসিভারের অন্য ধার দিয়ে ভেসে এলো শ্রীমতী অজন্তার অনুরাগ ছোপানো গলার কাটা-কাটা কথালাপেরই মধুরতা—"ঈষ্! ভারী কষ্ট হোচ্ছে না? রাগ কোরতে চাইলেই ত' রাগ কোরতে পার। বাধা কিসের? ভারী দুষ্টু তুমি! আমি এদিকে দেরি হওয়া সত্ত্বেও কিনা তোমার জন্যে নিজেকে ঠিক-ঠিকই ক'রে তুলেছি অনুরাগবতী! আর, হ্যাঁ, আর তুমি কিনা নিজেকে আমার জন্য কোরে তুলেছো রাগবান! ছিঃ, এ তোমার ভারী দুষ্টুমি কিন্তু! এই সন্ধ্যাকর, শোন লক্ষ্মীটি, রাগ ক'রো না। শোন, আমি কোন বিশেস কারণেতে বাধা পাওয়ায় সময় মতো আসতে পারি নি। তাই বলছি, তুমি লক্ষ্মীটি আর দেরি না ক'রে আমাদের রিজেন্টের বাগানবাড়ীতে চলে এসো, কেমন? টালিগঞ্জ ডাকঘর থেকে ফোন ক'রছি। লক্ষ্মীটি, মিনতি জানাচ্ছি। রাগ ক'রো না কিন্তু। ঠিক-ঠিক কথা না রাখতে পারায়। দেরি ত হ'ল তোমারই সুজাতাদির জন্যে। বৌদিকে জুবিলী পার্কেতে ওরই এক বন্ধুর বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দিতে হলো বলে, বেশ দেরি হয়েই গেছে। লক্ষ্মী সন্ধ্যাকর, কথাটি শোন আমার। তুমি আর দেরি ক'রো

না, বুঝলে গো? আমি ফোন রেখে দিচ্ছি।"—একনাগারেতে বলে চলা কথা শেষ কোরলো অজন্তা—তারই মধুছন্দা ভরা গলার কাকলী ঝরিয়ে ঝরিয়ে।

সুনন্দিতা এই মধুছন্দার ছান্দসী কথা শুনতে শুনতে— ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে বেশ উতলা হ'য়ে ওঠা মন নিয়ে সন্ধ্যাকর জানালো—"এই অজন্তা। শোন, ঠিক আছে। আমি এখনই চলে আসছি।"—এর বেশী কিছুটি আর না বলে—সন্ধ্যাকর রিসিভার ফোনের ওপরেতে রেখে দিয়েই ছুটলো মা'র কাছটিতে। পলক মাত্র বিলম্ব হোতে না দিয়ে রিজেন্টে বেড়াতে যাওয়ার কথাটি মা'কে জানিয়েই—সন্ধ্যাকর দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি ধরে তর-তর ক'রে নীচে নেমে গাড়ী-বারান্দায় চলে এলো। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা নীল এ্যাম্‌বাসাডারখানায় চড়ে বসলো। আর তখনি ফটক পার হ'য়ে গাড়ী দক্ষিণ দিকে চলতে লাগলো—রিজেন্টের রাস্তাটি ধরার জন্য।

রাস্তা খুব সংক্ষিপ্ত ক'রে রিজেন্টের বাগান বাড়ীতে এসে পৌছালো সন্ধ্যাকর। রাস্তার ওপরেই প্রধান ফটক। অবশ্য খোলা ফটকটি পেরিয়ে সেখান থেকে আবার বেশ অনেকটা পর্য্যন্ত বাগানের ঘুটিং বাঁধানো, হলুদ কাঁকর বিছানো পথটি ধরে এগিয়ে যেতে হয়। অবশ্য এই পথেরই শেষ যেখানে দু'ধারে ঘুরে গিয়ে হয়েছে—ঠিক সেখানটি থেকে আরম্ভ হোল আসল বাগানের। ঢুকতে ফটকের সামনেই বাঁধনো দু'ধারের রোয়াকেতে বসে থেকে দরোয়ান ও উড়ে মালীরা সবাই মিলে এক ধরনের অতি উপাদেয় রকম গাল-গল্প নিয়ে মেতে ছিল। ওরই মধ্যে দেখে ফেলায় দরোয়ান উঠে কুর্নিশ জানিয়ে সন্ধ্যাকরের গাড়ীকে পথ কোরে দেবার জনয—ফটক খুলে দু'পাশে সরিয়ে নিল। দরোয়ানকে কুর্নিশের প্রত্যুত্তর দিয়ে নীল এ্যামবাসাডার ভেতরে এনে অতি ধীরে চালাতে চালাতে এগিয়ে গেল। পথের শেষে-- যেখান থেকে পথটা আবার দু'ভাগে দু'ধারে গেছে—সেখানেতে একটি বড় দেবদারুর নীচে দেখতে পেল—অজন্তাদের লাল মিনার্ভাখানাকে। আর না এগিয়ে গিয়ে সেখানেতেই গাড়ী থামিয়ে রেখে নেমে পড়লো। সামনে থেকেই তাকালো একটু তফাতে টালির লাল রঙে ছাওয়া, ছাদে ঢেউ খেলিয়ে রাখা— দো'তলা বাংলোটির খোলা বারান্দাটির দিকে।

আর কি আশ্চর্য্য—ওভাবে শুধুমাত্র পলক ধরে তাকাতেই সন্ধ্যাকরের দুটি ডাগর চোখের মদির করা চাহনি পরম আকস্মিকের ছোঁয়া পেল। দেখলো—অজন্তা তাকে দেখতে পেয়েই বনহরিণীর গতিময় শরীরময়তাকে নাচাতে নাচাতে, ছুটে আসছে বারান্দা থেকে—ওরই দিকটিতে। পলক ঠিক দু'টি বার পড়তে না পড়তেই একেবারে কাছটিতে এসে মধুছন্দায় ভরা হাসিতে খিলখিলিয়ে উঠে—সঙ্গে সঙ্গে নিজের নরম নরম দু'খানা হাতের গোরোচনা শুভ্রতাকে বিস্তার কোরে ধরে ফেললো—ওরই ভালোবাসার সুখ—এই সন্ধ্যাকরের হাত দুটি। যুবতী দেহময়তায় উৎফুল্ল থাকার আবেগ—ওরই হাতের স্বর্ণকঙ্কন-কেয়ূরের সাথে সাথে সংঘর্ষ ঘটে যাওয়ায়—রিনী-ঝিনী শব্দ যতি ফোটালো। ছন্দ পেল। মিল ধরালো।

আগেরই মতো অতি বিস্ময়ে হতবাক্ হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সন্ধ্যাকর নিথর এক চঞ্চ লতারই মতোটি। মায়াবিনীর ছান্দস রীতিতে সেজে ওঠা অজন্তার কাছ থেকে—

এই অপার হওয়া মোহনীয় আবেশময়তার সুষমাকে এই প্রথম দেখতে পেল। সবুজ দেশের যুবতীর দেহে উচ্ছলিত থাকা রূপ-ঝরনারই রক্তিমাভায়—প্রিয় যুবক সুজনকের চোখ দুটি দেখতে দেখতে তাই—প্রিয়ার দেহেরই মুঠো মুঠো ভরা মদিরতাকে নিজের মধ্যে ছাপিয়ে নিল। যুবকের সুন্দর চোখেরই কালো কুট্টিম দুটি আপন মনসিজার অধরেরই লাল আভায় যেন সিক্ত হোতে, আর স্নিগ্ধ হোতে চেয়ে—হোয়ে আছে—অথির বিজুরিক। চাইছে—'চমকময় হোতি।'

হ্যাঁ, সত্যি-সত্যি—এ রূপ, এ যৌবন আজ সন্ধ্যাকরকে যে নতুন কোরেই করালো উপলব্ধি। আর তারই রূপদর্শনেতে হ্লাদিত। তাই ভাবতে ভাবতে আর অপলকে দেখতে দেখতে অনুরাগরঞ্জিত সন্ধ্যাকর—তালে তালে বিকেলে গড়িয়ে যাওয়ায় মুঠো মুঠো রুচিরার শুচিতা ঝরানো শ্রীমতী সন্ধ্যা নাম্নী অনুরাগবতীকে—ঐ দূরের নীল নিয়ে ধীরে-ধীরে অপসৃয়মান আকাশেতে দোল খেতে দেখায়—আপন চোখের কাজল কালো ইশারাতে ঝলমল আর রিমঝিম কোরে নেচে উঠলো শ্রীমতী অজন্তা পালিত—এই একটু তফাতেরই বিস্তৃত বারান্দার সোপানশ্রেণীতে—দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই।

সন্ধ্যাকর এমন গোধূলি বেলাকার আলোছায়ায় মনসিজর মতো দেকতে পেল তারই সানন্দিতা সুচরিতাকে।—আর ঐ শুচিস্মিতা মধুরিকাও পাল্‌টা দৃষ্টির অয়নে তাকিয়ে তাকিয়ে সুস্থিরে জানাচ্ছে—প্রণয়ের আরতি। আরাধনা।

এই আরাধনা হোল প্রিয়ার একান্ত ব্যক্তিক। সেই সঙ্গে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।—আর সেই নিরিখেতেই শ্রীমতী অজন্তা নিজের মাধুর্য্য ঘেরা মাধবীর রাগ নিয়ে—ঝলমলানো শরীরময়তার সবুজে লালেতে তরঙ্গিমা ধন্যা যৌবনের রূপ ও রেখাকে—অতি নিপুণিকারমতোই বরঅঙ্গের সাজ-প্রসাধনের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছে। যৌবনান্বিত সঘন রেখায় রেখায় উপছানো মধুরিমা সর্বত্র দীপ্তির দৃঢ়তা নিয়ে রয়েছে দৃপ্ত। অজন্তার সুষমায়িত দেহে রুচিরার আবরণ হ'য়েছে—লাল আর শাদা রঙ্ ধরে পরপর স্ট্রাইপ নিয়ে ছাপা রেশমী শাড়ী। খুব সূক্ষ্ম। জরীর ঘন করা কারুকাজ দুই পাড় আর ভেতরের জমিন বরাবর ফুলের মতো ফুটে ফুটে উঠে—ঝরাচ্ছে সোনালী চেখনাই। ঐ লালে-শাদার স্ট্রাইপ ভরা আঁচল দিয়ে বুকে-পিঠে আবরিত রাখার মধ্যেও শাড়ীর—অতি সূক্ষ্ম বুনোনের জন্য ভেতরের আঁট গঠনার মাপে-মাপে, প্লিট ভেঙ্গে-ভেঙ্গে তৈরী করা ক্রীম রঙের ব্লাউজখানার দুষ্টু হোয়ে ওঠার গভীর ব্যঞ্জনা—দেখা দিয়েছে আরো ঘন সন্নিবদ্ধ হোয়ে। কঠিন গঠনার জামা টাইট হ'য়ে রূপ ধরায়—শ্রীমতী অজন্তার মধুরিম বুকখানার ওপরে ওপরে—আপীন ধারাঙ্কিত সুষমালয়ে—তা আবরণেরই ঐ মতন নিরাবরণতায় ছবির মতো নিখুঁত। নিটোল বজ্রশ্রীর মতো উরোজ মাধুর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে রূপ-গৃহীত। পরিশোভিত। লালে-শাদায় শুধু লম্বা স্ট্রাইপে ভরা শাড়ীর রেশমী জমিনের নিলাজ-নিবারক—আঁচলের রঙীন জৌলুস ব্লাউজের গাঢ় ক্রীম রঙ্‌খানার সাথে মিলে-মিশে—ছড়িয়েছে যাদুময়ত! এমন এক যাদুময়তা—যা একমাত্র যৌবনের প্রখরতায় আর সবুজতায় রিমঝিম করা রূপবতীর—যুবতী-স্বভাব। তারই প্রকাশময় দুই গীতি-কবিতা। ছন্দের বাঁধনে যা

সুষম। যতির পরিমাপে যা দুর্বার। লয়েতে-মিলেতে যা অনির্বচনীয়। নামধেয়। শুধু অনিবার, শুধু অনিবার্য্যতায় যা হোল ওদেরই যুবতী দেহমনের—পরিমণ্ডল ও পরিব্যাপ্তিতে অপরিহার্য্য। হ্যাঁ, হ্যাঁ,—এখন সন্ধ্যা এসে পৌঁছানোর ঠিক আগের মুহূর্তটিতে দেখা—এমনি এক শ্রীমতী অজন্তাকে দেখে দেখে— যৌবনের নিখিল আর্তিতে গোছানো দেহ-মনের শ্রীমান সন্ধ্যাকর ভাবলো—ওদের এ হেন শ্রী-তে আছে—ধী। আর সেই ধী-তে আছে শ্রীরাধার যুগযুগ ধরে অনুসন্ধান করারই—আরাধিকার রূপধৃতি। কবিকৃতি।

তাই ভাবতে ভাবতে আর দেখতে দেখতে—সন্ধ্যাকরের মনের মধুরতা চঞ্চল ঊর্মিতে সেজে যেতে লাগলো। তার পরেও আপন প্রিয়ার রূপখানাকে এতক্ষণ ধরে দর্শন করছিল—মন উপছানো অবস্থারই দেহী-তরঙ্গিমার—ঢেউ গুণে গুণে। সন্ধ্যাকরের যৌবন জহুরীর মতো আপন প্রিয়ারই সন্ধ্যারাগ ধরা যুবতীকায়—ঐ সুষমছান্দস্ উত্থানে-পতনে—এক বেঠোভেনী সোনাটার মতো রিদ্‌মাস্ লহরে লহরে সাজানো বুকখানার মধ্যে সন্ধান পেল—ইতিহাসের প্রিয়া সুতনুকার, দয়িত-রূপদক্ষ দেবদত্তর শৈল্পিক ধ্যান-ধারণার উৎসখানাকে। এখানটিতে যে ওর এই অজন্তা হোল—দেহী সুতনুকা ঘেরা দেহী শ্রীরাধা। এই যুবতী-দেহী-রূপকুট্টিমতার ব্যঞ্জনাময় রূপধার থেকে বহ্নিশিখার মতো জ্বলছে ঝিলমিলানো আভা ছড়িয়ে—আলোর বন্যা হোয়ে, একই সঙ্গে শতেক ধারার রূপ নিয়ে। তাই মহাকবি জয়দেবের সৃষ্টিরই সেই যুগ যুগ ধরে বন্দনা কোরে আসার—সেই পীনোন্নতায় আর সুষমায়িত উরোজতায় অনির্বচনীয়া শ্রীমতী রাধা যেন এই মুহূর্তের—এই শুচিস্নিগ্ধা শ্রীমতী অজন্তার ভেতরে অন্তর্লীনার মতো—চিরন্তনী হোয়ে দেখা দিয়েছেন।

গোধুলির শেষ রাগেতে আনচান কোরে ওঠা যুবক সন্ধ্যাকরের মনে দোল দিয়ে গেল কবির সুভাষণ—আপন প্রিয়াকে বন্দনা করাতে।—"ঠিক-ঠিক, আমার এই অজন্তাই ত' আমাদের অনতিদূরের পরিণয় সমাপনেতে পৌঁছে—রাত ও প্রভাতের দুই রূপ নিয়ে হোয়ে উঠবে না কি যুবতীত্বে আর মহীয়সীত্বে একাকার? এই অজন্তা, বিবাহের পর 'রাতে' তুমি হয়ে উঠবে কবির বর্ণনা ঃ—

'হেসে করিয়াছ পান চুম্বন ভরা সরস বিম্বাধারে
কালি মধুযামিনীতে জ্যোৎস্নানিশীথে মধুর আবেশ ভরে।
তব অবগুণ্ঠনখানি.....আমি খুলে ফেলেছিনু টানি,....
আমি শিথিল করিয়া পাশ.....খুলে দিয়েছিনু কেশরাশ,
তব আনমিত মুখখানি.... সুখে ধুয়েছিনু বুকে আনি—
তুমি সকল সোহাগ সয়েছিলে, সখী, হাসি মুকুলিত মুখে
কালি মধুযামিনীতে জ্যোৎস্নানিশীথে নবীন মিলন সুখে।।'

—আর অজন্তা, শোন, 'প্রভাতে' তুমি হবে ঃ—

দেবী, তব সিঁথিমুলে লেখা...নব অরুণ সিঁদুর রেখা,
রাতে প্রেয়সীর রূপ ধরি....তুমি এসেছ প্রাণেশ্বরী,
প্রাতে কখন দেবীর বেশে....তুমি সমুখে উদিতে হেসে—

আমি সম্ভ্রমভরে রয়েছি দাঁড়ায়ে দূরে অবনত শিরে
আজি নির্মলবায় শান্ত উষায় নির্জন নদী তীরে।।"

শুধু কি তাই! রাতের আর প্রভাতের দুই রূপ-পরম্পরায় এতদিনে যে প্রিয়া তারই দয়িত সন্ধ্যাকরের মন-মহলে ভাবগাঢ় প্রতিমা হোয়ে ফুটেছে আজ এইমাত্র— সেই শ্রীমতী অজন্তার সব সময়েতে স্নিগ্ধ হাসিতে উপছানো থাকা—ঠোঁট দু'খানাকে আজ দারুণভাবে—লাল রঙ্ ওষ্ঠরঞ্জনীর পরাগ দিয়ে করা হয়েছে রঞ্জিত। সেদিকটিতে তাকিয়ে কিছুতেই চোখের পাতা একটুও এদিক-সেদিক করাতে পারলো না সন্ধ্যাকর—পরম এক বিস্ময়েরই টানাপোড়েনে পড়ায়। প্রিয়ার ঠোঁটে-ঠোঁটে লাল আঁক ঘিরে ঘিরে—এক দুষ্টু দুষ্টু অভিলাষ কি—ঠিকই নাচানাচি কোরছে। মাতামাতি কোরছে। তা হোলে নিশ্চয়ই প্রিয়া অজন্তার অধরেতে নাচানাচির ছন্দখানা—তার এই সন্ধ্যকরেরই কুমারবিস্ময় দিয়ে এখনো আবরিত থাকা যুবকাধরেতে লুটিয়ে পড়ে— ঠোঁটে-ঠোঁটে যতিতে যতিতে মিলেজুলে সাজাবে। আর রাঙাবে—যুবতীর চুমায়। শুধু চুমায়। হ্যাঁ, ঠিক তাই।—এমন নিলাজ কথাটা ভাবতে ভাবতে চলা—নিলাজক সন্ধ্যাকরের মনের হাজার-দুয়ারীতে ঝল্‌মলালো—কবিসম্রাটের লিরিক্যাল ব্যালাডে তৈরী যৌবন-রস-নিষিক্ত 'কড়ি ও কোমল'—

"অধরের কানে যেন অধরের ভাষা।
দোঁহার হৃদয় যেন দোঁহে পান করে।
গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটি ভালোবাসা
তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধর সঙ্গমে।
দুইটি তরঙ্গ উঠি প্রেমের নিয়মে
ভাঙিয়া মিলিয়া যায় দুইটি অধরে।"

—সত্যি-সত্যি, শ্রীমান সন্ধ্যাকরের সবুজাভা নিয়ে ঝকমকানো যৌবনেতে মুঠো মুঠো কোরে সুখ আর খুশী এনে দেবার জন্যই ত' তৈরী —শ্রীমতী অজন্তার লাল লাল অধরযুগল। প্রিয়ার অধরের ছোঁয়ায় ছোঁয়ায় যৌবনের কানুন ধরেই—সন্ধ্যাকরের যুবকাধরের ঠোঁটে-ঠোঁটে ফুটিয়ে তোলাবে—স্তবকে স্তবকে ভরা লাল পলাশ ফুল। তাই হবে। তাই করাবে তারই শুচিস্মিতা এই প্রিয়া।—নিজেরই যুবতী স্বভাবের স্বভাবজ দুষ্টুমির রঙখানা নিঙাড়িয়ে।—কেন না, সন্ধ্যাকর জানে—এই অজন্তা শুধু তারই জন্য আজ —বাগদত্তা। আর শ্রীমতী অজন্তার এই অনুরাগবতী সন্ধ্যার মতো মায়ারাগভরা দেহী-রূপ, অবেশ দেওয়ানো যৌবন, রক্তিমাভা ছড়ানো অধরেরই স্নিগ্ধ হাসির দুষ্টু-দুষ্টু ছর্‌রা, সলাজের ঘেরাটোপে থাকা অবস্থাতেই রূপবতী বুকখানায় নিলাজ ভরা ছন্দ ও যতি সাজানো, মদিরা কজ্জলিত চোখের শুধু বিলোলতা ঝরানো দৃষ্টি—এর এত সবেরই ত' সৃষ্টি হ'য়েছে প্রিয়র জন্য। আর স্থিতি পেয়েছে—এই শ্রীমান সন্ধ্যাকর চৌধুরীরই জন্য।

এই সাত-পাঁচ ভাব-ভাবনার তালে তালে—গোধূলি প্রায় দূর আস্তে চলে যেতে বসেছে। আর ওদিকে উকিঝুঁকি দিতে থাকা মিষ্টি সন্ধ্যা তখন ধূসরিমা ভরা বহু দূরেকার সীমাহীন আকাশেতে দোল খাচ্ছে—শুকতারাটির মিটিমিটি ভাবে

প্রকাশেরই সঙ্গে সঙ্গে।—তাই এই মুহূর্তে দক্ষ শিল্পীর হাতে গড়া এক মূর্তির মতো সুনিশ্চয়ে প্রিয়ার দাঁড়িয়ে থাকাকে—একটু তফাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেও—কিন্তু কোন অতৃপ্তি এলো না—অতি কাছের তাপ-ঝরনাটিকে বুকের আশ্রয়েতে গ্রহণ না করায়ও। এরই জন্য যুবক সন্ধ্যাকরের মনের অলিন্দ পথটি দিয়ে গুনগুনিয়ে উঠলো—মহাপ্রেমিক জন কীটস্ এর 'Ode to Fanny' নিয়ে—

"Ah! dearest love, sweet home of all my fears,
And hopes, and joys, and panting miseries,
To-night, if I may guess, thy beauty wears
A smile of such delight,.....As brilliant and as bright,
As when with ravished, aching, vassal eyes,
...Lost in soft amaze, ...I gaze, I gaze!"

হঠাৎ এ হেন কাব্য সুরভিতে ভরা প্রণয়াতিতে মনের প্রিয়র সচলতা উর্ম্মিমুখর আহ্বানে সাড়া দেওয়াতে—শ্রীমান সন্ধ্যকর ঐ তফাতে দাঁড়িয়ে থেকেই মুখের কথায় সরবে ঝল্‌মলালো—"ঈষ্। তুমি কি দুষ্টুমি কোরে এমন স্ট্যাচুর মতো নিজেকে দাঁড় করিয়েই রাখবে? আর মায়ারাগ দিয়ে অন্যকে ধাঁধিয়েই তুলবে? বাব্‌বা। এই অজন্তা, একটা কথাও ত' বললে না এই এতক্ষণে। শোন অজন্তা। আমি দাঁড়ালাম এখানটাতেই। তুমি এগিয়ে এসো। এই, কাছে এসো বলছি।"

শ্রীমতী অজন্তা তার চোখে-মুখে মধুর করা ছবির ভাবটি—দুলিয়ে নাচিয়ে জানালো তখনি—"ভারী শান্ত তুমি নিজে, তাই না? আচ্ছা সন্ধ্যাকর, তুমিও ত' কোন কথাটি বল নি এতটা সময় ধরে? তবে, বলি দোষ কি একতরফা আমার? এই, এই সন্ধ্যাকর। আমি যাবো না। তুমি এসো। লক্ষ্মীটি।"—বলতে বলতে শ্রীমতী অজন্তা তার সমস্ত শরীরময়তাকে আরো মদির ও মদালসা করালো। তারই রূপবিহ্বলতায় নাচালো। হাসালো। মিষ্টি হাসিতে মুক্তা ঝরালো।

সন্ধ্যাকর বলল আবদার নিয়ে—"না, না। দুষ্টুমি ছেড়ে তুমি এসো আমারই কাছটিতে। দুষ্টু অজন্তা। কথা শোন,এই লক্ষ্মীটি।"

আদুরে গলায় তারই উত্তর জানালো অজন্তা—"আগেই ত' বলেছি আমি কথা শুনবো না। এই সন্ধ্যাকর। লক্ষ্মীটি তুমি কাছে এসো। জান ত' ঠিক-ঠিকই, আমি দুষ্টুমি ক'রছি। এসো, এই দুষ্টু।"

—"সত্যি তুমি যা দুষ্টু না! বাব্‌বা, আমার ত' এখন থেকেই মনেতে ভয় এসে গেছে এই নিয়ে, যে, তোমায় বিয়ে করার পর না জানি মেয়েলি দুষ্টুমির দুরন্তপানায় তুমি আমায় কত বেশী নাজেহাল করাও! সত্যি, তুমি মোটেই মিষ্টি মেয়ে নও। এই তুমি, হ্যাঁ, তুমি হোলে মস্ত এক দুষ্টুটি। মস্ত দুষ্টুকা। তাই ঠিক না, এই অজন্তা?"

প্রশ্নের উত্তর না জানার পথেতেই—তাড়াতাড়ি সামনের দিকেতে এগিয়ে এসে আপন দুষ্টুকা এই অজন্তার আবেশ ভরা দেহময়তার ঘনিষ্ঠ তাপের সঙ্গে —সংযোগ রেখে দাঁড়ালো সন্ধ্যাকর। আর তখনি সুন্দর-দেহী আপন যুবকের বুকখানার আশ্রয়েতে অজন্তা মদালসার মতো ঝুপ কোরে পড়ার মতো নিজেকে মিলিয়ে দিল।

আপন হাতের কোমল বাঁধন ছড়িয়ে দিল প্রিয়র পিঠ পর্য্যন্ত। মুখোমুখি থাকায় এই কন্যা দুষ্টুকা তার টোল গড়ানো কপোল দিয়ে সজোরে ছুঁইয়ে প্রণয়ের উষ্ণতা জানালো—সন্ধ্যাকরের বাম ধারের কপোলেতে। গলার নীচেতে। কাঁধের ওপরেতে। তারই মধ্যে প্রিয়কে আদরে বন্দনা করার মতোই কোরে জানালো—"সন্ধ্যা। আমার সন্ধ্যাকর। এই, বলি দুস্টুমি কোরে এতক্ষণ ধরে কি দেখছো? বল, মিষ্টি।"

ঝকমক করা মুক্তার মতো শুভ্রতায় মুক্ত থাকা হাসি ছড়িয়ে বলল সন্ধ্যাকর—"দেখছি শুধু তোমাকে। আমার দুষ্টুকাকে। আমার মধুরা মিতাকে। আমার লক্ষ্মী অজন্তাকে। হ্যাঁ, লক্ষ্মী বনাম দুষ্টুকে।"

তারই উত্তরে অজন্তা রজনীগন্ধার মতো দারুণ সৌরভ মেশানো হাসিতে আনচানিয়ে উঠে বলল—"দ্যুৎ। শোন, এমন সময়ে, আর এমন সাঁঝের শুকতারা ফুটে ওঠার সময়টায় আমাকে আর লক্ষ্মীটি বলে সম্বোধন ক'রো না। এই সন্ধ্যা, বুঝলে? মুখ ফুটে বল—শুধু দুষ্টুকা। দুষ্টু অজন্তা। কেমন?"

আবার শুভ্র মুক্তার মতো মুক্ত ভরা হাসি ছড়ালো—যুবক সন্ধ্যাকার। আবদার নিয়ে জানালো—" বেশ। তাই ঠিক আছে। তুমি তা হোলে পুরোপুরি এক দুষ্টু অজন্তা। এই ত'?"

কিন্তু সন্ধ্যাকর এমন কথাটি বলতে থাকার সময়—সন্ধ্যারই মতো অনুরাগে বিলোলিতা অজন্তা—তার ডান হাতখানা দিয়ে ওর কথা বলা থামিয়ে দিল মুখখানার 'পরে চাপা দিয়ে। বলল অজন্তা আদর করার সুর ধরে—"এই, আর কথা নয়। সন্ধ্যাকর, শোন, এইবারটি একটু দুষ্টুমি আরম্ভ কোরে দাও, কেমন? এই, লক্ষ্মী সন্ধ্যাকর?"

রজনীগন্ধার মনমদির করা সৌরভ আবার অজন্তার হাসিতে উঠলো ঝলমলিয়ে। সাজলো রিমঝিম করার ছন্দ-যতি-মিলেতে!

কয়েকটা পলক কাটলো। তার পরেই সন্ধ্যাকরের মুক্তার মতো ঝকঝক করা হাসি এসে মিললো—অজন্তার রক্ত-রঙ্ রঞ্জিত অধরাধারে। আপন দয়িতের এ হেন দুষ্টুপনায়—লাল রঙের ছোপ ভিজে গিয়ে—সন্ধ্যাকরেরই অধরকে কোরে তুললো রাঙা। ঈষৎভাবে। শুধু লালে রঙীন আভাসিত রেখায়।

প্রিয়ার রাঙা অধর ধরে ধরে লজ্জার কুসুম চয়ন শুধু একটিবার করার পরেই—কি মনে হওয়ায় সন্ধ্যাকর মুহূর্ত মধ্যে থামিয়ে দিল আপন অধরেরই সহাস দুষ্টুপনাকে। দু'হাতের আধারে অজন্তার রুচিরায় পরম স্নিগ্ধ মুখখানাকে ধরে রেখে—চার চোখের মিতালি পাতিয়ে দেখতে লাগলো পলকশূন্য মনবিহ্বলতায়। মনময়তায়। ধ্যানমগ্নতায়। আবদার ভরা খুশীময়তায়।

আনন্দের সেই খুশীময়তায় নাচতে নাচতে অজন্তা বল—"এই? এই সন্ধ্যাকর। বলি, পথ পেয়েও পথ হারাচ্ছ কেন? ভারী দুষ্টুমি পেয়েছো না?এই, আমায় উতলা কোরে, আর এলো-মেলো ক'রে তারপরেই নিজে হোচ্ছ স্থির! শান্ত! বেশ, না? না, না, তুমি দুষ্টু হও। তুমি ঝড় হও। তুমি ভালোবাসা জানাতে জানাতে হও দুর্বার। হও দুর্দম। আমার মনের সায়রেতে ঝড়ের মাতামাতিতে ডেকে আনাও বন্যাকে।

খরস্রোতখানাকে। এই সন্ধ্যাকর। থেমো না। যে অনিবার থাকা মধুরের সন্ধান এই একটু আগে তুমি তোমার হাসি ভরা অধর থেকে ছোঁয়ালে—আমারই কুমারী-যৌবনের বিস্ময় জড়ানো কাঁপন ধরা ঠোঁট দু'খানায়—এই সন্ধ্যাকার, জান, এইটিই ত' আমার প্রথম অর্জিত—প্রথম পরশ। আর যৌবনে তা একমাত্র প্রথমবারের বলেই। তোমারও যুবক পরিচিতিতে সার্থ হোল এই উপহার। শোন, শোন। এ নিয়ে হও অনিবার। বাধনহারা। Oh, Sandhyakar! my betrothed!—Come, woo me, woo me ; for now I am in a holiday humour, and like enough to consent. What would you say to me now, an I were your very very Ajanta" এ, বল তাই কি?"

প্রিয়ার লাল লাল ঠোঁটে পরিশোভিত অধরাধারেতে—শেক্সপীয়রের অনন্যা মানস-কন্যা শ্রীমতা রোজালিণ্ডের দুষ্টু-দুষ্টু বাক্-বিভূতিটিকে ঝলমলাতে দেখে—শ্রীমান সন্ধ্যাকরের তখন ইচ্ছা হোল—যুবক অরল্যাণ্ডো হোতে।

—"ওগো অজন্তা। ওগো বাগদত্তা। দেখ, দূরের আকাশে সন্ধ্যা এখনো দোল খাচ্ছে। তার বিরাট আঁচলখানাতে চারধার এই আবরিত ক'রবে ক'রবে বলে। তাই আলো থাকতে থাকতেই আমি কোন কথার উত্তরটিতে দিতে গিয়ে অযথা সময় নষ্ট না কোরে বলতে চাই—আমার আদর। 'I would kiss before I spoke' কী রাজী ত'? বাঃ মেয়ে, তুমিই ত নিজে থেকে তাই চাইছ না?"

শ্রীমতী রোজালিণ্ডের কথার ফুলঝুরি ফুটিয়েই শ্রীমতী অজন্তা তার প্রাণাধিককে জানালো তখনি—"না, না। বলেছি ঠিকই। তবু কি জান, 'Nay, you were better speak first ; and when you were gravelled for lack of matter, you might take occassion to kiss...and for lovers, lacking (God warn us!) matter, the cleanliest shift is to kiss.' এই, এই? এই দুষ্টু ছেলে, এবার বুঝেছো ত' আমি কি চাই?"

প্রিয়ার কথা কেন তারই আদরের প্রিয় বুঝবে না?—ঠিকই বুঝেছে প্রিয়া। ও বুঝলো—বাব্বা, এত' আর যা তা, বা যার তার ভাষণ নয়! আর সত্যি, এ ত' আর যেন-তেন-প্রকারেণ করার মতো ভালোবাসা নয় কণামাত্র! শুধু শাণিত যুক্তির আদান-প্রদানে 'হ্যাঁ'-কে শুধু 'না'-ই করাতে পারলেও—প্রত্যুত্তরে কিন্তু অরল্যাণ্ডোরূপী শ্রীমান সন্ধযাকরও কমতি গেল না—যখন সে তারই আদরণীয়ার সুভাষণখানার প্রতি উত্তর জানাতে গিয়ে পাল্টা প্রশ্ন সাজালো—"ওগো মিষ্টি। বলি, এর পরে 'How if the kiss be denied?'—তখন?"

ওদিকে ওরই প্রিয়া এই অজন্তার শুধু দুষ্টুমিতে আবরিত করা যৌবন-সবুজ দেহমনের আঙ্গিনা জুড়ে—এরই উত্তরখানা ছিল সাজানো। গোছানো। আর দুষ্টুমিতেই রাঙানো। শ্রীমতী অজন্তা তাই সহাসে মুখর হোয়ে বলল—"এই সন্ধ্যাকর। শোন দুষ্টুটি। তোমার এ হেন প্রশ্ন করায় আমার মধ্যে কিন্তু কোন ভাবনা দেখা দেয়নি। কেন না তোমারই প্রিয়ার ঠোঁটে ঠোঁটে তারই লজ্জা কেড়ে নিয়ে চুম্বন-দান করাকে বারে বারে বাধা দিলেও—এটা আমারই প্রাণাধিক বলে, তোমারও জানা

উচিত, যে, তখন এই দুষ্টু মেয়ে-রূপী অজন্তাই....puts you 'to entreaty', and there begins 'new matter'."

সত্যি ত'— শেক্সপীয়রের অনিন্দ্য চরিত্রায়ন রোজালিণ্ডের মুখের কথাটিকে— বড় বেশী লাজহর ও বুদ্ধি-দীপ্ততায় ক্রেডিট কোরে শ্রীমতী অজন্তা শেষাশেষি যা শোনালো—তা যুবক সন্ধ্যাকরের মনে হোল—এমন কথাটার মূল্যায়ন সত্যি অনিন্দ্য। আর অনিবার।

ভালোবাসাবাসিরই রঙ্ ঘেরা সূর্য্য-স্নাত আবেশলোকেতে যদি সবুজে উচ্ছল দু'জনার মধ্যে—মন নিয়ে আর দেহ নিয়ে সযতনে করা জানাজানি ও চেনাশুনার ব্যাপারে—এই একটু দ্বন্দ্ব, এই একটু ভুল বোঝাবুঝিতে—সাধাসাধি করার মধ্যে মান-অভিমান ভাঙ্গাবার জন্য—আর তাই নিয়ে বিদিশার মতো বিস্ময় ঘেরা অভিমান করা, ও আলস্য ভরিয়ে অকারণেতে চোখের জল ফেলা—এ সবেরই এমনটা না হোলে পর—ভালোবাসার মধুবাতায় ঘেরা জীবন দুটি হ'তে পারে না—শুধু বিচিত্রারই সাজঘর। হোতে পারে না—মধুঋতায়ত সুখের মধ্যে—মিতালির জন্য শুধু রিমঝিম করা ছন্দ-কাকলী।

রঙীন হাসির শুভ্রতায় আনচানিয়ে সন্ধ্যাকর বলল—" বেশ। বেশ। পরের মেয়ের 'witty' কথাগুলো ধার কোরে ভালো কোরেই শোনালে দেখছি? আমি যদি অস্বীকার করি তোমার নির্দেশ না মেনে, তা হোলে কিনা you will put me to entreaty,and there will begin new matter? তা বেশ ত'! থেমে আছো কেন? তুমি নিজেই না হয় ভূমিকা তৈরী করাও। কেমন? আমি ভালো ছেলেটির মতো নিশ্চুপই থাকি। তাই ভাল। এই, বলি দুষ্টুকা, হয় বল কিছু। নাহয় কর কিছু।"

—"আমি! আমায় বলছো? তুমি না আমায় এত মুস্কিলেও ফেলতে পার তাই দেখছি। কথায় কথায়, আমারই কথার মানে অনুযায়ী শেষ পর্য্যন্ত তুমি সন্ধ্যাকর আমাকে লাজবাসরের অস্বস্তিতে টেনে দিতে চাইলে? ঈষ্। ভারী দুষ্টু তুমি।"

বলে অজন্তা সন্ধ্যাকরের হাসিতে আর খুশীতে ঝকমকানো চোখের দিকে তাকালো। তাকিয়ে তাকিয়ে হাসলো নিখুঁত এক মধুছন্দা রূপের মধ্যে।—রাঙা সন্ধ্যার অনুরাগ-নির্ঝরিণীটিকে সাজিয়ে নিয়ে। হাসিয়ে দিয়ে।—ঐ বহু দূরের আকাশেতে দোল খাওয়া—সুন্দরী সনধ্যারই মতো অনুরাগের লহরে লহরে নাচিয়ে।

সন্ধ্যাকর তখন খুশীময়তায়—ছন্দের মিল ধরাবার জন্য প্রয়া অজন্তাকে বুকের কারাগারে আরো ঘন কোরে বন্দিনী রেখে—লাল আভায় চুনীর মতো ঝকঝকে হাসিতে উপছানো মুখখানার ওপরেতে—প্রায় অধরে অধরাধর ছোঁয়াবার মতো ভাবে ঝুঁকে পড়ে বলল—

—"জান অজন্তা, তোমাদের যুবতী মনের দুষ্টু মতিগতি কখন যে কোন পথেতে চলতে চলতে পালাবাদল কোরবে, তা সত্যি স্বর্গের বেদতাদেরও থেকে যায়—অজানার ব্যাপার। কি, তাই ঠিক না? এই ব্যাপারে একটা কথা এখন আমার মনে পড়েছে। তুমি আমার নিশ্চলতা দেখে অনুযোগের মাপকাঠি দিয়ে নিজেকে করাবে সক্রিয়—ধরে ধরে, যা তুমি একটু আগে আমায় শোনালে না, হ্যাঁ, তার পরেও আমার

মনে হয়—ওটা কি তুমি নিজে থেকেও কোরতে চেয়ে, পারবে কি ঠিক ঠিক ভাবে মধুরেতে শুধু মধুর কোরে সমাধা কোরতে? আমার সন্দেহ আছে। কেননা, তোমরা হয়ত' কোরতে পেরেও, শেষে হয় ত' আবার বলতে চাইবে, এই সন্ধ্যাকর, কে বলল আমি এমনটা করেছি? আর কখনই বা ক'রতে চেয়েছিলাম? জান অজন্তা, তাই মনে পড়েছে কথাটা। শোন, তুমি ত' ফ্রান্সের বিখ্যাত লেখক স্তাঁদালকে চেন। জানি তাঁর 'Scarlet and Black' বইটি ত' তোমার প্রিয় একটি গ্রন্থ। ওর নায়ক সম্পর্কে তুমি ত' একটা ছোট্ট আলোচনাও করেছিলে কলেজ ম্যাগাজিনেতে।"

—"হ্যাঁ। হ্যাঁ। সব কথাই ঠিক। এই, বল, স্তাঁদালের কথা উঠেছে কেন? বুঝেছি। বুঝেছি সন্ধ্যাকর। স্তাঁদালের ত' 'Love' নামে একখানা নামকরা বই আছে। বলি দুষ্টু ছেলে, তা থেকেই আমায় কি কিছুটি জানাতে চাও?"

কথা বলতে বলতে—আজও ওর লাল লাল ঠোঁটেতে ফুটে থাকা অনির্বচনীয় খুশীর অন্বেষণ—তারই কুমারী বিস্ময়খানা নিয়ে আরেকধারার অধরের দুষ্টু-দুষ্টু কুমার-বিস্ময়খানাকে সিক্ততায—ঘনতর করা ছোঁয়াচে ছোঁয়াচে ভাসিয়ে নেওয়ারই জন্য—অধর সমেত একেবারে সন্ধ্যাকরের মুখটি হাসিকে প্রায় ছুঁতে ছুঁতে—কিন্তু পারলো না সত্যি অজন্তা তা সম্পূর্ণ করাতে। যতই ও যুক্তিবাদী আধুনিকাই হোক না কেন! ওকে বাধা দিল যুবতী স্বভাবের একান্ত লজ্জার অভিমানী মূর্চ্ছনা।

—"ঈষ্। ঈষ্। অনভ্যাসের রূপকলা কিনা, তাই এত কাছে এসেও পারলে না তৈরী করাতে— সেই 'new matter' খানাকে। শোন অজন্তা, আমি জোর কোরে নিজের জন্যা তা সঞ্চ য় করাতে পারি তোমার কাছে থেকে। কিন্তু তা কোরতে একটু ভয়-ভয় লাগছে। কেন জান? ঠিক সব তুমি নিজে থেকে পেতে দিয়ে, আর সত্যি পাইয়ে, হয় ত' শেষাশেষি বলবে, কৈ, আমি কি তা দিয়েছি? না ক'রছি?—জান ত' অজন্তা এই নিয়ে তোমাদের সম্পর্কে স্তাঁদাল তাঁর বিখ্যাত 'Love' বইটিতে লিখেছেন এক জায়গায়, আমি স্মৃতি ঘেঁটে তাই তোমায় শোনাচ্ছি। শোন,—'In cases where love has been thwarted by an ever-easy victory, I have seeen crystallization among the tender-hearted trying to form afterwards. "No", she says to him, laughing, "I don't love you."—বুঝলে মেয়ে, এ ভাবে এমন কথা বলে ফেলে, সত্যি ক্ষণেকের জন্য নিজেদের ভালোবাসার যুবকদেরই কোরে তোলাও—হতচকিত আর কি। সত্যি মুহূর্তের জন্য এমন না—না জানিয়ে আমাদের এ নিয়ে ধাঁধিয়ে দিতে ঠিকই দেখছি—তোমাদের খুবই ভালা লাগে। যাক্ ও কথা। আমায় কিন্তু অজন্তা, শোন, কখনো অমন ভাবেতে ধাঁধিয়ো না কিন্তু। নিষেধ আগে থেকেই জানিয়ে রাখলাম।"

"না। না। শোন সন্ধ্যাকর, আপাতত মানে যতদিন না আমাদের বিবাহ হচ্ছে, ততদিন আগে কিন্তু তোমায় এ নিয়ে কথা দিতে পারছি না। বুঝলে? বিয়ের আগেই ত' মন-প্রাণ ভরিয়ে দুষ্টুমি কোরতে ভালো লাগে। জান না? দুষ্টুমি যা করবার তা এখনি নেবো করে। বিয়ের পর এত শান্তটি থাকবো, যে, তুমি আর বিয়ের আগেকার অজন্তা যে কি বেশী দস্যি মেয়ে ছিল, তা ভাবতে গিয়ে, আর তুলনা কোরতে গিয়ে—

তুমি নিজেই উঠবে কিন্তু শিউরে। তখন বিয়ের পরেই এত বেশী শান্ত আর লক্ষ্মী মেয়েটি হোয়ে উঠবো যে, কেন,—তা পরে তোমায় একদিন বলবো। নিশ্চয়ই জানাবো।"

কথা শেষে দুষ্টু-দুষ্ট হাসি ছড়িয়ে আর ছিটিয়ে দারুণ মদালসারই মতো করে তাকালো অজন্তা— তারই আদরের, আর আবদার করার এই সন্ধ্যাকরের দুষ্টু হাসিতে নাচানাচি করা— অধরের দিটিতে।

— "দ্যুৎ। ও কথা বাদ দেও। তুমি বলছো, যে, এখন বিয়ের আগেতে মন-প্রাণ ভরিয়ে শুধু দুষ্টুমি কোরে কোরে ধাঁধাতে চাও আমাকে, এই ত'? আর তারপর আমাদের বিয়ে যখন হবে, ঠিক তখন থেকে তুমি হোয়ে উঠবে কি না অতি শান্তা। অতি লক্ষ্মীটি। তাই না?— কিন্তু কি জান— বিবাহের পরবর্তীকা, মানে এই তখনকার তোমাদের সম্পর্কে— তোমাদেরই সেই দেবতাদেরও নাগালের বাইরেকার হাজার এক দুষ্টুমিপনায় ঘেরা রহস্যময়তা দেখে দেখে, আর বুঝে বুঝে সেই মনীষী স্তাঁদাল তাঁর "Love"-এতে এটা নিয়েও বেশ বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাখ্যা রেখে গেছেন। জান,-- বিবাহের পর তোমাদেরই বিবাহিত জীবনের যৌবনস্নাত যুবতীকা সেই রহস্যময়তাতেই চায়— তাদেরই যুবক-স্বামীদের যৌবনায়নকে ধাঁধিয়ে দিতে। জান অজন্তা, স্তাঁদালের কথা তাই মনে পড়ছে তোমারই কথার পিঠেতে, যে,— "The husband of a young woman who is adored by her lover yet treats him ill, scarcely letting him even kiss her hand, has at best only the grossest physical pleasure where the lover would find the delights and transports of the keenest happiness possible in the world."— আচ্ছা অজন্তা, যা শুনলে আমার মুখ থেকে, এই তা নিয়ে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো কিছু কিছু। তুমি ত' মেয়ে, কাজেই ছেলেদের চাইতে অনেক আগেই বুঝে ফেলতে পারবে— কোন স্তাঁদাল এমন শাণিত কথার বুদ্ধি দীপ্ততায় তোমাদের সম্পর্কে এমন ব্যাখ্যা কোরেছেন। কি বল, ঠিক বললাম ত? শোন অজন্তা। শোন একবারটি।"

দুষ্টু-দুষ্টু হাসিতে ঝলমলিয়ে উঠে অজন্তা জানালো আমারই কপোলেতে তার একধারের কপোল লাগিয়ে সুন্দরে-মধুরেতে আদর করাতে করাতে—

—"আচ্ছা সন্ধ্যাকর! ব্যাপারখানা কি বল ত'? সত্যি আমার পক্ষে বোঝা মুস্কিল হোচ্ছে। কেন জান? এ জন্য, যে, কথায় কথায় আমার সমালোচনা করছিলে উপস্থিত এই তোমারই প্রতি বাগদত্তা থাকাটা নিয়ে। বেশ ত', তা না হয় ভাল কথা। কিন্তু বলি এটা কেমন কথা, যখন ভবিষ্যতে আমি কেমন, আর কি ভাবে তোমারই চাওয়া-পাওয়ার ব্যাপারে নিজের বিধি-নিষেধের কারণটি আরোপ কোরবো বলেই—তুমি এরকম সত্যি ধরে নিয়েছো? সত্যি তখনকার কথা নিয়ে এত কিছুটি শোনানোর কোন মানে হয়? না আছে? যাও, ভারী দুষ্টু তুমি। চাই না তোমার করা কোন আদর। আমিও পারবো না তোমায় আর আদর কোরতে। সত্যি, সত্যি, সত্যি—এই তিন সত্যি জানালাম।"

—"ঈষ্। ঈষ্। মেয়ের আমার সত্যি আবার অভিমান হোল বলে দেখছি। বাব্‌বা।

দোহাই তোমার। আর কিছুটি বলবো না, যাতে তোমার অভিমানে কোন দাগ না পড়ে। কথা দিচ্ছি। তাই বলে তুমি এতটা কঠোর হোয়ে না আমার প্রতি। শোন মিষ্টি। শোন লক্ষ্মীটি। আমার চাওয়াকে—তুমি নেবে না সত্যি তোমারই পাওয়ার মধ্যে? এই, এই, এবার? হ্যাঁ, এইবার কেমন মজা?"

সন্ধ্যাকর কথা বলতে বলতে তার প্রিয়ার শরীরেতে সুড়সুড়ি লাগিয়ে করাতে চাইলো—ব্যতিব্যস্ত থাকা এক এলোমেলো ছন্দ।

তখনি অজন্তা সুড়সুড়ি পাওয়ার শিহরেতে শিহরিয়ে উঠে-উঠে বলল—"আচ্ছা। আচ্ছা। তুমিও ত' কথা দিলে আর বাজে প্রসঙ্গের অবতারণা কোরবে না বলে? তাই আমি আমার মানাখানা ফিরিয়ে নিলাম। ভারী দুষ্টু। এই, কি কোরছ? ঘাট মানলাম। ধ্যাৎ। বড় লাগছে যে! এবার রেহাই দেও।"

দূরের সীমাহীন আকাশেতে তখনও দোল খাচ্ছে এগিয়ে এগিয়ে আসা—মেঘমেদুরতায় ঘনায়মানা শ্রীমতী সন্ধ্যা। তার অনুরাগ রঞ্জিত আঁচলখানা এরই মধ্যে আরো অনেকটা পর্য্যন্ত আবরিত কোরে তুলেছে। তারই আলো-আঁধারির লুকোচুরিতে সন্ধ্যাকর দেখতে পেল—প্রিয়া বাগদত্তার লাল অধরের ঠোঁটে-ঠোঁটে ঐ লালের ফাঁক দিয়ে ঝকঝক কোরে ফুটে আছে—চুনীর মতো লাল হাসিখানা। ওরই মধ্যে ফুটিয়েছে দুষ্টু-বুদ্ধি র লীলাময়তা। অধরের কানায় কানায় জ্বল-জ্বল করা লাল আলপনায়—যুবতীর নিজস্ব রীতির আদর করার আবদারগুলো—যেন থরে থরে তুলেছে সাজিয়ে। ভরিয়েছে মনমাদকতায়। ফুটিয়েছে মদালসা বিহ্বলতারই রূপঝরনায়।

প্রিয়া অজন্তা আজ এক মুহূর্তে তারই বাগদত্ত এই সুজন যুবকেরই তাপঝরা বুকের আরামেতে—তৃপ্তা ও দীপ্তা থাকতে থাকতে—ঐ দূরে থেকে আগতপ্রায় শ্রীমতী সন্ধ্যার অনুরাগ থেকে করা—লুকোচুরির আলোকে-আঁধারেতে এক হ'য়ে মিলে-মিশে অনুরাগ-বতীর মায়াঞ্জন ভরিয়ে জানাচ্ছে যেন সন্ধ্যাকরকে—অধরেরই মৌন ভাষার নিরালা থেকে—"Oh Sandhyakar, my beloved;—"

'See the mountains kiss high heaven,
And the waves clasp one another ;
No sister flower would be forgiven,
If it disained its brother ;
And the sunlight clasps the earth,
And the moonbeams kiss thd sea :
What are all these kissings worth,
If thou kiss not me?"

—আর তাই প্রেমিক সুজনক সন্ধ্যাকরের পক্ষে এমন জোরালো ভাষার মৌনতায় ঝলমল করা ভাবখানার পাঠোদ্ধার করা—খুবই সহজ হোল প্রিয়ারই অধরাধার থেকে—এই মহাকবি শেলীর কাব্যবিভূতিতে তৈরী "Loves' Philosophy"-রই অতি বাস্তবিকতা ফুটে ওঠার—ব্যঞ্জনা ধরে ধরে।

সন্ধ্যাকর তারই রুচিরা-স্নিগ্ধা প্রিয়ার অধরাধারেতে—এখন বিভাসখানার আভাসেতে উঁকি দেওয়ায়—শেলী রচিত "Loves Philosophy"রই প্রথম দিককার বাকী অংশখানা মুখের সরবতায় জানালো—অজন্তার দু'ধারের কপোলেতে আঙুল দিয়ে বুলানো আদর জানাতে জানাতে—

—"এই অজন্তা, তোমার ভারী দুষ্টু-দুষ্টু অধরখানা থেকে আমি মন দিয়ে পড়তে পেরেছি লাজহর এক চাওয়ার মস্ত কথাটিকে। তাই দেখতে দেখতে আমার মনে পড়েছে—

'The fountains mingle with the river,
And the rivers with the ocean ;
The winds of heaven mix forever
With sweet emotion ;
Nothing in the world is single ;
All things by a law divine.'

—বুঝলে অজন্তা, আইনানুযায়ী সব কিছুই হোল—স্বর্গীয়। পুণ্যতোয়া। তাই না? এই ধর না, যেমন তোমার এই দুষ্টুমি ভরা আবদারখানাও ত' এই নিয়মেতেই হোল—এক সুন্দর রূপ। ডিভাইন আসপেক্ট। শোন অজন্তা, এবার সত্যি-সত্যি দেখা যাচ্ছে সন্ধ্যার রূপসী লগ্ন তার আঁধার দিয়ে চারধার পুরোপুরি ঢেকে ফেলেছে। আর বাইরে দাঁড়ায় না। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ত অনেকটা সময় কাটানো গেল নানান কথার মায়াজাল বুনে বুনে। তাই বলি কি, আর বাংলোর ভেতরেই বা গিয়ে বসার কি দরকার? চল, আমরা বেরিয়ে পড়ি। সুজাতাদির ওখানেই যাওয়া যাক। তুমি রাজী আছো?"

নরম হাতের বাঁধনী সুবিস্তারেতে কঠিন ভাবে প্রিয়কে জড়িয়ে বেঁধে রাখার ইচ্ছা থেকে—আস্তে আস্তে আলগা কোরে নিতে নিতে অজন্তা বলল—"ঠিক আছে। তোমার কথা মতোই চল। বেরুনো যাক্। শোন্, আমার গাড়ীখানা গ্যারাজ কোরে রাখি। তোমার গাড়ীটিতেই ফিরে যাওয়া যাবে। আমার মনে হয়, সেটাই ভালো হবে। আমার সঙ্গে এসো। গাড়ীখানা আগে গ্যারাজ করার ব্যবস্থা করি।"

প্রথম অজন্তা এগিয়ে গেল বাংলোরই পেছনের দিককার গ্যারেজে গাড়ী তুলে রাখার জন্য। ওরই পেছনে পেছনে এলো সন্ধ্যাকার।

অজন্তা এগিয়ে গিয়ে তার গাড়ীর দরজাখানা খুলতে খুলতে হঠাৎ কেমন এক আকস্মিকের ছোঁয়া লাগায়—দরজা না খুলেই বন্ধ দরজার গায়েতে নিজের দেহের ভারটিকে ন্যস্ত কোরে—দাঁড়িয়ে পড়লো নিশ্চলা এক ছবির মতো।—নিজের সমস্ত অঙ্গসুষমার মধ্যে আবেশের ঢল্ ধরে মদিরতাকে খেলিয়ে তুললো।

বিলোলতায় হিল্লোল ফুটিয়ে রেখে আমেজ ধরানো গলায় আদর জানাবারই ভঙ্গিমায় জানালো মদালসা হ'য়ে ওঠা অজন্তা—"সন্ধ্যাকর। এমন এক সোনাঝরা সন্ধ্যাটিতে আমায় সত্যি-সত্যি পাগলকরা দুষ্টুপনায় পেয়ে বসেছে। কৈ, তুমিও তাতে সাড়া দিয়ে হোয়ে উঠবে না—শুধু দুষ্টুমান? এই, এই, শুধু একবারটি দুষ্টু হও। এমন

নিরালার নিঃশব্দ ঘেরা সন্ধ্যায় তোমারই প্রিয়ার হ'য়ে চাইছি কোরতে—এমনি দুষ্টুমিখানা। সত্যি সত্যি।"

সন্ধ্যাকর তখন তারই প্রিয়ার মদালসায় ঝকমক করা শরীরময়তায় মুঠোমুঠো করা ফুলের রঙ্গরাগখানার ওপরেতে প্রায় ঝুঁকে পড়ে বলল সপ্রগল্‌ভতায়—"এই দুষ্টু। কি চাও? বলি,—Only a never parting long kiss? And nothing else ? সত্যি তাই?"

অজন্তা উত্তরে জানালো—শুধু মুখের মৌনতা সাজানো হাসিরই মনমাদক করা উর্ম্মি আহ্বানেতে।

—"দুষ্টু। দুষ্টু। এই অজন্তা, বেশ তাই হবে। তাই নেও মন উপছিয়ে আমারই কাছটি থেকে।"

ও কথা বলতে বলতে—সন্ধ্যাকর তারই প্রিয়ার পেশলতায় আর নিটোলতায় আনম্র লজ্জাভারেতে ঘেরা বুকখানার নিরুপমতার সঙ্গে—নিজেরই কবোষ্ণ তায় হ্লাদিত বুকের আলিঙ্গনকে সম্পন্ন কোরে—অজন্তারই মুখের অতি কাছাকাছি নিজের মুখখানা রাখলো। —আর অজন্তা তখন সন্ধ্যাকরেরই দেহের তাপঝরার আধারেতে নিজেকে ভালো কোরে সঁপে দিতে-দিতে রক্তিমাভা ছড়ালো। আদুরে গলায় আমেজ ঝরিয়ে বলল—"এই, কি দেখছো? এই আলোয়-আলোয় ঝলমলিয়ে ওঠা জ্যোৎস্নার মধ্যে, আর এই পিপুল গাছের ছড়ানো ছায়ার মধ্যে আমায় পেয়ে, বল, কি দেখছো এত উতলা ভাবেতে?"

তখনি সন্ধ্যাকর বলল অতি ধীর করা লয়েতে—"ভুল বলছো। দেখছি ঠিকই। তবে কি জান অজন্তা, দেখতে দেখতে আজই কিছুক্ষণ আগে তোমার মুখেতে শুনতে পাওয়া—একটা জানানোর মতো কথা আছে যে, তা তোমার কাছে জানায়, আমি ভাবছি এখন, কি হোতে পারে সেই কথাটা! এই, জানাবে এখনই? জানাও লক্ষ্মীটি।"

জ্যোৎস্না-ধোয়া সন্ধ্যার প্রাথমিক ছোঁয়াতে অজন্তা আরো যেন রেঙে উঠলো। দেহেতে। আর মনেতে।

সেই আনন্দিত ভাব-পরম্পরা নিয়েই অজন্তা লজ্জায় শুধু লাল রঙ্‌ হোতে হোতে বলল—"ও বুঝেছি। তখন বলেছিলাম কথার ফাঁকে, যে, বিয়ের পর হবো—খুবই শান্ত আর লক্ষ্মীটি। কেন হবো, তাই না?"

বলতে বলতে অজন্তা তার দু'হাতের নরম বাঁধনখানা প্রিয়র দেহেতে আষ্টেপৃষ্ঠে ন্যস্ত রেখে জানালো—"এই ছেলে, বলি, বিয়ের পর আমাদের লাজপসন্দ অনুসারে আমি কি প্রজাবতী হবো না? যে কোন বিবাহিতা যুবতীই তার অসম লজ্জা দিয়ে সাজানো এই অতি পছন্দেরই কানুনেতে ঋতুর বিপর্য্যয়ে যৌবনাকুতি নিয়ে হোয়ে ওঠে—পুরোপুরি সৃজনশীলা। তাই এই লাজপসন্দ ধরে ধরে আমি যেদিন তোমারই সহায়তায় জানাবো—সত্যি-সত্যি মা হোতে চলেছি, ঠিক তখন থেকে আমার ভেতরের সব রকম দুরন্তপনায় ঘেরা দুর্দম দুষ্টুমিগুলো থাকবে না অবশিষ্ট—কণামাত্র। সব ঝরে পড়ে যাবে। লাজপসন্দ-খানা পরিপূর্ণতায় এনে যুবতীর যৌবনায়নী সৃষ্টিকলায় তোমায় দিয়ে আমি হবোই হবো— সেই ব্লু বার্ডের গরীয়সী

মা। আমার ঐ একটি মাত্র সন্তান হবে—হয় টিলটিল। আর না হয় ত মিটিল। নয়ত এলিস্। বা লুসি গ্রে আর নয় ত' আমাদেরই অতি ঘরোয়া বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট্ট অপু,—আর নয় ত'রূপদক্ষ বিভূতি মুখোপাধ্যায়েরই ছোট্ট দেহ-মনের মধ্যে হ'য়ে ওঠা—পাকা গিন্নী রূপী- -সেই রাণুকে। যদি প্রথম সৃষ্টিতে টিলটিল বা অপুর মা হই,—আর তাদের আদরে যত্নে সেবায় ভবিষ্যতের কোন নামী ও দামী ব্যক্তিত্বে ফোটাবার সহনশীলতা নিয়ে চলতে চলতে—যদি কোন দিন আমারসৃষ্টির কারুকাজ আবার নতুন এক লাজপসন্দ করার মধ্যে বাকী মিটিল বা রাণুর মা হতে চায়,—তা হোলে আর সময় কোথায় পাবো বল,—যার থেকে তোমায় নিয়ে শুধু হাজার এক দুষ্টুমিতে থাকতে পারবো—দুরন্তপনায় শুধু দুষ্টুমতী?"

প্রিয়ার অধর থেকে মুক্তা ভরা হাসি সমেত শেষ কথাটা বেরিয়ে আসার পরই—অজন্তার অধরেতে সন্ধ্যাকর নিজের অধরখানা ঝড়ের মতো কোণে তুলে—লুটিয়ে দিয়ে রাখলো। তারই মধ্যে বলে উঠলো সন্ধ্যাকর কোন রকমে—"ঈষ্। ঈষ্। কি সাংঘাতিক দুষ্টু মেয়েরে বাব্ বা। এখনো বিয়েই হোল না। রয়েছো শুধুই বাগদত্তা। তবু কিনা নিজের দুনিয়া ঘিরে ঘিরে রাম না জন্মাতেই অযোধ্যায়র সৃষ্টি করিয়ে রেখেছো? বাব্ বা। এই দুষ্টু বুদ্ধির কাছে আমার মতো ছেলেরও হার অবিসংবাদিত সত্য। কি ভীষণ তুমি! কোথায় বিয়ের পর আমরা—ভারত সরকারেরই মতো ঢাউস ঢাউস আকারে রচনা করারই একটা পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা ধরে করাবো বলে মনে মনে ঠিক কোরেছিলাম—ভারত সরকারেরই শেষ অবধি হাজার কাঠ খড় পুড়িয়ে পুড়িয়ে খুঁজে না পাওয়ার—কোন output! হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভেবে রেখেছিলাম তেমনি ধারার পরিবার পরিকল্পনায় নিজেদের তালিম দেওয়াবো। ও নেবো। কিন্তু তুমি দেখছি আমার সেই প্ল্যানখানাকে বানচাল করার জন্য এখনি পাল্টা এক পরিকল্পনা সাজিয়ে রেখেছো। ঈষ্। কি যে না তুমি, তা বোঝা সত্যি মুস্কিল! তুমি, হ্যাঁ, তুমি বিয়ের প্রথম বছর ও তার পরের পাঁচ বছরের মাথায় ঐ দু'জনাকে তোমারই লাজপসন্দ অনুযায়ী সৃষ্টি করাবে, তাই ত'? প্রথমটি বড় হোতে হোতে যদি তোমার মনে হয় এটা।—সত্যি ও বড় হোয়ে ওঠায়, নিজের ছোট্ট ব্যক্তিত্ব নিয়ে সে শিশু আর তোমার কোলে থাকতে চাইছে না, বলি ও মেয়ে, তুমি কি তখনি চাইবে নতুন আরেক জনাকে?—- যে কোলে কোলে থাকবে তোমার? ফলে তাদেরই জনককে তখন তাদেরই গরীয়সীয় মায়ের কাছটি থেকে—থাকতে হবে দূরে দূরে। দেহ-মনের সেই শত যোজন দূরে। তাই ত? বলি দুষ্টু, দুই পেয়ে যদি আবার বছর তিনেক পরে—চাও তিনেরই জন্য সৃজনতা? বলি, তারপর তখন?"

কথা শেষ কোরেই প্রণামাতানো সরব হাসির ছররায় ভেঙ্গে পড়লো—যুবক সন্ধ্যাকর।

অজন্তা তার অধরেতে বর্ধিত সন্ধ্যাকরের আদরকণাকে ঠোঁট দিয়ে নিঙাড়িয়ে কোন রকমে আবেশ জড়নো গলায় বলল—"যাও। ভারী দুষ্টুমি হোচ্ছে।"

—"বাঃ। দুষ্টুমি আবার কি করা হোল? তোমারই ভবিষ্যতের একখানা পরিকল্পনা নিয়ে এই আর কি কিছু পার্লামেণ্টোরী ডিসকাশন্ করা হোল। মোশান্ তুমিই

তুলেছিলে, তা খেয়াল আছে কি? এখন অপছন্দ হোলে, বল শুধু তোমার আমার এই Parliament of Love Affairs'-এ অন্য আর কোন লোক কি তার মাথা গলিয়ে 'স্পীকারো'চিত 'অর্ডার' করানোর মধ্যে 'adjournment of the house' করাবে, বল? রাগ কোরো না দুষ্টু। আর একটু আমায় খুলে বলতে দেও। অজন্তা, তোমার পঞ্চ -বার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম বছরের পকিল্পনা ধরে সৃষ্টি হবে—হয় টিলটিল কি অপুর। তারপর ঠিক চার বছরের শেষাশেষি—পাঁচ বছরের মাথায় দাঁড়াবে সংখ্যাখানা দুই। এবং শেষ সৃষ্টি রূপী সেই দুই-ই হবে—মিটিল বা রাণু,—কি তাই ত?"

—"যাও। এখনি এত সব ভাবনার সাত-পাঁচে নিজেকে জড়াচ্ছো কেন? হ্যাঁ, সন্ধ্যাকর তাই। যাও, আর কিছু আমি বলতে পারবো না। এর পরও তুমি যদি কিছু বল, তা হোলে তা হবে 'unparliamentary' বুঝলে, দুষ্টু ছেলে। এই, অমন গোগ্রাসে তাকিয়ে আমার মুখেতে আবার কি দেখছো?"

মুক্তার মতো ঝকমকানো হাসি ছড়িয়ে বলল সন্ধ্যাকর—" দেখছি দুষ্টুকা, তোমাকে। অজন্তা, তুমি কবে হবে অতি লক্ষ্মীটি— সেই তারই ছাপ কোথাও আছে নাকি লুকিয়ে,—তাই দেখছি শুধু।'

উত্তরে শ্রীমতী অজন্তা প্রিয়রই মতো মুক্তার ঝলক লাগানো রজনীগন্ধার মতো সৌরভ মেশানো হাসিতে মেতে উঠে বলল—"এই? তুমি কি যে না! বলছি ত' আমি কবে আর কখন লক্ষ্মী মেয়েটি হবো, তা কিন্তু ভাববার সময় নয় এটি। এমন শুধু— ভাবো আর বল, —'দুষ্টু অজন্তা'। হ্যাঁ, তাই।"

আবার মুক্তার মত অজন্তা হাত চাপা দিয়ে ধরলো সন্ধ্যাকরের অধরেতে। আর তখনি অজন্তা বলল—"এই। শোন মিষ্টি। আর কোন কথা নয়। একটু শুধু দুষ্টুমি আরম্ভ কোরে দাও এইবারটি। শোন, লক্ষ্মী সন্ধ্যাকর।"

রজনীগন্ধার সেই ভুরভুর করা সৌরভ আবার অজন্তার হাসিতে দেখা দিল। যেই সঙ্গে সন্ধ্যাকরের মুখ থেকে মুকত্রর মতো মুকতকরা হাসি এসে মিললো অজন্তারই লাল লাল অধরাধারেতে। আর তখন শুধু লাল রঙের ছোপ ভিজে গিয়ে— সন্ধ্যাকরের তিয়াসে তপ্ত অধরকে শুধু কোরে তুললো—রাঙা। ভেজা ভেজা লালেতে শুধু লাল।

চুমাচুমির আলাপনে—ঝড় হ'য়ে প্রিয়ার অধরেতে ফোটা হাসি-স্ফূর্ত চুনীর লাল ঝকমকানিতে দুষ্টু ছেলের যৌবনের প্রথম অধরালিঙ্গন এমন— দুরন্তপনার যৌবনিক ধ্যানে শিহরের আলপনা এঁকে এঁকে দিয়েছে—যার জন্য অজন্তা তার মদির বিহ্বলতায় পড়লো—পুরোপুরি ভেঙ্গে। এত সুখ, এত খুশীয়াল তৃপ্তি যে প্রিয়র অধর ছোঁয়াচে ঝরতে পারে বাদলের মতো আষাঢ়ী ধারায়—তা অজন্তাকে চরম সুখের রভসতায় তুলতে চাইলো কাঁদিয়ে। এটা যুবতী প্রিয়াদেরই আনন্দসায়রেতে নাচানাচি করার এক মস্ত কানুন, যে, সুখের চরমতা প্রকাশে যুবতীরা ঝরাতে চায়—অকারণ চোখের জল।

—"সন্ধ্যাকর। তুমি সুখী? খুব সুখী? জান, আজ আমার মুখের হাসিতে দুষ্টুমি

ক'রে যা দুরন্তপনা দেখালে—তার স্বাক্ষর সত্যি দারুণ ভাবে রাঙিয়ে গেছে তোমারই ঠোঁটেতে লাল রঙেতে। আমার ওষ্ঠরঞ্জনী তোমারই দস্যিপনার ধকল সহ্য না করার ফলে ধুয়ে মুছে যাওয়ায়।"

প্রিয়ার কথার কাকলি ভরা ফুলঝুরি হঠাৎ যেন থেমে গেল। আর তখনি সন্ধ্যাকরের কাঁধেতে নিজের প্রসাধনে বিপর্য্যস্ত মুখখানা ন্যস্ত ক'রে ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেললো—প্রথম চুমায় আস্বাদিতা অজন্তা। ওর চোখ দিয়ে ঝরনা হয়ে বেরুতে লাগলো আনন্দাশ্রু।

তাই দেখে—আবার আগের মতোই যৌবনের দুষ্টু ঝড় হ'য়ে চুমাচুমিতে মাততে মাততে সন্ধ্যাকর এই মুহূর্তে প্রিয়ার কানে কানে শোনালো—তারই প্রিয় লেখক তারাশঙকর বন্দ্যোাধ্যায়ের 'কবি' নামী উপন্যাসের একটি মুক্তার মতো কাব্যিক বন্দনা। আকারে 'কবি' উপন্যাস ছোট হ'লেও তাতে আছে—মনবতাবাদের পূজা। তাই সন্ধ্যাকরের মতে তার এই অতি প্রিয় গ্রন্থটি এক মহা-উপন্যাস। এই মুহূর্তে এত আনন্দের মন্দাকিনী ধারার মধ্যে প্রিয়াকে কাঁদতে দেখে সন্ধ্যাকরের হ'তে ইচ্ছা কোরল অতি সহজ-সরল গ্রাম্য বাঙলার—এক সুখী —নিতাই কবিয়াল।—আর সঙ্গে সঙ্গে 'কবি'র নায়িকা বসন্তকে জানানো—নিতাইয়ের তৈরী গ্রামীন ভাষার গানখানার দু'খানা চরণ ঝলমলিয়ে উঠলো—সন্ধ্যাকরেরই দুষ্টুমি করার স্বাক্ষর বহন করা দু'খানা ঠোঁটেতে ভিজে গিয়ে প্রিয়ারই মতো লাল হওয়া অধরাধারেতে—"এই দুষ্টু। ছিঃ, বল ত' এ আবার কেমন দুষ্টুমি কোরছ। এমনি কান্না? তবু হ্যাঁ—

" তোমার চোখে জল দেখিলে সারা ভোবন আঁধার দেখি।

তুমি আমার জেবনাধিক জেনেও তুমি জান নাকি?"

—জান অজন্তা? লক্ষ্মীটি, চোখ খোল। তোমার কি এই অকারণ চোখের জল ঝরালেই হবে? বলি মনের এই আনন্দাশ্রুর কথা কবিতায় জানাবে না? বেশ তুমি না জানাও, আমি তোমার মনের এই কান্নার অকারণ সুরের সৌন্দর্য্য নিয়ে মুখর হলাম—তোমারই প্রিয় কথাকার অন্নদাশঙ্কর রায়র কাকলি-ভরা কবিতায়—

না চাহিতে দিলে কেন দু'খানি চুম্বন কহিলে না ডেকে
নয়নের নিদ গেছে নিদের স্বপন মসীরেখা এঁকে।
লাজে করি নাই মানা বলি নাই ছি ছি না না
কিছু কি ভাবিলে পরে কিছুখন হাতে মুখ ঢেকে
এখনো দাগিয়া গেছে কি মধুর পাপ সুকলঙ্কময়
তনুখানি সঁপে খেদ মোর নাই তুমি যদি চাহ
মুখমদ বরিষণ দাও গো, নিবাই প্রাণ ভরা দাহ।
শিহরণে শিহরণে মরিব সুখমরণে
চুমি' চুমি' দাও তুমি তড়িৎ প্রবাহি' করি অবগাহ।'

—এই, বল কেমন সুন্দর দুষ্টুমি করে কবির কথা ধার ক'রে তোমারই এখনকার মনের বিশেষ অবস্থার কথাটি জানিয়ে দিলাম—তাই না?"

বলতে বলতে প্রিয়ার অধরের লাল রঙেতে স্বাক্ষর বহন করা সন্ধ্যাকরের দু'খানা

ঠোঁটেতে পুনরায় ঝককমালো— সেই চুমাচুমির দুষ্টু দুষ্টু যৌবনাকুতি।
চুমার বৃষ্টি আবার ঝরলো প্রিয়ার শান্ত অধরেতে।
প্রিয়র সাথে প্রিয়াও তাই মাতলো চুমাচুমিতে।
যৌবনের লজ্জাকে আরো মধুর করায়—এই প্রথম চুমা।
তাই অজন্তা-সন্ধ্যাকরের কাছে তা হ'ল অনির্বচনীয়!
চুমায় চুমায় লাজবতী অজন্তা বলল—"আরো দুষ্টু হও।'
—"হ্যাঁ, হ্যাঁ। তুমি হবে না দুরন্ত?" শুধালো সন্ধ্যাকর।
"এই, লাগছে সন্ধ্যাকর। বাব্‌বা। কি দস্যি ছেলে।"
"ঈষ্। ঈষ্। বলি অজন্তা, তোমার দুষ্টুমিপনা বুঝি কম?"
চোখ বোজা আবেশিত অজন্তা
খুশি সান্ধ্যাকর।"
রিমঝিমায় প্লেজারে—"ভান্ ভান্ দ্য ফাস্ট কীস।
চোখ খোলা নিবেশিত সন্ধ্যাকর ঝলমলায় প্লেজারে—
"রান্ রান্ দ্যা থাস্ট পীস্। তুষী, আড্ডা, অজন্তা।"

—২০শে ডিসেম্বর, ১৯৫৬

পাঁচালীর রেশ নিয়ে

কল্যাণীয়া মাধবী চক্রবর্তী, আদরের ছোট বোনটিকে।

"পথের পাঁচালী"র অনার্স ক্লাশ শেষ কোরে—ধীর পদক্ষেপে সিঁড়ির রেলিঙ্ ধরে আস্তে আস্তে একতলার দিকে নেমে আসছিল—সুন্দর সেন। ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। নাম ওর সুন্দর যেমন— তেমন চেহারায় ও ছিমছাম। ব্যবহারে আর স্বভাবেতেও সুন্দর। কেন না, অন্যরা যখন শেষ ক্লাশ হিসাবে আজকের দিনটিতে তাড়াতাড়ি ছুটি পেয়ে যাওয়ায়— হৈ-হুল্লোড় আর ছুটোছুটির ভেতরে এ-দিকে-ও-দিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থেকে—একটা সরব আর আর সাহস ঘেরা গুঞ্জন ফুটিয়ে চলেছে,—তখন সুন্দর সেন সবার থেকে নিজেকে একটা নিভৃতির মতো কোরে আলাদা রেখে—নীচের দিকে চলেছিল নেমে। ধাপে ধাপে সিঁড়িতে শব্দহীন প্যাডের স্লিপার পড়া পা ফেলে ফেলে নামছিল—আনমনা ভাবেরই এক চাঞ্চ লতা ভরিয়ে। অবশ্য তেতলা থেকে একবার মাত্র মোড় ঘুরে লম্বা সিঁড়ি একেবারে নীচে নেমে—গাড়ীবারান্দার চত্বর পর্য্যন্ত ছুঁয়ে আছে। এমন সিঁড়ি ধরে নামতে গেলে পর—স্বাভাবিক ভাবেই নজর ছড়িয়ে যায় চারধারে। কিন্তু—ওর নামার ধরন দেখলে পর মনে হয়— কোন দিকেই নেই যেন কণামাত্র ভ্রূক্ষেপ। নজর যেন নিজেরই কাছেতে হোয়ে আছে বন্দী। দিকভ্রান্ত।

অবশ্য ভাব-ভাবনা তার ছিল না নিশ্চল।—ছোট্ট অপুর জীবন-দর্শন শিশু-মানসিকতার দেয়ালা হাসি সমেত হাজার এক চঞ্চ ল-উর্ম্মি-মালায় সাজানো আহ্বান নিয়ে কেমন ভাবে—নানান রূপপরম্পরায়—নিখিল এক শৈশবেরই দলিল হোয়ে উঠতে পেরেছে—এই "পথের পাঁচালী"তে—তাই আকুল হোয়ে ভাবছিল—বিশ বছরেরই একটানা বিশখানা বসন্তেরই তাজা ছেলে—এই সুন্দর সেন নামী একটি নিভৃত যৌবন। এক নিরালা ঘেরা যুবক।

সেই নিভৃতিরই ধারণা সুন্দরকে ভাবায়— ছোট্ট অপুর সেই চারধারের পারিপার্শ্বিক অনাড়ম্বরতার মধ্যেকার সেই সব জীবন ও তাদেরই আর্তি ছিল—কত মধুর। কত রূপনির্ঝরিত। মায়—টাটকা রূপাভায় তা ছিল—নিঙাড়িত। তাদের সমাজও ছিল কত হারেক রকমেরই চিত্র-বিচিত্রায় সাজানো ও গোছানো। ওরা ছিল কত মহনীয়। কত কত মধুরিমার স্পর্শে স্পর্শে তা ছিল—সুন্দরম। মধুরাংশ্চ। কত ফুলের নাম! কত ফলের নাম! কত গন্ধ! কত পরিচিতি! কত ধৃতি! কত কৃতি!

—আর দুর্গা! অমন স্বভাবে, কথায়, কাজেতে প্রাণোচ্ছলা মেয়েটিকে কি সহজে ভোলা যায়? বিস্মৃতির আঁধারেতে কি তাকে সরিয়ে রাখা যায়? এই দুর্গারই ছোট মতন আকারখানায় উপ্ ছিয়ে আছে নানান মেয়েলি দুষ্টুমি—বনহরিণীর মতো। কত

প্রাণ মাতানো খিল্‌খিল্‌ করা হাসি। কত সুপ্ত শীতল ভালোবাসা। কত মন জুড়ানো শান্ত ভাবটি। তবু, হ্যাঁ, তবু দুর্গার জীবন হ'ল —একটা করুণ ট্র্যাজেডি!

সুন্দর সে কথাই মনে উঁকি দেওয়ায় রেলিং ধরে নামতে নামতে ভাবছিল। তাই ধরে আরো একটু ভেবেছে সে।—ওয়ার্ডসওয়ার্থের লুসি আর বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্গা—এই এরা দু'জনে ঠিক একই ছঁচে গড়া। লুসি হোল বিদেশের—ফ্রক্ পরা, আর চুলে বব্ করা এক ছোট্ট মেয়ে। আরনিজের ছোট আকারখানার উদোল গায়ে ছোট্ট একটা শাড়ী জড়ানো, ও কোমর ছাড়িয়ে নামা অপর্য্যাপ্ত কালো কালো মাথার চুলে ভরা ছিল—এদেশের ছোট্ট এক মেয়ে রূপী— এই দুর্গা; দু'জনাতে তফাৎ ছিল শুধু এইটুকুই।

—তবে মস্ত এক মিল ছিল এই হিসাবে, যে,— যে কোন দেশের স্থান-কাল-পাত্র ভেদে—লুসি গ্রে বা দুর্গা রায়—এরা কেউই ক্ষণিকের বিকাশ নয়। এরা হোল ছন্দ-যতিতে সাজানো—চিরন্তনীকা।

এই নিয়ে সুন্দর সেন ভেবেছে আরো একটু।—তা হোল ওদেরই ছোট জীবন দুটির ব্যাথাতুর ট্র্যাজেডি সম্পর্কে। লুসির জীবনে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ কোরে আনতে গিয়ে—প্রবল এক প্রাকৃতিক ঝঞ্ঝার মধ্যে পড়ে—ভাঙ্গা সেতু থেকে পিছলিয়ে খরস্রোতা নদীটির জলের তোড়ে ভেসে যাওয়ায়—এসেছিল ট্র্যাজেডি!—আর দুর্গা? তার বেলাতে ঘটেছিল সেই একই ধারার ব্যাপার। আপনার ছোট আকারের শরীরখানায়—গাছ-কোমর কোরে শাড়ী পরা দুর্গা—তার এক হাতে ছোট অপুকে ধরে রেখে—খুঁজতে বেরিয়েছিল আমের কুশী। কোন কিছুটি ভ্রূক্ষেপ না কোরে— বর্ষার মুষলধার দুর্দমতার ভেতরেই ছুটতে ছুটতে—হুটোপুটি করার মধ্যে এমন ভেজাটাই ভিজেছিল যে— শেষ পর্য্যন্ত বাঁধিয়ে তুললো কঠিন এক অসুখকে। শেষে তেমন ধারারই প্রাকৃতিক দুর্যোগের এক কালো-রাতে—দুর্গার ছোট জীবনটির পরিসমাপ্তি টেনে—এসে যায় ট্র্যাজেডি!

বড় করুণ!—আর ভাবা যায় না। "পথের পাঁচালী"র এই দুর্গা-প্রসঙ্গটি মনকে— কারণ ধরেই কোরে তোলায় বড় ব্যথিত। বড় আনচানানো।—সুন্দরকেও এই ভাব-বিভোরতা তাই করালো।

সত্যি, সত্যি—টাটকা যৌবনের প্রান্তর স্পর্শ করা—এই সুন্দর হোয়ে উঠেছে ব্যথিতমন—"পথের পাঁচালী" নামী শুধু মাত্র একটি বইয়ের—না ছায়া না কায়া— এমনি এক দুর্গা নাম্নী সচঞ্চলা, আর দুষ্টুমতি পল্লী-বালাটির জন্য।

কিন্তু—হ্যাঁ, এতক্ষণ ধরে পাড়াগাঁয়ের বনহরিণীর মতো প্রগল্‌ভা দুর্গার কথায় বিভোর থাকায়— খেয়াল ক'রতে পারেনি সুন্দর সেন, যে, —ততক্ষণে ঠিক ওরই পেছনটিতে একটু দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়িয়ে আছে একই অনার্স ক্লাশের—সতীর্থা দুর্গা।—অবশ্য বইয়ের দুর্গা থেকে এই দুর্গায় তফাৎ আছে অনেক। বয়েসে আর চেহারায় কলেজের এই দুর্গা অনেক বড়। আর দৈহিক রূপের কথা এখানে তোলা অনাবশ্যক এজন্য, যে,—বইয়ের ছোট্ট দুর্গা আর সুযোগ পেল কৈ—যার থেকে বয়েস এগিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সাথে—এই বড় দুর্গারই মতো যৌবনের সুষমা ঘেরা

অপার ঢল্‌গুলোকে—কোরতে পারত দেহী বসন্তেরই—লাজ আহরণের খেলা?—তবে মিল আছে পুরোপুরি নামেতে। সুন্দরের এই রূপবতী সতীর্থাটির পুরো নাম হোল—দুর্গা রায়। অবশ্য ওর নামের আগে সম্বোধন করা চলে না— ছোট্টটি বলে। সুন্দরের এই সতীর্থাকে সম্বোধনে বলতে হয়—শ্রীমতী দুর্গা রায়। বা,—শুধু শ্রীমতী দুর্গা!

আজ তাড়াতাড়ি কলেজ ছুটি হোয়ে যাওয়ার কারণ অবশ্য ছিল একটি। কলেজ স্পোর্টসেরই আজ হোল হিট। তাই এতক্ষণে এক রকম সবাই মাঠে চলে গেছে। যারা যায়নি তারা দোতলায় নেমে এসেছে। সিঁড়ি ফাঁকা ছিল। অন্য কেউ এতক্ষণে বড় একটা ওঠা নামা থেকে ক'রছিল না।

অবশ্য দুর্গার তারই পেছনটিতে দাঁড়িয়ে থাকার কথা সুন্দর জানতে পারলো ওরই জন্য। পেছন থেকে দুষ্টুমি করার মতো খিল্‌ খিল্‌ কোরে হেসে উঠে দুর্গা রায় জানালো নিজেরই উপস্থিতিকে—সুন্দরের আনমনা ভাবটিকে কাটাবার জন্য।

সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর যেন ঘুরে দুর্গার দিকে মুখ কোরে দাঁড়াল। তখনি মুখেতে এক ঝলক হাসি ফুটিয়ে বলল—"এই দুর্গা, আমি ভেবেছিলাম যে, তুমি নিশ্চয়ই এতক্ষণে নীচে নেমে অপেক্ষা কোরছ। সত্যি, কি মেয়েরে বাব্‌ বা।"

সুন্দরের কাছটি থেকে সিঁড়ির কয়েক ধাপ ওপরে দাঁড়িয়েছিল শ্রীমতী দুর্গা রায়—সপ্রগল্‌ভ হাসিতে আর খুশীতে ঝক্‌মকিয়ে। কয়েক পলক চুপ থাকার পর—বাদামী রঙ্‌ রেশম শাড়ীর ঝল্‌মলে আবরণ থেকে নিজের সমস্ত শরীরময় একটা নাচের ছন্দ ফুটিয়ে কথা বলল—সুন্দরেরই শেষের কথাটার পুনরাবৃত্তির সঙ্গে—"এই বলি, কি মেয়েরে বাব্‌ বা! আর তুমিই বা কেমন ছেলে! ভাবলাম তুমি ক্লাশ থেকে বেরিয়ে লাইব্রেরীতে আসবে। আর তা না, দিব্যি নিজে কি যেন ভাবতে ভাবতে নীচেই নেমে চলেছো। সুন্দর, তুমি বড় ভাবুক, তাই না? আমি কিন্তু, সত্যিই তোমার মতো এত কিছু ভাবতে পারি না। সত্যি, তুমি কি ছেলেরে বাব্‌ বা।"—বলতে বলতে দুর্গা রায় আবার আগেরই মতো—সেই ছোট্ট এক মেয়ের স্বভাব দিয়ে ঘেরা—খিল্‌ খিল্‌ করা হাসির জোয়ারেতে উপছে উঠলো।

এর কয়েকটি পলক পরে—বনহরিণীর মতো এক একটা লাফ দেওয়ার তাল ধরে—নাচের ছন্দ ঝরাতে ঝরাতে—নীচে নেমে ঠিক সুন্দরের বুকের আশ্রয়েতে নিজেকে ধরা দেবার মতোটি কোরেই—সামনে এসে ঝুপ কোরে দাঁড়িয়ে পড়লো। গাছ-কোমর কোরে বাধা শাড়ীর আঁচলে কঠিন হোয়ে থাকা—সুন্দরী বুকখানার মধ্যে বই-খাতা, হাত দিয়ে চেপে ধরে রেখেছে। সুমসৃণ ঘাড়টা একটু দুলিয়ে, আর কানেতে দোদুল ঝুমকোর দুল দু'খানা দোলাতে দোলাতে—দুর্গা আবার কথায় মুখরা হোল—"এই, বল, কোথায় যাবে? মাঠে, না অন্য কোথাও? এই, আমি কিন্তু আগেই বলে রাখছি, মাঠে আমি যাবো না। তুমি যেতে পার। ধ্যাৎ। অত ভিড় আমার ভাল লাগে না। যেতে হয় ত' চল অন্য কোথাও। কোন নিরিবিলি জায়গায় গেলে কিন্তু বেশ লাগে। কেমন, এই, যাবে তেমনি কোন জায়গায়?"

সুন্দর এক হাসি—মুখে ফুটিয়ে ধরে বলল সুন্দর—"এই, সত্যি বড় সুন্দর হয়

তেমন কোন নিরিবিলি জায়গায় ঘুরতে গেলে, তাই না? কিন্তু কি জান, এই মেয়ে, তা হোলে ত' তোমার দুষ্টুমি করার পক্ষে খুব সুবিধা হয়, তাই কি? নিরিবিলি জায়গা! পরিবেশটি নিঝুম! তার কেউ কোন কিছুটি দেখতে পাবে না! এর পর মিষ্টি সন্ধ্যা যখন হবে ঘনায়মান? হ্যাঁ, আর সেই সুযোগেতে তুমি তোমার খুশী মতো যত ইচ্ছা দুষ্টুমি কোরবে না? কি, বল, ঠিক বলি নি?"

সুন্দরের এই সুন্দর কোরে গোছানো কথা শুনতে শুনতে—শ্রীমতী দুর্গা রায় ঘন যুবতীকার অতি নিখুঁত লজ্জার রাগে—অল্প একটু রাঙা হোয়ে উঠলো। বলল তখনি মদিরা উপছানো চোখের চাহনি একটু নীচের দিকে নামিয়ে দিয়ে—"ধ্যাৎ। মোটেই নয়। আর কথা নয়। চল, বাইরে বেরুনো যাক্। কলেজ কমপাউণ্ডের ভেতরে থেকে আর সত্যি ভাল লাগছে না এ ভাবেতে কথার দান-প্রতিদান চালাচালি কোরতে। বুঝলে, চল এবার।"

সুন্দর শুধু দুষ্টুমির হাসি হাসলো, আর বলল—"এই দুর্গা। চল, এবার বাইরেই বেরুনো যাক্।"

শ্রীমতী দুর্গাও সে হাসিতে যোগ দিল। কোন রকম আর কথাটি বলল না। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দুজনেই নীচে নেমে এলো। তারপর বারান্দা ঘুরে মাঠ—এবং মাঠ থেকে ফটক পার হোয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো।

রাস্তায় এসে দুর্গা সামনের দিকে একটু এগিয়ে গেল—তাকে বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করা ফিয়াটখানার দিকে। সুন্দর থাকলো একটু চুপ কোরে দাঁড়িয়ে। দুর্গা কাছে গিয়ে বাড়ীর ড্রাইভারকে গাড়ীখানা বাড়ীতেই ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলল। আর বলে দিল—বাড়ীতে পৌঁছে যেন মা'কে জানিয়ে দেয় তার না আসার কারণটি। ড্রাইভারকে বলে দিতে বলা হোল—কলেজ ছুটি হোয়ে যাওয়ায় একটু বেড়াতে বেরিয়েছে—এই আর কি। ফিরতে হয় ত কেটু দেরিও হোতে পারে।—ড্রাইভার তখনি দুর্গার কথায় গাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে গেল। তাকে পেছনে ফেলে রেখে বাড়ীর গাড়ীখানার চলে যাওয়ার পথের দিকে একটু তাকিয়ে থাকল দুর্গা—আনমনার মতো।

ওদিকে সুন্দর তখন নিজের গাড়ীতে বসে স্টার্ট দেওয়ার উপক্রম কোরে—দুর্গাকে ডাকলো, চোখের ইশঅরায়। আর হাতছানি দিয়ে। আর তখনি অতি দ্রুত কাছে এসে—"এই যে" বলে চকিতের মধ্যে দরজা খুলে—দুর্গা বসে পড়লো পেছনেরই সীটখানাতে। বসেই দরজা সজোরে বন্ধ কোরে দিল—অশেষ তৃপ্তিধারায় ঝল্‌মলিয়ে থেকে।

দুর্গাকে সামনের সীটে নিজেরই পাশটিতে না পাওয়ায়—আর ওকে পেছনে বসে পড়তে দেখে—চালকের আসনে বসা সুন্দর এক হাতে স্টিয়ারিঙ হুইল ধরে—অন্য হাতে পাশের দরজাখানা খুলে দিয়ে অনুযোগ কোরল—"ও কি, তুমি পেছনে বসলে যে? না, না শোন দুর্গা। লক্ষ্মীটি, তুমি সামনের আসনে ঠিক আমার পাশটিতে এসে বসো। এই, দুষ্টুমি কোর না। এসো এইখানটায়।"

পেছনেতেই আরো আবেশ নিয়ে গদীতে হেলান দিয়ে—আরাম করার চেষ্টা

কোরতে কোরতে বলল দুর্গা—মধুর গলায় আবেশ ছড়িয়ে দিয়ে—'না। না। এখানেই বসতে দাও আমায়। পেছনটাই তো ভালো! কেন না, তুমি যখন সামনে রয়েছো, তখন নির্ভাবানায় এখানে বসা যাবে। সত্যি, এ মুহূর্তে তোমার পেছনের এই আসনটি দূরত্ব ধরে যতটা নিরাপদ হোতে পা'রে,—এই তা' কি আর তোমার পাশটিতে বসলে পর সম্ভব হবে? তোমার পাশে বসলে যে হারাতে হবে আমার সব নিরাপত্তা! নেও, নেও, আর অভিমান করার চেষ্টা কোর না। এই সুন্দর, লক্ষ্মীটি, রাগ না কোরে এবার গাড়ী চালাও।"

আবার অনুযোগ কোরল সুন্দর—"দুর্গা, বলি এই ত' এখনি আবার দুষ্টুমি আরম্ভ কোরলে বুঝি? সত্যি, সাধে কি আর বলি, কি মেয়েরে বাব্ বা! কথার অবাধ্য হোয়ো না দুর্গা, লক্ষ্মীটি! শোন, লক্ষ্মী মেয়েটির মতো সামনে এসে আমার পাশেতে জায়গা নিয়ে বসো।"

"দোহাই তোমার।"—আগেরই মতো দুষ্টু হাসিতে মুখরা থেকে বলল দুর্গা একটু রঙীন হোয়ে—"রাগ কোরছ কেন, এই সুন্দর? তুমি কিছুটি না বুঝতে চেয়েই কোরবে অভিমান? শোন, আপাতত কিছুটা পথ পর্য্যন্ত পেছনেই বসি। তারপর বুঝলে, এই সুন্দর, নিরাপদ জায়গায় পৌঁছিয়ে পর ঠিক তোমারই সামনে এসে বসবো। এখন বসছি না বলে রাগ কোরো না, লক্ষ্মী আমার। দিনের আলোয় এত বেশী খোলা পরিবেশে তোমার পাশটিতে বসে কোথাও চলেছি, এটাকে কলেজের অন্য ছেলে-মেয়েরা দেখলে পর কি এক রকমের অস্বস্তি লাগে না? আর তাই একটু-আধটু বুঝি এ ব্যাপারে লজ্জা কোরতে নেই? তুমি ছেলে, তাই তোমার অমন কিছুটি মনে না হোলেও কিন্তু—আমি মেয়ে বলে আমার বেশ লজ্জা করে।"

আনকোরা যৌবনের তরঙ্গিমা ধরে নেচে ওঠা সেই রূপেরই অশেষ ঢল্‌খেলানো দেহ-মনে বিভূষিতা এই মিষ্টি মেয়েটির কথায়—সত্যি সত্যি সুন্দরের মুখের কানায় কানায় উপ্‌ছানো—দুষ্টুপনায় ভরা হাসির সমস্ত গমক অজানিত পুলকে মধুর হোয়ে উঠলো। বলল আদুরে গলায়—"এই দুর্গা। এই মিষ্টি। তা হলে পেছনের সীটেই বসে থাক কিছু সময়! একটু পরে ত' সামনেই এসে বসছো। আমি জানি, আমি তোমায় পাশে পেয়ে নিজে থেকে কিছু দুষ্টুমি না করার আগেতেই ত'—আরম্ভ হবে তোমা'র দুষ্টুপনা, আমারই ওপর। তাই না? আমার পক্ষে তখন তোমার দুষ্টুমিকে সহ্য না কোরে পার পাওয়া মুস্কিল হয়।"

সুন্দরের এমন কথায়—নিজের ডাগর ডাগর চোখ দু'খানার প্রণয় রঙ্ ছোপানো চাহনি ছড়িয়ে দিয়ে একটু জোর দিয়ে দুর্গা জানালো —"এই ছেলে। এই দুষ্টু। বলি আমি যে তোমার কে, তা ত' তুমি জানই ভালো ক'রে। তবে মাঝে মাঝে এমন ভাবখানা দেখাও যেন, তুমি বোঝ না কিছুই? আমার দুষ্টুমি তোমায় সহ্য কোরতে হবে।"

একটু অভিমানের রেশ ঝড়ে পড়লো—এই সপ্রগল্‌ভা শ্রীমতী দুর্গা রায়ের কথায়—আনমনা থাকা সুন্দরেরই কথার পিঠেতে—উত্তরখানা বসিয়ে দিতে দিতে।

গাড়ী ততক্ষণে পথ চলা আরম্ভ কোরেছে। চালাতে চালাতে পেছনে একটু ঘাড়

বেঁকিয়ে বলল সুন্দর—" বেশ, তাই সহ্য কোরব। তবে, এইমেয়ে, বলি কি জান, একটু মাত্রা রেখে কোরো কিন্তু।"

সেই প্রণয়েরই রঙ্ ছোপানো দৃষ্টি নিয়েই দুর্গা বলল—"এই সুন্দর। শোন, তুমি নিশ্চয়ই জান যে, মেয়েরা তাদের ভালোবাসার ছেলেদের ওপরে নিজেদের দুষ্টুপনায় ভরা বুদ্ধির মারপ্যাঁচ খেলাতে পারলে পর—সত্যিই খুশীর কারণ ধরে পেয়ে যাই অনেক সুখ! কিন্তু এই সুন্দর, কৈ বললে না ত' কোথায় আমরা যাব, বা যাচ্ছি সে কথাটা? কোনখানে যাচ্ছি তা একবারটি বল, এই? উঁহুঃ, তোমাকে বলতেই হবে।"

গাড়ী চালাতে থাকায় দুর্গার দিকে আর ফিরে কথা বলা সম্ভব নয় বলেই—সামনের পথের দিকে নজর রেখে সুন্দর বলল—"এই মেয়ে, এখন কোথায় আর যাবে! এই আর কি, তোমার অনেক চেনার আর অনকে জানারই, সুন্দরদের বাড়ীতে চলেছো, বুঝলে। আমাদের বাড়ীতেই, মানে যে বাড়ীতে একদিন তুমি আমারই পরিণীতা হোয়ে আলোয় আলোয় রোশনাই ফুটিয়ে একটি বিদ্যুৎলতার মতো গৃহপ্রবেশ কোরবে—বুঝলে মেয়ে, তাই তারই আগে সেই বাড়ীতেই উপস্থিত থেকে মন ভরিয়ে, আর মনেরই নানান সাধ মিটিয়ে আমার ওপর দুষ্টুমি কোরে নিও যত পার ততই। এই, লজ্জায় রাঙা হোচ্ছ কেন?"

বড় সুন্দর এক বিস্ময়েরই ঘোরেতে বাক্রোহিতা হোয়ে দুর্গা জানতে চাইল—"ওঃ মা, সে কি কথা! তোমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাবে? তোমার মা কি ভাববেন বল ত' আমাদের দেখে? না, না, বাড়ীতে নয়। তুমি অন্য কোথাও নিয়ে চল আমায়। লক্ষ্মীটি, আমার কথাটি শোন একটিবার।"

সুন্দরের সুন্দর মুখখানার অধর কাঁপিয়ে ফুটে ওঠা— তেমনি এক সুন্দর উত্তরখানার জন্য সাগ্রহে দুর্গা হোয়ে পড়লো ভাবেরই টানাপোড়েনে— দোদুলা। বিহ্বলা।

তাই সুন্দর কোরেই সুন্দর জানালো—" তোমার কথাটা ত' শুনলাম। তুমিও লক্ষ্মীটি, এবার আমার কথাটি একবার ভালো কোরে শোন, কেমন! মা ত' তোমাকে ভালো ভাবেই চেনেন ও জানেন। আর তুমিও ত' তাঁকে ওভাবেই চিনেছো ও জেনেছো। তবে যেতে আপত্তি কোরছ কেন? বুঝেছি তোমাকে আমারই জন্য পুরোপুরি ভাবে গ্রহণ করার আগেতেই বাড়ীতে দেখতে পেলে পর মা খুবই খুশী হবেন,—যদিও জানি তোমার পক্ষে লজ্জা পাওয়াটা এর থেকে অসম্ভব নয়। তবে কি জান, অন্ততঃ আজ তোমার কোন অসুবিধা বে না। কেন জান, মা আজ বাড়ীতে থাকছেন না এ বেলাতে। এতক্ষণে বেরিয়েও পড়েছেন বোধ হয়। আজ তাঁর আমার দিদিমা'র কাছে যাওয়ার কথা। আর ফিরবেন সেই রাত্রে। তার আগে নয়। চল দুর্গা, অসুবিধা কিছু হবে না। আমার ছোট দুটি বোন ত বাড়ীতেই থাকছে। তোমার ভালো সঙ্গী হবে ওরা দুজনেই। ওরই মাঝে তুমি একটু না হয় নিরিবিলি খুঁজে নিয়ে আমার ওপরে কিছু কিছু দুষ্টুমি চালাবে, কি তাই ঠিক ত'?"

রঙীন হাসির মৃদু সৌরভ নিয়ে আদুরে গলায় শ্রীমতী দুর্গা রায় তখন জানালো—"সুন্দর, এই ত এতক্ষণে ঠিক দুষ্টু ছেলেটির মতোই কথাটি বললে দেখছি। অনেকটা

চলে এসেছি। গাড়ী চালাতে চালাতে সামনে নজর রেখে, পেছনে বসা আমায় কথা শোনাতে সত্যি তোমার অসুবিধা হোচ্ছে। এই, গাড়ী থামাও। এইবারটি আর কাউকে দেখার সম্ভাবনা নেই। এবার সামনে চলে এসে তোমার ঠিক পাশটিতে বসবো।"

তখনি গাড়ী থামলো রাস্তার ধার ঘেঁষে। সুন্দরের চোখ-মুখ তখন দীপ্ততায় উঠছে ঝলমলিয়ে। কয়েক পলকের মধ্যেই দুর্গা পেছন থেকে সামনের আসনে এসে ঝুপ কোরে বসে পড়লো—সমস্ত শরীরময় একটা পুলকের ছন্দ নাচিয়ে রেখে। দুর্গা ভালো কোরে বসতে না বসতেই—আবার গাড়ী চলা আরম্ভ কোরল দক্ষিণ ক'লকাতার দিকে। ঠিক ভাবে মৌজ কোরে বসার পর জানালার ওপরে হাত রেখে দুর্গা আবেশ ফুটিয়ে বলল—" শোন সুন্দর, এই জনারণ্যে ভরা পথ ধরে কিন্তু যাওয়া চলবে না। চৌরঙ্গীর মোড় পার হোয়ে একটা ফাঁকা রাস্তা ধরা চাই কিন্তু।"

হাসিতে আর খুশীতে উজ্জল থেকেই—সামনের পথের দিকে দৃষ্টি ধরে রেখেই সুন্দর বলল—" বেশ। তাই ধরবো।"

আর তারপর কি যেন মনে হওয়ায়—অন্য কোন কথাটি বলল না সুন্দর।

তার কিছু পরে জনারণ্যে আর কলকোলাহলে ভরাট চৌরঙ্গীর চার মাথার মোড়টিতে এসে—সময় অপহারক লাল বাতির বাধাকৌশলে পাশ কাটিয়ে পার হোয়ে গেল। তারপর ডান দিক থেকে ছটকটা রাস্তা এগিয়ে বাঁ দিকে ঘুরেই রেড রোড ধরে সুন্দর গাড়ী চালাতে লাগালো। কিছুটা পথ এগিয়ে যাওয়া মাত্র— কোন এক আকস্মিকের মায়ারাগেতে ঝল্‌মল্‌ কোরে ওঠায়—শ্রীমতী দুর্গা রায় সরব হাসির রিমঝিমানি নিয়ে—একই বয়েসী সতীর্থ—এই সুন্দরদর্শন—সুন্দরকুমার সেনের শরীরের সাথে ঘন হোয়ে ওঠার জন্য—ওর বাঁ দিকটিতে নিজেরই ডান পাশ নিয়ে এলিয়ে পড়লো। আরাম করার জন্য—রাশি রাশি চুলেতে সুন্দর—এক সতনু ছাঁদেতে খোঁপা বাঁধা মাথাখানা ধরে রাখলো সুন্দরেরই কাঁধের ওপরেতে। আর সুবর্ণ কঙ্কন পরা ডান হাতটি দিয়ে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা কোরল—সুন্দরেরই বুক-পিঠ পর্য্যন্ত।

তাই দেখে দেখে, না দেখারই মতো কোরে সামনের ফুলের গাছে সাজানো আইল্যাণ্ডটির দিকে চোখ রেখেই—খিল্ খিল্ কর হাসিতে মুখর হোল সুন্দর। গাড়ীর গতি কমিয়ে আনতে আনতে, পথের ধারেতে সরিয়ে নিতে নিতে বলল—"এই, দুষ্টু মেয়ে! বলি, এটা কি হোচ্ছে। সত্যি, তোমায় বোঝা মুস্কিল ব্যাপার। উঃ, কি মেয়েরে বাব্ বা।"

সুদর্শন সুন্দরেরই মতো খিল্‌খিলানো হাসিতে উপছিয়ে পড়ে—তখনি ঝল্‌মিলয়ে উঠলো দুর্গা নিজে থেকেই—নিজেরই বিশটি বসন্তমাদক বছরেতে টইটম্বুর থাকা— দেহ-বঙ্কিমারই প্রতিটি যৌবন গাঢ় রেখায় খুশী সাজিয়ে। আর তারই আবেশের মায়ামাধুরী ছড়িয়ে দিতে দিতে—এই সুজনকেরই তণ্ডালিক হওয়া একটি পাশের সঘন বাঁধনেতে—অনায়াসে দুর্গা নিজেকে —আত্মসমর্পিতা করালো। সুন্দরের বাম কাঁধেতে মাথা রাখলো পরম তৃপ্তি নির্ভরতায়। আপনার মনপসন্দ করা এই মধুরাংশচ সঙ্গিনীকে আদর জানানোর রীতি ধরেই কাছে টানলো। ডানহাতটি

স্টিয়ারিং হুইলের ওপরে শক্ত কোরে ধরে রেখে—বাঁ হাতের বাঁধন ছড়িয়ে শ্রীমতী দুর্গাকে বন্দিনী করিয়ে জানালো—টাটকা সবুজাভায় ঝল্‌মলানো যুবকেরই তপ্তালিক মুখর আদর ও তারই আবদার।

কিছু পলক পেছনে ফেলে চলে আসার পর—দুর্গা আগের মতোই সুন্দরের কাঁধেতে আরাম করা থেকে মুখের একটি ধার ন্যস্ত রাখার মধ্যেই জানালো—"সুন্দর। বলি, এই শোন। আচ্ছা, তখন কলেজেতে ওপর থেকে নামার সময়টিতে অনেকক্ষণ ধরে আনমনার মতো সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে কি এমন ভাবছিলে, কৈ তা আমায় বলবে না?"

কথার মধ্যেই মিষ্টি মেয়ের—হঠাৎ দুষ্টুতে রূপান্তরিতা হওয়ায় —আবদারের সুর ঢেলে দিল দুর্গা রায়—বেশ আদুরে স্বরেতে ভেসে থেকে।

তখনি কথার উত্তর দিল সুন্দর হাসিতে বিভোর থেকেই—"হ্যাঁ। এই জানাচ্ছি গো। জান মেয়ে, ভাবছিলাম কাউকে নিশ্চয়ই!"

চোখে-মুখে ঝল্‌মলানো দুষ্টুমিপনার রূপ ফুটিয়ে বলল সুন্দর—তারই এই মধুরা যুবতীর সঙ্গে বেশ একটু মজা ক'রবারই জন্য। দুর্গা, দুষ্টুমি কোরতে পারে, মজা দেখাতে পারে!—আর ছেলে বলে কি সুন্দর তারই মনপসন্দ হওয়া—এই মিষ্টি মায় দুষ্টুর রঙেতে দেহেমনে ঝল্‌মলানো মধুমিতার প্রতি টেনে দিতে পারবে না—যুবকেরই করা দুষ্টুমিরই আবরণ!—কারণ না মানারই মতো কোরে?

দুর্গা সহজ সুরেই জানতে চাইল—"এই, বল, কার কথা ভাবছিলে? কে সে? বুঝেছি। আমাকে নিশ্চয়ই। তাই কি?"

উত্তরে সুন্দর জানালো—"না গো না। তোমাকে নয়। ঈষ্। ভারী গর্ব না, যে, আমি ভাবনার বিষয় হিসাবে যেন তোমায় ছাড়া আর কিছুটি ভাবতে পারি না, না? বয়ে গেছে তোমায় নিয়ে অত শত ভাবতে।"

একই বয়েসের যৌবন থেকে কবিতার মতো সুন্দরী দেহ-বঙ্কিমা ধরে ধরে—নিখুঁত এক ছবি হোয়ে ওঠা এই দুর্গার চোখে-মুখে—তার এই কথায় কেমন রূপান্তর ঘটে যেতে পারে—তারই রূপ-পরম্পরার সন্দর্শনে তাকিয়ে থেকে—দুষ্টু হাসিরই ঘন রঙ্ নিয়ে—সুন্দরের মধুর যৌবনের চাহনিটি রাঙ্গিয়েই থাকলো।

দুর্গা বলল কাঁপন জাগা গলায়—"সে কি? বুঝেছি, দুষ্টুমি কোরতে চাইছ।"—কথার মধ্যে দিয়েই বেশ একটা সুন্দরী রাগ জড়ানো অভিমানের রেশ ফোটালো—মিষ্টি দুর্গা রায়।

গাড়ীর গতিবেগ এতক্ষণে একেবারে কমিয়ে আনা হোয়েছিল। ফুটপাতের ধার ঘেঁষে ঘেঁষে চলেছে। আস্তে আস্তে একেবারে থেমে যাওয়ার মতোই হোয়ে আসছে।

তবে বেশ নিরিবিলি জায়গা দেখে গাড়ী পার্ক করালো শেষ অবধি। সামনেই দেখলো ফুটপাথ ছাড়া ময়দানের একটি অংশ। কিছু তফাতে কয়েকটি দেবদারু গাছের গায়ে গা লাগিয়ে উঠে থাকা— গোল মতন সারির আশ্রয়টির নীচেকার—ছায়া ছায়া জায়গাটি নজরে পড়লো সুন্দরের। আর তখনি রাস্তা ছেড়ে—সুবজ ঘাসেতে মোড়া মাঠের ওপর দিয়ে গাড়ী আস্তে ক'রে চালিয়ে এনে রাখলো—ঐ

দেবদারুরই ছায়া-বিস্তৃতির মধ্যে—আড়াল ধরে। সেলফ্‌স্টার্টার একদম বন্ধ রেখে—পাশে বসে থাকা আপনারই আলিঙ্গ-নাবদ্ধ শ্রীমতী দুর্গার কপোলে আঙুলেরপরশ বুলিয়ে দিতে গিয়ে—প্রণয়াভাস উপছানো চাহনির স্নিগ্ধতায় রেঙে তাকালো সুন্দর।—ওদিকে ময়দানের ওপর দিয়ে চারধার থেকে শীতকালের মিষ্টি রোদ বিকেল গড়িয়ে যাওয়ায়—দুপুরের তাপঝরার রেশ হারিয়েও—ম্লান উষ্ণতার রেশ ছড়িয়ে চিক্‌ চিক্‌ ক'রে খেলে বেড়াচ্ছে। সেই রোদ তারই মিষ্টি আলো নিয়ে—গাড়ীর কাঁচ বন্ধ জানলা দিয়ে ভেতের লুটিয়ে পড়ে—দুষ্টুপনায় ঝল্‌মলাতে চাওয়া দুর্গাকে বেশ সুন্দর ক'রেই রাঙিয়ে তুলেছে। আর তার ওপরে—সুন্দরের কাছ থেকে হেঁয়ালি পূর্ণ কথার প্রত্যুত্তর পাওয়ায়—ওরই যুবতীকা ঘিরে ইচ্ছাকৃত অভিমান মিশেছে এসে। বড় বেশী বিলোলতারই হিলোল তোলা লাজ দিয়ে আবরিত হোয়েছে—শ্রীমতী দুর্গা রায়েরই দেহের উপস্থিত রূপতরঙ্গিমাটি।

বাদামী রঙের রেশম শাড়ী—তার মধুবাতায় কাঁপা শরীরময়তার সবুজ জৌলুস ঢেকেও—না ঢাকারই মতন মাধুর্য্য ছড়াচ্ছে—প্রতিটি শরীরীবঙ্কিমার প্রকট থাকা রেখায় রেখায়—ছবির মধ্যে প্রভাস পেয়ে। শাড়ীর মেলায়েম আবরণ আঁচল হোয়ে আড়া-আড়ি ভাবেতে—বুকের রূপসাজ সমেত কঠিন হোয়ে জড়িয়ে থাকায়—তারই চারপাশ দিয়ে লাল ক্রেপের ঝলস্‌ ছড়ানো ব্লাউজ ঝিকিমিকি খেলা খেলছে।— চোখ জুড়ানো রূপচর্চারই সুনিপুণ রেখায় রেখায়। যৌবনেরই পেশল সাজের এক ঢল্‌ থেকে আরেক ঢল্‌ পর্য্যন্ত! বিশ বছরের শরীর—গ্রীষ্ম-বর্ষায় ঘেরা এত ঋতুচয়নে—নিটোল কদম হোয়ে ওঠা রূপঝরা বুকের আপীন-মাধবীরাগ—না হোয়ে পারল না—লাজ-ভারেতে বিনম্র স্তবকাভার। শ্রীমতী দুর্গার সোনায় হলুদে মিল ধরা ত্বক-মাধ্বীর ওপরকার এই লাল লনের অঙ্গরাখা থেকে প্রকাশিত—ঐ রেশরম ছন্দেরই রূপাভা। —যৌবনের মাদকতা ভরা দুটি কদম ফুল—ঠিক কদমেরই মতো নরম হোল তার ছোঁয়া। ঠিক কদমেরই মতো গোলাকার হোল তার শৈল্পিকতা।—এরই রূপধৃতির অনির্বচনীয়তার প্রতি চোখের নিলাজ চাহনি ভরিয়ে তাকিয়ে থেকে—দুষ্টু হাসির মাদক রেশ ফুটিয়েই শুধু হাসির ঝক্‌মকানিতে মাতলো—সুন্দর নামী এই সুন্দর যৌবনেরই সাজঘরের শরিক ছেলেটি।

আবার সেই চিরন্তন অভিমানের সুর ধরেই দুর্গা বলল—"এই সুন্দর, বলি, বলবে না?"

সুন্দর দুষ্টুমি কোরেই বলল—"এই দুষ্টু মেয়ে। বুঝলে, আমি সেই দুর্গা মেয়েটিকেই ভাবছিলাম।"

বিস্ময়ের ভাব নিয়ে দুর্গা পুনরায় আবেগ জড়ানো গলায় বলল—"এই, সুন্দর। কিছু বুঝলাম না। সেই দুর্গা মেয়েটিকে? তার মানে? খুলে বল।"

সরব হাসিতে ভেঙ্গে পড়ে শ্রীমান সুন্দর বলল—"বলছি ত' তোমাকে নয়। দুর্গা নামটি কি শুধু তোমারই থাকতে পারে? আর কারুর বুঝি হোতে পারে না, না? বললামই ত' এ হোল অন্য আরেকটি মেয়ে। স্বভাব যার হোল বনহরিণীর মতো! আর মন যার হোল শিশুর মতো! এই, এবার বুঝলে নিশ্চয়? ও হোল আরেক দুর্গা।

তুমি নও। এই শোন, এই আরেক দুর্গা, মানে যাকে তুমি চেন না বা জান, সেই তাকে সত্যি আমার এত ভালো লেগে গেছে, যে, বলতে গেলে আমি তার সঙ্গে ভালোবাসায় পড়ে গেছি।"

বাস্। আর যাবে কোথায়। সুন্দরের ইচ্ছাকৃত এই ভাষণটুকু তার সতীর্থাকে—প্রজ্জ্বলিত করালো—অভিমানের প্রগাঢ়তায়। আর দুর্গা কান্না উপস্থিত হওয়ার অবস্থা ফোটানো মুখ ঘুরিয়ে নিল তখনি অন্যদিকেটিতে। প্রসাধিত কপোলের ওপর টোল গড়ালো। লাল ঠোঁটের হাসিতে কাঁপন জাগলো।—সব চাইতে প্রকট হোল—এই অভিমানের সুর—শ্রীমতী দুর্গার সবুজ রীতিতে বজ্রশ্রীর মতো সুধষমায়িত বুকখানাকে। গাছকোমর ক'রে বাঁধা শাড়ীর রেশমী আঁচল আপন বিস্তৃতির সংকোচনে—তারই নীচেকার লাল ব্লাউজের আবরণকে অস্বীকার করারই মতন ক'রে—প্রভাসিত করিয়ে তুলেছে এই মুহূর্তটির অভিমানী রূপটুকুন—দু ধারারই "lines of uninterrupted beauty" পর্য্যন্ত।—এ সব রূপ যখন—সুন্দরেরই চোখের সামনে পরিবর্তিত হোয়ে চলছিল—শ্রীমতী দুর্গারই যৌবনের ঢল্ সাজানো কোন কোন দেহী তরঙ্গিমায়—তখন যুবকের শাশ্বত এক দৃষ্টির মধুর করা অভিনিবেশ থেকে পলকহীন ভাবতে তাকিয়ে না থেকে পারলো না—এই সুন্দর দেহ-মনেরই সুন্দর থাকা—শ্রীমান সুন্দর সেন।

হোতে পারে ও এই সুন্দরেরই মতো—আধুনিক দৃষ্টি-ভঙ্গির মধ্যেকার—এক শ্রীমতী!—তবু কিন্তু ভালোবাসার মায়া কারাগারেতে আপনারই বয়েসী সেই নিজ নামেরই মতো রূপবান সতীর্থকে বরণ কোরে থাকায়—আজ এমন মুহূর্তে সব যুক্তি-তর্কের গণ্ডি ছাড়িয়ে—দুর্গা হোয়ে উঠলো—অভিমানী যুবতী। হোতে চাইল লাজবতী। আর হোল সত্যি সজলা।

এমন অভিমানের সুরটিকে আর বেশী ঘন হোতে না দেবার জন্য—সুন্দর নিজের দিকে দুর্গার মুখখানাকে জোর ক'রে ফিরিয়ে আনালো। তবে দুর্গা কিন্তু ফেরাতে চাইল না। অন্যধারে ঘুরিয়েই রাখতে চাইল। সুন্দর তাই তার এই অভিমানিনীর অপার সুষমা নিয়ে ঝল্কানো মুখটি হাতের শক্তকরা বাঁধনে বেঁধে নিয়ে—নিজের চোখের সামনেই তুলে ধরলো।—আর অবাকবিস্ময় নিয়ে দেখলো—ভালোবাসার এই মেয়েটির কজ্জলিত চোখ দু'খানার পাতা—বিন্দু বিন্দ হোয়ে জমে ওঠা জলের তোড়ে—বেশ ভারী হোয়ে এসেছে। অভিমানিনীর রেশ আর একটু চড়া রঙ্ পেলে পর—সত্যি ঝরে পড়বে এ কান্না—বাণের তোড় নিয়ে!

তাই মিষ্টি রাগের মাধবীলতায় দুর্গাকে সাজাবার জন্য সুন্দর বলে উঠলো—"ওই দুর্গা! তুমি কি বল ত'? সামান্য একটা কথা শুনেই এতটা কান্নার সামিল করাচ্ছ কেন? ভারী, দুষ্টু তুমি! শোন। এদিকে তুমি একটু আগে আমার ওপর অনুযোগ চাপিয়েছিলে, যে, আমি কেন আনমনা হোয়ে উঠি, তাই! কিন্তু এখন দেখছি যে, এই আনমনা হওয়ার ব্যাপারে তুমিও ত' কম যাও না?"

বলতে বলতে দুর্গার কাঁপা কাঁপা শরীরের রেশ অনুভব কোরতে কোরতে—ওরই গলার নীচে আর কাঁধের সুমসৃণতার মধ্যে আঙ্গুলের পরশ ধরে আদর কোরল—এই,

শ্রীমান সুন্দর সেন।—এইটুকু আদর দুর্গাকে ও জানাতে পারে— কেন না, ওরই ওই যুবতীত্বকে ভালোবাসার রাগলতা করাতে পেরেছে—এই সুন্দর নিজহে। যদিও এ ভালোবাসা—নিভৃতি দিয়ে গড়া! আর নিরালা দিয়ে ঘেরা!

অবশ্য ভালোবাসার অধিকার থেকে—এই মিষ্টি মাধবীরাগ নিয়ে কান্নার সামিল হোয়ে ওঠা দুর্গাকে—আরো বেশী কি-ছু রীতির আদর জানানোর ইচ্ছা সুন্দরের যুবক-মনটির নিভৃতে উঁকি দেওয়া সত্ত্বেও—আর বেশী কিছুটি কোরতে চাইল না। শুধু কথা বলল—"দ্যুৎ। সত্যি, তুমি কি মেয়েরে বাব্ বা! এমনটা খালি ভাবি তোমারই সম্পর্কে। আচ্ছা, দুর্গা; বলতে পার একটু আগের জিনিস, মানে যা তুমি শুনলে বা জানলে, সেই সম্পর্কে তুমি খেয়াল কোরে রাখতে চাও না কেন ?এই ত' ঘণ্টা দুয়েক আগে অনার্সের ক্লাশ কোরে এলে না? মনে পড়াও, তা হোলেই সব বুঝবে। আর এই আরেকটি মেয়ের কথায় যে দুর্গা ভেসে এসেছে বড় এক প্রসঙ্গ নিয়েই— সেই তাকেও তুমি চিনে ফেলতে পারব অনায়েসে। হ্যাঁ। সত্যি, সেই অপুর দিদি দুর্গার কথাই তোমায় এতক্ষণ ধরে জানাতে গিয়ে কোরছিলাম দুষ্টুমি— তোমারই অবুঝ মনের সঙ্গে। বুঝলে মেয়ে, এই আর কি। সত্যি, তুমি যে কি না তাই আমি ভাবি। আর ভেবে ভেবে ইচ্ছা হয় তাই দুষ্টুমি করার জন্য। এই তোমারই ওপর। বিশেষ বিশেষ সময়ে। যদিও এটা ঠিক যে, তোমার মতো আমি কিন্তু সময়ে কি অসময়ে এই যখন-তখন দুষ্টুমি কোরতে পারি না ঠিকই। কী, কিছুটি বলবে!"—কথা শেষ ক'রেই মিষ্টি দুর্গার মুখের প্রতি তাকালো অপলকে।

কী আশ্চর্য্য! যে মেয়ে অতি সামান্য কথার রহস্য ভাঙ্গবার জন্য—পথ প্রশস্ত থাকায়ও বিন্দুমাত্র চেষ্টা না কোরে—একটু বেশী অভিমানের সুর ধরেই নিজেকে করিয়েছিল— চোখে-মুখের রূপ ধরে ধরে বিলোলিতা আর কান্নার সামিল ;—সেই মেয়েই কিনা এখন মুহূর্তের পটপরিবর্তনে— মেঘলা আকাশের মেঘমুক্তি হোতে দেখা মাত্র—হোল স্বাভাবিকা! হোল ঝলমলানো! হোল সপ্রগল্ভিতা!—সুন্দর তাই দেখলো— কোথায় গেল সেই হঠাৎ জাগা অভিমানের কলহান্তরিকতার মতো রূপটুকুন! সবই যেন কোন যাদুমন্ত্রের টানে মুহূর্তমধ্যে হোল অদৃশ্য। আনন্দের আর স্বস্তির কল্‌কলানো হাসিতে দুর্গা তখনই ঝকমকিয়ে নেচে উঠলো। আর অমন ভাব-বিহ্বলতাকে শরীরময় সুষমার ঢল্ ধরে নাচাতে নাচাতে জানালো দুর্গা—"এই, শোন। বলি কি জান, আমায় ছেড়ে দিয়ে কিন্তু ঐ নতুন দুর্গাকে আর ভালোবাসা জানাতে যেয়ো না, বুঝলে? ভালোলাগা পর্য্যন্তই যেন থেমে যায়। তার বেশী কিন্তু এগিয়ো না লক্ষ্মীটি। এই সুন্দর, আমি বলি কি, এই নতুন দুর্গার বয়েসখানাই বা আর কত বেশী হোতে পারে? তেরো—খুব যদি বেশী কোরে ধরা হয়? কি বল, বয়েসখানা ওর তার চেয়ে বেশী নয় নিশ্চয়? এই আমারই মতো কি? ধর, আমারই মতো বিশখানা টানা টানা বছরের গর ডাগর চোখ বসানো—এমনই এক দুষ্টু স্বভাবের মেয়েটি কি সে?" একটু থেমে দুর্গা আবার জানালো,—

"আর আমার মতো কোরে কি তোমায় সত্যি সত্যি ভালোবাসা বাসতে পারবে? শোন, আমার চাইতে ওর বয়েস অনেক কম। বলতে গেলে বলতে হয়, যে ঐ দুর্গা

একেবারে ছোটটি। ওর ষোড়শী যুবতী হোতে এখনও বছর তিনেক দেরি আছে। আর আমার মতোটি হোয়ে উঠতে ওর পক্ষে আরো চার বছর অপেক্ষা কোরতে পারলে পর—সত্যি সেদিন হয় ত বা আমারই মতো বিংশতিবর্ষীয়া হোতে পারে। তার আগে নয়। দ্যুৎ। অত ছোট মেয়ে যে, সে ভালোবাসার কিই বা জানে, বল? তাই বলি, এই পুরনো আমায় ছেড়ে দিয়ে যদি নতুন ওকে গ্রহণ করার চেষ্টা কর, তা' হোলে তুমি ঠকবে ওরই কাছেতে। আমি তা' বলে দিয়ে তোমায় আগে থেকেই সাবধান কোরে রাখলাম কিন্তু।"

শ্রীমতী দুর্গার মুখ থেকে আত্মরক্ষার্থে এত সব সুবচনী মুখরতার মায়াজালে—সত্যি সত্যি খুশীয়াল হোয়ে উঠলো—সুন্দর স্বভাবেরই এই সুন্দর ছেলেটি। তবু প্রিয়াকে বলতে চাইল—"ঈষ্। নিজের হোয়ে অত ওকালতি কোরলে কি হবে বল, যদি না আমি ঐ ছোট্ট দুর্গাকে নিজে থেকে সরিয়ে দিয়ে রাখি! তবে? দ্যুৎ! তোমার চাইতে কিন্তু ও মন্দ হবে না মোটেই।"

সুন্দরের কথা থামতেই—দুর্গা রায় আবার কথায় মুখরতা ফোটালো। কানের মুক্তা বসানো ঝুমকোর দুল দু'খানা দুলতে থাকার মধ্যেই দুর্গা জানালো—"এই। তুমি এখন কথা বলবে না। আমি কি বলেছি যে, ঐ দুর্গা ভালো নয়? আমি যা বলতে চেয়েছি তা তুমি আদপেও পার নি কিন্তু বুঝতে!"

হঠাৎ কি মনে হওয়ায়—বনহরিণীর মতো অশেষ চঞ্চলতার প্রকাশে দুর্গা রায় তার দু'হাতের নরম বাঁধন ছড়িয়ে দিল—সুন্দরদর্শন সুন্দরেরই গলার চারধার দিয়ে। ঠিক ওর শুভ্র হাসিতে ঝিলমিলানো মুখখানার অতি কাছে নিজের মুখখানা টেনে নিয়ে বলল দুর্গা—"ঈষ! তোমায় ওর দেখি আমায় ছেড়ে? থাক্, থাক। ও সব কথা বাদ দাও। আমি বলি কি জান, এই সুন্দর? ভালো কোরে শোন। তুমি যদি ঐ ছোট্ট দুর্গাকে প্রকৃতির কোন নিভৃত কোণে,—এই মানে আর কি চারধারে সোঁদালি মাটির গন্ধ ছড়াচ্ছে, মাথার ওপরে বন-ধুঁধুল দোল খচ্ছে, ও-ধারে বাঁশঝাড় ক্কড়—ক্কড়—ক্কড়াৎ কোরে ঝড়ের হাওয়ায় মাতাল হোচ্ছে, আর বন-চাড়ালেরা নাচানাচি কোরছে সেই নির্জন কোন জিউলিতলার পথটিতে, অর্থাৎ রাতে যেখান দিয়ে যাওয়ার সময় জোনাকিরা পথচারীর চোখ ধাঁধিয়ে দেয়—ঠিক তেমনই মুহূর্তে তুমি যদি—ঐ সাজি মাটি দিয়ে কাঁচা শাড়ীটিকে খাটো কোরে পরে থাকা, আর এখনও যার ছোট বুকখানার মধ্যে আষাঢ়ী ঢল্ নিয়ে যৌবন ভরাট হোতে পারেনি— সেই অবস্থাকেই ডান দিকেতে উদোল কোরে রাখা, আর ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কোঁকড়ানো চুলে ভরা ঐ দুর্গাকে যদি—সত্যি তুমি বুকে টেনে নিয়ে আদর কোরতে চাও—তা হোলেই হোয়েছে আর কি! ও তখন নিশ্চয়ই তোমায় ছেড়ে পালিয়ে যাবেই! আর এরও ওপর এগিয়ে গিয়ে তুমি যদি তার কচি মুখখানায় আদর করার ফাঁকে চুমা খেতে চাও—তা হোলে বোধ হয় ঐ ছোট্ট মেয়ে তোমার কাছ থেকে নিবৃত্তি পাওয়ার জন্য কেঁদে-কঁকিয়ে-কামড়ে-খিম্চে একটা কাণ্ডই বাঁধিয়ে বসবে! বুঝলে গো, তাই তোমায় সাবধান কোরে রাখছি। তোমাতে আর ওতে বয়েসের ফারাক অনেকখানি। তাই বলছি এত কথা। আমি ত' তোমায় অন্তরঙ্গতায় এই দু'তিন বছরেই চিনেছি খুবই। বাব্বা, প্রথম

পরিচয়ের কিছুদিন পরেই সাত তাড়াতাড়ি একদিন প্রথম বছরের পরীক্ষার খবর বেরুবার দিন আমার কাছে কী নিয়ে আবদার কোরেছিলে মনে পড়ে কি তোমার? তুমি হোয়েছিলে দ্বিতীয়। আর আমি হোয়েছিলাম প্রথম। আমার এই প্রথম হওয়ার জন্য আমার কাছেতে তুমি চেয়েছিলে একটা উপহার! ভারী দুষ্টু তুমি! তা না হোলে কি অনেক কিছু উপহারের জিনিস থাকা সত্ত্বেও—তুমি যা চেয়েছিলে—মুখ ফুটে আমি তা ভাবতে গিয়ে এখনও লাজে রঙীন হোয়ে পড়ি।"

আর পড়লোও দুর্গা লাজের লালেতে রঙীন হোয়ে ঠিক এই মুহূর্তটিতেই—সুন্দরকে বেশ গুছিয়ে নেওয়া এই সব সুন্দর কথাগুলো শোনাতে শোনাতে। হঠাৎই দুষ্টুমি কোরে সুন্দরের বাঁ দিককার কপোলেতে নিজের কপোল গাঢ় ভাবে ছোঁয়ালো। একটু কয়েক পলকের জন্য নিথর হোল। তারপরে আগের কথার রেশ ধরেই—লাল অধরের মধ্যে পলাশের দ্যুতি ঝরিয়ে রেখে বলতে লাগল আদর করারই সুর ফুটিয়ে—"এই। বলি, মনে জাগছে ত' সেই উপহার চাওয়ার ব্যাপারটুকুর কথা? ঈস্। কি যে তুমি সেদিন আমায় লজ্জা দিয়েছিলে না, তা ভাবতে লজ্জারই রেশ আমার দেহেতে নেচে ওঠে। চেয়েছিলে কিনা আমার অধরের কৌমার্য্য—নিজের অধর দিয়ে আহরণ করার জন্য! বাব্ বা, যা বলা, করাও হোয়েছিল তাই। আর তখনি। কলেজেরই নিরালা এক কোণেতে অবস্থিত সেমিনার ক্লাশের ছোট ঘরখানাতে আমায় তার আগেতেই বন্দী কোরে রেখেছিলে। ইচ্ছা কোরলে আমি তোমায় সেদিন আমার অস্বীকৃতি জানাতে পারতাম। কিন্তু তোমার সাথে আমার সম্পর্ক সেই একটি ছরের মধ্যে এমন পর্য্যায়ে এসেছিল যে,—সেদিনের ঐ উপহারখানা তোমায় আমার অধর থেকে দেওয়াতে—আমি নিজেও অশেষ খুশীর স্রোতে উঠেছিলাম ঝলমলিয়ে। জান সুন্দর, সতেরো পার হোয়ে আঠারোর আঙ্গিনার বসন্ত-স্পর্শ পেতে পেতে—আমি আমাদের সেই "Sweet teen age" কে অভিনন্দিত করাতে পেরেছিলাম সত্যি সত্যি— তোমার দুষ্টু হওয়া অধরের মাদকতার মধ্যে নিজের অধরকে সংস্থাপন করায়! তাই না? বল, ঠিক বলছি না?—কিন্তু কি জান, বয়েসের অনেকটা তফাৎ রেখে—তুমি যদি ঐ ছোট্ট দুর্গার মতো অপর কারুর প্রতি নিবেদনে জানাও এমন কিছুটি, তা হোলে অবধারিত ভাবে তুমি সেখান থেকে হেরে আসবে। তাই বলি, এ সব চিন্তা উড়িয়ে দেও হাল্‌কা মেঘের দেশেতে!"

এক নাগারে এতখানি কথার ঝুলঝুরি ঝরাতে ঝরাতে এবার থামলো দুর্গা। হাসির স্বতঃস্ফূর্ত শুভ্রতা তার লাল ঝলস্ নিয়ে ঝলমলানো অধরে কোরছে নাচানাচি। তার রূপবতী বুকখানা পর্য্যাপ্ত পুষ্পস্তবকের ভারেতে—আঁচলের শক্ত হোয়ে জড়িয়ে থাকা আবরণেতে আনত না হোয়েও—ওরই মধ্যে ওঠা-নামা কোরছে কঠিন পেশলতার লাল আভা ছড়ানো—খুশীয়াল হওয়ার হিলোলতা। আর মুঠো মুঠো বিলোল থাকা বিহ্বলতা। তারই—ছন্দ-যতি-মিল! তারই—মিড় গমক মূর্চ্ছনা!

সুন্দরতায় ভরানো টানা টানা চোখের ভালোবাসার দ্যুতিতে ভরা যুবক-চাহনি ছড়িয়ে রেখে—সুন্দর অপলকে তার এই সুনন্দিতা প্রিয়াকে দেখতে লাগলো—মুঠো মুঠো আনন্দিতারই রূপ ধরে। আর তারই নিরিখেতে—সুন্দর তার যুবক মনের সবুজ

অলিন্দে ভাবাকুল হোয়ে ভাবতে লাগলো—সেই আগেরই মতো "পথের পাঁচালী"রই রেশটুকু নিয়ে—এই বাস্তবের শ্রীমতী দুর্গা রায় আর ঐ মহাগ্রন্থের পল্লীবালা দুর্গা রায়— এই দু'জনাতে কোন কোন দিক ধরে যেমন কিছু কিছু মিল আছে, তেমনি আছে প্রচুর অমিল। এমনটা হয় ত' হোত না—যদি—ওরা সমাজ ও সংস্কৃতির দু'ধারার বাসিন্দা হোয়ে না থাকতো। এদের একজনা পল্লীবালা। আরেকজনা শহুরে যুবতী। কিন্তু এমনটা ত হোতে পারত, যে, শ্রীমতী দুর্গা রায় হোত গ্রামীন যুবতী! আর ঐ ছোট দুর্গাটি হোত শহুরে কিশোরী!—তা হোলে কি হোত? তা হ'লে আরেক ধারার ইতিহাস বোধ হয় তৈরী হোত না। যা হোতে পারে, বা হবে—তা হোল—একজনা ঐ গ্রামীনই থাকতে চাইবে। আরেকজনা থাকবে শহুরেই। এই তফাৎটি বজায় রেখে—দু'ধারার হোয়েও ওরা কিন্তু কিশোরীই হোক্, আর যবুতীই হোক্ না কেন—এটা চিরন্তন সত্য যে—একজন আরেকজনার পরিবেশে পড়লে পর—অতি সহজে সুরেতে অনায়াসেই নিজেকে মিল ধরে মিশিয়ে দিতে পারবে। কেন না,—এটাই যেহোল ওদের মেয়েলি সার্থকতা! শিশুই হোক্, কিশোরীইহোক্ বা যুবতীই হোক্ না কেন—ওরা হোল ছন্দ-যতি-মিলের নিয়ন্ত্রা। বইয়ের দুর্গা আর বাস্তবের দুর্গা—এই দু'জনারই দেহ-মন ঘিরে বয়েসের যতটা তফাৎই থাকুক না কেন,—এটা সুস্পষ্ট হোয়ে উঠেছে, যে,—দু'জনাই স্বভাবেতে শিশু মতো! আর প্রকাশে হোল—বনহরিণী। প্রাকৃতিক ঝঞ্ঝার মতো—দুষ্টুমিতা। এই ঝড়েতেই প্রকৃতির কানুনে মাতাল হওয়ার ব্যাবারটি আনে—ওদের পরিতৃপ্তি। এই ঝড়েতেই শান্ত থাকার মধ্যে ওরা খুঁজে পায়—নিভৃত নিবৃত্তি।

এই ভাব-ভাবনার রেশ ধরে অনেক দূর পর্য্যন্ত এগিয়ে যাওয়ায়—হঠাৎ সম্বিৎ এলো সুন্দরের।—দ্যুৎ। এত কিছু ভাবনার কি আছে। আমার ও-ও ছিল একদিন বইয়েরই মতো দুর্গা। আর এই ছোটটিও কালের নিয়ম অনুসারে একদিন হোয়ে উঠবে। —আমারই এই যুবতী দুর্গাতে— যৌবনেরই ভরা ঘাঙ্গেতে টইটম্বুর করা।

আর কিছুটি ভাবতে চাইল না সুন্দর। এবার স্টিয়ারিং হুইলের ওপর থেকে ডান হাতখানা তুলে নিয়ে—আদর করার জন্য দুর্গার প্রতি দুটি হাতের বাঁধন বিস্তার করালো।

দুর্গা অবশ্য তখন ধরা দেওয়ালো নিজেকে—লালাভা ঝরানো হাসি,—আর হাসিরই খুশীতে ডগমগিয়ে থেকে।—কিন্তু গাড়ীর ভেতর থেকে সামনে-পেছনে দুর্গা তার কজ্জলিত আয়ত চেখের চাহনি ছড়িয়ে—বাইরের চারধার দেখার চেষ্টা কোরলো। দেখলো নির্জনতা চারধার ধরে ছাপিয়ে রেখেছে। বড় বেশী নিস্তব্ধ। গাড়ী আসছে না আর কোন। পথচারীও চলছে না। খালি শীতকালের পড়ন্ত বেলার মিষ্টি রোদ খেলে বেড়াচ্ছে চিক্ চিক্ কোরে। এই ত' নিভৃতির তৈরী করা সুযোগ। দেরি কোরলে পর এমন নিভৃতি ভরা সুযোগটি হারাতে হবে। তাই ভাবলো শ্রীমতী দুর্গা—দু'কানের মুক্তা বসানো ঝুমকো লতার দুল দু'খানাকে—দোলাতে দোলাতে।

অজন্তার ছান্দসী ছাঁদে খোঁপা বাঁধা মাথা একটু পেছনে হেলিয়ে দিতে দিতে—খুশীরই রূপবিহ্বতায় ঝক্‌মকিয়ে শ্রীমতী দুর্গা রায় নিবেদন কোরল শ্রীমান সুন্দর

সেনের প্রতি—"এই। এই সুন্দর। দেখ ত' ভালো কোরে—কি যেন আমার চোখেতে বাইরের থেকে উড়ে এসে পড়লো।"

সঙ্গে সঙ্গে—সুন্দর যেই তার এই দুষ্টু মাধবীলতারই মতো মধুমিতার মুখশ্রীর যৌবনান্বিত ঢলের ওপর—নিজের মুখ নিয়ে নুয়ে পড়ে দেখতে চাইলো—ঠিক তখনি দুর্গা খিল্ খিল্ করা হাসিতে ।ালোলতা ঝরাতে ঝরাতে—প্রিয়র বুকের আশ্রয় থেকে নিজেকে এক ঝটকায় সরিয়ে নিয়ে—সীটের ওপরেতে—আপনার ছবি হোয়ে ফোটা—রাশি রাশি করা লাজঘেরা শুধু শরীরময়তাকে এলিয়ে রাখলো। আর নরম নরম দু'খানা হাত দিয়ে সজোরে সুন্দরের নুয়ে আসা হাসিতে খুশীতে—দুষ্টুপনার ইঙ্গিত ধরে ঝলমলানো সুন্দর মুখখানাকে ধরে রেখে —অতি কাছেতে টেনে আনলো। দুষ্টুপনায় মেতে ওঠা দুর্গা তার প্রণয় নিয়ে জড়ানো লালে লাল ঠোঁটের সঙ্গে—প্রিয় সুন্দরের অধরকে ছুঁইয়ে রেখে—মধুরাংশ্চ করা সৌরভেতে ভরিয়ে দেওয়াতে লাগলো।

একটু পরেই ফাঁকা রেড রোড ধরে গাড়ী চললো সুন্দরদেরই বাড়ীর দিকে। দু'জনেই তখন সুতৃপ্ততারই হর্যোজ্জল থাকা শুধু রভসেতে হোয়ে আছে মাতোয়ারা। মদালসা।—সুন্দর দেহ-মনের অধিকারী—এই সুন্দর তখন বাঁ হাত দিয়ে—তারই বুকের মধ্যে লুটিয়ে থাকা ঝল্মল্ আর ছল্ছল্ করা ঝরনারূপী শ্রীমতী দুর্গা রায়কে কঠিন বাঁধনেতে বন্দী রেখে—গাড়ী চালাচ্ছে ডান হাতে। "পথের পাঁচালী"র রেশ ফুটিয়ে দুর্গা ও সুন্দর—পরম এক নিভৃতিকে অনুভব কোরছে। পরম এক নিরালার আবেশ কেড়ে নিচ্ছে।

গাড়ী চালাতে চালাতে বাঁ হাতেতে—প্রিয়ার নরমে পেশলে মুঠো মুঠো থাকা—আরাম নির্ঝরিত বুক পর্য্যন্ত বাঁধন বিস্তারিত রেখে, আর চলার গতি খুব কমের দিকে রেকে—গুনগুনিয়ে শ্রীমান সুন্দর সেন জানালো আদর ভরা গলায়—"এই। এই মিষ্টি। জান, এখন না আমার মনে কবি কান্তি ঘোষের অনুবাদিত রুবাই উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে। এই, শোন—

'রাত পোহাল—শুনছ সখি, দীপ্ত উষার মাঙ্গলিক?
লাজুক তারা তাই শুনে কি পালিয়ে গেছে দিগ্বিদিক!
পুব-গগনের দেব-শিকারীর স্বর্ণ-উজ্জ্বল কিরণ-তীর
পড়ল এসে রাজপ্রসাদের মিনার যেথা উচ্চশির!"

—এই, এই দুষ্টু মেয়ে, কি ভারী সুন্দর না?"

মিস্টি মাধবী রাগেতে ঝলমলাতে থেকে শ্রীমতী দুর্গা রায় তখনি আদুরে স্বরে জানালো—কাটা কাটা ভাবেতে—"এই। এই। সত্যি ভারী সুন্দর। এই ছেলে, এই দুষ্টু। শোন, আমি তোমারই জানানো এই রুবাইয়েরই মতো কিছুটি শোনাতে চাই—রায় গুণাকর অন্নদাশঙ্কর রায়ের কথায়—

'আমরা দু'জন রসিক সুজন সকল রসই ভালোবাসি।
এতই বৃহৎ নয় গো জগৎ গড়বে আড়াল দোঁহার মাঝে।
সুদুর অদূর সমান মধুর বিয়ের বাঁশি নিত্য বাজে।

চোখের দেখা ভাগ্যে লেখা নেই বলে কি রইব একা?
আমরা দু'জন রসিক সুজন লিখব রসের লিপিকা যে।
হুই সুন্দর রই সুন্দর করি সুন্দর সৃষ্টি
তব তনুরুচি তনু মোর শুচি অনুরঞ্জিত দৃষ্টি।"

তাই শুনতে শুনতে সুন্দর বলল—"দুর্গা। তুমি সত্যি ঐ ছোট্ট দুর্গা নও। তবে কিন্তু ওরই সুর আছে তোমার মধ্যে। তুমি ঐ ছোট্ট দুর্গারই মতো দুষ্টু মাধবীলতা। তুমি এক দুষ্টু বনহরিনী!"

তেমনি দুর্গা বলল—"এই, আর তুমি কি? আমি যদি হই দুষ্টু মাধবীলতা, তা' হোলে তুমি?"

"আমি?—নিজেই উত্তর দিল সুন্দর—"অমি হ'লাম তোমার দুষ্টুমির ইন্ধন। তোমার জন্য আমিই ফুটিয়েছি পথের পাঁচালীর রেশ।"

—২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৫৬

নির্জনা রঙ্গরাগ

সুন্দর এক নামের অধিকারী—সতীর্থ দেবব্রত চন্দ, সুহৃদয়েষু

ঘরের বাইরেতে সবুজ রঙ্‌ করা একটা বেতের চেয়ারে বসে আছে রমা। সামনেই গ্রিলের রেলিঙ্‌ বসানো ঝুল বারান্দা।

রমার আকারখানা ছোট খাটো। যৌবনের টাটকা আভায় বেশ ছিমছাম তার ঐ ছোট্ট মতন শরীরখানা। ওই মিষ্টি রূপের আকার ঘিরে—তারই আনাচে-কানাচে বড় বেশী করুণ ধরনেরই এক মৌন-মুখরতায় রেখেছে ভরিয়ে। ভাবটুকুন তার রূপরে ভাসা ভাসা অবস্থা থেকেই হোয়ে উঠেছে সুস্পষ্ট। ওরই ভেতর দিয়ে রমার রূপসী তনুর সবুজ মধুরাগখানা রঙিয়ে গেছে—এক মদিরা ভরা চোখেরই—তৃষা থেকে ঝরা—ঘনিষ্ঠ তাপকে জড়ানো—সিঁদুরে আভায়।

আর রমার ছন্দাসী যৌবনের প্রখর হওয়া রেখার রেখায় উপছে পড়েছে—কোন এক অলকাপুরীরই ঘন-রঙ্‌—নিঝুম নিঝুম নিস্তব্ধতা। নিশ্চলতা।

এমন নিশ্চুপ ভাবেতে নিশ্চলা রমার সামনে—ঝুল বারন্দার রেলিঙের ধার ধরে সাজানো আছে চন্দ্রমল্লিকা ফুলের বাহার ছড়ানো—এক সাড়ি লাল মটির টব্‌। ফুলে ফুলে হরেক রকম রং বেরঙের ঝলস্‌ ফোটানো টব্‌গুলোর নীচেতে—পেতলের চক্‌চকে পাত নিয়ে লাইনিঙ্‌ দেওয়া। গোধূলি কালের একটু আগেও দেখা যাচ্ছিল—আকাশের পশ্চিম দিগন্তে হেলে পড়া সূর্য্য সেখানে ঝুঁকে পড়ে—চিক্‌চিক কোরে নেচে উঠেছে। তারপর একটু একটু কোরে আড়াল দিয়ে দিয়ে লুকিয়ে পড়তে লাগলো—ধূসর রাঙা মেঘেরই কোলে। তখন রিমঝিম করা সন্ধ্যা আসার আগেই, আর সাঁঝের দীপ জ্বালানো অন্ধকার এগিয়ে এসে পৌঁছেনোর পূর্বক্ষণে—আগমনী সঙ্গীত গেয়ে নিজের নিজের কুলায় ফিরে ফিরে চলেছে—ক্লান্ত আর শ্রান্ত পাখীরা। এখানে সেখানে, সীমাহীন আকাশের নীল নির্জনতায়—ডানা মেলে উড়ে উড়ে পরিশ্রম করার পরেও—ঐ সাঁঝের একটু আগে—তাদের ছোট মতন সরু সরু ঠোঁটে ঠোঁটে—মুখর হোয়ে ছিল কিচির-মিচির করা কলতানের—মিষ্টি রবারখানা। চিরিক, চিরিক! চিক্‌চিক আরো কত শব্দ!

রমার আজকের এই মুহূর্তে, দেহের সুন্দর খাঁজ কাটা সবুজাভায় সাজা অকারের ভেতরের ভেতরে—তার একান্ত আপন মনের রূপটুকুন বড় দুর্বল করা এক চাহনি নিয়ে ফুটেছে—প্রভাসে, বিভাবে। অবশ্য কিছুদিন আগের এক বড় অসুখ থেকে ভুগে ওঠার শারীরী দুর্বলতাটুকুকে কিন্তু—রমার সুস্নিগ্ধ যৌবনে বিভাস পাওয়া প্রেমময় মোহাবেশ ঢেকে রেখেছে—অন্য জনাদের অনুসন্ধানী চোখের আড়াল থেকে। কোন অপর জনের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির পক্ষেও সম্ভব নয়—সেই কমনীয় নরম অঙ্গের

আরামঝরা পেলবতাকে অতিক্রম কোরে জানতে পারা—আজ রমার অন্তরের মধ্যে লীন হোয়ে থাকা—অসুখেরই প্রভাব থেকে ছোপানো দুর্বল রঙটুকু সত্যি কী রকম, আর কেনই বা তা রাঙিয়ে গেছে ধূসরেতে?

তবে অন্য পরে কা কথা—সেটা কিন্তু একমাত্র জানতে পারে রমার দেহকে সুন্দর করাবার, আর মনকে মধুরে রাঙাবার অধিকারে স্বত্ববান—সেই যুবক ছেলেটিরই—সুজনক যত্ন। আর তারই আদর ও আবদার ভরা আহ্লাদগুলো। প্রণয়েরই সাত রঙ্ ছড়ানো আলোর পৃথিবীতে থাকতে চাওয়া—সেই লীলাচাঞ্চল্যে রুমঝুম কোরে মাতামাতি করা—রমেন বন্দ্যোপাধ্যায়েরই যৌবনের তাপ ভরা মিনতিরই—বহুত নিবেদনগুলোর দীপ্তি!

সুস্মিতকান্তি এই চব্বিশ বছরের রমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একজন তরুণ শিল্পী।—যদিও তার শিল্পচর্চার কারুকাজ তুলি-ক্যানভাস-আর নানান রঙ্ নিয়ে নয়। তার কাজ হোল সাহিত্যেরই কারু-ধারার এদিক-সেদিক নিয়ে—কথায় কথায় ঠঅসবুনোনেতে কাহিনী পরম্পরা ধরে ধরে বোনা—মায়াজালেতে কথা বাঁধার কাজ। প্রেম-পরিণয়-সামাজ-জীবন ও তারই হাজার এক খুঁটি-নাটি ঘেরা আলাপচারণেতে—তা তৈরী করাবার শিল্পায়নই হোল—তারই সূক্ষ্মতম কারুকাজ।

তাই কথাশিল্পী স্বামীর এই কারুকাজ সমাধা করার অধিবাসেতে—"সত্য-শিব-সুন্দর" রূপটির ভেতরকার চিরন্তনী পরিকল্পনায়—স্রষ্টার প্রেরণাকে যোগান দেয় তারই ভালোলাগা থেকে ভালাবাসায় পরিণীতা এই,—এই বরঅঙ্গে সর্বত্র রুচিরায় রুচিরায় মদিরা ভরিয়ে রাখা—রমা বন্দোপাধ্যায়া। অনেকগুলো শীত-গ্রীষ্মের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত করা—কিছু কম চব্বিশটি টানা টানা বছরের প্রান্তে নীতা—এই শিল্পী-জায়া রমার অশেষ ভাবের বিহ্বলতায় প্রাণোচ্ছলা থাকারই—শুচি-স্নিগ্ধা রূপখানা। ওরই সুরভিত ধূপ-বিভাসখানা!

সর্বোপরি—আপনার যৌবনেরই প্রখরতা নিয়ে সবুজ থাকা আভায়-রূপভায় মিলিয়ে-মিশিয়ে—যৌবনের জয়গাথাকে সামাজিক ভালোবাসার নিরিখ সমেত—ওদেরই যুবকত্ব আর যুবতীত্ব সম্পর্কিত হরেকরকম কথা ও কাহিনীর স্রষ্টা—এই বধূ রমা বন্দ্যোপাধ্যায়। বারে বারে প্রিয়তমর সৃষ্টি-কাজের সন্ধ্যাযোগে—নতুন নতুন ভাবের আর উদ্দীপনা জাগানো অনুভাবেরই—এক, একটা ব্যঞ্জনাময়ী মূর্তিতে আর সঘন আর্তিতে—নিজেকে তুলে ধরায় ডালিয়া ফুলেরই মতো সুবিস্তারে—একটি একটি পাপড়ি খুলে খুলে। রং বেরঙ্ ছিটিয়ে, ছড়িয়ে। গাঢ়তায় রাঙিয়ে। কবিতার মতো ছন্দে ছন্দে নাচিয়ে।

সত্যি ঋতুতে ঋতুতে রীতির নানান কারুসম্ভার নিয়ে জাগা ছন্দ-যতি-মিলেতে—পুরো পুরি ভাবে রমেনেরই জন্য যৌবনায়ন করা লীলাচাঞ্চল্যের আঙ্গিনায়—স্ত্রী রমা হোয়ে উঠেছে—সুজনক আর সুমধুরিক থাকা দাম্পত্য-বোঝাবুঝির অধিকারে আর স্বাধিকারে—প্রিয়তমরই প্রাণেতে সঞ্চারণকারী আহ্লাদ থেকে—আহ্লাদিতা।—অনয়া আরাধিকা শ্রীরাধারই মতো।

ধপ্ ধপে ফর্সা পায়ের পাতায় আলতার রক্ত রঙ্ দিয়ে রঞ্জিত। সরু কোরে রেখা

টানা। রমা ছোট্ট এক শিশুর মতন জড়ো-সড়ো ভাবে আরাম চেয়ারেতে বসে থেকে—পায়ের দুটি পাতায় পাতায় শুভ্রতাকে রাঙানো অলক্তক শোভাকে তুলে ধরেছে একখানা ছোট্ট মোড়ায় ওপরে। আর তারই মধ্যে পায়েতে বাঁধা রয়েছে কালো ভেলভেটের চক্ চক্ কার অনেকগুলো কোরে স্ট্র্যাপ লাগানো—গ্রীসিয়ান স্লিপারখানা।

স্বভাবে মধুরিকা রমার এখনকার এমন ভাবখানা নিয়ে বসে থাকার অভিব্যক্তিটুকুন আরো বেশী রকমে হোয়ে উঠেছে—নির্জনে স্বাক্ষরিত। বিশেষ কোরে একলা থেকে সময় কাটাবার মুহূর্তগুলোতেই বেশ কিছুদিন ধরে দেখা দিচ্ছে—তাকে ছাপিয়ে ওঠা এই ধরনেরই নির্জনতায় ঘেরা, আর নিশ্চলতায় ভরা—সমাহিত এক ভাবের ব্যঞ্জনাটি।—আর এমনটা মাঝে মাঝে অঘটনের মতো ঘটে যায়—সময়ের হিসাব ঠিক ঠিক কোরতে না পারায়।—মায় রমেনের মা ও বাবার সাক্ষাতেই। তাঁদেরই স্নেহার্তি ঝরা আদর ও যত্নের অশেষ দরবারেতেই।

এমনটা আজ রমার পক্ষে সম্ভব হোয়ে উঠেছে—তারই প্রণয়-সহচরের সঙ্গ থেকে ছাড়া অবস্থারই বিপাকে। বিরোধোভাসে। তারই জন্য প্রিয়াকে বেপথুমনা কোরে রাখার এক অসাবধানী ইঙ্গিতে।

অন্য ভাবের ধূসর রাঙা এক দুনিয়ায় কিন্তু তাকে ছেড়ে রেখে—রমেনেরই কাছে কাছে থাকবার প্রতিটি মুহূর্তের যতি ধরে—রমা গুন গুন কোরে গান গাওয়ার মতো সুরেলা লহরে লহরে তুলে চলে—মুখর থাকা কল-কাকলিকে। তখন জাগায় নিঝুমতাকে হারিয়ে দেওয়া আর নিরালাকে সচলিত রাখা—মৃদুল সুরেরই মীড়-গমক-মূর্ছনা। লজ্জা জড়ানো প্রাণের ছন্দে ছন্দে ঝক্‌মকিয়ে নাচিয়ে তোলায় রাঙা হাসির খিল্ খিল্ করা রূপখানাকে। রঙ্গরাগ ভরা রেশম শাড়ীর সাত রঙা আঁচলখানাকে রমা তার বুকের ওপরের ভরাট সুষমার পেশলে জাগা—ওঠা ও নামার ছন্দকে ধরে নাচাতে নাচাতে—আর পিঠের ওপরকার ঐ সুমসৃণ ঘাড়েতে চকচক্ করার মধ্যে—ঝল্‌মল্ কোরে দোলাতে দোলাতে চাঞ্চল্যে আর লাস্যে না হোয়ে পারে না—রিমঝিম। শুধু রিমঝিম। আজ, একটু আগে, রমেনের মা এখানে এসে অসুখ থেকে সেরে ওঠা—একান্ত আদরের এই পুত্রবধূ রমাকে তার দেহ-মনের অস্বস্তিকর দুর্বলতাখানা ছাড়াবার জন্য খাইয়ে গেছেন, এক পেয়ালা ওভাল্‌টিন। ঐ জিনিসটুকু কয়েকটা পরপর চুমুকে খাওয়ার পর বেশ একটা আরামের আমেজ পেল বসে থেকে। নিজের হাতে খাওয়ানোর পর কিছু সময়ের জন্য তিনি তার আদরের পুত্রবধূর সঙ্গে গল্প কোরলেন, বসে বসে।

একটু পরে বাইরে বেরুবার কথা ছিল রমেনের মা'র। তাই কথায় কথায় এক সময় গল্প শেষ কোরে উঠে পড়লেন। সস্নেহে আদর কোরে বললেন—রমা মা, আমি তা হোলে চলি এখন। রমেন একটু পড়েই এসে পড়বে। তুমি এখানেই ভালো কোরে বসে থেকো কিন্তু। আমার মানা রইলো, উঠে যেন চলা-ফেরা কোর না। শরীর ত' তোমার এখনও রয়েছে দুর্বল হোয়ে। উঠবে না ত' রমা মা, কথা দিলে? আমার দুষ্টু মেয়ে, কেমন, ঠিক?

বলতে বলতে রমার গাল দুটি হাত দিয়ে টিপে ধরে আদর কোরলেন। তারপর আর দাঁড়িয়ে না থেকে মা আজ বাইরে বেরুবার জন্য কুঁচিয়ে পরা তাঁতের বাদামী রঙ্ শাড়ীখানার সামনের কোঁচানো ভাব—হাতের চাপে চাপে ঠিক কোরে নিয়ে, বারান্দা ছেড়ে ভেতরে চলে গেলেন। প্রথমে সাধারণ আটপৌরে ঢঙেই পরেছিলেন শাড়ীখানা। কিন্তু আদরের বধূ-সুজনা রমার করা দারুণ পীড়াপীড়িতে তিনি বাধ্য হোলেন—তা কুঁচিয়ে পরতে।—আসল কথা—রমেনের মা দেখতে খুব সুন্দরী। আর তার সঙ্গে বয়েস বাড়ার রূপটিও কোরে তুলেছে তাঁকে আরো সুন্দর। এই বছর চল্লিশের কাছাকাছি তিনি। আপন পুত্রবধূর মতে—সাধারণ ভাবে শাড়ী পড়লে পর না কি মা'কে ভালোরকম মানালেও এটা ঠিক যে,—ততখানি মানায় না তাঁকে, যতখানি কুঁচিয়ে পরলে পর মানায়। তিনি তাঁর একমাত্র ছেলের বৌ-কে খুব বেশি ভালোবাসেন বলেই রমা তার এই মায়ের কাছে—এমন আবদারটুকু নিজের মেয়ের মতোই করে থাকে। আর তাইতে শেষ পর্য্যন্ত জিতলে পর—ও পায় প্রচুর আনন্দ।

অবশেষে আদর করারই মতো বৌ—এই রমার আবদারগুলোকে রক্ষা করাবার জন্য মাকে ঐ ভাবে সাজতে দেখলে পর—রমেনও হোয়ে ওঠে খুব খুশী। রমেন যে তার মাকে অসম্ভব রকম ভালবাসে—এত বড়টি হোয়েও। বিবাহ করার পরেও! আর ওরই মধুরিকা রমাও তেমনি গভীরে ভালোবাসতে পেরেছে—এই মাতৃ- প্রতিম অপার স্নেহময়ীকে।

আর ঐ থেকে প্রিয়তমের খুশীতে নেচে ওঠা মনের সহাস ঘেরা ছোঁয়াচখানা পেয়ে—তখনি রমা ঝল্‌মলিয়ে রাঙিয়ে যায় গাঢ় সিঁদুর হোয়ে। লাজে লাজে তখন হোয়ে পড়ে কুঙ্কুমিতা। সুষমায়িতা। সঘন যুবতীত্বে তপ্তালিকা।

এই তারা দু'জনাই আজ একে ও অপরায় মিলে-মিশে—সন্তান ও সন্তান-প্রতিম—রূপরেখাটি ধরে তাদের প্রেমময়ে গরীয়সী এই মা'কে যে বড্ড বেশী রকমে ভালোবাসে! অন্যের দৃষ্টিতে তা ধরা পড়ে তুলনাহীন ভাবেতে। সময়ে সময়ে বিস্ময়ের ঘন-ঘোরেতে।

মা চলে যেতেই রমার মঞ্জুলিত মুখখানা চোখের কাজলে, আর ঠোঁটের লালেতে মৃদু মৃদু কাঁপন তুলে মুখর হোয়ে উঠলো শুচিতায় মাখা হাসিতে। ঐ হাসিরই গমকে।

রমা সিঁদুর হোয়ে উঠলো আরো বেশী আনচানানো রীতিতে।—কেন না, মায়ের কাছ থেকে আদর খাওয়ার লজ্জারাগখানা রুম-ঝুম করা তৃপ্তির রেশ ছড়িয়ে যাওয়ায়। ছিটিয়ে দেওয়ায়।

ঝিলিমিলি করা মায়ারাগ থেকে তাই সুছন্দিতা থাকা রমা আরো রঙীন হোয়ে পড়লো—তারই নির্জনে নিঝুম নিঝুম ভাবাবেগে মাতা মূর্তিতে। আর আর্তিতে। মায় রূপধৃতিতে।

আলোর অধিক আঁধার দিয়ে সাজা সন্ধ্যার আঁচলখানা আড়াল কোরে—দূরের আকাশে উঁকিঝুঁকি দিতে থাকায়—দোল খেয়ে গেল রমার চোখের মদির করা দৃষ্টিখানা।—তাই হাতে ধরা গল্পের বইখানাকে খোলা পাতা বন্ধ কোরে আস্তে আস্তে কোলের ওপরেতে শুইয়ে রাখলো। আনমনা হোয়ে ইতস্তত ভাবের হাতের আঙুল

বুলিয়ে গেল—বইটির সুন্দর ছবি দেওয়া মলাটের ল্যাকার লাগানো গ্লসি ভাবের—ওপর ওপর। হঠাৎ কী মনে হওয়ায় উচ্ছল হাসির উপ্‌ছে পড়া ভাবকে রক্তরাঙা ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরলো।

মনের গহন কুঠুরীতে ঢু'ক পড়ে রমা ভাবলো—গতকাল রমেন ক'লকাতার বাইরের একটি সাহিত্যের চক্রে প্রধান অতিথি হিসাবে যোগ দিতে যাবার আগে, ঠিক দুপুরের দিকে খুব একটা অভিমান কোরে গেছে—আমারই জন্য। কারণ হোল, আমি ওর যাওয়ার মুহূর্তে ওরই মনের মতোটি কোরে সাজি নি বলে। তারপর অভিমান নিয়েই ডায়মণ্ড হারবারে গেছে। সঙ্গে নিয়েছে আমাদের গাড়ীখানা। সেখানে এক জমিদার বাড়ীতে আজ সারাদিন থেকে ফিরে আসছে এই সন্ধ্যাতেই। এই এখনি আর কি, আমার রমেন ফিরে এলো বলে! কিন্তু আজ? আজকের সন্ধ্যায় কী আর আমাকে দেখে আমারই আদরের রমেন আমার ওপরে কোরও পারবে আবার অভিমান? না, না। আর অভিমান কোরবে না। আর পারবেও না। আমার রমেন খুব ভাল। অভিমান ত' শুধু কোরব আমি। আমাদেরই যুবতী রীতিকার কাছে অভিমান হোল একচেটে কাজ। মনোপলি ব্যাপার আর কি। আমরা তাই কোরব অভিমান পলকে পলকে। আর ওরা তখন প্রস্তুত হবে অভিমান ভাঙ্গাতে। কারণে-অকারণে, চোখেতে চোখেতে ফোটাব অভিমানের জলকণা মৃদুল কান্নার গমকে—আর তখনি ওদের রূপতিয়াসে বিভোর অধর আমাদের চোখেতে লুটিয়ে পড়ে আহরণ কোরবে অভিমানের সেই জলকণা।

নিঝুম ভাবের টানাপোড়েনে পড়ে মনে মনে সাজিয়ে রমা নিজেই এর উত্তরখানাকে ঠিক কোরে নিতে পারলো নিজেরই জন্য।

ভাবনায় আকুলতি করা সে উত্তরটি নিজের মনেতেই পেয়ে যাওয়ায়—মধুর হাসিতে নেচে উঠলো রমার চারধার ঘিরে রাখা—নির্জনতার নিরালা মতো সাজখানা নিয়ে। মাখিয়ে দিয়ে গেল তারই রঙ্গরাগ ছাপিয়ে সুন্দর হওয়া মধুরিমাকে। তারই রূপতরঙ্গিমাকে।

যেখানে রমা বসে আছে, তার সামনে দিয়ে বারান্দার রেলিঙ্‌ ধরে নীচের বাগান থেকে লতিয়ে লতিয়ে উঠে এসেছে মাধবীলতার সুমসৃণতায় কোমল লতা-জাল।—বেশ অনেকটা জায়গায় লতিয়ে লতিয়ে নিয়ে শেষ হয়েছে ঘন হোয়ে!

ওরই থেকে মাধবীর কয়েকটি সরু সরু লতা রমার সামনে হেলে পড়ে মৃদু-মন্দ বাতাসের পাতলা থাকা ঝাপটার মধ্যে অল্প অল্প দোলা পেয়ে দুলছে। ঝুলছে। নাচছে।

আর এই অবস্থার নির্জনতা ছাপিয়ে তখন আস্তে আস্তে সন্ধ্যা—তার আঁধারকে তুলে আনছে খুব ঘন কোরে। ছন্দে ছন্দে সুষমায়িত করিয়ে। নীল নির্জন আঁচলে ঢাকতে ঢাকতে।

বারান্দার খোলা পরিবেশের মধ্যে ওপরের সিলিঙ্‌ থেকে ঝোলা ঝালর-বাতিরই একটি অল্প শক্তির নীল আলো জ্বলতে জ্বলতে—ছড়িয়ে পড়ছে চারধারে। বাইরে যাবার আগে মা নিজেই ঐ আলোটাকে জ্বালিয়ে দিয়ে গেছেন।

বেলোয়ারী কাঁচের ঝালর বাতি থেকে ঝরে পড়া নীল নীল আলোর—ঐ ম্লান

দ্যুতি বেশ একটা মায়া মেশানো পরিবেশের সৃষ্টি কোরেছে। নীল নামের নির্জনতা যে শুধু এক কাব্যিক অনুভূতিমাত্র নয়,—এই তাকেই এখনকার মুহূর্ত স্বাক্ষরিত করাতে পেরেছে। ঝকমকিয়ে। ঝলমলিয়ে।

মাথার ওপর দিয়ে, আর গালের তুলতুলে আভাকে সামনে হেলে পড়ে ছুঁয়ে থাকা মাধবীলতাগুলোর মধ্যে থেকে বেছে বেছে—একটা সরু চিক্‌চিক্ করা লতাকে হাতের নরম মুঠোয় ধরে নিয়ে—রমা আনমনা থেকেই আপন হাতের সুবলয়িত রূপের মধ্যে লতনোর মতো কোরে জড়াতে লাগলো। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে অপলক দৃষ্টিতে নিজের সাজ করা পোশাকের, আর প্রসাধনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, বারে বারে। অপলকে। নিশ্চলতায়।

মায়ারাগ ছোপানো কাজলের রেখায় টানা নয়নাভিরাম হোয়ে ভাসা ভাসা দুটি চোখ দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো—নিজেরই বর-অঙ্গখানার—নরম নরম রুচিরা ঘিরে করা—প্রসাধনেতে সুরভিত রাখা বেশ-বিন্যাস। আর তারই নিখুঁত হওয়া পরিপাটি রূপকে। আপন শরীরের যৌবন-ঢাকা এই রূপসজ্জা দেখে বড় সপ্রতিভা হোল রমা।—খুবই পরিপাটি করা দেহেতে আবরিত রাখা এই অভিসারিকার মতো আজকের—এই সাজ-গোজখানা। গায়ের রুচিরায় রঙ্ লাগাবার জন্য জড়িয়েছে গাঢ় ক্রীম কালারেরই ঝিলিমিলি ভবের আভা লাগানো—কাশ্মিরী রেশমের শাড়ী।—বিয়ের মাস চারেক পরেই গত মাসে রমার চব্বিশ বছর পূর্ণ হয়। রমেনের মা তারই আদরের বধূ-রত্নাটির জন্মদিনটিকে স্মরণীয় করার জন্য সেদিন আশীর্বাদ মাখিয়ে এই শাড়ীটি দিয়েছিলেন।—আর প্রিয়ার জন্মদিনটিতে মায়ের দেওয়া এই ক্রীম কালারের ঝল্‌মল্ করা রেশমী শাড়ীখানাকে—রমেনের নিজেরও হয়েছিল খুবই পছন্দ মতো।

আজ রিমঝিম করা সন্ধ্যার পুরোপুরি আঁধার দিয়ে ঢেকে না দেওয়ার আগেই—রমার পরনের শাড়ীটির ক্রীম রঙের জৌলুসকে শত গুণে প্রজ্জ্বলিত করিয়ে তুলেছে—সুইস্ সিল্কের টুকরো কাপড় থেকে তৈরী করা—নতুন এক ডিজাইনের এই "বোট-নেক্" গলার ব্লাউজখানা। ব্লাউজের রঙ্‌খানা হোল চক্‌চকে লাল। আর সেই সঙ্গে খুবই গাঢ় ভাবে হয়েছে রাঙানো।

রূপবতী দেহের সাজখানাকে পরিপাটি কোরে শেষ করার পর, বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—এ পাশ আর ও-পাশ ঘুরে-ফিরে দেখেছিল। মধুরিম করা প্রসাধনী রূপকলাকে সযতনে সারার পর—ওভাবে অঙ্গরুচিকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে দেখতে অপরূপ তৃপ্তির আমেজ মেশানো হাসির ঝলকান খেলে গেছিল—রমার দেহের প্রতিটি যৌবন ঘন বাঁকেতে। অঙ্গে আর প্রত্যক্ষে। রূপে আর অপরূপেতে। তারই রেশ ধরে রমার মুখের লাল হাসি সব চেয়ে বেশী প্রগল্‌ভ হোয়ে ঝরেছিল আয়নাতে প্রতিফলন দেখে দেখে—নিজেরই শরীরী সৌন্দর্য্যের অনিন্দ্যতা দিয়ে গড়া, মধুরে রম্য বুকের—বড় বেশী শোভাময় ও লাজহীন মূর্ছনার ছন্দেতে ঘেরা, ওঠা আর নামায়—ছবি হোয়ে পর্য্যায়িত থাকা—নরমে আর পেশলে। এরই বর্ণ ঘেরা ছবি ধরে লাল রেশমের আবরণের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে প্রিয়া যুবতীর

লীলাচাঞ্চল্যে বিভোর অতিশয়-সযতনে-কাঁপা-গোপন হৃদয়না। নিজেরই হাতে তৈরী করা এই ব্লাউজখানাকে ইচ্ছে কোরেই রমা টাইট্ ফিটিঙের মাপে মাপে কেটে— ঘন ঘন প্লিট্ ভেঙ্গে সেলাই করার দরুণই—হোয়েছিল আঁট-সাঁট গঠনে রূপায়িত। এটি অবশ্য বিয়ের আগেরই করা।

রমার আজ শখ হোয়েছে—কবি জয়দেবের কোমল-কান্ত-পদামৃত কাব্যেরই সেই শাশ্বত নায়িকা-রূপী উত্তমার মতো—রঙে-রসে-সুরভিতে— রূপনির্ঝর হোয়ে সাজবার জন্য।

সেজে আর সাজিয়ে শখ মেটাবার পর—রমা নিজের প্রসাধিত দেহে ফোটা চোখ জুড়িয়ে আনা রূপের সাগরে স্নান করাতে চাইলো—অতি সুজনকে আর প্রিয়ায় একাত্মক—রমেনকে। মঞ্জুলিক স্বামীকে।

আয়নায় প্রতিফলিত থাকা এই ছন্দিত সাজের দিকে আবার তাকালো রমা। একে তখন ছিল নিরালায় ঘেরা শান্ত পরিবেশখানা। তায় আবার হোয়ে আছে নির্জনতায় নিঝুম। তারই মধ্যে রমা দেখলো, আর দেখতে দেখতে কোরল অনুভব যে—বুকেতে আঁট কোরে বাঁধা ভেতরের শ্বেত-শুভ্র বক্ষবাস সুমসৃণতায় ঝক্মক্ করা লাল রেশমেতে হোয়ে ওঠা নিরাবরণারই মতো—রূপের ঝিলমিলে আভাকে ভেদ কোরে বেরিয়ে এসেছে—যুবতী বুকের শ্রেষ্ঠ ও সুষম রীতির সৌন্দর্য্য সমেত। ক্রীম রঙ্ আঁচলখানা আড়া-আড়ি ভাবে বুকেতে রাখায়—নীচেকার লাল ব্লাউজ আরো লাল রঙ্ নিয়ে ঝল্মলাতে পেরেছে—তারই ভেতরের—বাস-কুঞ্চলিকারই তুহিন শুভ্রতায়। এ রূপ, এ সুযমায়িত মাধুরীধারা—ত্রয়ী আবরণিকারই এক-দুই-তিন পাক নিয়ে—জড়ানো আর সাজানো। ঐ তালে তালে লাজকণায় ভরিয়ে রাখা—ওঠা আর নামা করা বুকেরই যৌবনাভার সমেত। "বোট্ নেক্" গলার কিনার দিয়ে বিভাসিত না হোয়ে পারে নি তাই নিটোলতায় হওয়া পেশলিত— আর আপীনতায় থাকা সুমিত রীতিকায় ফোটা—এক শৈল্পিক অভিব্যক্তি।—যা রূপের মান নির্ণয়ে অশেষ রকমে একই সমতাযুক্ত দুটি পারিজাতের—চরমতম সপ্রগল্ভতা ছাড়া আর অন্য কিছুটি নয়। সেই রীতিরই নীতিমাফিক রমার বুকের ওপরকার মধুময় ছন্দে ছন্দে সৃষ্টি করাতে পেরেছে—রাঙা এক সাগরেরই দারুণ হোয়ে দেখা দেওয়া হাজার তরঙ্গ-দোলায় দোল খাওয়া—লাল আভাঙ্কিত স্তনশোভাকে।"That warm, white, lucent, million-pleasured breast"—আজ সত্যি হোয়ে উঠেছে রমার মধ্যে—টার্নড্ রেড্।—তাই দেখে রমার মনে গুনগুনিয়ে উঠলো—মহাকবি কীটস্ তাঁরই প্রিয়া শ্রীমতী ফেনী ব্রনেকে যা শুধাতে পেরেছিলেন—সেইটাই।—আর যেটা নিয়ে রমেন প্রায়ই শুধায় বহুত মিনতিতে রমার প্রতি—

"Unmasked, and being seen,—without a blot!
Oh! let me have thee whole,—all—all—be mine!
That shape, that fairness, that sweet minor zest
Of love, your kiss,—those hands, those eyes
divine"....

সত্যি, সত্যি রমাও ত জানে—তার শরীরের রঙ্খানা হোল ধপ্ধপে শুভ্র। ওরই মধ্যে আছে লালচে আভা মাখা একটা সোনালী মিশ্রণ। তাই রমার মনে পড়লো—টাহিটি দ্বীপের সেঁই নিরাবরণা আর নিরাভরনা যুবতীদের—যাদের টাটকা রূপ আর মাধুর্য্যঝরা দেহ-সায়রে ধাঁধিয়ে উঠে—শিল্পী পল গ্যঁগার মনে হোয়েছিল—এটি হোল—গোল্ড্ অফ্ দেয়ার বডিজ।—সত্যি, সত্যি, আজ রমার শরীরী রুচি নিয়ে ফুটে উঠেছে—শুভ্রতায় নাচা ত্বকের সুমসৃণতায় সোনা-রঙ্-খানার লাল হোয়ে থাকা।—গোল্ড্ অফ্ হার বডি টার্নড্ রেড্।—বুকের ওপরের সুষমায়—লালে-সোনায় দোল খাওয়া থেকে ছন্দে ছন্দে ওঠা-নামা করা পীনোন্নতায়—কাঁচুলী পরা শ্রীমতী রাধা আর এই রমা বন্দ্যোপাধ্যায়—ইতিহাসের ঐ একজনা আর বর্তমানের ও—এই দু'জনায় মিলে-মিশে লীন হোয়ে গেছে—যুবতীরই ঋতুসাজ ধরা অভিসারিকা বেশের চিরন্তনী স্বত্বাখানার মধ্যে। ওদের আবহমানকালের রীতিই যে হোল—যৌবনায়ন করা দয়িত যুবকদের তৃষা জড়ানো চেখের মীনপিয়াস পূর্ণ করাবার জন্য—আনন্দ-লহরদলের সৃষ্টি করানোটা।

তাই মনে হওয়াতে আয়নার কাছ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিল রমা এক লাজুকা তনয়ার মতো—খুশীরই গমকে কাঁপন ধরায়। চোখে-মুখে তার ক্ষণেকের জন্য সলাজ থাকা ছন্দখানা আবীর কোরে তুলেছিল। ওদিকে রমার হাতের মুঠোর মধ্যেই—এখনো পর্য্যন্ত ধরা ছিল রেশম আঁচলখানা। এবার মধুর ছবির মতো—বুকের ওপরকার লজ্জাধারার মধ্যে নিলাজতায় উপ্ছে উপ্ছে পড়া—দুই প্রগল্ভতাকে আবরণ টেনে দিয়ে লুকোতে চাইল—বাম কাঁধের ওপর দিয়ে তুলে নিয়ে পেছনে ফেলে আঁচলখানাকে পিঠেতে ঝুলিয়ে। আঁচল—সুউঁচু বুকের উত্থান আর পতনের ছন্দ থেকে গড়িয়ে পড়লো। কিছুতে ঠিক কোরে রাখা যাচ্ছিল না। তুলতুলে রেশম সেখানকার অতি আপীন থাকা যৌবনের গমককে সহ্য কোরতে না পারার মতোই পিছলিয়ে যাচ্ছে খালি।—এর কারণটা অবশ্য টের পাওয়া গেল অল্প একটু পরেই। ওদিকে তখন রমার মাথার ওপরেতে পুরো দম দিয়ে চালিয়ে রাখা পাখা বন্ বন্ করা গতি নিয়ে—মাতাল বাদুলে বাতাস হোয়ে যাওয়ায়, দমকা বাতাসকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে চলেছে। রমার বুঝতে বাকি থাকলো না যে—ওর বুকের লাজকে নিলাজ করাতে ওই চলমান পাখাটিই কোরছে সাহায্য। তারপর পুনরায় তাই আঁচলখানা নিজের হাতে তুলে ঠিক কোরে রাখার পরমুহূর্তেই বাতাসের দাপটে তাকে সামলানো খুবই মুস্কিল হোয়ে উঠছিল। শেষে বাধ্য হোয়ে রমাকে পিঠের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে, পেছন থেকে আবার সামনের দিকেতে আঁচলখানাকে টেনে এনে—বেশ শক্ত ভাবে কোমরের নীবিবন্ধের বাঁধনের সাথে বাঁধতে হোল, গাছ-কোমর কোরে।—ফলে বুকের নিলাজ ভাবখানা আবার আগেরই মতোই প্রকাশ পেলো—প্রকটে, পেশলে। এবারে শুধু একটা রঙ্ নয়। দু' দুটো রঙ্ ছাপিয়ে বুকের ঐ অনিন্দ্য শোভা—প্রসাধিত পোশাকের আড়ালে আড়ালে থেকেই—আভাস দেখিয়ে বেরিয়ে আসার তালে তালে ঝিকিমিকি করা রূপ নিয়ে সাজলো। সবার নীচে হলুদ-সোনায় ঝলস্ দেওয়া ত্বক্-যৌবনেতে—নিটোল কোরে জানো শ্বেত-শুভ্র বক্ষবাসখানার সুচিকণ

বাঁধন। তার ওপরে আঁট করে ছন্দ নিয়ে ঝলক্ ছড়ানো লাল ব্লাউজ। আর তারও ওপর দিয়ে আড়া-আড়ি ভাবে পড়ে থাকা ক্রীম রঙীন শাড়ীর মোলায়েম পরশ নিয়ে বুলানো আঁচলখানা। আর এই শেষের দুটি অঙ্গরাখার লাল ও ক্রীম্—এই দু ধারারই জৌলুসখানা ছিল—বেশী রং মেরই ঘন। প্রখরেতে প্রজ্জ্বল। স্বভাবেতে উজ্জ্বল। শরীরময়তায় ঝল্মলে।

দরজা বন্ধ ড্রেসিঙ্ ঘরের মধ্যে তাই সাজখানা পরিপাটি ভাবে শেষ করার পর, দুর্বল শরীরে সহাস সুখের ছন্দ ফুটিয়ে—রমা নাচিয়ে তুলেছিল নিজের যৌবনসৌরভকে। তাই দেখে দেখে, তার টানা টানা চোখ থেকে আনন্দধারা ঝরে ঝরে পড়তে লাগলো। সেই আনন্দের বিভাস তার প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত থাকতে চাওয়া কণিকায় কণিকায় ঢেলে দিয়ে যাচ্ছে—এক সুছন্দিত শক্তির উচ্ছলতাকে। দেখতে দেখতে আনন্দের এই সজীবতার কাছে—শরীরের দুর্বল থাকা রূপটুকুন হোতে পেরেছিল অদৃশ্য।—তারই থেকে রমার শরীর আর মন ভরিয়ে—আনন্দধারার সুখময় ঢেউ ওঠানামা কোরে দোলা দিয়ে গেল। ওর শিহর সত্যি বড় পুলক জাগায়। গমকঝরায়। সহাসে রাঙায়। কত সুখ তার। কত রূপ তার। কত খুশী তার।

কত সুখ। কত রূপ। কত বিভোরতা।—সবই ত' এনে দিয়েছে তারই জন্য তার স্বামী সুজনক—এই রমেন। যদি ও—অচিন কোন দেশের নাম না জানা পাখীর সন্ধান চায়—তাও বোধ হয় এনে দিতে পারবে প্রিয়ারই সুখের জন্য—এই রমেন।

সত্যি। সত্যি। সত্যি এই মায়ারাগ দিয়ে ঢাকা—বিজন প্রহরান্তর ধরে এগিয়ে থাকা নিরালার যত কিছু ভাব, যত কিছু প্রভাব—তা ত' রমেনের জন্যই উঠেছে ফুটে—নিঝুম নিঝুম নিরুপমতায়। তাই ত' রমার অঙ্গরাগ ঝলক্ দিয়ে সাজিয়ে তুলেছে—রূপে-রসে-সৌগন্ধে ফোটা—নির্জনা রঙ্গরাগখানাকে।

ওরই আদরের রমেন এই রূপের মধ্যে, এই মাধুরীর মধ্যে হাসিতে উচ্ছল থেকে অবগাহন কোরে—মুক্তিস্নান কোরবে।—আর রমা তখন তার প্রিয়তমকে সোহাগ ভরিয়ে আপন সৌন্দর্য্যের মধ্যে মুক্তিস্নান করিয়ে—নিজে সুখী হোয়ে—খুশীরই ছোঁয়ায় ধন্য হবে। তার ভালোবাসা যুক্ত হোয়ে উঠবে অশেষ গরিমায়। তাই রমা এই মুহূর্তে নির্জনে থাকা নিঝুম ভাবাবেগকে কাটিয়ে রেখে—খিল্ খিল্ করা হাসিতে—হোয়ে উঠলো সালঙ্কৃতা।

দেহের রঙ্গরাগ রমার যৌবনাঙ্গের সর্বত্র রিমঝিম কোরে নাচতে লাগলো—কোন এক রভস ধরনো আনন্দ-সায়রেতে রূপখানা পরিগ্রহণের জন্য। অবশ্য সে ধারার রভসানন্দ এখনো এসে পৌঁছয়নি। আসবে বলেই—আসি আসি কোরছে। সুরেলায় সাজনো এক নৃত্যকলায় পটিয়সী যুবতীর মতো—সেই সুরীতিকার নূপুর-ধ্বনির মধুক্ষরা শিঞ্জিনী তুলে এগিয়ে এসে মিলিত হবে।—

তাই নির্জনতাকে দোলা দিয়ে অস্ফুট স্বরে রমা বললো চন্দ্রমল্লিকার মতো সৌরভ নিয়ে ঝরা মদিরা মাখানো হাসিটিকে অধরের কানায় সাজিয়ে—এই রমেন। এই খুশী। কেন দেরী কোরছ এসে পৌঁছতে? এসো তাড়াতাড়ি। তোমারই জন্য যে তোমার এই রমা তার বুকেতে পেতে রেখেছে তোমারই হৃদয়ের সিংহাসন। দেখ না একবারটি

এসে,—এই বিদিশা রাঙা সন্ধ্যায় কেমন কোরে সাজিয়ে তুলেছি আমার এই অবস্থাকে, সত্যি.সত্যি। এখনি এসে পড় কাছটিতে, এই রমেন? এখন এসে দখল কর তোমার রাজার আসনটি। রাজা তুমি! জান না? না, তার চেয়েও তুমি বড়। তুমি আমার প্রাণেরই মধুর স্বত্বা। আমার ভালোবাসার দেবতা। তাই বলে আমি কিন্তু দেবী নই। আমি হোলাম তোমারই অন্তর্লীনা। তোমার অভিষেকে হওয়া রাণী। শুধু তোমারই রমা। রমা আর রমা।—আরো অনেক কিছুই হয় ত' এইভাবে মোকাবিলা কোরত অস্ফুট গুঞ্জন তুলে। কিন্তু তেমন কোরে কথা নিয়ে আরও এগিয়ে যাওয়ার পথেতে সতীনের মতো বাদ সাধলো—লজ্জা। ছিঃ, ছিঃ, বড় প্রগল্‌ভা হোয়ে উঠেছে রমা।—তাই না! নিজেকে তাই এমন প্রশ্ন কোরল রমা।

রমার হঠাৎ লক্ষ্য হোল নিজের বাঁ হাতেতে জড়ানো মসৃণ মাধবীলতাটির দিকে। তার খেয়াল ছিল না, ভাবাকুল থাকার মধ্যেই কখন যে সেই লতাখানা লতিয়ে লতিয়ে জড়িয়ে ধরেছে হাতের অনেকটা ওপর পর্য্যন্ত। মোটামুটি ভালো রকমেই শক্ত কোরে ধরেছে। রমার মনে পড়ে গেল তাই মুখের মধ্যে আবীর মাখাতে মাখাতে—একটি লাজ ঘেরা কথা।

—রমেনের পুলক ঝরানো বুকের কঠিন আলিঙ্গনেতে একবারটি আশ্রয় পেলে পর ত'—এই রমাও ঐ মাধবীলতাখানার মতন কোরেই—জড়ায় প্রিয়কে। ও-ও যে তখন স্বামীর সুখ-ঝরা বুকের ওপরে না হোয়ে পারে না—দুষ্টু মাধবীলতাটি! প্রাণের প্রিয় সুজনের বুকেতে কঠোর বাঁধনেতে নিজেকে সমর্পণের মধ্যে বন্দী থাকাটাকে উপেক্ষা কোরে—সজোরে নিজের হাত দিয়ে আর পা দিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে ধরে নিয়ে—সমস্ত সময়ের জন্যেই যেন—রমা রাখতে চায় অলিঙ্গনের মধ্যে—আটকে।—তারপর শেষ পর্য্যন্ত ভালোবাসায় ক্লান্ত হোয়ে ওঠা রমেন তাকে নিজের কঠিন বাঁধন থেকে মুক্তি দিলেও,—রমা কিন্তু তাকে নিজের নরম নরম দুটি সুবলয়িত হাতের বাঁধন থেকে মুক্তি দিতে চায় না—সহজে।

ঐ তেমন ভাবেতে রমা এখন তার হাতের পেলবতা ঘিরে জড়িয়ে থাকা—সেই তন্বী সোনার মতো চিক্‌চিক্ করা লতাটিকে ছাড়িয়ে না দিলে,—সেই লতা কিন্তু আপনা থেকে কিছুতেই ছাড়তে চাইবে না তার হাতেতে জড়ানো অবস্থাকে। জড়িয়ে জড়িয়ে থাকবেই সে ছড়িয়ে। সত্যি মাধবীলতা হোল বড় দুষ্টু স্বভাবের লতা। সঙ্গে সঙ্গে ঐ প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার আরেকটি কথা মনে হওয়াতে—রমার মদালসা থাকা মুখে রুচিরা রাঙা হোয়ে উঠলো—রুমঝুম তানে মাতা সন্ধ্যার অনুরাগ ভরা নির্জনতা ছাপিয়ে।—কথাটা হোল—লতাবেষ্টিতক্! শুধু তাই নয। আরো কয়েকটি মধুর হোতে সুমধুরিক কথার রণন জাগলো,—যৌবনায়নী ভালোবাসার রূপধৃতির অভিনিবেশেতে। তাদের অনেক পরিচিত। অনেক প্রভাস। বহুল প্রভাব। হরেকরকমবা সুখ দেওয়া-নেওয়ার কারুকলা ফোটায় আর সাজায়—ছোট ছোট প্রণয়াচারের ঘন-সন্নিবদ্ধ ছন্দে আর যতিতে ঘেরা—এক একখানা গীতি-কবিতার মতো। ঠিক যেন ভালোবাসা জানানোর আর দেওয়ানোর ঋতুতে ঋতুতে ঝল্‌মল্ করা—লিরিক্যাল্ ব্যালাড্! প্রণয়াচারের শিল্পকলা। আর্ট য়্যাড টেক্‌নিক অফ্ লাভ—

থ্রু ওয়র্ম য়্যাম্‌ব্রেসিং। তিল-তণ্ডুলক করা আলিঙ্গনাদির শৈল্পিক-সম্ভার সমূহই—হোল তাই। আর তাই এর নামও রয়েছে অনেক। মনে পড়লো রমার তাই একের পর এক—বৃক্ষাধিরূঢ়ক। ললাটিকা। ঊরূপগূহণ। ক্ষীরনীরক! আরো অনেক নাম। আরো অনেক কথা! এই নির্জ্জন মুহূর্তে নিরালা ছাপিয়ে এক এক কোরে রমার মনের খুশীর সাথে মোবিলায় ঐ সব নামের অভিধা ব্যঞ্জিত হোয়ে উঠলো—ছবির পর ছবিতে। ভালোবাসায় যুগপতে সঙ্গত থাকার ঋতুবিপর্য্যয়ে যৌবনায়ন করার—শৈল্পিকতায়, তারই আর্ট, আর তারই টেক্‌নিক বিবর্ধনেতে।—অবশ্য নির্জনতার মায়ারাগে স্নান কোরতে কোরতে—রমা অতি স্বাভাবিক কানুন বলেই—প্রিয়তমর অবর্তমানে অতি নিলাজিতার মতো—বিশদ ভাবে প্রণিধান না কোরে পারলো না—এই সব নামের অন্তরালে থাকা ব্যাপ্তির খুশীয়াল করা রূপ-পরম্পরাগুলোকে।—অবশ্য প্রাণাধিক আর সুজনক রমেনই—তার প্রিয়াকে বহু বিদিশার অন্ধকারে আর শ্রাবস্তীর সন্ধ্যায়—আলোর চাইতে অধিক আঁধারে—যৌবন দিয়ে যৌবনেরই লাজহরণ করা রিমঝিম মুহূর্তগুলোতে—ভালোবাসাবাসির মধ্যেই জানাতো আর বোঝাতো—আপনার প্রিয়ংবদ পরিচিতিখানাকে সরব মুখরিত রেখে রেখে।—তাই আজ এই নিরালার নির্জনা রঙ্গরাগ প্রাণ ভরিয়ে আর মন উপছিয়ে মাখতে মাখতে—খুবই নিলাজিতা বধূটির মতো ঝলমল কোরে হৃদয়ঙ্গম কোরতে চাইল। একে একে।

—আদরের রমেন যখন তাকে নিজের কোলের ওপরে দুষ্টুমির ভেতরে বসিয়ে রেখে, সুখের জোয়ারে ভাসতে ভাসতে পরস্পরের সুমধুরিক হোয়ে ওঠা মুখরুচিরার পানে তাকিয়ে—মুখোমুখি শোয়ার পর—রমা নিবেদন কোরতো প্রিয়র প্রতি প্রিয়ারই প্রত্যালিঙ্গনখানাকে—সহাসে আর নিলাজে।তারপর যুগপতে তারা আপন আপন সক্রিয়তার রীতি ধরে নিজেদের বন্দী অবস্থাখানাকে এমন কঠিনতার নাগপাশেতে জড়িয়ে জড়িয়ে বাঁধার-চেষ্টা কোরতো—যার দরুণ রমার মনে হতো—দুজনেই যেন দুজনারই সমগ্র শরীরাভ্যন্তরের আকার ঘেরা আড়ালে আড়ালে—পড়েছে পীনোদ্ধ হোয়ে।—অনুপ্রবেশিত হোয়ে।—প্রিয় তারই প্রিয়াকে—তার পরে বুঝিয়েছিল—এরই রূপখানার নামকরণ করা হয়েছে—'ক্ষীরনীরক'। মানে ক্ষীর ও নীর। কী, সুন্দর নয়? কী, মধুর নয়? এই, বল?

—আবার আরেক রীতিকারই সযতনে প্রণয় নিয়ে মাতামাতি করার ঋতুবিবর্ধনেতে নেমে—কখনো কখনো প্রিয় চাইতো—তারই প্রিয়া নিজে থেকেই এই সলাজ কেড়ে নেওয়ার কারুকাজে হোয়ে উঠুক—সক্রিয়া। মঞ্জুলেতে অপার নিলাজিতা। তাই—আরামঝরা, আর লাজ কেড়ে নেওয়া বিছানার খুশীময়তার অনুরাগেতে পাশাপাশি ভাবেতে শায়িতা থাকার পর—একে তারই অপরার সাথে একযোগে অধর থেকে অধরের তীরে তীরে—চারখানা কাঁপা কাঁপা ঠোঁটের মিলনে মিলনে পাতাবে—"রাঙা হাসির বাসর শয়ন"। তার পরে একজন তারই আরেকজনাকে সুবলয়িত হাতের সঘন করা বাঁধন দিয়ে বাঁধতে বাঁধতে—ঘন করানো বাঁধনখানাকে বিন্দুমাত্র আল্‌গা না করাতে দিয়ে—পরস্পরের বুকেতে বুক, কপোলেতে কপোল—আর সর্বোপরি একের ললাটের সাথে অপরের ললাট ছুঁয়ে

ধরে—ঘষতে ঘষতে বিরোধ করার মতো ভাবরাগ ফোটানোর এই কারুরূপখানার আভিধানিক নাম প্রসঙ্গে—প্রিয়াকে রমেন জানিয়েছিল—ওগো মধুর, ওগো সুজনা। এরই নাম 'ললাটিকা'।—আর, আর তারা বুঝেছিল যে—এই বিশেষ কারুকাজখানা সমাধা করার রিমঝিম মুহূর্ত্তটিতে—প্রিয়াকেই হোতে হবে—সব থেকে সক্রিয়া।

আরো মন-মদির কোরে রাখা আলোর রূপ-মহালেতে প্রণয়াচার নিয়ে মিথুন সাজের অধিবাসেতে মশগুল থাকাকালীন—প্রিয়র বুকের খুশীনির্ঝর বাঁধন পেয়ে—আলিঙ্গন সুদৃঢ় করার মুহূর্তে সবিশেষ ধারাই আরেকখানা রীতিকর সম্পর্কে—সংস্কৃত পণ্ডিতেরা যা বলে গেছেন—তারই আকার ফোটাবার জন্য—রমা হোয়ে ওঠে আপন সুজনকের যৌবন-সায়রেতে—বড় বেশী রকমে—সক্রিয়া। আর সচলতায়—অলাজুকা। গতিময়তায়—অস্থির বিজুরিকা। কভু নাহি যেন মানে থির বিজুরী! রমা ত সেই সব আলো ঝরা সুখলোভীলগ্নগুলোতে—হোয়ে ওঠে তাই। যদিও চেহারায় একেবারে গোরোচনা সোনালী রঙ্ নিয়ে বিভাসিতা নয়—তবু কিন্তু রমা স্বভাবে অস্থিরা থাকতেই ভালোবাসে—তেমন তেমন মিথুন গোনা প্রহরে প্রহরে—যৌথ ভাবেতে যৌবনকে দীপায়ন করারই জন্য।—এই তারই অয়নে—দীপ জ্বালার মতো কোরে রমা লাজহরার ভাব-বিহ্বলতায় মনে কোরল—কোন কোন সময়ের পারে অযোধ্যার সন্ধ্যা থেকে আরম্ভ কোরে মালবের রাত্রি পর্য্যন্ত— কাঁপাতে কাঁপাতে—হঠাৎ এক তীব্র আলোর দ্যুতিতে ঝলস্ লাগিয়ে যখন তারই প্রাণাধিক রমেন—বাসকসাজ নিয়ে প্রিয়ার সামনে মুখোমুখি ভাবে দাঁড়াতো,—তখন রমা দেহের হিলোল ঘেরা ছান্দস্ বাঁকে বাঁকে দুষ্টুমির রঙ্ নাচাতে নাচাতে—প্রিয়তমর পায়ের পাতার ওপর নিজের একখানা সুমসৃণ পা রেখে দাঁড়ায়।—আলতা মাখা গোড়ালিখানা একটু উঁচু করে তুলে ধরে। ও ভাবে দাঁড়াবার পর রমা তার আরেকখানা পা দিয়ে কিছুটা উঁচুতে উঠিয়ে জড়িয়ে ধরতো—রমেনেরই আরেকটি পায়ের জানু পর্য্যন্ত।—ঠিক ঠিক, একখানা বেতস লতারই মতো! তবে পুরোপুরি নিলাজিতা হোয়েও আরেক ধারার নিঝুম নিঝুম লাজের ছোঁয়ায়—প্রিয়র দেহের সাথে আশ্লিষ্ট থাকার মধ্যেও—একটু বেশ সামনে থেকে পেছনে হেলে পড়ার মতো কোরে নুয়ে থাকতো রমা—আপন সুজনকেরই দেহের কিনারা থেকে মাত্র কয়েক মাত্রা নীচেতে—ঠিক ঠিক প্রিয়র অধরের দামাল থাকা সিক্ত ছোঁয়া থেকে—আপনার সমস্ত মুখখানাকে হঠাৎ ঝড়ের টানাপোড়েনে, মুহূর্তেই চায় না যেন বিপর্য্যস্ত করাতে,—কাজলে-কুঙ্কুমে-লৌধ্ররেণুতে—আর লাল ওষ্ঠরঞ্জনীর সব রঙ্কে—এখানে সেখানে একাকার না করাবার জন্য! তাই নিজের মুখখানার অবস্থান থাকে প্রিয়র মুখের সন্নিধি থেকে—অনেকটাই নোয়ানো। ফলে প্রিয়কে একটু শান্ত রাখা যায় ঐ ভাবের ব্যবস্থায়। তাই বলে রমা কিন্তু থাকে না নিশ্চুপ হোয়ে!—রমা তখন—মাটি থেকে গাছেতে আরোহণ করার কৌশল দিয়ে রমেনের শরীরী যৌবনকে পেশলিত দুই হাতের নরম নরম বাঁধনে বেঁধে ওপরেতে উঠে উঠে—সচেষ্ট হয় প্রিয়র তিয়াস জড়ানো অধর ছাপিয়ে নিজের লাল লাল ঠোঁটের টান-ছোঁয়াচে—চুমার ঘন করা আলপনায়—সাজাতে আর রাঙাতে।—তাই প্রিয়তমকে ও ভাবেতে সাজানো আর রাঙানোর জন্য—রমা যে সুরীতির রেখা

ধরে আলিঙ্গনের মধ্যে শ্বাতায়ন করাতে পারে প্রণয়াচার সমূহ—তারই নাম হোল—"বৃক্ষাধিরূঢ়"।—ওকে রমেনই জানিয়েছে এই নামখানা। মধুরে-সুন্দরে মিশিয়ে। মিলিয়ে।

এই ভাববিভোর নিরালায়—নিলাজ ঘেরা মিথুনবাসরের কথা ভাবতে ভাবতে চলার পথে—চারধারের নির্জন রঙ্গরাগ থেকে মুঠো মুঠো লাজকণায় আবরণ পেয়েও—বারণ না মানার মতোই নিলাজিতা বধূটির রঙীন গরিমায় নাচানাচি করার মধ্যে, শেষাশেষি রুমুঝুমু ভাবে উঁকি দিয়ে গেল—এই ভাব-সমারোহেরই সমাপ্তি টানার পরিপ্রেক্ষিতে আরেকখানা কারুকাজ।—যা "লতাবেষ্টিতক" নামেতে নামী থেকে—রমাকে এই মুহূর্তে নিজেরই হাতের কব্জি পর্য্যন্ত জড়িয়ে জড়িয়ে ওঠা—সেই চিকন-সরু সোনার মতো চক্‌চক্ করা মাধবীলতাটির প্রসঙ্গ ধরেই উঠতে পেরেছে—তারই প্রিয়া পরিচিতির সুসমঞ্জস লীলাময়তায় মাতামাতি কোরে। সঙ্গত থাকা দুষ্টুমিরই রঙ্-গভীরতায়।—শেষ পরিক্রমার ভাববিভোরতা রমার মন ছাপিয়ে মদালসার মতো মধুরিম হোয়ে মাখতে মাখতে—আর তারই সঙ্গে নিলাজ হোতে হোতে ভাবল—সময় বিশেষে প্রিয়াকে আলিঙ্গনেতে টেনে নেবার মুহূর্তে—রমেন হয় ত' বা ঘরের মোজাইক্ করা মেঝেতে থাকতো সোজা হোয়ে দাঁড়িয়ে, আর নয় ত' বা আরাম করার মতো শোয়া অবস্থায়—দোদুল থাকা বিছানার শুভ্র ফেনিলতায় টান টান ভাবে ছড়িয়ে রাখতো নিজেকে।—তখন কৌশলী তৎপরতায় রমাকে সক্রিয় হোয়ে, ঠিক ঐ মাধবীলতাটিরই মতো রমেনের যৌবন-দেহকে জড়িয়ে জড়িয়ে ধরে উঠতে হয়, আর আপনার সুষমিত থাকা বুকের দু'ধারার পুষ্প-স্তবকের পীনোতায় শিহর ছড়াতে হয়—ঠিক যেমন কোরে লতা মাত্রেই তার সামনের গাছটিকে পরম এক নির্ভয়তার আশ্রয় হিসাবে—জড়িয়ে জড়িয়ে ধরে রাখতে পারে। অর্থাৎ নাম পাওয়া ঐ লতাবেষ্টিতকের মানেই হোল—লতারই মতো কোরে প্রিয়া তার প্রিয়কে দুই হাতের নরম নরম বাঁধনের কঠিনতায় বেষ্টন কোরে—আলিঙ্গনখানাকে সুদৃঢ়তায় বাঁধবে। আর ঠিক তারপরের পরিক্রমায় এগিয়ে এসে—প্রিয়তে একান্তে আপনাকে সমর্পিতা রাখার পর—রাগানুরাগে ঝলকানো অধরের লাল ঠোঁট দিয়ে প্রিয়র মুখেতে ঘন ঘন এঁকে দেবে—অভিমান ভরা—চুমার আলিম্পন। আর তখন আনন্দের শিহর সঞ্চারণের প্রতিটি গমক থেকে রমার দেহী যৌবন অকারণে কেঁদে ওঠে।—বিন্দু বিন্দু জলের মুক্তার মতো রূপ—কাজল-চোখের কিনারা ধরে সাজায়—আর ধীরে ধীরে ঝরায়। মুখের লাল লাল হাসির ভেতর থেকেই তখন বেরিয়ে আসে—সুখ পেয়ে অশেষ সুখী হওয়ারই স্বীকৃতি-স্বরূপ—ধ্বনি সীৎকৃতির টানা টানা—রিদ্‌মাস্ লহর-দল।

নিরালা ভাবনা ধরে উজান হোয়ে ভেসে আসে আরো অনেক দাম্পত্য-রূপকলার—মধুরে মধুর আর সুন্দরে নিলাজ—ছবির সারি। রমা ভাবে অনুরাগ থেকে— তার রমেন তাকে প্রায়ই আদর করার সময় শোনায়—"আমার রমা। তুমি আমার সব রকমের সুখ। তুমি আমার খুশীর দেশের রাণী। রমা, রমা, এই মেয়ে।

তারপর রমেনের সে সব কথা শুনতে শুনতেই—রমা খিল্‌খিল্ করা হাসিতে

পড়ত জোয়ার ভেঙ্গে। ঐ অবস্থায় দৃঢ় আলিঙ্গনে ধরা বাঁধনের মধ্যে থাকাকালীন—প্রিয়ার অধরে তীর ভাঙ্গা হাসির জোয়ারে রমেন ভাসিয়ে না দিয়ে ছাড়তো না—দীর্ঘ করা—এক একখানা—ঘন চুম্বন দিয়ে টেনে টেনে আঁকা রেখা!

আর, তারপর থেকে রমেনের টানা অধরের মধুর পরশ ও আরাম ধরানো ছোঁয়াচ—ঝড়ের দামাল বেগে প্রবাহিত হোয়ে যায়—রমার সুন্দর সুন্দর অঙ্গ, ও তারই প্রত্যঙ্গ ধরে। প্রিয়া বরকন্যার ছবির মতো চোখে, মুখে, কপালে, গালে, ঠোঁটে, ভুরুতে, আর বুকের ছন্দে ছন্দে ওঠা-নামা করা ঋতুতে, আর তারই বৃন্তে বৃন্তে, গলার খাঁজে, পিঠের ওপরের সুমসৃণ কাঁধেতে, হাতে, আঙুলে—অঙ্গরুচির মাধবীরাগ থেকে নাচানাচি করা—সমস্ত জায়গাতেই শ্রাবণের বর্ষণ-মুখর দিনের মতো—ভালোবাসায় সাজাতো—রমেনেরই বাদুলে হাওয়ায় হাওয়ায় দোল খাওয়া—দুর্দমতাগুলো।—আর তখন দাম্পত্য রীতিকার পুণ্যশ্লোক ধরে—পরম প্রণয়েতে সজীব থাকা ভালোবাসা জানানোর চিহ্নগুলো—রমেনেরই সুন্দর দেখতে অধরাধার থেকে—এক এক টুকরো আদর হোয়ে ঝরে ঝরে পড়তে থাকে—ঠিক শিলাবৃষ্টির মতো।

হ্যাঁ। আর ঠিক তারপরেই প্রিয়তমর সহাস ভরা মুখের প্রগাঢ়তায় ছন্দিত চুম্বনধারার সঘন হোয়ে স্বাক্ষরিত হওয়া দাগগুলো—সুন্দরী অনিন্দ্যা রমার রূপ-অপরূপেতে অভিষিক্ত থাকা দেহরুচির স্থানে-স্থানে—ভিজে-ভিজে মত অবস্থায়—কাজলে-কুঙ্কুমে-পরাগে-ওষ্ঠ-রঞ্জনীতে একাকার কোরে—উজ্জ্বল হোয়ে উঠতে থাকে—প্রসাধনেরই ওপরে ওপরে। লাল লাল দাগ নিয়ে।

—সত্যি, আর বেশী কিছু রমা ভাবতে পারছে না।—এই এখনি তার আদরের—আর আবদার করার রমেন এলো বলে!

—আর ঠিক তারপরে, নিজের কাছটিতে রমেন এসে পৌঁছাবার পর কী হবে,—সত্যি তারপরের সেই কথাকে আর ভাবা যায় না রমার পক্ষে।—যা ভাববার—তা ওর দুষ্টু রমেনই—এসে ভাববে।

আর ঐ ভাবেতে রমেনেরই ওপর নিজের সমস্ত ভার ন্যস্ত কোরে—পরম ও চরম তৃপ্তি পায় রমা।

সে জন্য, তাই রমার অসুখ থেকে সেরে ওঠার পর—আজ সত্যি সত্যি ভাব-বিহ্বলতার ঢল্ খেয়ে—দুর্বল থাকা অস্বস্তিকে কাটিয়ে উঠতে পেরেছে রমা।

ও আজ সুখী। আদরের রমেন আসবে বলেই হোয়ে উঠেছে আরো সুখী। আরো খুশী। আরও লাজহীনা। সপ্রগল্‌ভিতা।

আজকের সন্ধ্যায়, এখন রমেন এসে পৌঁছানোর প্রতীক্ষায় থেকে, রমার সুখী দেহের মধুক্ষরা রঙ্গরাগ চরম এক খুশীর হিল্লোলে দারুণভাবে নেচে উঠতে লাগলো—নিরালায় নির্জনতাকে ছাপিয়ে। হাসিয়ে। রাঙিয়ে। আর মৌন থাকা মুঠো মুঠো লাল লজ্জায় সাজিয়ে।

—৩রা জানুয়ারী, ১৯৫৭

মিলন ত্রিযামা

নবাগতা প্রাবন্ধিকা—শুচিস্মিতা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আমার আদরণীয়াকে।

রঙীন হাসির ঝরনায়—নিজের প্রাণের সব রকম সুন্দর সুখকে ভাসিয়ে দিতে— যে কোন প্রেমিকা মেয়েই স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে এমনি একটি রাতের—প্রথম যামে। মধুমাসের জ্যোৎস্নার সাগরে ডুব দিয়ে—অন্য একজন প্রেমিক সুজনের খুশীর ফোয়ারা থেকে—হাজার রকমের আনন্দ আবেশ কেড়ে নিতে অনেকেই হয়ে ওঠে—আহ্লাদিনী। আর সঞ্চ ারিণী। ঠিক ঝরনা, সুন্দরী ঝরনার মতনই তারা তখন—তরলিত চন্দ্রিকা চন্দন বর্ণা হয়। কে না জানে এমন একটা মোহ জড়ান, সেই সঙ্গে মায়া মেশান, আর সুষমা ছড়ান মধুরিম রাত—জীবনে একটিবারই আসে। সে রাতের প্রত্যেকটি যাম যে—প্রাণকে নানান রঙে রঙীন কোরে তোলে। প্রতি পলকে পলকে এক প্রাণ আর এক প্রারের মুখেতে—সুধার পেয়ালা তুলে ধরে। মুখে মুখ রেখে—সুধা খাইয়ে দিতে দিতে—মদির বিহ্বলতায় ভাসে। ভরা তৃষ্ণায় প্রাণকে হিল্লোলিত কোরে—সুখের তরঙ্গ-দোলা ফুটিয়ে তোলে। সুখের সে তরঙ্গ-দোলায় দুলতে দুলতে যে কোন মেয়েই চিরন্তনী প্রিয়ার ছন্দখানা পেয়ে—অন্য জনের প্রাণ ছাপিয়ে নেচে যায়। রঙের পরশ আর মনের পরশ—এই দুইয়ে এক হ'য়ে মিলে গিয়ে—নিত্য-নতুন আনন্দ-নাচের রিম্ ঝিম্ করা রিদম্ সৃষ্টি করে।—প্রাণের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে যেন বীটোভেনের অমর সুরের মূর্চ্ছনা জেগে ওঠে। নেচে যায় রিমঝিম কোরে।

রাধাকে দেখলে কিন্তু এ কথার ভেতরে এখন কোন রকম মিতাক্ষরের ছন্দখানাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সে যেন চিরা-চরিত প্রেমিকা মেয়েদের থেকে একটি ব্যতিক্রম। মিলনের মধুরাত হাতের মধ্যে পেয়েও—সে ব্যাপারে রাধা যেন বড় বিবাগিনী। একটা কি যেন অজানা ব্যাপার তাকে ঘিরে ঘিরে চলেছে। সে ব্যাপারটুকু এখনই প্রকাশ পেতে চায়।—কিন্তু প্রকাশ হ'তে চেয়েও হ'তে পারছে না। রাধার চবিবশ বছরের পরিপূর্ণ নিটোল যৌবনের দীপ্তিলতার দরজায় এসে তা বাধা পড়ছে। তার রূপ-সুষমার ঘোমটার অন্তরালে তা লুকিয়ে রয়েছে। রাধার মিলন রাতের জন্য—আপন অঙ্গ-সজ্জার লাল সাজের আবরণের ভেতরে সে ব্যাপার অন্তরালবর্তী। তবু ;— তবু যেন সে প্রেমের একটা মৃদু ছন্দের মূর্চ্ছনা জাগছে তার চোখের মধ্যে। রাধার সে চোখেতে কিসের,—সত্যি কিসের যেন একটা ছবি দেখা দিচ্ছে।— সে কি রাঙা বেনারসীর ঝিলিমিলিতে নেচে ওঠা—চবিবশ থেকে এই মুহূর্তে অষ্টাদশীতে রূপান্তরিতা নববধূর—প্রথম প্রেমরাগের আরক্তিম লজ্জায় জড়ানো রাধার ছবি?—সত্যি বধূ রাধার,—না, অন্য কিছুর? কোনটা?

—হঠাৎ রাধার মধুময় বধূবেশের লজ্জা মাখানো যুবতী দেহখানা যেন কঁকিয়ে

কেঁদে উঠলো—শাদা ভেলভেটের মোলায়েম চাদরে ঢাকা বিছানার ওপরে। পা গুটানো অবস্থায় বসে থেকে—হাঁটুর মধ্যে মুখখানা চেপে ঢেকে রেখে—রাধা তার চব্বিশ বছরের চব্বিশটা বসন্তকে—ভয়ানক করুণভাবে কাঁদিয়ে তুললো। কান্নার দোলায় রাধার নিটোল শরীরের সুন্দরী যৌবন—দুলে দুলে, ফুলে উঠতে লাগলো।

সে সময়ে আনন্দরূপ বিছানা ছেড়ে— সেখান থেকে একটু তফাতে বসে ছিল একখানা সোফার ওপরেতে—আধ শোয়া অবস্থায়। তারও মন এখন এক অজানা ব্যথায় মোচড় খাচ্ছে।—সত্যি সে এমন কি দোষ ক'রেছে—যার জন্যে এই একটুখানি আগে—রাধা তার ভালবাসাকে প্রত্যাখ্যান ক'রল?—আনন্দরূপের কাছ থেকে রাধা—একটা শুধু সামান্য আদরের পরশও নিতে চাইল না।

আনন্দরূপের পঁচিশ বছরের প্রাণও তাই কেঁদে উঠলো রাধার এমন ব্যবহারে।—যে বিশেষ রাতের প্রতিটি যাম সাক্ষী থেকে—তাদের দুটি জীবনের গ্রন্থিকে দৃঢ়তম বাঁধনের মধ্যে বাঁধতে এলো—ঠিক তখনি ঘটলো এমন কে অপ্রীতিকর জিনিস! সোফায় বসে বসে—আকূল-পাথারি ভাবে ছাই-পাশ ভাবতে ভাবতে চলল তার মন। অত সব ভেবেও এর কূল–কিনারার কোন হদিস মিলল না। শেষে নিজের মন যখন প্রায় কান্নার সামিল হ'য়ে উঠলো,—তখনি আনন্দরূপ শুনতে পেল—রূপবতী রাধার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ।

কান্নার হঠাৎ পাওয়া চমক তখন ভেঙ্গে গেল আনন্দরূপের ভেতর থেকে। সোফা ছেড়ে খাটের কাছে এগিয়ে দাঁড়ালো। আর তখনি বিছানার ওপরে বসে পড়ে—মুহূর্তের ভেতরে আনন্দরূপ দু হাত দিয়ে রাধাকে এক রকম জোর করেই কঠিন আলিঙ্গনেতে ধরে রেখে—নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে আটকালো। একটু আশ্চর্য্য হলো। এবার ত রাধা কোনো রকম ভাবে বাধা দিতে চাইল না তাকে। বরং তার প্রিয়তম মানুষটির বুকেতে আশ্রয় পেয়ে— সেই আশ্রয়টুকু যাতে হাত ছাড়া হয়ে না যায়—তারই জন্য চেষ্টা ক'রতে লাগল সে। প্রেমের আবেশে ভরা চোখ দিয়ে তাই দেখে দেখে আনন্দরূপের মনে হলো—বয়সে চব্বিশ বছরের হ'লেও অষ্টাদশীর মতন দেখতে রাধা—যেন একটি ছোট্ট শিশুতে রূপান্তরিত হ'য়ে উঠেছে। শুধু একটি ছোট্ট শিশু! তা ছাড়া আর কি!—মনে হলো আরো কিছু।—এই মুহূর্তে রাধা যেন অনেক বেশী অসহায়া হ'য়ে পড়েছে। অনেক আগে থেকেই সে একটা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছিল। এখন আনন্দরূপের বুকের মধ্যে সে তার খুঁজে খুঁজে বেড়ানো— সেই পরম আকাঙ্ক্ষিত আশ্রয়টুকু পেয়েছে। তবু,—তবুও যেন মনে হচ্ছে—এখনও সে সম্পূর্ণ নিরাপদ হ'তে পারেনি। কি যেন একটা অব্যক্ত ব্যথার কথা রাধার সমস্ত যৌবন-দেহের ভেতরে—গুমরে গুমরে মরছে। প্রকাশ পেতে চায় অচিরেই। তবু প্রকাশিত হ'তে চেয়েও—হ'তে পারছে না। সেই হ'তে পারছে না বলেই—এখনও তার অনুরাগের ভেতরে করুণ কান্নার মৃদু কম্পন-রেখা জেগে জেগে উঠছে। তার সুছাঁদের অপরূপ দেহবল্লীরর মদালসা রূপ এলোমেলো হোয়ে পড়ছে। তার পুলক জাগানো বুকের যৌবন রঙটি—জ্বল জ্বল অবস্থায় স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের ভারে—ফুলে ফুলে দুলে চলেছে। নিজের হাতের কঠিন বাঁধনের মধ্যে

থাকায়—তা স্পষ্ট অনুভব ক'রতে পারছে আনন্দরূপ। অবশ্য এইমাত্র রাধার স্নিগ্ধা রূপের ভেতর থেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শেষ আবেগটুকু থেমে গেছে। বিছানার ওপরে পা দুটো লম্বা ক'রে ছড়িয়ে দিয়ে—রাধা এখন আনন্দরূপের বুকের ওপরে তার রেশম জামার তুলতুলে ভাবের মধ্যে নিজের মুখখানা লুকিয়ে রেখে—আদুরে মেয়ের মতো ঘষতে লাগল। একটু পরেই আবার ছড়ানো পা দুটোকে টেনে এনে গুটিয়ে রাখলো। আনন্দরূপের আরামে ভরা—আবেশে বিহুল কোরে তোলা বুকেরই কঠিন বাঁধনে থাকা আলিঙ্গনের মধ্যে— সে শিশু হ'য়েই রইলো। বড় নিশ্চুপ তার এখনকার ভাবের অভিব্যক্তি। কোন রকমে ভালবাসার লাজ লাগানো ও ফোটানো দু'একটি মিষ্টি কথার কাকলি শোনাবার মতো—শক্তিটুকুও যেন নববধূ রাধার ভেতরে বিন্দুমাত্র নেই।

আনন্দরূপ এবার তার প্রিয়া রাধাকে আদরের ভেতরে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা কোরল। তবু কোন রকমে একটি কি দুটি মাত্র কথা বলে শোনাবার জন্য আপন প্রিয়ার রূপ ঝলসানো যুবতী দেহের কোথাও—অনুভূতিময় সূক্ষ্ম কম্পনের রেখাটুকুকেও জাগতে দেখা গেল না। মুখ তার নির্বাক। তাই দেখে দেখে—বধূর রঙীন তনুশোভার সুন্দর সুন্দর ছবির মতন চোখে-মুখে-বুকে-পিঠে, আর ঘন তমসাবৃত অলকের গুচ্ছে গুচ্ছে—আনন্দরূপ নিজের আবেশে ভরা আদর মাখানো হাত বুলালো প্রথমে। শেষে দু'হাতের মুঠোর মধ্যে রাধার মধুক্ষরা মুখখানা নিয়ে—নিজের রূপ-পিয়াসী চোখের সামনে তুলে ধরলো। যুবতী প্রিয়ার চব্বিশ বছরের চব্বিশটা বসন্তে ভরা আরক্তিম মুখের দীপ্তির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে অসম্ভব রকম সরলতায় পরিপূর্ণ—শিশুরই স্বর্গীয় সুধামাখা মুখখানা। সে শিশু মুখের দিকে তাকালে পর—চোখ জুড়িয়ে আসে আপনা থেকেই। পরিপূর্ণা প্রেমরাগে রঞ্জিতা—নিটোল যৌবনের ভারে লাজুকা রাধার ঠোঁটের প্রগাঢ় রঙের লাল আভার মায়াবেশ—আর সিঁথির টক্‌টকে লাল রঙের জ্বলজ্বলে কিরণ ছড়ানো পবিত্রতা—দুইয়ে মিলে চোখ জুড়িয়ে দিল আনন্দরূপের। প্রিয়াবধূর চোখ থেকে অপরূপ আলোর পরশ ছড়িয়ে পড়ছে ভেজা ভেজা অবস্থায়। সে আলোকের ভেতরে যেন একটা বিশেষ অভিব্যক্তির পরিচয় আছে। আনন্দরূপ তার কিছুই ধরতে পারলো না। একটি যুবতী মেয়ের এ সময়কার মনের ভেতরে যদি সে ঢুকে পড়তে পারতো মোকাবিলায়—তা হোলে বুঝতে পারতো রাধার চোখের ঐ আলোর পরশটুকু কিসের। আর রহস্যটুকুই বা কী? সে অত সব ভাবতে চাইলো না। কোন সন্ধানও ক'রল না সে রহস্যের উন্মোচনে। আর শুধু শুধু সময় নষ্ট ক'রতে ভাল লাগছে না তার। এটা হলো তার আর রাধার বিবাহিত জীবনের পরিপূর্ণ যুগল রূপের ভেতর থেকে—এক সাথে শয্যা গ্রহণের— প্রথম মিলন রাত। অবশ্য আনন্দরূপ যদি এ নিয়ে অন্ততঃ একটিবার ভেবে দেখতো; আর যদি একবার নিজের প্রিয়া সুজনার সম্বন্ধে মনোবিশ্লেষণ কোরত—তা হোলে নিশ্চয়ই সে ধরতে পারতো আসল জিনিসকে।—রাধার টানা টানা চোখের মধ্যে যে ছবি ফুঠে উঠেছে—তা কি সত্যি নববধূর পরিপূর্ণ যৌবনের ভারে জড়ো-সড়ো থাকা—শুধু একখানা লজ্জারুণ ছবি? না, অন্য কিছুর ব্যঞ্জনা আছে সে ছবির মধ্যে? এর কোনটা

সত্যি ?

অত কিছু এখন ভাববার সময় নেই আনন্দরূপের। সুন্দরী যৌবনে অনন্যা রাধার যৌবনের বিচিত্র রঙে ও রূপে অভিষিক্ত দেহরাগের—অপূর্ব ছন্দকে চোখের অপলক দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো। তাই দেখে তার নিজের হাসি মাখানো ঠোঁটের ফাঁকে—এক সুন্দর কামনার ছবি ফুটে উঠলো। সে মধুর ছবির অভিব্যক্তি চঞ্চ ল হয়ে ছুটে চলল—তার পরিপূর্ণতা খুঁজতে। আর অ—খোঁজবারও কোন প্রয়োজন নেই। সুস্মিত আনন্দরূপের হাসিভরা মুখেরই ঠোঁটের ফাঁকে দেখা দেওয়া মিষ্টি কামনার ছবিটুকুর পরিপূর্ণ হয়ে রূপ পাওয়ার আধার—তার আপন পিয়াসী মুখের সামনে—নিজেরই দু'হাতের শক্ত মুঠোর মধ্যে ধরা আছে। অপলক চোখের চাহনি নিয়ে দেখতে দেখতে মুহূর্তের মধ্যে তার কামনাযুক্ত মিষ্টি মাখানো অধর—সামনে হেলে লুটিয়ে পড়ল রাধার রূপানুরঞ্জিত ঢল্‌ঢলে মুখের লাল ঠোঁটে। মিষ্টি মধুর পরশ খাইয়ে চলল—আনন্দরূপ—তারই প্রিয়া বধূর মুখের ঢল্‌ঢলানি রূপের-—এখানে-সেখানে। একবার যুবতী সুজনার জলেতে ভেজা কাজল চোখেতে।—আর একবার তার টোল খেয়ে গড়িয়ে পড়া গালের গোলাপী কোমলতায়। আবার একবার তা অগ্নি-উজ্জ্বল রাখা টক্‌টকে অধরে নিজের পিপাসিত মুখ থেকে শতধারায় উপচে পড়া—সুন্দর কামনা জড়ানো মিষ্টি ঠোঁটের পরশটিকে—ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে নিয়ে গেল—উষ্ণতা ঝরাতে ঝরাতে। আবেশ ধরে।

মাঝখানে একবার কথা বলে নিল আনন্দরূপ আদর মাখানো গলায়—রাধা। আমার লক্ষ্মী রাধা। আমার দুষ্টু রাধা। আমার রাধা। মিষ্টি রাধা। এই।

আরো এক রকম অনেক মধুর কথাকেই হয় ত বলে বলে শোনাতো আবেগে। কিন্তু আর বলল না—রাধাকে এখনও একটা ছোট্ট কথা মুখে এনে উচ্চারণ কোরতে না দেখে। পুনরায় সে তার রূপসী সুস্মিতার মুখেতে মধুর সুধার আস্বাদ ঢেলে গেল। ঐভাবে ব্যতিব্যস্ত কোরে তোলার চেষ্টা করল—যুবতী প্রিয়ার মৌন অবস্থাকে। তা হলে যদি কথা বলে রাধা। এ ভাবে চলায় আস্তে আস্তে তার তনুশোভার লাল লজ্জারূপটি বেপথুমন হ'য়ে উঠলো। ওদিকে ততক্ষণে একটু একটু করে আনন্দরূপের হাতের কঠিন বাঁধনটি—শিথিল হতে হতে শিথিলতর হ'য়ে এসেছিল। এবার যুবক স্বামীর গভীর প্রেমে পূর্ণ বুকের মধুর আশ্রয় থেকে---বিছানার ওপরেতে গড়িয়ে পড়লো তার বিপর্য্যস্ত দেহখানা। শাড়ীর আঁচলখানা সুন্দরী অনন্যার চব্বিশ বসন্তে পরিপূর্ণা বুকের—নিটোল সৌন্দর্য্যের ওপর থেকে সরে গিয়ে লুটিয়ে পড়েছে—বিছানারই শাদা রঙের ভেলভেটিনের ওপরে। শাদার মধ্যে লালবেনারাসীর লাজ-রাঙা পবিত্র রূপটি—ঝিকিমিকি খেলায় মেতেছে। কথা বলল না এখনও রাধা। তাই দেখতে পেয়ে আনন্দরূপের চোখ দুটো এবারে সত্যি করুণ বেদনায় ছল্ ছল্ করে এলো। কিন্তু তা ক্ষণেকের জন্য।

আবার রাধা তার ঐ বিপর্য্যস্ত রূপ নিয়েই—বিছানার মোলায়েম গ্লসি চাদরের মধ্যে মুখ লুকিয়ে—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

আনন্দরূপ সত্যি এবার মরিয়া হ'য়ে উঠেছে। যে ক'রেই হোক্ তাকে জানতেই

হবে—তার এই সুহৃদয়ার ভেতরে কি এমন গুরুতর ব্যাপারখানা ঘটে আছে—যার জন্যে আজকের এই রাতের প্রতিটি যাম নষ্ট হ'তে চলেছে! তাকে জানতেই হবে। সে যে কোরেই হোক্। কারণ সে আজ রাধার স্বামী।—কিছু নিয়ে কোন রকম লুকোচুরি খেলা অন্ততঃ তাদের দুজনের মধ্যে আদপেও হওয়া উচিত নয়। তার কাছে আসল ব্যাপারটুকু কি খুলে বলতে লজ্জা পাচ্ছে—তারই সুস্মিতা বধূ? কিন্তু তার পক্ষে ত কখনো একটুও লজ্জা পাওয়ার কথা নয়। শুধু কি আজকের এই শুভ রাত্রিতেই—ওদের দু জনের পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় ঘটলো—নববধূ আর নব বর রূপে! কিন্তু, তা তো মোটেই সত্যি নয়।

—রাধা নামে এক মেয়ে, আর আনন্দরূপ নামে এক ছেলে—আর এই তাদের দুজনারই পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় হয়—বেশ কয়েক বছর আগেই। রাধার তখন বয়েস ছিল যোলো।—আর আনন্দরূপের তখন সতেরো।— কৈ, কোন দিনই ত' তার কাছে কোন কিছু নিয়ে,—তা সে জিনিস যতদূর গোপনই হোক্ না কেন—বলতে বিন্দুমাত্রা লজ্জা পায় নি অকপট ভাব নিয়ে! সব জায়গায় যে কোনও ব্যাপারে, সব সময়েতেই আনন্দরূপের কাছে—রাধার ব্যবহার ছিল বড় বেশি খোলাখুলি ধরনের! কোন বিষয়ে নিয়ে কোন জিনিসকে—রাধা এক মুহূর্তের জন্যেও গোপন করা বরদাস্ত ক'রতে পারতো না।

আনন্দরূপ তাই ভাবল—তবে, আজ সে কেন নিজেই অমনটি ক'রছে? আজ এমন ব্যবহার করা মোটেই শোভা পায় না—এই নতুন পরিচয়ের লীলাসঙ্গিনীর পক্ষে। ভাল লাগবারও কথা নয় তা। এতবছর পরে—এই ত' আজই তারা বর আনন্দ আর বধূ রাধা—দুজনেই নিজেদের ভালবাসাবাসির চরম আকাঙিক্ষত বিবাহিতা জীবনেতে—ন্যায়তঃ ভাবে প্রবেশ ক'রতে পেরেছে।

সুইচ্ টেপার একটা শব্দ হলো খুট্ ক'রে। নিবে গেল দপ্ ক'রে ঘরের ভেতরকার অত্যুজ্জ্বল আলো। অন্ধকারের ভেতর দেহের শৌখিন পোশাকটি না ছেড়েই—বিছানায় উঠে শুয়ে পড়ল আনন্দরূপ। শুয়ে পড়েই হাত দিয়ে সজোরে কাছে টেনে এনেই—বুকের ওপরে জড়িয়ে ধরলো রাধার কান্নার বেগে ফুলে ফুলে ওঠা—কোমল কমনীয় দেহখানা। ঝড়ের বেগে যুবতী প্রিয়াকে—হাত-পা দিয়ে নিজের শরীরের সঙ্গে লতিয়ে ধরার মতো কোরে —বাঁধতে লাগলো আনন্দরূপ।

সত্যি এই মুহূর্তে—রাধা যেন নিজের সঠিক রূপটির মধ্যে ফিরে আসতে পারলো—ঘরের অন্ধকারের মায়াজাল—আর বাইরের জ্যোৎস্নার আলোর লুকোচুরি খেলার মধ্যে—আনন্দরূপের বুকেতে শায়িতা থেকে। খুশী হ'য়ে রাধা এখন আদর দিতে গিয়ে তার সুদর্শন স্বামীর পঁচিশটা বছরের বসন্ত রূপকে—একই ভাবে জড়িয়ে জড়িয়ে ধরতে লাগলো—নিজেরই মুঠো মুঠো আরাম ঝরানো বুকের—সুস্নিগ্ধ মোলায়েম আবেশের মধ্যে।—তার এখন অভিমানিনীর মতন মূর্তি। আনন্দরূপকে দিয়ে নিজের অভিমান ভাঙ্গাতে চাইলো। সুজন স্বামীর আদরের মধ্যে— সে তার নিজের অভিমানকে ভাসিয়ে দিতে চায়। নিজে গলে যেতে চায় সেই আদর পাওয়ার সুখেতে।—সে সুখ পেয়ে ঝিলমিলিয়ে উঠবে তার প্রাণ। তার

মন। সেই সঙ্গে তার সুন্দরী দেহের মধুরা প্রেমরাগ।—আর আনন্দরূপকেও রাধা সে সুখের ভাগ দেবে।—ভালোবাসাবাসির মধ্যে— সে তাকে তা দেবে ও নেবে।—আর নেবে ও দেবে।

পরম প্রিয়জনকে সুখ দেবে ভেবে—সে মুহূর্তেই রাধা নিজের মধ্যে গুমরে মরা সেই অব্যক্ত বিষাদময়তাকে ভুলে যেতে বাধ্য হলো। আর একটু ভাবলো—ছিঃ, ছিঃ। আজকের মতন এমন একটি দিনে নিজের প্রেমময় যুবক-সুদর্শনের প্রতি এই ধরনের ব্যবহার করাটা কি তার শোভা পায়? আচ্ছা, একটুও কি তার লজ্জা কোরলো না আনন্দরূপের মত একটি ছেলেকে অমন ভাবে শুধু শুধু মনেতে ব্যথা দিতে?—" তোমার হৃদয়ের মতনই আমার হৃদয় হোক্"—এই প্রতিজ্ঞাটুকু রাধাকে অগ্নিসাক্ষী রেখে ক'রতে হ'য়েছে—তারই অন্তরতমের জন্য। প্রেমিকা স্ত্রী হ'য়ে এরকমটি করলে পর যে—আনন্দরূপের জন্যই অমঙ্গল ডেকে আনা হবে! না, তা কখনও হ'তে পারে না। রাধার আজ আনন্দরূপ ছাড়া নিজের সমস্ত পরিচয়ই যে মিথ্যা।—আনন্দরূপই যে তার সব স্বত্বা।—এই রাধার মনের সমস্ত সুখ। আর সেই সঙ্গে তারই লীলাবাসরের পরম সঙ্গী।

রাধার এবার মন নাচলো। প্রাণ হাসলো। কথা বলল বড় মধুর ভাবে আদর ঢেলে। আস্তে আস্তে বলল—আনন্দরূপ। আমার আনন্দ। আমার রূপ। তুমি রাজা। তুমি শুধু আমার। আমাকে কত ভালোবাস তুমি। তোমাকেও 'বাসি। ভালবাসি খু-উ-ব। আমি তো-মা-র-ই। তো-মা-র—...

আবেগে কথা বন্ধ হ'য়ে গেল রাধার। বেশ কাটা কাটা ভাবে শেষের কথাগুলো বলে গেল। এর মাঝখানে আনন্দরূপ নিজের মুখ থেকে একটা উষ্ণ পরশ দিয়ে—সিক্ত টি্প এঁকে দিল তার কপালের কেন্দ্রস্থলে। আবার বোধ হয় এর থেকে বেশী কিছু ক'রতে যাচ্ছিল সে। কিন্তু ক'রতে দিল না রাধা—তীব্র হাসির তীব্র ঝলকানি দেওয়া নিজের মুখটিকে সরিয়ে নিয়ে। আনন্দরূপের চোখ থেকে খুশীর উজ্জ্বল রূপটি—মুখের শুভ্র হাসির ঝিলিকে ঝিলিকে ঝরে পড়ছে।

বলল আনন্দরূপ—তুমি দুষ্টু।

—জানই ত' বড় দুষ্টু আমি। এবার কিন্তু আমার আমি দোব। বাধা দিও না। দুষ্ট ছেলে।

বলতে বলতে রাধার শরীরের মধ্যে—হাসির তরঙ্গে তরঙ্গে আনন্দদোলা সৃষ্টি হলো। চোখের মধ্যে বার কয়েক পলক পড়লো ও উঠলো। তারপরেই অষ্টাদশীর মত অথচ চবিবশটা বসন্তে ভরা রাধার রাঙা ঠোঁট দুটি এগিয়ে এসে—কঠিন হ'য়ে আঁটকিয়ে থাকলো আনন্দরূপের খুশীর রভস হাসিতে উপছে পড়া—আদরে-সোহাগে ভরা মুখেতে। ঐ ভাবে দু জনেই একে অপরের মুখ থেকে সুধা আহরণ ক'রতে লাগল। আনন্দরূপের বুকেতে—রাধার যৌবনেতে পরিপূর্ণা নিটোল বুকের পেশলতা আরামের শিহরণ তুলে—পরস্পরের সুদৃঢ় আলিঙ্গনের মধ্যে পরশের ঘনিষ্ঠতায়—অন্তরঙ্গতারই লাজহর রভসে রভসে ভরিয়ে দিল। অপরূপ আনন্দেরই প্রবল আতিশয্যের তাড়নায়—অশেষ পুলক-আদর লাগিয়ে গেল। যুগল লীলার

পারিজাতের মদিরায় তারা হ'য়ে থাকলো মাতোয়ারা।—রাধা সুখ দিয়ে খুশী ক'রল আনন্দরূপকে। আনন্দরূপ খুশী হয়ে সুখ ঢেলে দিল রাধার মধ্যে।—সুখ হলো খুশী। আর খুশী পেলো সুখ।

ভালোবাসাবাসির পবিত্র পরিণয়ের যুগল লীলায়— কেউই ক্লান্ত হলো না।—সুধা খেয়ে—আর সুধা দিয়ে দুজনেই হ'য়ে উঠেছে প্রাণের অণুতে অণুতে—চিরশক্তিতে উচ্ছল! সমুজ্জল!—খাঁটি প্রেমের যে হোল তাই ধর্ম। তাই কৃতি। তাই ধৃতি।

আনন্দরূপ বলল—আমার একটা কথার উত্তর দেবে, লক্ষ্মী রাধা?

তাই বলে সে তার যুবতী বরবর্ণিনীর পিঠেতে হাত বুলালো আস্তে আস্তে। মধুরতার আবেশ মাখাতে মাখাতে।

বলল রাধা আদরে গলে যাওয়া গলায়— দোব, আনন্দ। নিশ্চয়ই দোব।

কথা বলতে বলতে আনন্দরূপের কাঁধের ওপরে—আবেশ ভরিয়ে মাথা রেখে—আরামে চোখ বন্ধ ক'রল রাধা। একটু পরেই হাসির নাচনে তার চোখের বন্ধ দৃষ্টি খুলে গেল। আনন্দরূপকে দেখতে লাগল আলো আঁধারির রূপের মধ্যে অপলক চাহনি নিয়ে।— দেখতে দেখতে ছোট্ট শিশুর মতো আবদারের মধুর সুরেতে ভেঙে পড়লো রাধা।

রাধা কথা বলল মুখের শুভ্র হাসির ঝলমলানি ছড়িয়ে—কি দেখছো আনন্দ, মুখের দুষ্টুমি ভরা হাসিতে মুখর হ'য়ে. তোমাকে আজ রাতে বুকের বাঁধ থেকে কিছুতেই আর ছাড়ছি না, আনন্দ। এভাবে তোমার বুকের মধ্যে বন্দিনী থেকে—নিজের সুখের উদার আশ্রয়টুকুকে স্থায়ী ক'রে রাখব—অন্ততঃ যতদিন না,—সে আসে! সে সত্যি আসি আসি করছে!

এই কথা বলতে বলতে—রাধার উজ্জ্বল রাঙা মুখের রঙীন হাসির ঝরনা আর চোখের চঞ্চলা হরিণীর দৃষ্টি—অন্ধকারের মধ্যেই নিথর আর নিশ্চল হ'য়ে এলো।—ঝরণা তার নিজের গতি হারালো রাধার মুখের হাসি মরে যাওয়ায়।—দৃষ্টি অন্ধ হলো হরিণীর নিশ্চলতা প্রাপ্তিতে।

আনন্দরূপ দেখেও এর কোন কিছু ঠাহর ক'রতে পারল না। বোধ হয় ভুলেই গেছিল যে—ভালবাসার নরম মেয়েরা সুখ আর দুঃখ—যখন যেটা আসে—তখনি হাসির কি কান্নার স্রোত— সেটার যে কোন একটির মধ্যে অনায়াসেই নিজেদের ভাসিয়ে দিতে পারে! রাধার এখন হ'য়েছে সেই অবস্থা। দুঃখের কথা মনে হওয়াতেই—তার ছবির মতো কাজল আঁকা চোখ দিয়ে —জল ঝরার উপক্রম হলো।

সেদিকে আনন্দরূপের কোন রকম ভ্রুক্ষেপ ছিল না। রাধার মুখের এই কথার কোন মানেই ক'রতে চাইল না। খিল্ খিল্ ক'রে হেসেই আনন্দরূপ উড়িয়ে দিতে পারলো সে সব কথা।

কিন্তু এ কি!

চমকে উঠলো আনন্দরূপ।

আলো-আঁধারির মধ্যে রাধার চোখ দুটি চিক্ চিক্ করে উঠলো জলে ভরা অবস্থায়।

আবার কান্না!

আর এক মিনিটও দেরি ক'রতে পারলো না আনন্দরূপ এই দেখে। বিছানার ওপরে উঠে বসে রাধাকে নিজের কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বুকেতে জড়ালো। বিছানায় লুটানো প্রিয়া নারীর বুক থেকে সরে যাওয়া আঁচলখানা হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে—রাধার উদোল বুকের অনিন্দ্য রূপশিল্প ঢেকে দিয়ে—তার গালেতে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে আদর ক'রলো।

আনন্দরূপ বলল—আমার রাধা। লক্ষ্মী রাধা। আমাকে কি তুমি বলবে না এমন কি কথা ভেবে ভেবে নিজেকে এই ভাবে কষ্ট দিচ্ছ? রাধা, তুমি কি আমাকে তোমার মনের ভেতরকার অব্যক্ত ব্যাথার কথা না জানিয়ে এমনি ক'রে কাঁদাতে চাও? বল লক্ষ্মীটি।—বলতে বলতে রাধার কপালেতে—আনন্দরূপ নিজের এক পাশের কপোল ধরে লাগিয়ে রেখে—আদর কোরল তার পিঠে-মাথায় পা হাতের পরশ ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে।

ডুকরে কেঁদে উঠলো এবারে রাধা।

কান্নার সঙ্গেই মধুরা রাধা বলল—আমাকে তুমি ক্ষমা ক'রবে বল? আগে বল, তাই ক'রবে? আমি যে তোমার প্রতি মিথ্যাচার ক'রেছি। হ্যাঁ, মিথ্যাচারই ক'রেছি। সত্যি বলছি। বিশ্বাস কর আনন্দ। সত্যি তাই।

এ ধরনের কথা শুনতে শুনতে—বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গিয়ে নিজের আলিঙ্গনের মধ্যে আরো শক্ত ক'রে চেপে ধরলো আনন্দরূপ—তার সুন্দরী যৌবনেতে অনন্যা স্ত্রী—এই রাধার ক্রন্দসী দেহকে।

বলল আনন্দরূপ—এ সব তুমি কি বলছ, রাধা?

কান্নায় ফুলতে ফুলতে রাধা বলল—বিশ্বাস কর আনন্দ, সত্যি কথাই বলছি। আমার রূপ, আমি যে তোমারই সন্তানের মা হ'তে চলেছি। তুমি যে হবে তারই বাবা। রূপ, মিথ্যাচার ক'রে খুব গর্হিত অন্যায় ক'রে ফেলেছি, তাই না? বল আনন্দ, বল লক্ষ্মী রূপ, এ জন্যে আমি তোমার কাছে ক্ষমার যোগ্যা কি? বল, আমার লক্ষ্মী আনন্দ?

সব কথাই শুনলো আনন্দরূপ। তার পায়ের নীচে থেকে যেন পৃথিবী কেঁপে উঠলো দারুণ ভাবে একটা ভূমিকম্প হয়ে যাওয়ায়। এ কি কথা বলছে রাধা! এ কি অঘটনের ব্যাপার! তার সমস্ত শরীর আর মন থর থর করে কেঁপে গেল অজানা ভয়েরই প্রহেলিকায়। আর একটু হ'লেই খাটের কিনারে বসে থাকা—আনন্দর বেসামাল দেহখানা সেখান থেকে নীচের মেঝেতে পড়ে যেতো। রাধা ছিল তারই বুকের আশ্রয়। আর সেও এই একটু আগে সরে সরে এসেবসেছিল—একেবারে বিছানার ধারটি ঘেঁষে।— সে সময়ে হঠাৎ রাধা নিজের সংবিতটুকু ফিরে পেলো।

তার এই অবস্থায় নীচের দিকে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখে—রাধা চকিতের মধ্যে আনন্দরূপকে সজোরে নিজের বুকেতে টেনে এনে জড়িয়ে ধরলো। এ অবস্থায় যুবতী বধূ—তারই বেপথুমন স্বামীকে জোর করে বিছানায় শুইয় দিল।

রাধার ছবির মতো মুখশ্রীটি শুভ্র হাসির ছটায় ঝল্‌মল্ ক'রে উঠল। তার টানা টানা চোখ আনন্দে ডগ্ মগ্ ক'রে নেচে গেল। ঠোঁটের গাঢ় রঙ আরো বেশী লাল হয়ে উঠতে লাগলো। গালেতে হাসির তরঙ্গে তরঙ্গে— টোল গড়িয়ে পড়লো।

রাধা বলল হাসিতে ঝলমলিয়ে—সব বলছি আনন্দ, আগে তুমি শান্ত হও লক্ষীটি।

মুহূর্ত মধ্যে আনন্দরূপের মনের সমস্ত আঁধার যেন কেটে গেল। আর এক হঠাৎ আলোর ঝলকানি খেলে গেল তার সমস্ত প্রাণ জুড়ে। — সে আলোর ঝলকানো আভায় উদ্ভাসিত হলো—তার মনেরই গোপন কথার।

—"বুঝেছি রাধা। বুঝেছি আমি।"—বলতে বলতে আনন্দরূপ আষ্টেপৃষ্ঠে রাধাকে বুকেতে বাঁধতে লাগলো। স্ত্রীর আরক্তিম গালেতে নিজের দু'ধারের গাল জোরে জোরে ঘষতে লাগলো।

বলল আনন্দরূপ ঐ রকম ভাবে তার প্রিয়া স্ত্রীকে আদর ক'রতে ক'রতে—আচ্ছা রাধা, সে ত কবেই ঠিক হয়ে চুকে গেছে। কিন্তু তার পরেও এ তুমি কি কথা বলছ রাধা? আজ থেকে ঠিক পাঁচ মাস আগের হঠাৎ ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা—যা সম্ভব হ'য়েছিল আমাদের দু'জনকারই মনের এক অপ্রতিরোধ্য কামনা পূর্ণ করার প্রবলতম ইচ্ছা জাগায়!—আর সে ইচ্ছাকে পূর্ণ করাতেই ঘটে গেল সেই ব্যাপার—সর্বাংশে শুধু তোমাকে ঘিরে। আর সচেষ্ট হ'য়ে তখনি সেই ঘটনার রেশটুকুকে তোমার ভেতর থেকে সমূলে উৎপাটন করা হয়েছে। কিন্তু রাধা, তার পরেও তুমি এ কি কথা বলছো! এ কি কথা.....

কথা শেষ হলো না আনন্দরূপের। নিজে থেকেই সে তা শেষ ক'রতে পারল না। আবেগে তার গলা বন্ধ হয়ে এসেছে। ভয়ের ভয়ানক শিহরণে কেঁপে উঠল তার শরীর। চোখ অসম্ভব রকম ছল্‌ছল্ করে উঠল জলে ভরা অবস্থায়।—আনন্দরূপের প্রেমে ভরা চবিবশ বছরের প্রত্যেকটি বসন্ত এই কাঁদলো বলে!

আনন্দরূপের কান্নার সামিল সবুজ প্রেমের মাধুরী জড়ানো মুখের ওপরে—নিজের ছবির মতন আলো হাসির ঝিলিক দেওয়া—প্রেমের রভস মুখখানা ধরে রাখলো রাধা। দেখতে লাগল গর্ব—ভরিয়ে আপন স্বামীর সরলতায় মূর্ত অপরূপ মুখ-চোখ। দেখে দেখে স্বামী গর্বে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। আনন্দগরিমায় নিজের অঙ্গরাগেতে মাখালো রুমঝুম করা ছন্দ।

ভাবল রাধা—পৃথিবীর কোটি কোটি লোকের মধ্যে আর কেউ তার এই আনন্দরূপের চাইতে কোন অংশেই আপন নয়। তার সমস্ত স্বত্বাই একমাত্র এই সুন্দর ছেলেটির—জন্যে-ই।— যে ছেলে তার সমস্ত জীবনানন্দের লীলাসঙ্গী। তার অকৃত্রিম বন্ধু। মনে হলো তার—উঃ, কত ভাল তার আনন্দরূপ। কত অতুলনীয়।

রাধা বলল—ছিঃ আনন্দ, পাগলামি ক'রে ভয় পেয়ো না। তুমি মেয়ে নও।

তোমার পরিচয় ছেলে। সেটা আগে খেয়ালে রেখো। আর আমি যদি মেয়ে হয়েই সব রকম সামাজিক লজ্জা আর ভয়কে তুচ্ছ মনে করে অস্বীকার ক'রতে পারলাম, ও সেই সঙ্গে যে ঘটনা অপ্রতিরোধ্য ভাবে ঘটলো তোমাকে ও আমাকে ঘিরে,—তাকে যদি ভগবানের অভিপ্রেত কাজ বলেই মেনে নিতে পারলাম—ও আরো জানলাম যে, ওটা তাঁর-ই আশীর্বাদের এক পবিত্র ফুল বই আর কোন কিছু নয়। মেয়ে হয়ে আমি যা ক'রতে পারলাম, কৈ তুমি সবল ছেলে হ'য়েও তা সেটুকু সাহস ক'রতে পারলে না? কেন পারলে না, রূপ? তুমি তখন নিশ্চিন্ত হবার জন্য ভাবলে—তুমি যা যা ব্যবস্থা আমার জন্যে ক'রে দিয়েছো তাইতেই ঘটনার মূল তার গোড়া সমেত নষ্ট হ'য়ে গেছে।—কিন্তু এর পরেও দেখা গেল ঘটনার ফলটুকু সমূলেই রয়ে গেছে—আগের মতনই প্রাণ-চঞ্চল। একটু কোন আঁচড়ের দাগও পড়তে পারলো না —তার গায়েতে। সে প্রাণে বেঁচে থাকলো আমারই জন্যে। তোমার দুষ্টু শিরোমণি—এই রাধার জন্যে-ই।

এক টানে এতগুলো কথা বলে এখানে এসে থামলো রাধা।

ছল্ ছল্ চোখে আনন্দরূপ বলল—তোমারই জন্যে রাধা? তুমি-ই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছো?

গর্বিত ভাবে বলল রাধা—হ্যাঁ, আমি। আমিই তোমার সেদিনকার সেই সন্তানকে বাঁচিয়ে রেখেছি। দীর্ঘ চার মাস ধরে তাকে আমার রক্ত দিয়ে, অপার স্নেহ দিয়ে অকৃত্রিম ভাবে সৃষ্টির রূপটুকুকে দিয়ে আসছি—শিল্পীর মতন। দেখ আনন্দ, বিশ্বাস যদি তোমার এক রকম নাই হয়, তা হ'লে লক্ষ্মীটি রূপ—আমার শরীরের এইখানটায় নিজের হাতে ধরে স্পর্শ করে দেখ। হাত ছুঁইয়ে পরখ ক'রে দেখলেই তোমার ভাবী সন্তানের প্রাণের স্পন্দনটুকু টের পাবে এর ভেতর থেকে। এখানে সে দিনে দিনে বড় হ'চ্ছে পৃথিবীতে উন্মুক্ত আলোকের মধ্যে এসে—তারই উজ্জ্বল ধারায় স্নান ক'রে —নিজে অপরূপ হ'য়ে উঠবে বলে। ভুলে যেও না সে তোমারই সৃষ্ট। তাই তোমার-ই মত হবে মূর্ত তার প্রাণ।— সে যে তুমি-ও। আমার আদর-আহ্লাদ দেওয়া-নেওয়া আর পাওয়ার লীলাসঙ্গী আনন্দরূপেরই সে হবে—এক ঝক্‌ঝকে চক্‌চকে উজ্জ্বল রাঙা—টুক্‌টুকে সংস্করণ। সে দেখতে কতটুকু হবে জান—এই মানে এই এত-ত-টুকুন।

রাধা খিলখিল করে হাসতে হাসতে হাত দিয়ে পরিমাণটুকু দেখিয়ে বলল—বুঝলে আনন্দ, সে এই, এই এত-ত-টুকুন হবে।

বলে ও দেখিয়ে দিয়ে আনন্দরূপের ডান হাতখানা টেনে নিয়ে রাধা তার উদরেতে ছুঁইয়ে ধরে রেখে বলতে লাগলো—সেদিন অসময়ে আমাদের দুজনের ক্ষণিকের দুর্বলতার জন্য আমার মধ্যে অবৈদধভাবে তোমার সন্তানের সম্ভাবনা দেখা দেয়। ফলে কুমারী হ'য়েও জননীর মূর্তি ধরতে হলো আমাকে। তুমি তাই দেখে আমার কুমারীত্বের মর্য্যাদাকে অক্ষত ক'রে রাখবার জন্য চেষ্টা করলে। উঃ, সে কি ভীষণ ব্যাপার! সাধারণ একটা সামাজিক লোকলজ্জার জন্য শেষে একটি শিশুর প্রাণকে অকারণে হত্যা ক'রতে হবে! তুমি ত সেই ব্যবস্থাটুকু করেই কলকাতায় ফিরে গেলে।

সেখানে ফিরে গিয়ে এই ভেবে তুমি নিশ্চিন্ত হলে যে, সব রকম অঘটন চুকে গেছে। ভয়ের বা দুশ্চিন্তার আর কোন অন্য কারণ এর পরে থাকতে পারে না, আর নেই-ও। আমি কিন্তু তোমার কোন পরামর্শকে গ্রহণ ক'রতে পারিনি। দেখ আনন্দ, তুমি অবুঝের মতো যা ক'রতে চেয়েছিলে, আমি বুঝে কখনও সেটি হ'তে দিতে পারি না। দেখ রূপ, আমি একজন মেয়ে। মেয়েরা জীবনে এক সময়ে না এক সময়ে মা হয়। তবে অনেক সময় অনেক জায়গায় মেয়েদের ভেতর থেকে অনেকেই হয় ত সব দিক অনুকূলে থাকা সত্ত্বেও—মা নাও হতে পারে। এর মানে এই নয় যে, তারা মা হওয়ার অনুপযুক্তা। এর পেছনে সব সময়ে উপস্থিত থাকে—প্রাকৃতিক কোন কারণের ব্যতিক্রম! বা মানুষের আদর্শের কোনো মাহন দৃষ্টির উদার প্রসারতা! বা কামনার সাব্লিমশেন্! মেয়েদের এই বিশেষ দিকটিও বাস্তব জীবনের দিক দিয়ে সত্য।—আবার অন্য দিকটিও অতিমাত্রায় বাস্তবে সত্য— যেখানে নির্বিশেষে সব মেয়ের মধ্যেই প্রিয়ার মতন স্বতন্ত্রতা নিয়ে—মায়ের শাশ্বত রূপটি বিরাজ করে। আনন্দ, তোমার সঙ্গে সেদিন পর্য্যন্ত আমার বিয়ে হ'তে পারেনি বলে কি—আমি তোমার সন্তানের মা হ'তে পারব না? ওগো আনন্দ, আমি যে একমাত্র তোমাকেই আমার আরাধ্য স্বামী, আমার প্রাণের অর্ঘ্য দেওয়া দেবতাটিরূপে দেখতাম—সেদিনের অনেক আগে থেকেই। আমার রূপ, তুমি কি তা জানতে না? আমি জানি, আমার আনন্দ সেটুকু জানলে পর অমন ক'রে ভয় পেতো না। তাই ভয় পেয়ে সরে গেছিলে তুমি।

সে কথা শুনতে শুনতে আনন্দরূপের নিজের স্বত্বা হারিয়ে যাচ্ছিল প্রিয়ার গর্বিত ভাবের মধ্যে। তার চোখের মধ্যে ভরা জল থৈ থৈ ক'রছে। কান্না আসছে তার দারুণভাবে। কিন্তু কাঁদতে চেয়েও কাঁদতে পারছে না। এর মতো কষ্ট নেই! কেন না একবার কেঁদে ফেললেই—কষ্টের অনেকটা অবসান হয়। তাই দেখে কথা থামিয়ে রাধা মিষ্টি আদর ঢেলে দিল প্রিয়ার জলে ভরা চোখে। শান্ত হয়ে উঠলো তার ঐ অবস্থার সেই ভয়ানক অস্থিরতা।

ঐভাবে তাকে শান্ত ক'রে রাধা বলল—ওগো আনন্দ, কৈ তুমি আমাকে ক্ষমা ক'রেছ ত? আর কয়েক মাস পরেই আমি তোমার সেদিনকার অবাঞ্ছিত সন্তানের মা হব তাই বলে কি তুমি আমায় ক্ষমা ক'রবে না? শুধু একটা সামাজিক ঘটনা ঘটবার আগেই এমনটি হলো বলেই কি এর জন্যে কোন রকম ক্ষমা নেই?—বিয়ের পর সবই বুঝি বৈধ? আর তার আগে সবই বুঝি অবৈধ? তা হলে আনন্দ, তুমি যে আমাকে অনেক বছর ধরেই ভালবেসে এসেছো, সেটাও ত আনন্দ, তোমার উচিত ছিল এই পৃথিবীর আলো-বাতাসের মধ্যে থেকে সরিয়ে ফেলা! কিন্তু রূপ, তুমি ত' তা ক'রলে না! *আমার প্রতি তোমার সীমাহীন ভালবাসাই যে তোমাকে সেরকম কিছু* ক'রতে দেয় নি। তবে তোমারই দেহে থেকে আমার শোণিতে অঙ্কুরিত হওয়া এই ভাবী শিশুটির বেলায়—কেন অমনটি ক'রতে চেয়েছিলে?

আরো আবেগের সঙ্গে রাধা জানালো—তুমি কি জানতে না, যে, তোমার ও আমার এই যৌথ প্রয়াসের সৃষ্টি কাজের মূলই হলো—আমাদের ভালবাসার

পূর্ণাহুতি? ধর আনন্দ, বিয়ের পরে আমাদের জীবনেতে কোন না কোন সময়ে—আমার মধ্যে তোমারই সন্তানের জন্য প্রাণ সৃষ্টি করার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারতো। আর সম্ভাবনা দেখা দেওয়া কি হওয়াটা মোটেই অস্বাভাবিক কিছু নয়। রূপ, তকন সে সন্তানের ব্যাপারে বৈধতার প্রশ্ন জাগে না ত'? আর যত্ন প্রশ্ন জাগে তার সবই আমার মত মেয়েদেরই ব্যাপারে? আনন্দ, বাস্তবের মধ্যে সমাজ অনুমোদিত বিবাহিত জীবনেতেও ত দৈনন্দিন হাজার রকম অবৈধ ব্যাপার ঘটে চলেছে!—কিন্তু সে নিয়ে ত সমাজের কোন রকম মাথা ব্যথা হ'তে দেখা যায় না? বরং নিশ্চিন্তে হেলে-দুলে ঘুমিয়ে থাকে সে সব সমাজ ব্যবস্থাগুলো। কোন জুজুবুড়ির অতি দাপটে তার মুখটি সেলাই করা থাকে। সে মুখ খোলবার উপায় থাকে না তার। এই, চুপ করে রইলে কেন? কথা বল লক্ষ্মীটি। ছিঃ, পাগলামি করে না। ওগো আনন্দ, এবারে ক্ষমা ক'রেছ নিশ্চয়?

রাধা কথা শেষ ক'রলো। তার বলার যতটুকু ছিল, বলেছে সে ততটুকুই। এবার আবেশে ভরিয়ে নিজের মাথা রাখলো আনন্দরূপের কাঁধেতে শুইয়ে। হাতের আঙুল দিয়ে স্বামীর সুন্দর মুখেতে বুলানো পরশ লাগিয়ে—আদর ক'রতে লাগলো আবেশ দিয়ে।

নিজের ভুলে আর রাধার মহানুভবতার শান্তরাগে ভরানো ভাবী মায়ের অপূর্ব গরিমায় সুস্নাতা মূর্তির কাছে—এই মুহূর্তে আনন্দরূপের অভাবনীয় পরাজয় ঘটে গেছে। রাধা মেয়ে হয়ে যে অসম সাহেসের পরিচয় দিতে পারলো, ছেলে হয়ে আনন্দরূপ ত তার এক অংশও সাহস ক'রতে পারেনি। প্রিয়া নারী যা ক'রতে ভয় পায়নি, তাই ক'রতে ভয় পেয়েছিল তার-ই প্রিয়তম পুরুষ। সত্যি প্রিয়তমা স্ত্রীর কাছে এই পরাজয় স্বীকারের মধ্যেই তার আনন্দের সুখ সব চাইতে বেশী। তাই মনে ক'রে আনন্দরূপের পঁচিশ বছরের পরিপূর্ণ যৌবনের সুখী প্রাণটি কেঁদে উঠলো—শিশুর মত। তার চোখ থেকে জমা হয়ে থাকা জল দুই গাল বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো বিছানার ওপরে।

তাকে ও ভাবে কাঁদতে দেখে রাধা তখন অস্থিরা হয়ে উঠলো। এ সে চায়নি কখনো। অন্ততঃ তার লীলার সঙ্গীকে কাঁদতে দেখলে পর নিজেকে না কাঁদিয়ে রাখা যায় না। আনন্দরূপের বুকের ওপরেতে রাধা উপুড় হয়ে পড়ে বলল চোখের জল ফেলছো? কষ্ট পেয়েছ?

বলতে বলতে রাধা ক্ষিপ্রগতিতে আনন্দরূপের জল ভরা চোখ থেকে সমস্ত জল—মুখ লাগিয়ে পরশে পরশে শোষণ করে নিল। শেষে বলল রাধা—আমার রূপ, এবার বেশ একটুখানি খিল্‌খিল্‌ ক'রে হাস।

ঝক্‌মকিয়ে তখনি হাসির ঝিলিমিলি ফুটে উঠলো আনন্দর মুখেতে।—তুমি রাধা। তুমি আমার ভাবী সন্তানের মা হবে! তুমি মিষ্টি রাধা! তুমি মিষ্টি মা হবে। উঃ, কি সুখের কথা! রাধা, তুমি শুধু অফুরন্ত সুখ! দুষ্টু রাধা! তুমি শুধু সুখ আর সুখ!

বলতে বলতে ছোট্ট শিশুর মতো হয়ে উঠলো আনন্দরূপের মনের তাজা উচ্ছলতা। সুখের শুধু মধুর নাচ নাচতে লাগলো—তার প্রাণ জুড়ে। খুশীয়াল যুবক

তাই হাত দিয়ে টেনে নিয়ে রাধার লাজুক শরীরের যৌবন চঞ্চ লতাকে বুকেতে কঠিন বাঁধনের ভেতরে জড়াতে লাগলো। মুখ দিয়ে তার শুধু খুশীবিভোর হাসির রঙীন ছর্‌রা ছুটেছে। আর নাচছে। রিদম্ ধরে ধরে।

ওদিকে রাধা তার সেখানকার মোলায়েম রূপের নিটোলতার মধ্যে মধুরভাবে অপরূপ পুলকানন্দের ছোঁয়াচ্ পেল। তার বুকের শিল্পশোভার এই অনন্য ব্যঞ্জনার মধ্যে—নিজের মুখখানাকে এনে রেখেছে আনন্দরূপ। রাধা অনুভবের পরশে পরশে মাতোয়ারা হয়ে উঠতে লাগলো—প্রিয়তমেরই মুখের এক একটা উষ্ণ পরশের মদিরা ভরা—সিক্ত বিহ্বলতায়। সুখের তালে তালে আর খুশীর কাকলিতে—কলকলিয়ে উঠলো রাধার চব্বিশ বসন্তে ভরা রাঙা যৌবন।

—আনন্দ। আমার রূপ। তুমি আমার ভাবী শিশুর বাবা। আর আমি তার মা। কত সুখী আমি! সুখী তোমারই জন্যে।

কথা বলে নিয়ে আনন্দরূপের বুকেতে কঠিন বাঁধনের মধ্যে বন্দী অবস্থাতেই—-হাসির কুশীবিহ্বল ঝরনায় ঝলমল করে নেচে উঠলো—প্রিয়ার সুখ আর খুশী। রাধা মুখ নীচু করে আনন্দরূপের গালেতে হাসির সে ছোঁয়াচটি বসিয়ে দিল।—খুশীরই তরঙ্গের মাঝে আলো আঁধারির লুকোচুরি খেলাতে করা সুখের মদির সুরভিতে কল-কাকলি মুখর হয়েই থাকল তারা দু'জনা— বেশ কিছু সময়। তারা দু'জনা। এক সুখ। আর তারই খুশী। দুষ্টু আনন্দরূপ আর মিষ্টি রাধা।

—তখন রাতের শেষ যাম।

—মহাকবি শ্রীমধুসূদনের জন্মদিনে, ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৫৭।

পলাশের লাল রঙ্

আদরের শুচিস্মিতা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়া, সুচরিতাষুকে—

খোলা বারান্দায় তখন বসন্ত-বিহ্বল হওয়া সন্ধ্যার রূপোলী চাঁদের সুষমার মধ্যে বসেছে—তারা দু'জনা।

বসে আছে তারা এক জোড়া কপোত-কপোতীর মতো মধুমাসের কল্-কূজনতায় মুখর হ'য়ে। জ্যোৎস্নায় স্নান করা সন্ধ্যার রূপোলী আলোর রঙীন ঝল্‌মলানিতে তাদের দু'জনাকে দেখাচ্ছে বড় বেশী—নয়নাভিরাম। বড় বেশী মধুরতায়—রিমঝিমানো।

বাসন্তী চাঁদের সুধা মেখেছে সমস্ত দেহ ভরিয়ে, আর মন রাঙিয়ে—তারা দুই—রূপদর্শন যুবক ছেলে, আর তারই শত আবদার জানানোর, আদর দেওয়ানোর সেই শত রূপে শত বার কোরে দেখা—যুবতী মেয়েটি।

ঋতুবিচিত্রার পরিণয়ে আশ্লেষ-বাঁধা—তারা একজন আর্য্যপুত্র বর।—আর অপরজনা হোল তারই—বরনারী প্রিয়া।

দু'জনা তারা। শুধু দু'জনা।

দুটি দেহ। দুটি মন। অবশ্য একে ও অপরে আলাদা হোলেও—স্বত্বে আর অস্তিত্বে—ওরা হোল এক। তখন আর দুই নয়।

ঠিক—একই অস্তিত্ব। যেন—এক অঙ্গে থাকা একই রূপ!—দু'জনারই।

ওরা দু'জনা, মানে—বরপুরুষ অরিজিতের। আর তারই বরনারী অশোকার।

বারান্দার রেলিঙের ধার ধরে বসানো ফুলের টব্‌গুলোকে ছুঁয়ে গেছে রজনীগন্ধার কুঁড়ি ফোটাবার জন্য রাতের আগমনী গান গেয়ে চলা মর্মর বাতাস।

সেই মর্মর করা বাতাসের শন্ শন্ গতির চঞ্চল তাড়নায় নিজেদের ফুটিয়ে তুলেছে রজনীগন্ধারা। আর ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে তাদের অশেষ পরাগের সুবাসখানাকে। সে সুরভির মদিরতায় তারা দু'জনা তখন বিভোর।

তারা বসে আছে নীল ভেলভেটিনের চাদরে ঢাকা একখানা ডিভানের ওপরে।

দু'জনার এই সময়টায় বসে থাকার ভঙ্গিমাটুকু যে কোন শিল্পীর তুলির টানে টানে ক্যানভাসের ওপরে চিত্র হয়ে ব্যাঞ্জনা দিতেপারে—এক যুগল-দম্পতিরই। ওদেরই প্রণয়েতে সপ্রগল্‌ভিত থাকা আনন্দেরই এক নিরালা ঘেরা নিঝুম মুহূর্তকে।

আকাশ রঙীন দেওয়ালেতে ঠেসান দিয়ে অরিজিতের বসবার ভঙ্গি। তার গায়ে ঘিয়ে রঙীন রেশমের তৈরী শৌখিন পাঞ্জাবি। রূপোলী আলোর ঝলকানি লেগে জামার রঙ আরো রঙীন হয়ে আছে ঝল্‌মলে ভাবখানা নিয়ে। ধুতির কড়া মাঞ্জা লাগানো পাড়েতে চুনোট করা রয়েছে। পাট পাট ক'রে ভাঁজ করা কোঁচার প্রান্তে

তৈরী ফুলখানা—একটু তফাতে নীল্ ভেলভেটেডর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে—বিস্তৃত হয়ে খুলে যাওয়ায়। বসে আছে নিজের শরীরের ডান দিকে, একটুখানি হেলে। কাত হ'য়ে।—আর বরনারী অশোকা—তার বর-পুরুষের বুকেতে আরাম ভরিয়ে হেলান দিয়ে বসে থেকে ডিভানের নীল আচ্ছাদনের ওপর—পা দু'খানা মুড়ে নিয়ে শাড়ীর আবরণীতে রেখেছে আবৃত। প্রিয়া যুবতীর ঐ সময়কার আনন্দ-সায়রেতে ডগ্‌মগ্ করা শরীরের লাজুক লাজুক ভাবেতে পরিপূর্ণা যৌবনাভারখানাকে—প্রিয় তার নিজের বুকেতে সেখানকার স্নিগ্ধতা ভরা কামনার মায়া-জালেতে করিয়েছে বন্দী। অমন ভাবের একান্ত অন্তরঙ্গতার মধ্যে বেঁধে রাখবার জন্যই অরিজিত তার বাঁ হাতের কঠিন ক'রে তোলা বাঁধন দিয়ে—জড়িয়ে জড়িয়ে ধরেছে অশোকার বাঁ হাতের পেলবেতে পেশল কব্জিখানায়। প্রিয়র একটি মাত্র হাতের কঠিন বাঁধনের মধ্যে থেকেই প্রিয়ার অপূর্ব অঙ্গরাগ নিয়ে ঝল্‌সানো রূপাতিশয্য হয়ে পড়েছে—শান্ত আর ধ্যান-সমাহিত। চোখ ঝলসানো লাল সুইস্ সিল্কের সাজেতে রঙীন থেকে সুস্মিতা বধূটির গরিমায় মশগুলা অশোকা—একটু নত হয়ে আপন মাথা ধরে রেখেছে প্রিয় সুজনেরই কাঁধেতে। আসমানী রাগে রঞ্জিত প্রণয়েরই রভসে রভসে মুখর শুচিশ্রীখানা এক পরম খুশীর কারণ হয়ে অশোকার—মুখশ্রীরই সবটা নিয়ে আছে জড়িয়ে। প্রিয়ার সে অপরূপতার ছান্দস্ সুষমাকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে অরিজিতের টানা টানা চোখ দুটি পীনোদ্ধ হয়ে থাকলো তারই ধাঁধিয়ে দেওয়া বিভাসেরই মধ্যে। নিজের প্রেয়সী স্ত্রীর রূপধন্য করা চোখের কাজলে রাঙা দুটি কালো কালো কুট্টিম ঘিরে যে চাহনি ঝরিয়ে রেখেছে সুখলোভাতুর করা যৌবনাকাঙ্ক্ষা, আর মদালসা এক বিলাসকে—তারই আঙ্গিনায় পড়ে বিহ্বলিত হয়ে গেল প্রিয়র মনের আকুতিগুলো। তাকিয়ে তাকিয়ে প্রিয় দেখলো—তারই অশোকার সব সময়ে স্মিতা থাকা অধরেতে—গাঢ় লাল পরাগ দিয়ে মাখানো অবস্থায়, টক্ টক্ হয়ে ফুলে ওঠা ঠোঁট-যুগলের উজ্জ্বলা আভায় স্পষ্টাক্ষরেই যেন ছাপিয়ে গেছে—স্বর্গ-দুহিতা উর্বশীরই মুখের মতো কুন্দশুভ্র হাসির কল্‌কল্ আর ছল্‌ছল্ করা ঝরনাখানা।

শুভ্র মতন ঝরনা-ধারায় ভেসে যাওয়া কাকলি-মূর্ছনা নিয়ে আদুরে গলায় আদরের রেশ ঢেলেই বরনারী অশোকা বললো—এই, কী দেখছো?

প্রেয়সী বধূর দু'হাতের পেলব বাঁধনের ভেতরে তখন জড়ানো অরিজিতের গলা। আর অন্য দিক থেকে মৃদুল ছন্দে বরপুরুষের ডান হাতের আঙুলগুলো অশোকার ছবির মতো নিখুঁত চোখে-মুখে-গলায়-বুকে-কাঁধে-গালের দু'ধারের সুন্দরী পেশলতায়—বুলিয়ে বুলিয়ে আদর ক'রে বেড়াচ্ছে।

অশোকা আবার বললো মুখের কাকলি-ভরা হাসির কল্‌কলানি তুলে—এই রিজিতা, শোন, কৈ বললে না ত' কী দেখলে এতক্ষণ ধরে আমার মুখেতে?

প্রগাঢ় রীতির ঋতুসাজে মুখর ভালোবাসা জানানোর মধ্যে নিজেকে উজাড় করে বিলিয়ে দিয়ে একমাত্র ভালোবাসারই সুজন ছেলেটির জন্য অশোকা নাম রেখেছে—রিজিতা। আপনার মনের মিষ্টি মাধবী-রাগ মিশিয়ে প্রেমিকা স্ত্রী তার এই সুন্দর-মনা

স্বামীর আসল নাম থেকে—প্রথম অক্ষরটাকে বাদ দিয়ে শেষের অক্ষরের সঙ্গে একটা আকার যোগ করে ডেকেছিল—"রিজিতা" বলে—ঠিক দু'টি বছর আগেতে, সেই সেদিনকার প্রেমিক অরিজিতের বাইশ বছরী যৌবন-মাধুর্যে সেজে ওঠা—সেই সুন্দরম্ পরিচিতিখানাকে। ঐ দু'টি বছর আগের সেদিনটি ছিল তাদের দু'জনার কাছেতেই—বিবাহের পর প্রথম মিলন রাতের দ্বিতীয় যাম ঘেরা, ও যৌবন দিয়ে সাজা বাসরের মধ্যে। অশোকার মনেতে আজও সুস্পষ্ট হয়ে গাঁথা আছে এক অখণ্ড রূপ নিয়েই—সেই মনোরম রাতেতে অবিরাম আনন্দ-রভসেরই আদানে আর প্রদানে প্রগল্‌ভ হয়ে ওঠা—যুগপতে ভালোবাসাবাসির টুকরো টুকরো ছবিগুলো। এখনো অশোকার মনে জাগরূক হয়েছে—সেদিন ব্যারাকপুর রিভার সাইডের এই বিরাট জমিদার বাড়ীর বড় ছেলে অরিজিত রায়ের (বিলেত থেকে অল্প বয়েসেই ব্যারিস্টার হয়ে সদ্য প্রত্যাগত) জীবনে সজীব থাকা যৌবন বিভূষিত ক'রে এগিয়ে এসেছিল তারই কিশোর প্রাণেতে দোলা জাগিয়ে তোলা—দীর্ঘ আট বছর আগের সেই দুষ্টু মেয়েটি—পশ্চিমের এক বাঙালী জমিদারেরই সেখানকার লরেটো কন্‌ভেন্টের দশম শ্রেণীতে পড়া, সেই আদুরে মেয়ে—সেদিনকার মাত্র ষোলটা শীত আর গ্রীষ্মের তাপে সেজে ওঠা অনন্যা রূপবতী রূপে—অশোকা বন্দ্যোপাধ্যায়ার কুমারী যৌবন—সবে মাত্র যা রমণীয় যৌবনের সবুজে হয়েছিল—শত ধারে উন্মেষ নিয়ে বিভাসিত।

ঝরনা-ধারার মতো হাসির কাকলিতে মুখর থেকে গেছে অশোকার অধরের দুটি ঠোঁট ধরে লাল পরাগ রেণুতে রাঙিয়ে থাকা—আলোক-নির্ঝরিত আভাকে ছাপিয়ে ছাপিয়ে। আবার ডাকলো অশোকা আদুরে গলায়—এই, এই রিজিতা, শোন?

অরিজিতকে ডেকেছে তারই প্রিয়া-সুজনা। ডাকলো আবার "রিজিতা" বলেই। এই নামে ডাকতে ডাকতে—নিজের মনেতেই অশোকার মনে হয়—এই নামটা তার শুনতে লাগে সব থেকে মিষ্টি। আর সেই সঙ্গে দ্বিতীয় কারুর অমন নাম নেই বলে তা আর এক দিক থেকে অমূল্য! ও ভাবে—এই রিজিতা নামের মধ্যে বেশ একটা মনোরম আর কবিসুলভ কল্পনার অনুরণখানা খুঁজে পাওয়া যায়।—তাই নিরালা ঘেরা, নিঝুম পরিবেশেতে যখনি নিজের আনন্দে আর খুশীতে বিভোর বুকের সুখ-ঝরানো অঙ্গনে বন্দী করাতে করাতে—এই মধুরে আর যৌবনে সুন্দর হ'য়ে ফোটা যুবকটির খুশীময়তায় ঝল্‌মল্ করা স্পর্শখানা পায়—তখনি অশোকা আজকের এই মুহূর্তটির মতোই আবেশে নরম আদুরে গলায় ডেকে ওঠে—"রিজিতা। আমার রিজিতা।"—বলে। হ্যাঁ। অশোকার মনে এখনও জ্বল-জ্বলে প্রভা নিয়ে ভাবে-বিভাবে মুখর হয়ে উঠছে একটি মধুর ছবি।—

অশোকার মনে রুমঝুম ক'রে নেচে উঠলো ছবির পর ছবি।—সত্যি সেদিন এই বাড়ীরই একটি ছবির মতো সাজানো ঘরেতে পাতা হয়েছিল নব-দম্পতির জন্য মিলন বাসরেতে যৌবনায়ন করা প্রথম রাতটিকে। সেদিন রাতের প্রথম যামখানা ঘন হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই এগিয়ে এগিয়ে এসেছিল যুগল স্বত্বায় নাচানাচি করা প্রণয়ের বাঁধনহারা স্রোতখানা। শুধু ফুল আর ফুলে ভরা সুখ-শয্যার মধ্যে অরিজিতের যৌবনাঙ্কিত দেহের বাইশটা বছরের এক একটা মধুরে উচ্ছলিত পরশ অশোকাকে

করে তুলেছিল হত-চকিতা, প্রণয়-বিহ্বলা। ওরই রভসিত রবাব মুখরতাকে প্রিয়ার নরমে-পেশলে-মসৃণতায় পর্য্যাপ্ত পুষ্পস্তবকাবনম্রা হয়ে থাকা বুকেতে—দুটি পেলবে সুবলয়িত হাতের কঠিন থেকে কঠিনতর করা বাঁধনের ভেতরে বন্দী ক'রে ক'রে রেখেছিল—প্রিয়র বয়েসখান' থেকে আড়াই মাসেতে পিছিয়ে থাকা—বাইশ বসন্তেরই নিখুঁত সৌন্দর্য্য হ'য়ে বিকশিতা—বধূ অশোকার সলজ্জ সুতনুকার—আকার ঘেরা জ্যোতির্ম্ময় রূপশ্রীকে, ধাঁধিয়ে দিয়ে।

ঐ অবস্থার ভেতরেই একবার বরপুরুষ তার প্রতীক্ষিতা বরনারীর সুস্মিতা মুখের অধরে—কানায় কানায় লাল রঙ্ ছাপিয়ে অজস্র ভাবে নিজের মুখের মধুলোভী ভাণ্ডার থেকে সুধা বিতরণ করার মধ্যে—দিয়েছিল পরিপূর্ণতায় ভরাট কোরে।—আর তার পরেতে, তখনি আরেকবারের পালায় নেমে বধূ দ্বিগুণ ভাবে প্রতিদান দিয়ে দিয়ে পূর্ণ করিয়ে তুলেছিল—নিজেরই পরিণীত পরিচয়ের শ্রেষ্ঠ সুখ—স্বামী অরিজিতকে।

সত্যি দু'বছর আগে, সেদিনটিতে অরিজিত প্রথম দিককার সক্রিয়তায় প্রণয়ের কারুকাজ—চিত্র-বিচিত্রায় প্রিয়ার দেহের সবুজ ঘন বাঁকে বাঁকে ফুটিয়ে রেখে—বধূর যৌবনান্বিত লজ্জা-ধারাটিকে অমন ভাবেতে সুখ দেওয়া-নেওয়ার অজস্রতায়, বেপমান করিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিল বলেই—সে সময়েতে সত্যি মাত্র কয়েকটি মুহূর্তের এ-ধার থেকে সক্রিয়া হয়ে ওঠা অশোকা—সপ্রগল্ভা মেয়ের মতো দাম্পত্য সাজে রীতি মাফিক ঋতু ফুটিয়ে হয়েছিল—বধূ নিলাজিতা। তা' না হলে পর দয়িত-স্বামীকে নিজের লাল লাল অধরেতে, বাদুলে বাতাস কাঁপিয়ে যাওয়া হাসির ঝরনা থেকে সুধা বর্ষণের ভেতর দিয়ে—পারতো না প্রিয়কে পরিপূর্ণ আবেশে আর আমেজে —স্নান করাতে!—আর ঠিক সেদিনই রাতের শেষ যামের দিকে ঘুমিয়ে পড়ার আগে—চরম আর পরম সুখে বেপথুমন অবস্থায় বরপুরুষ অরিজিত তার বরনারীকে বলেছিল—"অশোকা। এই মেয়ে! বল, আজ থেকে আমায় তুমি কী বলে ডাকবে?"

সে কথা শুনে একটুও দেরী হয়েছিল না অশোকার পক্ষে তখনি নতুন একটা নামেতে—অরিজিতকে ডাকতে যাওয়ায়। আগে হতেই তার মনে ছিল এই নামটুকু। লাজুক লাজুক হাসির ছর্‌ররা ছুটিয়ে সেদিন অরিজিতের কানে কানে প্রগল্ভতায় উপছানো আদরের মধ্যে বলেছিল—"রিজিতা। আমার রিজিতা। এই, কেমন, এখন থেকে তা হলে তোমায় আমি ডাকবো এই নামেতেই?"

প্রিয়াকে আদর মাখাতে মাখাতে অরিজিত বলেছিল—"বেশ। বেশ। আজ থেকে তোমার কাছে আমার নাম হোল এটাই। ভারী সুন্দর কিন্তু! এই অশোকা, যেমন তুমি, না?"

তারপর,—হ্যাঁ, দুটি বছর পরে—আজও ঐ একই ভাবে আর একই রূপের ছন্দ ফুটিয়ে রেখে অরিজিতের কানেতে প্রগল্ভতায় মুখর আদর মাখানো সুরটুকু ঢেলে দিয়ে ডাকলো অশোকা—রিজিতা। এই রিজিতা। বলবে না, কী দেখছিলে এতক্ষণ ধরে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে?

প্রিয়ার প্রশ্নের দিকে নজর রেখে অরিজিতের চোখে-মুখে মধুর হওয়া হাসির ভেতর দিয়ে এক জানা ও অজানা অপরূপতার সপ্রগল্‌ভ ইচ্ছাখানা উঁকি দিয়েছে—প্রিয়তমেরই আপন মনের সবুজেতে ঘন হয়ে থাকা—গোপন কুঠুরীরই অপার রহস্য মাঝেতে লুকিয়ে থেকে।

বলল অরিজিত—দেখেছি কিছু। অনেক কিছুকেই। কিন্তু তবু বলবো না।

—এই। কী, তা হলে বলবে না ত'? বেশ, ভাল কথা। আমি তা হলে আগে থেকেই এটাও তোমায় এখনই জানিয়ে রাখছি, যে আগামীকাল ভোরের সময় তোমার সঙ্গে শিকারেতে আর যাচ্ছি না। বুঝলে? এই, ছাড় এবার। আমায় কাজে যেতে দাও। এই, ছাড় এবার, ছিঃ রিজিতা।

নিজেকে তখন অরিজিতের দুটি হাতের কঠিনতর বাঁধন থেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা কোরল অশোকা।

অরিজিত বলল—আমি তোমায় ছাড়বো না। আর তোমায় এখান থেকে আমি যেতেও দোবনা।

অশোকা বলল—এই, বেশ ত' মজা! ছাড়বো না আর দোব না বললেই হোল বুঝি, কি গো, বল?

বলল অরিজিত দুষ্টু হাসির গাঢ় ঝিলিক ছড়িয়ে—ছেড়ে যে তোমায় এখন অন্য কোথাও চলে যেতে দোব না, সেটা ত' তুমি ভাল করেই দেখতে পাচ্ছ। এই অশোকা, এবার তুমিই বল, চেষ্টা করে কী নিজে থেকে আমার হাতের এই বাঁধনখানা ছাড়িয়ে নিতে পারছো?

তখনি অশোকা জানালো—নিজেকে এখন সত্যি তোমার দাপট থেকে সরিয়ে আর ছাড়িয়ে নিতে পারছি না যে, সেটা কিন্তু খুবই সত্যি কথা। শুধু আমি কেন, আর অন্য কোন মেয়ের পক্ষেও নয় কো এটা সম্ভব, সেও অনায়াসে তোমার এই অশেষ রকম দস্যিপনার কবল থেকে নিজেকে আনতে পারবে না, ছাড়িয়া আর সরিয়ে! এই রিজিতা, বুঝলে, তোমায় এমনি দেখতে ত' দেখায় বড় বেশী শান্ত মতন, কিন্তু একবারটি যদি আমাকে নিরালায় পেয়ে নিজের বুকের মধ্যে আটকাতে পেরেছো কী, অমনি আরম্ভ হোল যত রাজ্যের দুরন্তপনা—এই আমারই ওপরে। একবার আরম্ভ হোল ত' সহজে আর তার থেকে নিষ্কৃতি নেই। আচ্ছা দস্যি ছেলে বাব্‌বা! উঃ, লাগে! ছাড়, এই। উঃ, সত্যি লাগছে বড়! ওগো, ছাড় এবারটি। আর বলব না তোমায় যে, তুমি দুরন্ত। তুমি দস্যি ছেলে। ঘাট হয়েছে বলে মেনে নিচ্ছি। সত্যি, সত্যি রিজিতা, তুমি দস্যি নও। তুমি, হ্যাঁ তুমি, বড় বেশী লক্ষ্মী ছেলে। কী, খুশী হোলে ত'? এবার ছাড়, লক্ষ্মীটি। আমায় একবারটি মা'র কাছে যেতে দেও।

নিজের শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে অরিজিত সজোরে চেপে ধরেছিল অশোকাকে। এখন কিন্তু হাল্‌কা ক'রে ধরেছে। চাপ পড়ছে না আর। অশোকাও আর উঃ শব্দখানা কোরছে না। তার মুখের লাল হাসিতে খিলখিলিয়ে উঠেছে একটা রঙীন আনন্দ, ও তার ছবিটি।

অশোকা আবার বলল—বেশ রিজিতা শোন, আমায় যদি এখন যেতে না দেও তা

হলে বল, তাকিয়ে তাকিয়ে আমার মুখেতে তুমি কী দেখছিলে?

বলল অরিজিত—আগেই বলেছি ত' বলবো না। খুব যে আমায় লক্ষ্মী ছেলে বলে ভুলোচ্ছ, না? কিন্তু অত সহজে আমি ভুলছি না। আর তোমায় ছাড়ছি না। আর তোমায় যেতে ও দিচ্ছি না।

অশোকা বলল—ছিঃ, যেতে দেও। বলছি, ছাড় আমাকে। ছিঃ দিনের আলোর মতোই জ্যোৎস্নায় ধোয়া এমন সন্ধ্যার খোলা-মেলা জায়গায় এভাবে আমাকে আটকে রাখতে একটুও লজ্জা করে না, বুঝি?

হাসির দুষ্টুমিতে নেচে উঠে অরিজিত বলল—লজ্জা আবার কিসের? আমি এমন কী আজে-বাজে কাজখানা করেছি যার জন্য লজ্জা পেতে হবে?

অশোকা বলল—তোমার মধ্যে কী লজ্জা-শরমের একটুও জ্ঞান আছে, না থাকে! যদি থাকতো তা হলে কী আর এমন ভাবে এই অসময়ে আমাকে আটক করে রাখতে? ওদিকে দেখ, মা আমাদের একলা একলা রান্না ঘরে বসে রাতের খাবারের ব্যবস্থা করছেন আর এ-দিকে কিনা তুমি আমাকে বুকেতে কেড়ে রেখে শুধু আদর আর সোহাগ করতেই চাইছ! এই, একলা একলা কাজ কোরতে বুঝি মা'র কষ্ট হয় না, না? ছিঃ, অনেক হোল আর এভাবে ধরে রেখো না। এবারটি ছেড়ে দেও। আমাকে কাছে বসে থেকে মাকে কোরতে দেও সাহায্য।

অরিজিত বলল—তবু যদি তোমায় এখন যেতে না দেই মায়ের কাছেতে,—তা হোলে কী তুমি খুবই জোর করবে আমার ছেড়ে যাবার জন্য?

অশোকা বলল—যেতে না দেওয়ার জন্য অবশ্য এখন তাই নিয়ে কোন রকম আর জোর কোরতে চাইব না। তবে এর জেরখানা কিন্তু সাধ ভরিয়ে পরে কোন এক সময়ে মেটাবো, তবে ছাড়বো।

জানতে চাইল অরিজিত—এই বল, কেমন ভাবে তা মেটাবে?

অশোকা তখনি জানিয়ে দিল—মাকে, মানে তোমার মায়ের কাছে বিশেষ কিছু বলে দিয়ে মেটাবো এর জের।

অরিজিত বলল—কী বললে তুমি, মাকে বলে দিয়ে! তা মাকে কী এমনটা বলবে শুনি?

অশোকা বলল—তা, এই আর কি, মানে মাকে বলবো আসল কথাটাই।

অরিজিত জানতে চাইল—আসলটা আবার কী?

অশোকা জানালো—আসছে কাল যে আমাকে সঙ্গে নিয়ে শিকার কোরতে যাচ্ছ, এই তারই কথাটা।

বিস্ময় প্রকাশ করে অরিজিত বলল—মাকে বলবে যে, তোমাকে নিয়ে আমি কাল শিকার কোরতে যাব, এই ত'? তা এ আর এমন কি জের মেটাবে!

অশোকা বলল—এখন ত' নিশ্চয়ই বলবে এ আর এমন কী! আগে ত' গিয়ে মাকে এটা খুলে বলি, তারপর, হ্যাঁ, তারপরই টের পেয়ে যাবে এর মজাটা কতদূর পর্য্যন্ত গড়াতে পারে!

অরিজিত বলল—এর ভেতরে মজাটা টের পাবার মতো এমন কী আছে, শুনি?

এর আগেও ত' কতবার তোমাকে নিয়ে শিকার কোরতে গেছি। কিন্তু অশোকা, কই কিছুই ত' হয় নি।

অশোকা বলল—এই রিজিতা বলি, আগে কিছু হয় নি বলে যে এবারেও হবে না কিচ্ছুটি, সে সম্বন্ধে কী তুমি একেবারে স্থির স্বীকৃতিখানা পেয়ে গেছ, বুঝি?

হেসে হেসে অরিজিত বলল—এই অশোকা, যদি বলি আমি এ ব্যাপারে স্থির।

ছন্দে ছন্দে হাসি মিলিয়ে অশোকা নিবেদন কোরল—তা হলে বলবো তোমার মধ্যে উপস্থিত বুদ্ধিখানার অভাব ঘটেছে। হ্যাঁ, সত্যি তাই হয়েছে।

অরিজিত কোরল প্রশ্ন—তার মানে?

বলল অশোকা—মানেটা হোল জলের মতো সোজা। তাও যদি বুদ্ধি খাটিয়ে ধরতে পারতে, তবে না হয় বুঝতাম যে তুমি সত্যি সব ব্যাপারেই থাক হুশিয়ার। কিন্তু বলি, পেরেছ কি তেমনটা খাটাতে?

অরিজিত বলল—তা সত্যি পারিনি।

বলল দুষ্টু হাসির ঝিলিক হেনে তখনি অশোকা—তা' পারবে কী ক'রে। সত্যি নিজে যেমন, বলেছো ঠিক তেমন ধারার কথাটাই। বলি রিজিতা, ছোট্ট এক খোকার মতো ব্যবহার করতে বুঝি খুব ভাল লাগে, না? তুমি সময়ে সময়ে হয়ে পড় এক ছোট্ট শিশুটির মতো নও ত' কী এর চাইতে কম, শুনি? হায় এটুকুও যদি তোমার মধ্যে খেয়াল কোরে রাখতে!

বিস্ময়ে বিমূঢ় চাহনি ফুটিয়ে বলল অরিজিত—এই অশোকা, তুমি যে এখন কী বলতে চাইছ, তার থৈ পাওয়া আমার পক্ষে সত্যি মুস্কিলের ব্যাপার হয়ে পড়লো দেখছি। এই মিষ্টি, শোন গো তোমার এখনকার কথার কিছুটি আমি বুঝে উঠতে পারলাম না। সত্যি বলছি। বিশ্বাস কর। তুমি এই একবার বলছ বুদ্ধির কথা, আবার তারপরেই বলছ তার ভেতরে যদি আমার খেয়ালখানা থাকত! এই, খুলে বল, কী ব্যাপার।

দুষ্টুমির রঙ্ মাখতে মাখতে বলল—তা কী আর এখন খেয়াল হবে রিজিতার! এখন এটিকে না বুঝতে পারলেই যে তোমার পক্ষে ভালো হয়, তাই না? সাধে কী আর তোমাকে ছোট্ট খোকা, মায় ছোট্ট এক শিশু বলতে ইচ্ছে হয়! হওয়ার মতো কারণ আছে বলেই তা বলতে ইচ্ছে ক'রে। এদিকে ত' বেশ ছোট্ট ছেলেটি সাজতে তোমার খুবই ভালো লাগছে, না? কিন্তু, এই দুষ্টু, এই রিজিতা, একটু ভালো ক'রে শোন এবার। এই, এই তুমি যে ওদিকে আবার আমার খুকুসোনার বাবা হবার জন্যই যে চাইছ—সুন্দরে আর মধুরে মশগুল হোয়ে, বলি, ভুলেই গেছ নাকি সে কথা? এই, ও কথা খেয়ালে রাখতে পার না কেন? খুকুসোনা ত' আর আমার একলারই হবে না। সে হবে তোমারও। আমার আদর খাবার, আর আদার পাওয়ার এই ''তুমি''টির জন্যও।—কথা শেষ কোরেই অশোকা তার প্রিয়তমর অধরে ঘন ভাবে ছোঁয়াল আদর করাবার জন্য—নিজের লাল লাল ঠোঁটে নাচানাচি করা দুষ্টু হাসিখানাকে, আবেশ থেকে।

অশোকা জানে, আর তার অরিজিতও জানে এটাই যে—তার প্রিয়া অশোকা

আজ যে প্রজায়নী ঋতুসাজেতে বিদিশার সন্ধ্যার মতো গরিমায় রিমঝিমাতে পেরেছে—তা প্রথম থেকে শেষ অবধি হোল পরম এক আকস্মিকেরই রূপ-ধৃতি। কবি-কৃতি।—তাই অশোকা এই নিরিখে বার বার আজ মনে না কোরে পারছে না "ড্রীম চিল্ড্রেনে"র স্রষ্টা—সেই মহান কথাশিল্পী চার্লস্ ল্যামের সুভাষিত ভাষণখানা। ল্যাম তাঁর "দি চাইল্ড্ এঞ্জেলে" যা লিখেছেন—তা আজ একটু সময় পেলেই বসে বসে পড়তে থাকে অশোকা। আপনার প্রজাবতী রীতিকায় আকার ঘেরা রূপসুষমায় ঝল্মল্ করতে করতে ল্যামের রচনার "স্বপ্ন শিশু"দেরই সুখী কল্পনায় না হোয়ে পারে না আজ অশোকা—বড় বেশী মশগুলা। আর ধ্যান নিয়ে জাগা শিশুময়তায় বিহ্বলা। ল্যাম্ তার কাছে মায়ের ভাবী আর্তিতে হোয়ে উঠেছেন—স্মৃতির স্মরণিকা। তারই সরণি ধরে অশোকা চলতে চলতে মনে কোরল "দি চাইল্ড্ এঞ্জেলে" লেখা আছে ঃ—

"Whence it came, or how it came, or who bid it come, or whether it came purely of its own head, neither you nor I know—but there lay, sure enough, wrapt in its little cloudy swaddling bands—a Child Angel........

Sun-threads—filmy beams—ran through the celestial napery of what seemed its princely cradle. All the winged orders hovered around, watching when the new-born should open its yet closed eyes ; which, when it did, first one, and then the other—with a solicitude and apprehension, yet not such as, stained with fear, dim the expanding eye-lids of mortal infants, but as if to explore its path in those its unhereditary palaces—what on inextinguishable titter that time spared not celestial visages ! Nor wanted there to my seeming—O the inexplicable simpleness of dreams!—bowls of that cheering nectar,

—which mortals *caudle* call below.—Nor were wanting faces of female ministrants,—stricken in years, as it might seem,—so dexterous were those heavenly attendants to counterfeit kindly similitudes of earth, to greet, with terrestrial child-rites the young *present,* which earth had made to heaven."

তখনি অরিজিতের মনের সুখ নেচে উঠলো এক মধুর ছবির ভাবী স্বাক্ষর সমেত। প্রজায়নী রীতির আরাধনা থেকে প্রিয়তম তার মঞ্জুলা স্ত্রীর চব্বিশটা বসন্তে ঘেরা দেহের ঋতুবিচিত্রায় স্পন্দিত করাতে পেরেছিল প্রজাবতী পরিচিতিকে শেষ পর্য্যন্ত। —ওরই সেদিনের স্পন্দন ধরে বরনারী অশোকা তার শারীরী-যৌবনে উপছানো খুশীর চরমা ব্যাপ্তিকে বিকশিত করাতে করাতে —বরপুরুষ স্বামীর সবুজেতে সবুজ যৌবনায়নে মাতামাতি কোরে—সঙ্গত হোয়েছিলই সুখ মিতালির—আলো ঝরা

আঙ্গিনায়।

তারপর থেকে মাস চারেকের মতো সময় অতীত হয়ে এলো।—ওরই মধ্যে সুদীর্ঘ রেশ টেনে চলা প্রায় তিন হাজার প্রহর থেকে প্রহরান্তরে, সৃষ্টির সূক্ষ্ম কারুকাজখানাকে পুষ্পিত করাতে করাতে চলে এলো তা সুবিনীতা অশোকার সুতনকায় আড়াল করা দেহ মঞ্জিলে।—আজ এই মুহূর্তে চারটি মাস পেছনে ফেলে রেখে অশোকার বরবর্ণিনী রূপখানা হোয়ে উঠেছে সম্ভবামি "খুকুসোনা"য় প্রজায়িতা। পুষ্পায়িতা।—সত্যি বরনারী অশোকা আর বরপুরুষ অরিজিত—এই দু'জনারই মীনপীয়াস দেহ-সায়রের অয়নে সঙ্গত থেকে যে রূপতিয়াসে ফুটিয়েছিল মধুরম্ সৃষ্টিকলার সাজ ও কাজ—এই তারই অয়নান্ত চয়ন সমেত, প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে পলে পলে—এক অপরূপ আনন্দ আর অশেষ ধারার খুশীময়তায় আনচানানো "খুকুসোনা"র জন্ম-সম্ভাবনারই রূপরেখা—যার সৃষ্টি পূর্ণতা পাবে—এক ছোট্ট-মতন ফুট ফুটে মেয়েতে। নাম তার এখনি হয়ে গেছে ঠিক। আপাতত থাকবে—খুকুসোনা!—নিজের মধ্যে সরব আভাসে স্বাক্ষর নেওয়া সম্ভাবিত মেয়ের জন্য বরনারী অশোকা অনেক আগে থেকেই মনে মনে ঠিক করে এসেছে—এই মিষ্টি আর হাল্‌কা মতন নামটুকুকে।

এবার অরিজিতের মনে পড়লো—একদিন দুপুরে বিশ্রাম করার সময় অশোকা কোথা থেকে যেন ছুটে এসে তার বসে থাকা সোফাখানার পেছনে দাঁড়িয়ে পড়ে—সামনের দিকে ঝুঁকে থেকে ওরই গলা এক হাতে জড়াতে জড়াতে—প্রিয়র কোলেতে চার্লস্ ল্যামের লাল রেক্সিনে বাঁধানো বইখানা ফেলে রেখে, একটা বিশেষ পাতার যেটা শব্দ কোরে পড়তে বলে, নিজেও সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তির মতো কোরে গেছিল পড়তে পড়তে—ঠিক যেখানটিতে মনীষী ল্যাম তাঁর "দি চাইল্ড্ এঞ্জেলে" লিখেছেন ঃ—"And in the archives of heaven I had grace to read, how that once the angel Nadir, being exiled from his place for mortal passion, unspringing on the wings of parental love (such power had parental love for a moment to suspend the else-irrevocable law) appeared for a brief instant in his station ; and depositing a wondrous Birth, straightway disappeared, and the palaces knew him no more. And this charge was the self-same Babe, who goeth lame and lovely—but Adah sleepeth by the river Pison."

শত রূপে দেখা, আর শতেক সাজেতে শত বার ধরে কাজল চোখের সঙ্গে চোখাচোখি কোরে—প্রিয়া তার প্রিয়তমের একান্ত কাছাকাছিতে থেকে যায়—অচেনা, আর অজানা! তাই প্রিয়াকে অপার বিস্ময়ের মায়াজাল থেকে ছাড়িয়ে এনে—তবে শেষ পর্য্যন্ত এবার বুঝতে পেরেছে অরিজিত—যথার্থই। সম্ভবা খুকুসোনার কথা শোনামাত্র তার মনের সমস্ত সুখ খুশীতে ভরপুর অবস্থায় শিহরণ তুলে গেল—সবুজ আনন্দের পুলক সঞ্চারণে।

আপন বরনারীর ল্যাজে আরক্তিম প্রণয়ের রভসতায় ভরাট থাকা মাধুর্য্যকে

নিজের দুটি হাতের মধ্যে ধরে রাখলো। চোখে-মুখে আদর করার জন্য আঙ্গুলের পরশ ছুঁইয়ে খুশীতে স্নান করাতে করাতে বলল অরিজিত—এই, অশেকা, বুঝলে তুমি না এখন আমাকে সত্যি আরো মুস্কিলে ফেললে। আমি ত' কিছুতেই বুঝতে পারছি না যে,—তোমাকে নিয়ে আগামীকাল শিকারেতে যাওয়ার প্রসঙ্গে এমন কী যোগাযোগ আছে আমাদের সম্ভাবিত খুকুসোনার সাথে? আর যার জন্য এ কথা তুমি এখন তুলেছ। এই, তুমি নিশ্চয়ই এটা নিয়ে বেশ দুষ্টুমি কোরছ, অশোকা! তাই না?

ও কথা শুনতে শুনতে বধূ অশোকার লাল অধরের রঙীন তীর দুটিতে ছাপিয়ে ছাপিয়ে ছড়িয়ে গেল, মুক্তোর মতো ঝক্ ঝকে হাসি। সেখানকার মায়াবেশ মাখানো রঙ্ আরো উজ্জ্বল হোয়ে ঝল্‌মলিয়ে পড়েছে। বরনারী তখন তার বরপুরুষের বড় বেশী মনোরম থাকা মুখে ডগ্‌মগ্ করা শান্তশ্রীখানার সামনে—দুষ্টু হাসিতে ছোপানো অধর-সমীপবর্তিকার ওপর দিয়ে—আপনার ছবির মতো আর কল্পনা দিয়ে ফোটানো সুনিপুণ ছাঁদের সপ্রগল্‌ভ মুখখানাকে—এগিয়ে নিয়ে এলো।

রভস ভরা হাসিতে কুঙ্কুমিতা থেকে বললো অশোকা—রিজিতা, আমি দুষ্টুমি ঠিকই কোরছি। এবার যদি গিয়ে মাকে বলে দিই যে, তুমি আমাকে শিকারেতে সঙ্গে কোরে নিয়ে যাচ্ছ, তখন? এই, বলি, তা হোলে কী আর তারপর আমাকে পারবে সঙ্গে নিয়ে যেতে? আমার এখনকার এই অবস্থায় আমাকে শিকারে নিয়ে যেতে চাইছ যে, তা জানতে পারলে পর আমাদের মা আমায় না যেতে দিয়ে, শুধু তোমাকেই বকবেন। ফলে মার কাছ থেকে বকুনি খাওয়ার পর আমায় নিতে না পারার দরুণ তোমার জন্য শিকারের আসল সুখটুকুই যাবে মাঠে মারা। তখন সল্ট্ লেকেতে তুমি আমায় পাশটিতে না পাওয়ায়, একলা একলা নীরস ভাবে শিকার কোরে বেড়াবে। আর, হ্যাঁ গো রিজিতা, আর আমি তখন শুধু আরামের মধ্যে মায়ের আদরে আদরে তারই চোখের কাছটিতে থেকে এক সময়ে হয় ত' লক্ষ্মী মেয়েটির মতন তাঁর কোলেতে মাথা রেখেই ঘুমিয়ে পড়বো।

অরিজিত বলল—বুঝেছি। এখন দেখতে পাচ্ছি তুমি দুষ্টুমি কোরেই আসছে কাল ডাক্ স্যুটিংয়ে বেরুনোটাকে নষ্ট করাবে। আমাদের ভাবী খুকুসোনার কথা তুলে এ ব্যাপারে এখন বেশ একটা চেষ্টা কোরছ যাতে যাওয়াটা আর না হয়, তাই ত'?

অখনি অশোকা বলল—কেন কোরব না শুনি! তুমি কী আমার উত্তরটা এখনও দিতে পেরেছো?

অরিজিত বলল—উত্তরটা যদি এখন দেই তা হলেও কী মাকে বলে যাওয়াটা বন্ধ করাবে?

অশোকা বলল—ছিঃ, ছিঃ। অত মন্দ আমি নই। এরপরে আর মাকে বিন্দু বিসর্গও জানতে দোব না যে, আমি আমার এই রকম অবস্থাখানা নিয়ে তোমার সঙ্গে চলেছি—ডাক্ স্যুটিংয়ে। সত্যি রিজিতা, এবার বল কী দেখছিলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে?

—শোন, তা হোলে, এই মিষ্টি।—অরিজিত বলল।

লাল হাসির ভেতর থেকে বললো অশোকা—এই, বল। আমি শুনছি, রিজিতা।

ঘন লাল সুইস্ সিল্কের চোখ ঝলসানো শাড়ীর মায়াবী সাজে ঝল্‌মল্ করা বধূ অশোকার সলাজ-প্রখরতায় রঙীন দেহকে অরিজিত হাতের কঠিনতর বাঁধন দিয়ে প্রগাঢ় ভাবেতে জড়িয়ে নিলো নিজের বুকের আশ্রয়েতে। ঐ অবস্থার আশ্লেষিত ভুবন থেকে সুখ আর খুশীতে মুগ্ধা বরনারী অশোকার— পেশলে সুউচ্চ রীতিকার ঘেরাটোপ দেওয়া বুকের অনন্যরূপম্ দুটি বেহায়া ছন্দ থেকে নির্ঝরিত পরশের কঠিনতা—চুম্বন কোরল দয়িত অরিজিতেরই বুকের আরামকে। বরপুরুষও অনুভব কোরল—মধুরতর আবেশে নেচে ওঠা নিজের বুকেতে আনন্দ-নির্ঝরিত-পুলকভার আহরণ করার তালে তালে—অশোকার দেহে শোভিত হওয়া সুরভিত আবরণ থেকে নির্য্যাস বিতরণ করা সুতনুর সব চেয়ে রঙীন থাকা অবস্থায় মাধবীরাগ ছড়ানো বুকের—সুন্দরম্ সুখখানাকে।

ভাব-মাধুরীর অমন বিভাবেতে প্রভাবিত হোয়ে শুভ্র হাসিতে ঝল্‌মলিয়ে উঠলো অরিজিত। আলোক-সম্পাতের অপরূপ ঝলকানি উপছে পড়ছে তখন তার চোখের টানা টানা রূপ ডিঙ্গিয়ে, মুখের কিনার ধরে ফুটে থাকা হাসিতে, আর হাসি-হাসি তৃপ্তিতে। তার মধ্যে বিকশিত হোয়ে আছে সুখের আনন্দ আর খুশীর রভসমুখরতাই ছড়াছড়ি। আদর কোরে বরনারীর পরাগ রেণুতে ছাপিয়ে থাকা আরাম জড়ানো গালেতে, একান্ততায় ছোঁয়ালো নিজের মুখের ডান দিকটি। প্রিয় তারই প্রিয়ার লজ্জার আবরণেতে ঘেরাটোপ দেওয়া—অশোকার আরক্ত যৌবন-গভীরতায় পেশলিত রূপ ও অপরূপ পর্য্যন্ত—প্রতিটি ভাব-প্রখরতার ভেতর শিহরণে শিহরণে বিহ্বল হোতে লাগলো। সবুজে সজীব দেহ নিয়ে আর মন নিয়ে বিভূষিতা দয়িতা তারই মধুরের জন্য রূপ জানাজানির মাতামাতিতে দিয়েছে—এক একটা আবেশে শত-ধার হওয়া—বিহ্বলতামুখর সুস্নিগ্ধ ছোঁয়াচের—ঘনঘোর নরমতা, কোমলিত নিটোলতা।—তাই বসন্ত-রাঙা সন্ধ্যায় রুমুঝুমু তান-মান-গমকের সঙ্গে আলোকাভিসারে নেমে—প্রণয় আর পরিণয় দিয়ে ঘেরা রূপারূপ থেকে—ওরই যুগল-স্রোতের ধারায় ধারায় মাতাল না হোয়ে পারলো না—ওরা। প্রিয়তমা স্ত্রীর সুন্দরী লাজে রঙীন দেহের সোনালী যৌবন—মুহূর্তে মুহূর্তে স্নান কোরে চলেছে দয়িতের প্রণয়-রীতির ঘনঘোর সুখাতিশয্যে। অরিজিতের মধ্যেকার আরাম আর আবেশের প্রতিটি আদর-ভরা ছন্দগুলোতে পুলকেরই দোলনে—ঝুলন খেলার মতো এক অপার অনুভূতির সৃষ্টি হোল। মনে হোল তার—সেও যেন অশোকার মনের গরিমাধারা—আর দেহের যৌবন-নাচা মদিরাধারারই যুগল রূপের সায়রে সায়রে কোরছে—আনন্দ-স্নান। মুক্তিস্নান। রূপস্নান।

মুঠো মুঠো আবেশ মাখাতে মাখাতে প্রিয়াকে জানালো অরিজিত—শোন, অশোকা। আমি, হ্যাঁ, তোমার এই 'আমি' তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম তোমারই মুখখানাকে। হ্যাঁ, সত্যি, দেখছিলাম আর দেখে দেখে ভাবছিলাম,—আমার প্রিয়া কোথা থেকে পেয়েছে এমন অনিন্দ্য রূপ-সুষমাকে! আমারই প্রিয়ার লাল অধরের ঐ কুন্দশুভ্র হাসিখানা কী স্বর্গ-দুহিতা উর্বশীরই দান, না আশীর্বাদ? এই, অশোকা, এটাই ভাবছিলাম তাকিয়ে দেখে দেখে।

ছোট্ট এক আদুরে মেয়ের মতো খিল্‌খিলিয়ে হেসে ফেলে বললো অশোকা—এই, শুধু এইটুকুই কী? জান, আমার মন বলছে যে, না তুমি দেখছিলে আরো কিছু!

প্রিয়ার মুখেতে পাল্‌টা প্রশ্ন জাগতে দেখে অরিজিতও হেসে ফেলল। বললো হাসি উপচে পড়া মুখেতে—মধুর ওগো, হ্যাঁ! ধরেছো তুমি ঠিকই। দেখছিলাম আরো কিছু।

অশোকা বলল—আরো কিছুটা যে কী, সেটাও বল আমায়। এই দেরী কোর না।

অরিজিত বলল—অশোকা শোন। এই যে বলছি।

—তুমি বল। আমি শুনছি রিজিতা।

একটু পলকের জন্য থেমে অরিজিত বলল—জান অশোকা, দেখছিলাম তোমার রঙীন হাসিতে ঝিলমিল করা জোয়ারের কানায় কানায় ভরাট থাকা অধরের মধ্যে, এই আরো কিছু দেখাটাকে। উর্বশীর মুখের মতো কুন্দশুভ্রতা কোরছে টল্‌মল্‌ তোমারই প্রগাঢ় লাল পরাগের ছোঁয়া লাগিয়ে রাঙানো দুটি ঠোঁটেতে। ঝল্‌সে ওঠা ঐ টক্‌টকে আভাকেই ভেবেছিলাম অরো কিছু বলে। আমার মধুর ওগো, আমার দুষ্টু, বুঝলে তাই দেখতে দেখতে আমার মধ্যে রণিত হোয়ে উঠলো এক সুন্দর ইচ্ছা। মধুরে তা অভিলাষিত। আকাঙ্খিত। তাই থেকে আমার অভীপ্সা জেদী হোয়ে উঠলো তখনি—তোমার লাল হাসিতে উপছানো অধরসমীপবর্তী থেকে সেখানকার উজ্জ্বলে-মধুর সুখাবেশকে আপানার একান্ততায় কেড়ে নেবার জন্য। তারপর বুঝলে অশোকা, তোমার ঠোঁটের অগ্নিশিখার মতো জ্বল জ্বলে রঙে রঙীনকোরে তোলাব আমার মুখখানা। এই, কথা শুনলে?

কথা বলতে বলতে মিষ্টি হাসির ছর্‌ররায় দারুণ ভাবে চক্‌মকিয়ে উঠলো—অরিজিতের মধুপিয়াসে লোভাতুর মুখখানা—একহঠাৎ পাওয়া সুখের ঝলস্‌ থেকে রাঙা ঝলকানির ঝিকিমিকিতে।

প্রিয়র ঐ অভিব্যক্তি দেখতে দেখতে—খুশীর সোনালী রঙ্‌ ভরা হাসিতে হাসিতে ঝল্‌মলিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত হোয়ে উঠলো অশোকার লাল অধরের কানাচে কানাচে—স্বামী অরিজিতের জন্য সমস্ত ব্যাপ্তিতে ভরা মধুরেতে সুন্দর সুখখানা। হঠাৎ আরামের এক টুকরো ঝলক্‌ দিয়ে রূপবতী অশোকার প্রণয়-পিয়াসী মুখের অনন্য শিল্পশ্রী ঝাঁপিয়ে পড়লো—বরপুরুষেরই রূপানুরক্ত মুখের ওপরেতে। অরিজিতের তিয়াসী মুখের সুন্দরতম অভিলাষকে মাতাল কোরে তুললো তারই প্রিয়া—ঠিক তখনি। প্রিয়র জন্য প্রিয়া তার রূপসী মুখের মাধুর্য্যের ঢল্‌ কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে—দেওয়াতে পারলো এক একটি ছোঁয়াচ-মধুরিমার—সঘন মদিরতা ভরা রভস্‌।

তাই থেকে বরনারী অশোকার মনেতে এক অপরূপ সুখের আদানে মাতামাতি করা অনুভাবখানা উঠেছে ফুটে। এবার অরিজিত সক্রিয় হোয়ে যোগ দিল তারই মধ্যে। বধু বরবর্ণিনীর মুখের অনিন্দ্যা শিল্পকলার শুচিশ্রীখানাকে—নিজের মুখের রবাবে ঝরা বাদুলে হাওয়ার ঝাপ্‌টার গতিতে মিল পাওয়া—সুখ-নেয়া করা স্পর্শগুলো দিয়ে দিয়ে বিপর্য্যস্ত কোরে তোলাতে লাগলো। ওরা দু'জনা আগের মতোই এখনো যুগপতে সঙ্গত থাকা দাম্পত্য-রীতিকার ঋতু ফোটানো আলিঙ্গনের কঠিনতর বাঁধনের মধ্যেই—একজন আটক কোরে রেখেছে—তারই আর

একজনাকে। অরিজিতের সবুজাভা পরিচিতির যুবকত্ব আপন বুকেতে না হোয়ে পারলো না—লাজহরণক—তারই প্রিয়ার ভরাট বুকের তাজা যৌবনতার প্রতি। তাই ঋতু বিপর্য্যয়ে আবাহন করা অশোকার মাধুর্য্যস্নাত বুকের সলাজেতে বাধা না মানায়—অসম্ভব রকমে তা বেহায়া হোয়ে পড়া আরাম-নির্ঝরিণীর পেশলিত ছোঁয়ায় বেঁধে—তীব্র বিভাসের আপীনেতে প্রতিভাস পাওয়া চুম্বনে চুম্বনে—প্রিয়ার লাজ কেড়ে নিল প্রিয়তমর বুকের লাজহরণক—ঐ যুবকত্ব—আর ঐ যৌবনত্ব।

ভালোবাসার মদির করা আরামের মধ্য অশোকার মন খুশীতে বিভাসিতা হোয়ে ওঠার তাড়নায় নাচতে যেয়ে, দোদুল দোলনেতে উঠলো দুলে দুলে। তার মনে হোল—অরিজিতের মুখেতে মুখ রেখে সে টাটকা পলাশ ফুলের রক্তবর্ণকে প্রগাঢ় ভাবের রূপরেখা ধরে রাঙিয়ে দিতে পেরেছে—আপন অধরেরই লাল আভারই সুধা মাখিয়ে মাখিয়ে। আর তারই স্বামীর ঔদার্য্য ভরিয়ে অরিজিত যেন প্রিয়ার বুকেতে নিজের বুকের তাজা যুবকত্বকে এলিয়ে রেখে, যৌবনায়নী আরামকে আহরণ করার—সৌন্দর্য্য-চাপে আর মাধুর্য্য-চাপে—সেখানকার দু'ধারার স্তবক-ভারে আনম্র—লাল লাল পলাশ ফুলকে দিয়ে নির্য্যাস তৈরী করাতে চাইছে। পলাশময় নির্য্যাসকে চিপে চিপে ওরই গাঢ় রঙ থেকে জৌলুস শোষণ করার ভেতর দিয়ে—নিজেদের দাম্পত্য স্বত্বার স্বত্ব সমেত তুলছে—রত্নত্বে রাঙিয়ে।

অশোকা কথা বললো আবেশের সায়র থেকে স্নান কোরতে কোরতে। মুখ আর চোখ ছাপিয়ে কাজল আঁকা পাতায়, আর লাল পরাগ মাখা অধর-কিনারেতে লেগে আছে শুধু সোনালী হাসির উজ্জ্বল ঝলমলানি। বলল অশোকা—এই, এই রিজিতা। শোন, একবারটি।

আর ওদিকে ঝিকিমিকি করা হাসির শুভ্রতা ফুটে আছে অরিজিতের মুখে। বলল সে—অশোকা, কিছু বলবে বুঝি?

অশোকা বড় মিষ্টি কোরে শুধালো—হ্যাঁ!

তেমনি ভাবে অরিজিতও বলল—এই মধুর, এই লাজুকা, বল।

—রিজিতা। এই লক্ষ্মীটি। আগে বল, আমার একটা কথা রাখবে তুমি? যদি বল রাখবে তা হোলে আমি এখনই তোমাকে বলব। লক্ষ্মী ছেলে, কথা রেখো কিন্তু।—তা বলতে বলতে অশোকা বেশ একটা মিষ্টি সুরের রেশকে অনেকটা পথ পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে গেল।

—এই, আমি কথা দিচ্ছি অশোকা। এবার জানাও কী তুমি বলতে চাইছ।—তা জানবার জন্য অরিজিতের আনন্দ মাখানো চোখে-মুখে দেখা দিয়েছে অশেষ এক আগ্রহের আভাস।

অশোকা বলল—রিজিতা শোন, আমার মনের মধ্যে কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর কোরে রাখা এমন কোন ভয় জড়ানো ভাবখানা উঁকি দিচ্ছে।

অরিজিত বলল—এই, তুমি কিসের জন্য ভয় পাচ্ছ? খুলে বল, তা না হোলে যে ধরতে পারবো না।

তখনি কথার উত্তর দিল অশোকা। প্রিয়ার কথার ভেতরে এবার সত্যি ভয়

জড়ানো স্বর অনুরণিত হোয়ে উঠলো। নিজেও তা বুঝতে পেরেছে। তাই অশোকার স্নিগ্ধতায় সাজানো হাসি হাসি মুখের আরক্ত রূপের ঝিলিমিলিতে একটু যেন করুণ ছবির স্পষ্টতা নিয়েই তা উঠেছে ফুটে।

প্রিয়র মুখের এক পাশেতে কপোলে কপোল ছুঁইয়ে আদর করার মতো কোরে ঘষতে ঘষতে অশোকা বলল—লক্ষ্মী রিজিতা। আমাকে তুমি এবার একটিবারের জন্য ক্ষমা কর। দোষ নিও না আমি তোমার সঙ্গে শিকারে যেতে পারবো না বলে। আর তোমার সাধ মিটিয়ে নিজের হাতে বন্দুক ধরে শিকার করা, সে ত' আমার এখনকার এই অবস্থার দিক থেকে দারুণ ভাবে অসম্ভব। সত্যি বলছি, আমার এই অবস্থারই কথা ভেবে তা থেকে সরেই থাকতে চাইছি। ওগো রিজিতা, শোন লক্ষ্মীটি, তোমার আর আমার, মানে আমাদের ভবিষ্যতের খুকুসোনার আসার সম্ভাবনা দিনে দিনে এগিয়ে যাওয়ায়, ওরই মঙ্গলের জন্য যেতে পারবো না। এই দুষ্টু, জান না তুমি যে, একেবারে প্রথমবার হিসাবে সন্তান-সম্ভবা অবস্থায় কোন মায়েরই উচিত নয় নিজের শরীরের ওপর অযথা দৌড় ঝাঁপ বা হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে দিয়ে পরিশ্রমের ধকলখানাকে সহ্য করানো। আর তারই থেকে দেহে-মনে ক্লান্ত কোরে তোলানোটা। এ ব্যাপারে মেয়েরা মা হোতে যেয়ে যতটা হুশিয়ার হোয়ে থাকে,—এই, মানে তোমরা ছেলেরা কিন্তু ততটা থাকতে পার না। তোমার প্রতিও আমার এই অভিযোগ থাকছে। হুঁশ থাকলে কী শিকারে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোরতে জোর? এই, শোন, আমার আজকের এই মিনতিখানাকে তুমি গ্রহণ কর ক্ষমা কোরে। লক্ষ্মী রিজিতা, কথা রাখ আমার।

কোন রকম আশ্চর্য্য হোল না অরিজিত প্রিয়ার এ সব কথা শুনে। একটু মাত্র বিস্ময়ও বোধ কোরল না। কেন না—ভাবী মা'র মনের হঠাৎ জাগা এই ইচ্ছার চাইতে আর কোন কিছু—এত দামী ও খাঁটি হোতে পারে না। শুধু অশোকা কেন,—যে কোন যুবতী মেয়েরই পক্ষে—প্রথমবার মা হওয়ার সময়েতে মনের অবস্থাখানা এমনই ভয়ের আর শঙ্কার ভারে—একরকম কাতর হয়েই থাকে। অরিজিত হৃদয় দিয়ে অকপট ভাবে সে কথাগুলোকেই এখন কোরতে পেরেছে—অনুভবে বিভাবিত।

এমন এক বিভাব মনেতে জাগার জন্য আনন্দ-সায়রে নেচে উঠলো অরিজিতের খুশীভরা প্রাণের সবুজে ঘন রঙটি। যৌবনে তাজা মুখর সাজটি। নিলাজে ভরা সুখটি। —আর তার পরেই সুদর্শন বরপুরুষ তার লীলসঙ্গিনীর রূপানুরক্ত মুখের শুচিস্নিগ্ধ লাল আভাকে আদরে আদরে বড় বেশী রীতিতে প্রগল্‌ভ কোরে তোলাতে লাগালো—নিজের হাতের আঙুল বুলানো শিহর দিতে দিতে।

অরিজিত বলল—এই মধুর, এই অশোকা, তুমি ঠিকই বলেছ। এটা আগে আমার খেয়ালে থাকলে পর নিশ্চয়ই তোমায় শিকারে নিয়ে যাবার জন্য জোর করতাম না বিন্দুমাত্র। তুমি আমাদের "খুকুসোনা"র মা হোতে চলেছো। তোমার এই অবস্থায় কখনো কোন অঘটন ঘটতে দিতে পারি না। উঃ, কী সুন্দর তুমি! খুকুসোনার পৃথিবীতে এসে পৌছুতে এখনও কিছু দেরী আছে। প্রায় মাস ছয়েকেরই মতো কিছু কম-বেশী।—এই মেয়ে, বলি যে, অর এরই মধ্যে এখনই কি না তুমি একেবারে

সাক্ষাৎ মা'র মতোই হোয়ে উঠেছো, হাবে-ভাবে! সত্যি, সত্যি, আমার প্রিয়ার অন্য কোন তুলনা নেই। বাব্ বা, কি যে তোমার ব্যাপার, তা বোঝা সময়ে সময়ে আমার পক্ষেও হোয়ে ওঠে না।

হঠাৎই কথা থামালো অরিজিত। পলক ফেলতে না ফেলতেই প্রিয়ার শুচিস্মিত অধর থেকে লাল ঠোঁটের ওপরে সজোরে আপন অধর নিয়ে লুটিয়ে পড়ে আঁকতে আঁকতে সঘন করালো চুমার ভেজা ভেজা রূপরেখাগুলোকে। পারস্পরিক চুমাচুমির ঋতুসাজে মধুবাতায় কাঁপা গুঞ্জরন ছাড়িয়ে ওঠা হ্লাদিত দয়িত, নিবেদনেতে অভিযোগখানা জানালো—বাব্ বা। বাব্ বা, এর পরে যখন খুকুসোনা জন্ম নেবে, তখন কী আর তোমার কাছটিতে আমার জন্য এই এখনকার মতো আদর, আর শত রকম আবদার জমা থাকবে? তখন থেকে খুকুকে নিয়েই ত' সব সময়তে হোয়ে থাকবে ব্যস্ত। তোমার বুকের আরাম-সায়রে আমাকে নিশ্চয় তখন আর দেবে না — খুশীর সাঁতার কাটতে! আর দেবে না নিশ্চয় এমন এক অধিকার, যার প্রতিদানে তোমার অনুপম এই বুকের সুষম ছন্দে ছন্দে—নাচাবে আর রাঙাবে সুন্দরী লজ্জাভারখানাকে—প্রিয়রই নিলাজ হওয়া যুবক-রীতিকার এক দুরন্ত-সন্ধ্যায়। এই, এই মেয়ে শোন, আমি কী আর তখন তোমার কাছে পাত্তা পাব! এক কণামাত্র আদরও বোধ হয় এখনকার মতো অসময়েতে—সময় ছাড়াও যাবে না পাওয়া—তোমারই কাছ থেকে। এটা ভাবতেই কেমন কেমন যেন লাগছে আমার। উঃ, সত্যি তখন ত' তুমি শুধু বুঝবে, মেয়ে আর মেয়ে। খুকুসোনা আর খুকুসোনা। মনেতে ত' অন্য কিছু ধরবেই না। আর ভাববেও না। এই মিষ্টি, আমায় ত' তখন একরকম ভুলেই যাবে, না অশোকা? কী হোল, অত হাসছো যে দুষ্টু মেয়েদের মতো? শিকারেতে আর যেতে হবে না বলেই বুঝি এত আনন্দ, আর এত হাসি, না?

দয়িত স্বামীর এমন কথা শুনতে শুনতে ছোট্ট এক মেয়ের মতো খিল্‌খিল্ করা হাসির জোয়ারে আছড়ে পড়লো অশোকার উক্তি—ওগো রিজিতা, অত ভাবনা কেন তোমার? মেয়ে হবে, তারই অশেষ আনন্দের মধ্যেও ভয় জাগছে যে! খুকসোনা আমার কোল জুড়ে বসে থাকবে, আর মাঝখান থেকে তখন তুমি আমার অধর থেকে আদর আহরণ করার ব্যাপারে হবে বঞ্চিত। প্রতিহত। তাই না? এই, ভারী দুষ্টু তুমি! কত পরিকল্পনায় সাজানো, কত আনন্দে খুশীতে আকাঙ্খিত খুকুসোনাকে পেয়ে যাচ্ছ,— আর তবু কি না ভয় কোরছ মেয়ের বিনিময়ে যদি হারিয়ে যায় আপন প্রিয়াটি, তাই কী? ওগো প্রিয়, ওগো দুষ্টু, ছেড়ে দাও এ সব ভাবনা।

অরিজিত বলল—আর তুমি, হ্যাঁ গো তুমি তা' হোলে কী?

অশোকা বলল—আমি হলাম আমি। আমি মানে হোল, বিশেষ ভাবেতে তোমারই আমি। আবার বেশী কি শুনি! কেন না এ মুহূর্তে আমায় নিজের বুকেতে বন্দী কোরে রাখা এই রিজিতা নামের সুন্দর ছেলেটিই যে হোল ভাবী খুকুসোনার মায়ের—একমাত্র সব সুখ। সব কিছু আনন্দেরই আকার। আর তারই অসম এক খুশী। সত্যি, সত্যি—হাসিতে, খুশীতে, সুখেতে মিলিয়ে তুমিই যে হোলে আমার এখনকার একমাত্র স্বত্বা! জান নিশ্চয়?

কথা বলতে বলতে অরিজিতের হাতে আদর কোরে চলার ফাঁকে একটি ছোট্ট চিমটি কেটেই—সেই ফিকিরে বরপুরুষের বাঁধন থেকে সজোরে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। তখনি নেমেও পড়লো ডিভানের ওপর থেকে। আর নেমেই চকিতের মধ্যে অশোকা বারান্দা ঘুরে পালিয়ে গেল মা'র কাছটিতে—আপন যুবতীদেহকে বিভূষিত রাখা লাল সুইস্ সিল্কের শাড়ীর এলোমেলো হয়ে থাকাকে—ঠিক কোরতে কোরতে। যাওয়ার সময় অরিজিতকে উঠে তাকে ধরে আনবার মতো এক মুহূর্তের সময়টুকুও দিল না।

তারপর সেদিনের সন্ধ্যা ছাড়িয়ে রাতের রাকা রূপের মায়া-রঙ ছড়াতে ছড়াতে হোয়েছিল ঘনায়মান। নিঝুমিত। নিশ্চলিত। মন্দাক্রান্তা ছন্দে তুলে দিয়েছে—আঁধারের চেয়ে আলোক অধিক—রূপঝরা বিভাসেতে পাওয়া বিভূষণখানা।

সেদিনের তেমনি একটা রাতে তারা দুজনা মঞ্জুলে রসমধুরিক দাম্পত্য রীতির সুরীতিকা ধরে ঘুমিয়েছে স্প্রিংয়ের দোদুল করা খাটের ডান্‌লোপিলো পাতা বিছানায়। তারই মধ্যে দুটি যৌবনেতে তাজাদেহের ঘুমিয়ে থাকা অবস্থা বেশ একটু মৃদু মৃদু দোলায় উঠেছে দুলে দুলে। শুক্ল-পক্ষের সোনায়-রূপোয় ঝল্‌কানো পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না তার মিষ্টি আলোর ছড়া-ছড়ি করা ভাব নিয়ে, সাজানো ঘরটির তিন ধারেরই বড় বড় জানালাগুলোর ভেতর দিয়ে আছড়ে আছড়ে পড়েছে এসে সমস্ত জায়গা জুড়ে। সুবিস্তৃতির ঘনতা নিয়ে। স্প্রিংয়ের দোদুল সুখশয্যায় শরম লাগা আবেশ নিয়ে ভালোবাসা জানাজানিতে মাতা-মাতি করা—দুটি সুখী যৌবনেতে ঝলকিত থাকা আভাময় সৌন্দর্য্যকে, রাতের রুপোলী রাকা আলো মাখিয়ে স্নান করাচ্ছে—রূপো থেকে সোনা হোয়ে ওঠা রঙ্ ঢেলে ঢেলে। এই শুক্লপক্ষের আলোর স্নিগ্ধতা বরনারী প্রিয়া আর বরপুরুষ আর্য্যপুত্রের দেহের দুটি যৌবনান্বিত রূপের কানাচে কানাচে—এঁকে দিচ্ছে অপরূপ এক মায়াবেশেরই ঝলমলানিতে ভরা রেখাঙ্কনগুলো। বাইরে বেশ শন্-শনানি নিয়ে বাদুলে বাতাস বয়ে চলেছে। জানালা দিয়ে বাদামী রঙের সিল্কের পর্দাগুলোকে উড়িয়ে উড়িয়ে ঘরের মধ্যে এসে, হুল্লোড় তুলছে। খাটের ওপরে ঠিক মাঝখানটায় সিলিঙ্ থেকে ঝোলানো পাখাখানা পূর্ণ গতি দিয়ে চালু থাকায়, বাতাসের ঠাণ্ডা আমেজকে বড় বেশী কন্‌কনে কোরে বিলোচ্ছে। তাই ঘরের ভেতরটায়—বাইরের ও ভেতরের বাতাসের সংমিশ্রণে ঘটা তীব্রতার জন্য কোরে তুলেছে—প্রায় শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত। তাইতে ওদের দু'জনার বেশ একটু শীত শীত লাগছে। আর একটু একটু কাঁপুনিও জাগছে। তাই দু জনায় ঘুমোচ্ছে জড়াজড়িতে জড়ো-সড়ো হোয়ে।—বরনারী অশোকা শুয়ে আছে আপন দেহ-গাঙ্গেতে গাঢ় রঙে উপ্‌ছানো মদালসা মদিরতা ভরিয়ে। তার শুয়ে থাকার ভঙ্গিমাখানা ভারী সুন্দর হোয়ে ফুটেছে। ঘুমুচ্ছে সে বরপুরুষের বুকেতে বন্দী থাকা আদর মাখানো আলিঙ্গনের মধ্যে পেছন ফিরে, পিঠ রেখে। তার অনন্যরীতির সুরী যৌবন দিয়ে সাজানো দেহের সামনের সমস্ত অংশ, বিচিত্রিতায় জ্যোৎস্নার ফুটফুটে বর্ণ-ছটায় রাঙিয়ে গেছে সপ্রগলভ ভাবেতে। বরপুরুষ অরিজিতেরও সুদর্শন রূপ-যৌবন তেমনি ভাবে আলোকধারায় উঠেছে ঝক্‌মকিয়ে।—সেই লাল টক্ টকে সুইস্ সিল্কের নয়নাভিরাম

শাড়ীখানা সুন্দরী-অনিন্দ্যা অশোকার নিটোলতায় নিখুঁত আর পেশলতায় বঙ্কিমা-ঘন শরীরী যৌবনের পরিপূর্ণ রেখাগুলোকে কোন রকমে রাখতে পেরেছে লুকিয়ে—বড় বেশী এলো হোয়ে জড়িয়ে যাওয়া আবরণেতে। তারই সুমসৃণতায়, আর লালচে আভা জড়ানো শুভ্রতায় পেলবিত বুক আর পিঠ রয়েছে সম্পূর্ণ ভাবেতে উদোল। আর যেন অমন রূপের নিলাজ ভরানো বিকাশের প্রতি পড়বে না অপর কারুর চোখের চাহনি—তাই যেন অনেকটা উদাসীন। সুইস্ সিল্কের লাল টুকটুকে আঁচলখানা স্প্রিংয়ের বিছানার ওপর থেকে গড়িয়ে গিয়ে পড়েছে—নীচের মোজাইক্ করা মেঝেতে। সেখানে পাতা নীলে আর সাদায় কাজ করা কাশ্মিরী কার্পেট। খুব পুরু। তেমনি মোলায়েম। নীল আর শাদায় টকটকে লাল—বেশ মানিয়েছে মেঝের বাদামী রঙ্ মোজাইকের কাচের মতো স্বচ্ছতার মধ্যে—আলোর ঝিকিমিকি করা ভাবের সঙ্গে মিলে যাওয়ায়। তাই শাদা, নীল আর বাদামী রঙ্কে যেন বাতাসে বাতাসে দুলে উঠে—লাল আঁচলখানা নাচের তালে তালে নিজের জৌলুসের ছোঁয়াচ লাগিয়ে আদর কোরছে। আঁচলের মধ্যে মাখানো রয়েছে অশোকারই যৌবন দেহের প্রাণ মাতাল করা সুরভির সুবাস।

আরো গভীর শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নার সোনায় আর রূপোয় ফোটা ঝরনাধারাটি বরবর্ণিনী অশোকার সবুজ-গাঢ় যৌবনকে ঘিরে ঘিরে রূপদক্ষ শিল্পীর নিপুণ হাতেতে খোদাই কার তনুশোভাকে—প্রকৃতির মায়া দর্পণের কাঁচেতে প্রতিফলিত করিয়ে তুলে ধরেছে। তারই থেকে দেখে দেখে নিশ্চয় প্রকৃতি নিজেই হোয়ে পড়েছে অপার খুশীতে মুগ্ধা। তার এই খুশী হওয়ার সমস্ত ভাবখানা উপছিয়ে গেছে। ঐ ভাবটি অশোকার আবরণ-লাজেতে সাজা—লাল সুইসে বৃত থাকার মধ্যেও জেগে উঠেছে প্রায় নিলাজ-নিরাবরণতায় উদোল হওয়া দেহের তটে—রূপবঙ্কিমা ধরে ধরে বিকাশ করা অনন্যতায় রুচি-স্নিগ্ধ যৌবনশ্রীখানা ঘিরে ঘিরে—চিত্রবিচিত্রার পরিবেষ্টনী দিয়ে দিয়ে।—এই সুমধুরিক মুহূর্তটির নিরালায় স্বতঃস্ফূর্ত থাকা—নিঝুম নিঝুম অবস্থা নিয়ে ফোটা প্রিয়ার নিরাবরণার মতো দেখতে হওয়া অতি সুষমিত রূপখানাই হোল—সুন্দরী যুবতীর দেহী-রীতিকারই এক চরম ধারাঙ্কিত খাঁটি সত্য। সবুজাভায় আনচানানো যুবতী মাত্রেরই মঞ্জুলিত ঋতু-ময়তায় —স্ফূর্ত এই শিল্প-বিচিত্রিতার মধ্যেই নিহিত আছে—সত্য, শিব আর সুন্দর।

তাই এক পরম সত্যের কানুনে নিখিল পুরুষজাতির যৌবনে অঙ্কিত যুবকত্বকে—এই যুবতী-প্রকৃতির দেহগত এমন এক সৌন্দর্য্যের অশেষ প্রাচুর্য্যতা আপনারই যৌবনান্বিত শৈল্পিক সম্ভারের কঠিন পরশে পরশে দান করাতে পারে—একমাত্র যৌবনকে। ছন্দে ছন্দে অটুট রেখে। সচলিত করিয়ে। গতির আবেগে আর অনুরাগে ফোটা আবেশিত অভিমানে—কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে।

এমনটাই হোল সবুজের সাজঘর—প্রণয় ও পরিণয়ের দুনিয়াদারির শতেক ধারার কারুকাজ ফুটিয়ে রাখার জন্য।—তাই নিজেকে হ্লাদিতার পারিণীতা পরিচিতিতে বিভূষিত রেখে আপন যৌবনকেই যুবকের দেহে সজীবতারই সবুজ রঙে রাঙিয়ে দিয়ে যেতে পারে—একমাত্র ওরাই মানে—যারা যুবতীর মাধুরী রাগেতে

রূপবতী। প্রণয় প্রসঙ্গে লাজবতী। মধু, মধু, সেই মধুক্ষরা মিথুনাবাসরের সুচরিতা থাকা সুবিনীতা থেকে তপ্তালিকা হওয়া পর্য্যন্ত—ওরা। সেই শুচি-স্নিগ্ধারা। সেই শুচিস্মিতারা। তাই, হ্যাঁ তারই রীতিতে ফোটা শরমহারা ঋতু বিপর্য্যয়ে অবগাহন কোরেছে—প্রিয়র জন্য প্রিয়া ঘুম ঘুম আলোকধারার মধ্যে, শ্রান্তিভরা ছন্দেতে ঘুমিয়ে পড়ে।—তাই আজ শুক্লপক্ষের এই জ্যোৎস্না-ধোয়া আর মধুর বাতাসে মাতাল করা রাতেতে—স্বামী অরিজিতের বুকেতে ভালবাসার জীয়নকাঠির সন্ধানে রূপাভিসার করাচ্ছে—বধূসুজনা অশোকা নিজেরই যৌবন প্রাচুর্য্যে পরিপূর্ণ, আর মাধবী রাগে রঞ্জিতা—যুবতীর সেই মঞ্জুলে-সহাসে বিকশিত সৌন্দর্য্যকে। বিভাবিত মাধুর্য্যেতে। স্বাভাবিক ঔদার্য্যের অনুরণনে।

বধূ অশোকার সুন্দর সুন্দর আর লাল লাল দুটি ঠোঁটের মিষ্টি রঙ্ নিজেরই ঘুমন্ত মুখের কমনীয় মাধুরীধারাকে আলোর সোনা-ঝরা মুহূর্তগুলো সমেত —মধুবর্ষী এক হাসিতে নাচিয়ে রেখেছে। অধরেতে উপছানো খুশীর নাচেতে হাসির রবাব হোয়ে উঠেছে শুধু লালে লাল। ঘুম ঘুম ছন্দেতে মাতা পাপড়ির মতো সুমসৃণ পাতায় ঢাকা চোখ দুটির কিনারে কিনারে টানা—সরু কাজলের রেখা, অমাবস্যার তমসায় ঝরিয়েছে মদিরতা। তার আরক্তিম গালেতে ছোপান পরাগ রেণুর প্রসাধন ছাপিয়ে তা কপালের মাঝখানটিতে আঁকা কুঙ্কুমের টিপের চক্ চক্ করা বর্ণ-ছটার সঙ্গে তাল রেখে স্পষ্ট হোয়ে আছে চিক্ চিক্ করার মধ্যে। বধূত্বে রূপবিভূষিতা অশোকার টানা সিঁথির সিঁদুর রূপোলী চাঁদের আলোর ছোঁয়াছে ছোঁয়াছে চিকন সরু সোনার পাতের মতন উঠেছে ঝক্‌ঝক্ কোরে। ওই ভাবেতে লাল রঙ্‌কে রুপোলী গ্রাস কোরে তবেই হোতে পেরেছে—রঙ্-সোনালী। আর নিখুঁত সোনার মতোই ঝলকে ঝলকে ঝলস্ ছড়িয়ে দিয়েছে—সিঁথিতে আঁকা সিঁদুরের মতোই পবিত্রতম দ্যুতিতে।

যে কোন রূপবতীর যুবতী পরিচিতিতে প্রিয়ার রীতি ধরে বধূ নামে নামাঙ্কিতার দেহ ঘিরে প্রকাশ পাওয়া এই পবিত্র ভাবখানা সত্যি একটা মস্ত কানুন হিসাবেই অপরের চোখের রূপতৃষ্ণা ছড়ানো অপলক চাহনিকে মুহূর্তেরই প্রতিভাসে কোরে আনে—শুচিস্নিগ্ধ।—আজকের এই রাকা ঘেরা জ্যোৎস্না-ধারার পরিপূর্ণতার মধ্যে সব চাইতে বেশী উজ্জ্বল, আর সেই সঙ্গে লাজহরণক হোয়ে উঠেছে—বরনারী অশোকারই শরমে শরমে প্রকটিত তার পেশলিত রূপসী বুকের ওপরেতে, সুযম ছন্দে ছন্দে ফোটা সৌন্দর্য্যকে রাঙিয়ে রাখা—মাধুর্য্যেরই চরম অভিব্যক্তিখানা। তারই ছন্দ মেলানো ওঠা আর নামায় জাগে—এক রূপাতীতেরই মধুরিক ব্যঞ্জনা! এমন ভাবখানা আরো বেশী কোরে ঝলমলিয়ে দিয়েছে অশোকার দেহরাগেতে ছাপা দুধে-আলতায় ভরা অতি শুভ্রতার রঙখানাকে। সেই দুধে-আলতায় মেশানো শরীরী রঙ্ নাচিয়ে, যেন তারই পেশলে পেশলে ছন্দিত আর স্পন্দিত বুকের দুটি নিটোল মধুরিম শিল্পধারাকে—রূপদক্ষ শিল্পী দেবদত্ত যেন আপনার মতোই প্রিয়া সুতনুকাকে—প্রকাশ করার জন্যই অশেষ ধৈর্য্যের মাপকাঠি ধরে খোদাই কোরে কোরে তৈরী করাতে পেরেছেন। নিজের সুষমিত বুকের দু'ধারার এই শিল্প-শোভার অপর্য্যাপ্ত সম্ভার নিয়ে—অশোকা সত্যিই অপরার কাছে অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী। অনন্যায় অনিন্দিতা।

চেনা-জানা যুবকেরা তার এই আবরণেতে বারণ না মানায়—সপ্রকট থাকা নিটোলতা দেখে দেখে হোয়ে ওঠে হতবাক্। হতচকিত। আর অচেনাদের ত' কথাই নেই। সমবয়েসী অঙ্গনারা সামনাসামনি কিছুটি অবশ্য বলতে সাহস পায় না—ঠিকই। কিন্তু পেছনে ফিরে না কোরে পারে না—ঈর্ষা। তাই দেখে আর জেনে-শুনে তারই গর্বের বরপুরুষটির মন আনন্দ আর খুশীতে উপ্‌ছে পড়ে, ভরাট অবস্থায়। অশোকা যে তারই বিবাহেতে সাত পাকে বাঁধা—স্ত্রী। ও যে বাঙ্‌লার বধূ—তাই কানুন বলেই অশোকার মধ্যে টইটম্বুর হোয়ে আছে—বুক ভরা মধুতে। আর সে যে হোল তারই প্রিয়-সুজন। প্রণয়ের একান্ত সহচর, আর উদ্দীপক। তারাদু'জনায় মিলে-মিশে মিতালি পাতা ভুবনেরই হোল লীলাসঙ্গী আর লীলা-সঙ্গিনী। সে হোল ও। আর তেমনি ও হোল সে। মিলিত প্রেমের ঝুলন খেলা নিয়ে মাতা—এক যুগল স্বত্ত্বা। কোন রকমেই এখন একজন তারই আরেকজনাকে কিছুতেই পারে না আর—কাছ ছাড়াটি করাতে!—আজও তাই অরিজিত তার বরনারীকে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে—পেছন ফেরা অবস্থাতেই জড়িয়ে ধরা আবেশ দিয়ে বুকেতে ঘন কোরে রেখেছে, তারই আবদার করা আহ্লাদেতে। ওই আবেশেরই রেশ থেকে বধূ অশোকার অসম সুষমা নিঙাড়িত আর উত্থানে-পতনে নাচের রিদম্ ঘেরা—উঁচু উঁচু স্তনশোভার নীচে দিয়ে বরপুরুষের হাতের বাঁধনখানা জড়িয়েছে—পিঠ থেকে বুক পর্য্যন্ত নিজেরই বুকের সঙ্গে। এক মঞ্জুলিক যুবক স্বামীর সুরীতি-মুখর অধিকার থেকে অরিজিতের দুটি হাতের লাজহরণক স্পর্শ—সুন্দর ভাবে ছুঁয়ে আছে—প্রিয়তমা অশোকার সৌন্দর্য্যে পেশলিত বুকের ওপরকার জ্যোৎস্নায় ঝল্‌মল্ কোরে রূপস্নান সারা—সেই দু ধারার দুই কঠিন মাধুর্য্যভারকে। পলকে পলকে সোনায়-রূপোয় ঝলকানো পূর্ণিমা রাতেতে অপরূপ সেই ঝিলিমিলি ভরা রূপের ভেতরে তা সত্যি এক অনন্য ধারার শোভা হোয়ে উঠেছে—ঠিক যেন দুটি পলাশে রাঙা সঘন লজ্জায়। লজ্জার ভাবখানা বড় প্রগল্‌ভিত। লাজ হারানো হোয়েও—প্রিয়র ছন্দিত পরশেরই থেকে ঝরা আরামেতে রূপ-মাখা অবস্থায় খুশীয়ালিনী অশোকার—মধুময় বুক সেখানকার শরমহারা সুখকে লুকোতে চাইছে—লাজেরই আবরণে আবৃতা রেখে। তেমনি হোল অরিজিতের দুটি স্পন্দনভরা হাতের বাঁধন—যা প্রিয়ার সুষমিত বুকে ঝরিয়েছে আরাম, আবেশ, আর মুঠো মুঠে নিলাজ-সুখ। রূপোয় আর সোনায় অনুরাগ ভরা রাকার আলোক-সায়রেতে ঘুমানো বরনারী অশোকার শরীরী জৌলুসের দুধ-আলতা মেশানো রঙ থেকে—পেশলে কঠিন হওয়া পীনোন্নত স্তনশোভার ওপরে নিটোল বৃন্তে বৃন্তে ফুটে উঠেছে—লাল লাল পলাশগুচ্ছ। শুধু কুঁড়ি হোয়ে ফুটে থাকতে চায় নি। অপেক্ষায় আছে নিখিল প্রেমিক জাতির এক সুজনতম ছেলের যৌবন-সবুজ অবস্থারই, হাসিতে হাসিতে উপছানো ঠোঁটের পাগল করা খুশীর ঘন ঘন ছোঁয়াচ পেয়ে—ফুটবে বলে। সুস্মিতকান্তি অরিজিতের সুন্দর মুখখানার মিষ্টি মিষ্টি পরশ নিয়ে, থরে থরে সাজানো ঠোঁট দুটি শুধু একটিবারের জন্য—অশোকার বুকের ওপরকার সবুজ যৌবন দিয়ে খোদাই করা অনন্যরীতির মাধুর্য্যধারার ওই পীনোন্নত থাকা—দুই সুকঠিন রূপের বৃন্তে বৃন্তে—ওঠা-নামায় করা নাচানাচিতে কাঁপা কাঁপা পেশলতায় ছাপিয়ে দিয়ে

যাক্—অধরেরই সুখলোভাতুর থাকা প্রগাঢ় চুম্বনখানা—তা হোলেই হ্লাদিতা হবে প্রিয়া সব চাইতে সুখে। আর সব থেকে বেশী রকম খুশীতে। আর তখনই সঙ্গে সঙ্গে লাল লাল পলাশেরা তাদের পাপড়ি মেলে ছড়িয়ে দেবে আসমানী আভা। রূপোয়-সোনায় ঝলকানো আলোয় স্বাক্ষর যাবে রেখে। সত্যি এই রূপ দেখে একদিন অরিজিত তার প্রিয়ার কানে কানে শুধিয়েছিল একটা সূক্তি—অনোরে দ্যঁ বালজাকের থেকে—"A man loves with his heart, but a woman with the point of her breast." সত্যি, সত্যি, সত্যিই ত তাই। আর তাই সে কথায় সায় দিয়ে বলেছিল অশোকা—ঈষ্। ভারী দুষ্টু কথাখানা যে শোনাচ্ছ! কিন্তু কী জান, তবু শুনতে আমার লাগছে বেশ মিষ্টি মিষ্টি, তোমারই হাসি ভরা মুখ থেকে।

ওদিকে কিন্তু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে একটা স্বপ্নকে অশোকা দেখে যাচ্ছে। স্বপ্নে দেখছে—অরিজিত যেন আজ ভোরে একলাই গেছিল সল্ট্ লেকেতে ডাক্ স্যুটিঙ্ করার জন্য। সকালে বেরিয়ে, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যার কুলায় আশ্রয় নিতে যাওয়ার গোধূলি রাঙা মুহূর্তটিতে এসেছিল ফিরে। শিকার কোরে প্রায় ডজন খানেক হৃষ্টপুষ্ট হাঁসকে কখনো আয়েসে, আবার বা কখনো অনায়াসে বন্দুকের ছর্‌রা গুলিতে—সহজেই ঘায়েল করাতে পেরেছিল। কোনটা হয় ত' গুলি বিঁধে ঝুপ কোরে পাখা আছড়াতে আছড়াতে কাছেই পড়ে যায়। আবার কোনটা বা শিকারীকে একটু জব্দ করবার জন্য—বেশ অনেকটা দূরের জলে এসে পড়ে। তখন অরিজিতকে বন্দুকখানা পিঠে ফেলে রেখে, প্যান্টের পা গুটিয়ে তুলে নিতে নিতে, সামনে এগুতে হয়। ও ভাবে জল ভাঙ্তে ভাঙ্তে সামনে এগিয়ে যেয়ে ধরতে হয়েছে। হাতে গুলি বেঁধা হাঁসটিকে তুলে নেবার পরও ক্ষণিকের জন্য সেখানকার জলের ওপর খানিকটা জায়গা জুড়ে ঝরা রক্তের ফোঁটায় ফোঁটায়—ঈষৎ লাল হোয়ে থাকতো। ঐভাবে সবগুলোকেই ধরার পর অন্য লোক দিয়ে একসঙ্গে পায়ে পায়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে ক্যাডিলাক্‌খানার পেছনে রেখে নিয়ে এসেছিল।—তারপর গাড়ী নিয়ে বাগানের গেট ছাড়িয়ে ভেতরে ঢোকার সময়—অশোকা দাঁড়িয়েছিল বাড়ীরই বাইরের দিককার বারান্দায়। সেখানে দাঁড়িয়ে বাড়ীর দরোয়ান ডালা খুলে ভেতর থেকে সমস্ত হাঁসগুলোকে তুলে নিয়ে কাঁকর বিছানো রাস্তার ধারেতে, বাঁধানো ঘুটিঙের ঠিক পাশেতেই—সবুজ ঘাসের লনের ওপরেতে রাখলো সেগুলোকে। অশোকা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো—মৃত হাঁসগুলোর গা দিয়ে এখনও যেন ঝরে ঝরে পড়ছে রক্তের ছোট ছোট বিন্দু। তার একটু পরেই ওদের ওখান থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হোল মালির ঘরের দিকে।—কিন্তু মনে হোল যেন—ওরা অন্যত্র যাওয়ার আগে সেখানকার সবুজ ঘাসের জায়গাটাকে—কিছুটা নিয়ে, রক্তে রক্তে দিয়ে গেছে ভরিয়ে। অনেকক্ষণ ধরে তাই সে তাকিয়ে দেখছিল। হুঁশ হোল যখন অরিজিত স্নানঘর থেকে পরিচ্ছন্ন হোয়ে পোশাক পালটিয়ে, প্রসাধন সেরে—ডাকতে এলো।

—ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই অশোকা স্বপ্নখানা দেখে চলেছে।—তারপর তারা কত গল্প কোরল রাত গভীর না হওয়া পর্য্যন্ত। অরিজিত নিজের কাছটিতে রেখেছিল বসিয়ে—প্রিয়াকে আদরে-সোহাগে নাচিয়ে-হাসিয়ে। শুধুমাত্র শিকারেরই কথা নয়।

আরো অনেক কিছুর কথাই বললো।—তারপর খাওয়ার পালা শেষ হওয়া মাত্র একটু তাড়াতাড়িই যেন ওরা দু'জনাই ঢলে পড়েছিল গাঢ় ঘুমের রাজত্বে। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ার পরই এ কী'হোল তার!—সন্ধ্যা হওয়ার আগে বিকেলের অস্তগামী আলো এসে না পড়তেই, অশোকা তখন যে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছিল সবুজ ঘাসের ওপরকার অল্প একটু জায়গায় কেমন ভাবে একটু একটু কোরে রক্তের ফোঁটা—জমে জমে কোরে তুলেছিল লাল—তাই-ই এখন তার মন জুড়ে, দিয়ে বসেছে দারুণ এক ভয়। সত্যি ত' হাঁসগুলো যেন মরে যেয়েও কী এক আক্রোশের ঝোঁকে—বেশ আলোড়ন তুলেই ঝটাপট পাখনা আছড়াচ্ছে! কিন্তু, ব্যাপার ত' ভালো নয় বলেই মনে হচ্ছে। বড় বিশ্রী এই ছবিটা। আরে, আরে! ও, কী? আমার খুকুসোনা না? হ্যাঁ। ঐ ত' আমার খুকুসোনাই যে ঐ ভাবে তার কচি কচি হাত আর পা নিয়ে থপ্ থপ্ কোরে হামাগুড়ি দিচ্ছে বাগনের ঘাসের মধ্যে—সামনে এগুবে বলে। কিন্তু, কিন্তু ঐ ধারটিতে ও যাচ্ছে কেন? আরে, ঐ ত' ঐ দিকেতেই খুকুসোনা তার ছোট্ট মতন রাঙা টুক্‌টুকে মুখখানায়—খিল খিল করা হাসিতে ভরিয়ে নিয়ে এরকরকম যেন জোর কোরেই ছুটছে, হামাগুড়ি দিতে দিতে। ঐ ত, ঐ খানেতেই ঘাসের ওপরের লাল অংশটুকু ওদের গা দিয়ে ঝরা রক্তেই ত' হোয়ে আছে—লালে লাল। ওঃ মা, ওঃ কী; মরা হাঁসগুলো যে আবার কখন এ দিকটিতে এসে গেল দেখছি! এই, দেখেছ দেখেছ; হাঁসগুলো এগুতে এগুতে খুকুসোনাকে সামনে দেখতে পেয়েই কিনা দাঁড়িয়ে পড়েছে থমকে যাওয়ার মতো। কিন্তু এ কী কোরছে ওরা! প্রত্যেকটি তাদের লম্বা লম্বা মুখের ছুঁচলো ঠোঁটকে হাঁ করিয়ে ধরে, আর পাতা পায়ের ধারালো নখ্‌কে বাগিয়ে রেখে—যেন একটা হিংসা নিয়েই এগিয়ে আসছে—খুকুসোনার দিকে। এখনও ত' ওদের গুলি বেঁধা গা দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা বিন্দুর মতো রক্ত ঝরছে। ওরা নিশ্চয়ই এখন একযোগে খুকুসোনার ওপরে চার ধার থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার তুলতুলে নরম শরীরখানাকে কামড়ে-খিমচে-ঠুকরে রক্তাক্ত কোরে তোলাবে। ঠিক, ঠিক, এই ভাবেতেই তাদেরকে একটা কৌতূহলী খুশী মেটাতে গিয়ে গুলি কোরে মারবার প্রতিশোধটি নিতে চাইছে খুকুসোনারই ওপরে!—কেন না, কেন না ওরই বাবা যে—

—এই, ধর, ধর। খুকুসোনাকে ছুটে গিয়ে ধরে আন। ওকে এখনি একসঙ্গে থাকা হাঁসেরা কামড়ে-খিমচে একটা রক্তারক্তি ব্যাপার ঘটাবে যে! ওগো রিজিতা, ওঠো। এই, উঠে পড় লক্ষ্মীটি।

ঘুমের গাঢ় ঘোর থেকেই চিৎকার কোরে উঠলো বরবর্ণিনী অশোকা। আর তখনই স্বপ্ন দেখা তার মুহূর্ত মধ্যে হোল উধাও। অরিজিতের হাতের বাঁধনের ভেতর থেকেই সে পাশ ফিরে শুয়েই শক্ত কোরে জড়িয়ে ধরল বরপুরুষকে।

অশোকার এমন ভাবে এই মাঝ রাতেতে ঘুম থেকে জেগে চিৎকার কোরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই অরিজিতেরও ঘুমখানা গেছে ভেঙ্গে—প্রিয়াকে ভয় পেতে দেখে। সেই সঙ্গে ভয়ের কাঁপন থেকে কুঁকড়ে-মুকড়ে উঠে প্রিয়কে জড়িয়ে ধরার আভাস থেকে। তখনি বিছানার উপর উঠে বসে অরিজিত অশোকাকে হঠাৎ ভয় পেয়ে কাঁপা অবস্থা থেকে নির্ভয় করার জন্য বুকেতে তুলে নিয়ে আটকালো। প্রিয়ার ভয়ে বিহ্বল শরীরে

আদর করার মধ্যে, হাত বুলোতে বুলোতে বলল—এই অশোকা। লক্ষ্মীটি বল, কী হোল তোমার। এই, হঠাৎ ভয় পেয়ে চিৎকার কোরে উঠলে কেন? বল, এই?

ভয়কাতর চোখের কাজল মাখা চাহনি নিয়ে ভালো করে অরিজিতের চোখের দিকে তাকালো অশোকা। তখনো ঘুম ঘুম ভাবের ম্লান একটা জড়তা মাখা থাকলেও—জ্যোৎস্নার আলোকধারা ঠিকরে পড়েছে তার কাজলে টানা ছবির মতন, আর সেই সঙ্গে মোহ জড়ানো চোখ দুটোয়।—অরিজিত দেখলো তার বরনারীর চোখেতে ভরা জল থৈ থৈ কোরছে। জ্যোৎস্নার ঝল্‌মলে রূপ তারই মধ্যে কোরছে চিক্ চিক্। কী একটা মনে হওয়ায় অশোকা তার গাল অরিজিতের মুখেতে ছুঁইয়ে ধরে ঘষতে লাগলো। ঐ রকম কোরতে কোরতে বলল অশোকা—এই রিজিতা। শোন, ও এমন কিছু নয়। এমনি আর কি। সত্যি বলছি, এমনিই অমন ভয় পেলাম।

অরিজিত বলল—কিন্তু না, বেশ বুঝতে পারছি যে তুমি একটা কিছু লুকোতে চাইছ। তোমার চোখ-মুখের কাঁপা কাঁপা ভাবে ফোটা ভাবখানাই ত' বুঝিয়ে দিচ্ছে—যে তুমি বেশ ভয় পেয়েছ। কী বল, ভুল ধরিনি?

অশোকা যেন অভয় পেয়ে বলল—হ্যাঁ রিজিতা, হ্যাঁ। ঠিকই ধরছ। আমি কিন্তু লুকোতে চাই না তা।—এই বলে অশোকা অরিজিতের কাঁধে নিজের মাথাখানা আরাম কোরে রেখে পর পর সব কথাই বলে গেল—স্বপ্নে এই একটু আগে যা দেখলো, তার সবটাই।

সবটাই শুনলো অরিজিত। তার পরে বলল—এর পর? এই, বল?

—এর পর কী? শুনবে রিজিতা?

বলতে বলতে অশোকা ঝৎ কোরে দুষ্টুমি ভরিয়ে বরপুরুষের স্নিগ্ধ চোখ দুটোকে গাঢ় ভাবে আদর কোরলো নিজের লালে লাল নরম ঠোঁটের থেকে—পরপর আঁকা কয়েকটা ভেজা ভেজা পরশ টেনে দিয়ে। একটু পরেই মনের খুশী নিয়ে কল্‌কলিয়ে উপ্‌ছে পড়ে বলল অশোকা—এই মধুর, শোন, আগামীকাল আর কিন্তু তোমার শিকারে যাওয়া চলবে না। বুঝলে রিজিতা? সত্যি বলছি, মোটেই যাওয়া চলবে না। আর এটাও জেনে রাখ যে, অন্ততঃ আমাদের খুকুসোনার জন্ম না হওয়া পর্য্যন্ত তুমি আর একটি দিনের জন্যও শিকার কোরতে যেতে পারবে না। বুঝতে পেরেছ, এই?

হাসতে হাসতে অরিজিত বলল—যদি তবু যাই? তা হোলে?

—এই, যাবে? তা হোলে বেশ যেও। কিন্তু তার আগে জেনে রাখ যে, আমার মাথার দিব্যি রইল। এবার যাও দেখি কেমন এর পরেও যেতে পার তারই সাহসটা একবার দেখবো।

কথা শেষে অশোকার শুচিশ্রী ভরা মুখের খুশীর রঙেতে দুষ্টু হাসির জোয়ার উজাড় হোয়ে উঠলো।

আনন্দেরই গমক থেকে অরিজিতের সুন্দর মুখশ্রীতে ছাপিয়ে যাওয়া শিশুর মত কৌতূহলী ভাবখানা—আরা রঙীন হোল। বলল আদর ঝরানো গলায়—এই অশোকা। এই দুষ্টু মেয়ে। সত্যি তোমার মতো মেয়ের দুষ্টুমির কাছেতে পার পাওয়াটা যে শুধু আমার একলার কেন,-তা অন্য কারুরই পক্ষে নয় সম্ভব। তবু দিব্যি জানিয়ে

রাখছো? বাব্‌বা; ভারী দুষ্টু মেয়ে! এই এসো, সমস্যা ত' মিটলো, বলি আর ঘুমুবে না? জেগে জেগেই কাটিয়ে দিতে চাও না-কি?

—না। না। ঈষ্, তুমি ঘুমুবে বুঝি? কিন্তু তোমাকে ঘুমাতে দিলে ত'?

সুবিনীতা অশোকার লাল আভায় ঝল্‌মলানো অধরেতে শুধু রিমঝিমিয়ে নাচানাচি কোরছে—দুষ্টু হাসিরই খিলখিলিয়ে ওঠা—ছর্‌ররা।

—এই, বলি, ঘুমাতেও দেবে না? তা হোলে কীকোরবে বল জেগে জেগে?—অরিজিতের মনেতেও তখন প্রিয়ার অধরে ধরা হাসির ছোঁয়াচখানা লেগেছে।

আর তখনি আপন সমস্যাটির সমাধান পাওয়ারই নির্ভয়তায় খুশী থেকে, দয়িতকে পুরস্কৃত করার জন্য প্রিয়া হোল সক্রিয়া—প্রণয়েরই ছান্দস্‌রীতিতে। নীতিতে।

তাই সুস্মিতদর্শন বরুপুরুষেরই কান্তিঝরা মুখের রঙীন থাকা সুখের ব্যাপ্তিতে—বরনারী প্রিয়া তখনি আপন মুখের দীপ্ত ঊষার রাঙা মাঙ্গলিকি জানালো—লাল লাল ঠোঁটে আনচানানো খুশীর সঘন ছোঁয়ায়। সিক্ততায় কাঁপা কাঁপা ভাবেরই বাঁকা-চোরা কোরে আলপনা এঁকে এঁকে। তারপর বলল অশোকা—এই, রিজিতা।

অরিজিত প্রতিবেদন কোরল—কী?

বলল অশোকা আদুরে মেয়ের মতো চোখে-মুখেতে রূপের ঢল নাচিয়ে নাচিয়ে—শোন। এই লক্ষ্মীটি, আমায় এখন বুঝতে পারছো কী?

শুধালো অরিজিত—এই। বুঝেছি। পেরেছি। ওগো মধুর, হ্যাঁ।

কাটা কাটা কথার ঝনঝনানি মৃদুলে দোলাতে দোলাতে নিবেদন কোরল অশোকা—এই রিজিতা। এই মিষ্টি ছেলে! তবে তোমার চপলতা কেন দুষ্টুমি না কোরে থাকছে নিশ্চুপ? কেন তোমার প্রণয় জানাজানির ভাবখানা হোয়ে উঠছে এত নিঝুম? এত নিথর? বল, বল আমায়, ওগো সুন্দর?

শুধু জানাল অরিজিত—আমার অশোকা। এই, তুমি অশোকা সত্যি দুষ্টু। বড় দুষ্টুমতি।

আগের মতো সোনায়-রূপোয় মাখামাখি করা—জ্যোৎস্নার রূপনির্ঝরটি আলোয় আলোয় খালি স্নান করিয়েই চলেছে—ওদের দু'জনাকে। নিজেদেরই ভালবাসাবাসির ঋতুমহলেতে সঙ্গত থাকা অবস্থাতেই। ঘরের তিন ধারের বড় বড় জানালা দিয়ে মাতাল বাতাস বাদুলে ধারার ঝটপটানি সমেত প্রচণ্ড ভাবেতে তেড়ে তেড়ে এসে তাদের রীতি-সুন্দর, নীতি মধুর বিবাহিত ভালবাসার শান্ত আর স্নিগ্ধ মূর্তিকে—মিথুনেরই ভাস্কর্য্য ফোটানো নিয়ে—বিপর্য্যস্ত কোরে তোলাবার জন্য অনেক চেষ্টাই কোরে চলেছে। কিন্তু সত্যি ওদের মিলনবাসরের রূপবিচিত্রার সমাহিত আরাধনার সঙ্গে যুঝতে পারছে না। ওদের দু'জনায় তখন—সুখ আর খুশী—এদেরই দেওয়া আর নেওয়ার পালা চলেছে।

অশোকা আর অরিজিত—তারা হোল দুটি তাজা রক্তধারার মতোই—লালে বিভূষিতা লাল পলাশ। সুখ আর খুশী দুইয়েরই এখনকার রঙ হোল প্রগাঢ় লাল থেকে হওয়া—আরো টক্‌টক্ দ্যুতি ঝরানো—লাল আভা।

আর এই ভালবাসাবাসির স্বতঃস্ফূর্ততায় অশোকা ও অরিজিতের বিবাহিত যুগল থেকে এক ও অদ্বিতীয় হোয়ে ওঠা ঐ একই স্বত্তাখানা ঝল্‌মলিয়ে আছে—অস্তিত্বময় তাজা লালে। লাল তাজায়। রক্ত পলাশেইর মতো। তাজা তাজা লাল রঙ্—তাদের দাম্পত্যবিচিত্রার সুনিকেতনটিকে প্রগাঢ়তায় ভরিয়ে রেখেছে।

আর, ওদের দাম্পত্যরীতির রহস্যঘেরা বাসর থেকে সৃষ্টির তিতিক্ষা ধরে, যৌথ প্রয়াসে রূপদান করা—ঐ ভবিষ্যতের খুকুসোনাও হোল ওদেরই প্রণয়ে বাঁধা আর পরিণয়ে স্বাক্ষরিত অভিব্যক্তিখানার—আরেক তাজা লাল রঙ। প্রখর তার রূপ। প্রগাঢ় তার স্থিতি। অসম তার ধৃতি। অশেষ তার কৃতি। তা একখানা লাল পলাশেরই প্রতিচ্ছবি।

সত্যি, সত্যি—এই সুমধুরিক ঋতু নিয়ে স্ফূর্ত যৌবনায়ন চয়ন কোরে আনে—সৃষ্টি সুখেরই সলাজ-সুন্দর অসীমতাকে, আর শেষ না হোতে পারা—সেই অশেষতাকে। সেই সুন্দরের আর মধুরের বৃতি—সত্যি কৃতির শৈল্পিক কারুকাজে—হোয়ে ওঠে—নিটোল রুপকুট্টিম। অটল থাকা কবি-কৃতি। কেন না,—এই পলাশের মতো তাজা লাল বিভূতির মধ্যে সেজে ওঠা—দম্পত্তির পুণ্যশ্লোকেতে আকার ঘেরা যৌবনায়নী সৃষ্টির শৈল্পিক ঋদ্ধিখানা—তাই না হয়ে পারে না—নিখুঁত কবিতার মতো। আরো ব্যাপকে—তা হোয়ে ওঠে—লিরিক্যাল্ ব্যালাড্! সৃষ্টিতে। স্থিতিতে। অস্তিত্বে।

তাই—লাল লাল পলাশেরই পুণ্য দ্যুতিতে ঝলমল করা প্রিয়ার সলাজ-মধুর প্রজাপতি-পরিচিতিকে আরতি কোরে আজ মাঝে মাঝে জানায় অরিজিত—ওগো মধুর। ওগো শুচিস্মিতা। তুমি কবিতার মতো! সৃষ্টির অন্বয় নিয়ে ছন্দে ছন্দে তুমি পুষ্পিতা করিয়ে চলেছো—ছন্দ-যতি-মিল গমক ধরা গীতালি মূর্ছনারই—মীড় আর গমকে। ওগো, তোমায় আজ জানাতে ইচ্ছে হয় যে, তুমি মধু। তুমি শান্তির নীড়। তুমি শক্তির উৎস। তুমি সৃষ্টির নিয়ন্ত্রা।

অশোকা তখন জানায়—দ্যুৎ। এ যে রিজিতা, তুমি কবিতা বানানোর মতোই দুষ্টুমি কোরছ, কথার ফুলঝুরি ফুটিয়ে! তাই না?

—সত্যি। ঠিকই বলেছো। জানো, আজ তোমায় লাল পলাশেরই মতো কোরে—বুকেতে বন্দী রেখে মনে পড়ে—ওমর খৈয়ামেরই মতো—

"সেই নিরালা পাতায় ঘেরা বনের ধারে শীতল ছায়
খাদ্য কিছু পেয়ালা হাতে ছন্দে গেঁথে দিনটা যায়,
মৌন ভাঙ্গি মোর পাশেতে গুঞ্জে তব মঞ্জু সুর
সেই ত সাকি স্বপ্ন আমার সেই বনানী স্বর্গপুর।"

—এই অশোকা। কি গো, বল, তোমায় পেলে এমনটা মনে করা কী ভুল?

পলাশেরই মতো তাজা লাল পবিত্রতায় ঝল্‌মলিয়ে, আর সঘন যুবতীত্ব নিয়ে রিমঝিমিয়ে প্রিয়কে নিবেদন করে থাকে অশোকা প্রায়ই—ওগো রিজিতা, ওগো আমারই মধ্যে সৃষ্টি করারই উৎসরূপী স্রষ্টা, তুমি কী ভুলে যাও, যে, আমার মতো

কবিতাখানাকে তুমিই করিয়ে রেখেছো—মিতাক্ষরা। প্রজায়িতা। পুষ্পায়িতা।

সুরেলা লহর ফোটানো কবিতারই কাটা কাটা ছন্দ নিয়ে কথা বলতে থাকা এই অশোকা হলো বধূ-নিলাঞ্জিতাটি রূপে—আকারে ও প্রকারে—নিখুঁত এক লিরিক্যাল্ ব্যালাড্। গীতি-কবিতা।—কেন না—যুবতী প্রিয়ারা বিদিশার আঁধারেতে ও শ্রাবস্তীর সন্ধ্যায়—হোয়ে ওঠে কানুন ধরেই—কবি-প্রাণা। তা না হোলে যে—প্রিয়তম পথ চলতে চলতে হোয়ে পড়বে—দিশাহারা। প্রিয়া থাকবে বিনিদ্র—প্রিয়রই শান্তির নীড়ে বন্দী থেকে থেকে—তাজা লাল পলাশ হোয়ে, প্রভাসিত হবার জন্য। ঐ ভাবে প্রিয়া পৃথিবীর সব রকম ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকে পাহারা দিয়ে রাখবে—তারই প্রাণের সুজনক প্রিয়তমকে। জাগতিক অনেক কিছুরই ভ্রান্তিবিলাস তার অন্তরতম এই যুবককে মায়ায় ধাঁধিয়ে দিয়ে—পথভ্রষ্ট করাতে পারে—যে কোন মুহূর্তে!—তাই আজ, প্রায়ই মুঠো মুঠো পলাশের লাল বিভূতি ছড়াতে ছড়াতে জানায় অশোকা, প্রিয়তমের শুচিতা ভরা অধরে সুধার আমেজ থেকে চন্দ্রমল্লিকার হাসি মাখাতে মাখাতে—ওগো মিষ্টি? শোন, ছিলাম এক। তোমায় নিয়ে হোয়েছি দুই। এবার? ওগো দুষ্টু! এবার তোমার স্রষ্টার তিতিক্ষা ধরে ঐ মিতাক্ষরা দুই থেকে সৃষ্টি করাতে করাতে চলেছি—আগত ঐ তিনকে—খুকুসোনার মধ্যে। তাই না? ছন্দ ছিল—দ্বিপদী। এবার হোয়ে উঠেছে মিল পয়ারেরই—ত্রিপদী। ঠিক, ঠিক, তাই। তুমি মধুরে থেকো নিশ্চিন্ত। ভয় করো না। আমি থাকবো তোমারই জন্য বিনিদ্র। পাহারা দিয়ে।

প্রিয়ার অধরের লাল লাল পরাগের ওপর দিয়ে—পলাশের দ্যুতিকে আরো সঘন কাবার জন্য চুমার স্থায়িত্ব বিলম্বিত করাতে করাতে—অরিজিত না জানিয়ে পারে না আজ—ওগো আনন্দিতা। তুমি আমায় রাখবে শঙ্কা থেকে, ভয় থেকে পাহারা দিয়ে দিয়ে। তার মানে জান কী? তার মানে, তুমি তো হালে—শ্রীরাধা। তুমিই কুলকুণ্ডলিনী শক্তি। তুমিই যুবকের হ্লাদিনী স্বত্বা। তুমি ধী। তুমি শ্রী। শোন গো মধুরা, রাধা হোল চিরন্তনী। রাধা শাশ্বত যৌবনাবতী। নারীর সব রূপ, সব মাধুর্য্য তাঁরই মধ্যে হোয়ে আছে একাকার। তোমায় দেখে দেখে মনে পড়ে—তুমিও তাই। তোমারও একই অঙ্গে সমারোহ নিয়ে ফুটেছে নানান রূপ। তাই কবির ভাষাতেই বলতে চাই—

"গোরোচনা গোরী পেখনুঁ ঘাটের কূলে।
কানাড়া ছান্দে কবরী বান্ধে নবমল্লিকার মালে।।
ফুলের গেঢুয়া ধরয়ে লুফিয়া সঘনে দেখায় পাশ।
উঁচু কুঁচযুগে বসন ঘুচে মুচকি মুচকি হাস।।"

—সত্যি অশোকা, ছন্দে-সুষমায় আর অভিধায় যা বোঝাতে চেয়েছেন কবি—তা প্রকারন্তরে তোমার এই একই অঙ্গে থাকা এত রূপখানার আতিশয্যকেই পরিচায়িত কোরছে। তাই না?

আর তখন তাজা লাল পলাশের মতো রঙীন দ্যুতিতে ঝকমকিয়ে থেকে অশোকা প্রতিবেদন করে—ওগো, এ তোমার দুষ্টুমি হোচ্ছে। এতই কী আমার পরিচয়? এতই কী আমার রূপের ধৃতি? কী জানি! দ্যুৎ, এবার নিরস্ত হও শুধু অমারই কথায়! আর শোন লক্ষ্মীটি, আমার খালি মনে পড়ে কী জান? মনে পড়ে স্মৃতির টানে যে, ওগো

প্রিয়তম, আমরা দু'জনাই যেন খুকুসোনার আগমনের পথ চেয়ে বসে থেকে মনে রাখতে পারি এটাই, যে, "This day is almost done. When the night and morning meet it will be only an unalterable memory. So let no unkind word; no careless, doubting thought; no guilty secret; no neglected duty; no wisp of jealous fog—becloud its passing. For we belong to each other—to have and to hold—and we are determined not to loose the keen sense of mutual appreciation which God has given us. To have is passive, and was consummated on our wedding day, but to hold is active and can never be quite finished so long as we both shall live."

প্রিয়ার কথার এই অভয়ঙ্কর রূপারূপ থেকে বারে বারে নির্ঝরিত হোল—লাল তাজা, আর তাজা লাল সুরভির প্রখর দ্যুতি—পলাশময়তায় প্রিয়র অধরকে আদর করাতে করাতে।

—১৬ই জুন, ১৯৫৮.

দুই শিল্পী আর এক সৃষ্টি

বিশ্বাসই যার মূলধন—সেই আলোককুমার ঘোষ, সুহৃদয়েষু

কাকলি বলল—এই।

আদর ঢেলে। আবেশ মিশিয়ে। মধুর থেকে সুন্দর কোরে।

তাই কথার উত্তরে শুধালো দেবল—কী?

যৌবনায়নে কাঁপা ছিল যুবকের এই উত্তর। প্রত্যুত্তর। প্রিয়ার ছোট্ট কথার পিঠেতে বসাতে পারলো তেমনি এক ছোট্ট জিজ্ঞাসাকে।

হৃদয়ের দীপ্তিকে ব্যাপ্তির ঝল্‌মলানিতে নাচিয়ে নাচিয়ে কাকলি আবার বলল—দেবল, এই?

তার মঞ্জুলিত থাকা সুষম-ভরা বুকের দু'ধারার যৌবন—লাল রেশমের মধ্যে অন্তরীন অবস্থায় রিমঝিমিয়ে দোল দিয়ে গেল—পেশলিত ওঠা ও নামায়। ঠিক যেন আভাসিত করাল—"To feel for ever its soft fall and swell, Awake for-ever in a sweet unrest, Still still, to hear her tender taken breath." (Keats)—আর ঐ ছোট্ট কথার মূর্ছনা গমন ধরে তার কানের লতিকায় পরা—মুক্তো বসানো ঝুমকোলতার দুল দু'খানাকে ঝড়ের মতো দোলালো। আর লাল লাল ঠোঁটের কানায় কানায় নাচালো—দুষ্টুমির ছবি।

অনুরাগ ঝরিয়ে আবার কাকলি ডাকল—এই! শোন।

প্রিয়ার এমন কোরে প্রিয়কে ডাক দেওয়ার মধ্যে ছন্দিত হোল—ঝিলিমিলি করা সন্ধ্যার অনুরাগবতী রূপখানা।

তাই সন্ধ্যার ঐ রূপাভা কাকলির সারা অঙ্গরুচি ঘিরে ঘিরে সাজিয়ে দিয়েছে—কুঙ্কুম রঙ্। সিঁদুরের লাজে কাঁপিয়ে। ভরিয়ে।

হ্যাঁ, এরই রঙ্ থেকে ফোটা ঝলস্ দিয়ে প্রিয়র দুটি ভাসা ভাসা চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার ফলে দেবল জানাল—এই, কাকলি বল। কথা বলতে চেয়ে ডেকে ডেকে থেমে যাচ্ছ কেন?

—এই, সত্যি এইবার আর আমার কথা পথ হারাবে না ব্যক্ত হোতে যেয়ে। বুঝলে।—ঐ কথার রেশ ধরেই কাকলি জানাল তার মনের খুশীকে—শোন দেবল, মনে রেখো শুধু এ কথাটাই, যে, এখনো এই "আমি"টি তোমারই জন্য হয়ে আছি একান্ত আপন। ক'দিন পরে যে কোন রকম ঘটনা-পরম্পরায় যেমন কিছুই ঘটুক না কেন, তার ব্যাপারে আমি যা অনুমাত্র পছন্দ করি না, তুমি এখনই সেই সব আজে-বাজে, আর অলক্ষুণে চিন্তায় নিজেকে কেন কোরে তোলাচ্ছ ভয়কাতর?

কথা বলতে বলতে, আর প্রিয়কে আদর জানাতে জানাতে কথা নিয়েই এগিয়ে গেল কাকলি। ক্ষমাসুন্দর থাকা অজানিত সান্ত্বনা নেমে এলো প্রিয়ার কথার সুর ধরে, আর বিস্তৃতি নিয়ে—

—ছিঃ দেবল, কথাটা শোন। তুমি ছেলে। তুমি সবুজ এক প্রাণোচ্ছলতা। তুমি আমারই রূপ। আমারই ধ্যান। কাজেই কোথায় এ অবস্থায় তুমি নিজে সুস্থির থেকে আমার মনের জোরকে আরো শক্ত কোরে তোলাতে চাইবে, আর কি না তা না কোরে তুমি নিজেই যে ভেঙ্গে পড়ছ? এই দেবল, এই লক্ষ্মীটি, শেষে কি না নিজেরই চোখেতে জল নিয়ে থৈ থৈ ভাবে ভরিয়ে তুললে?

নিজের হাত দু'খানার পেলবতার মধ্যে তখন দেবলের মুখখানা তুলে ধরে তারই কান্না জড়ানো রূপের ওপরে ঝুঁকে পড়ে কথা ফোটাল কাকলি—শোন দেবল, বলি যত অঘটনই হোক না কেন, আর যে অবস্থাতেই তোমার কাকলি পড়ুক না কেন, তাতে কিন্তু কিছুটি এসে যাবে না। জানবে দেবল, তোমার আজকের এই মুহূর্তের মতোই কাকলি চিরকালই থাকবে তোমারই। আমার মাথার দিব্যি করা থাকল, যদি এ কথা না রাখতে পারি তারই জন্য।

কথা বলে চলার ফাঁকে ফাঁকে কাকলির বেদনাক্লিষ্ট মুখখানার সুষমা থেকেও—এ অবস্থায় মুক্তার মতন ফুল্ল হাসির ছর্‌রা থেকে—সুতৃপ্তিকার রঙীন ঝিলিক হানল—দেবলের জন্যে।

তারই রীতি ধরে হাসি-খুশীতে রাঙিয়ে তোলা কাজল আঁকা চোখের মদালসা হোয়ে পড়া চাহনি নিয়ে তাকাল কাকলি দেবলের ভাসা ভাসা—সুন্দর দুটি চোখেতে—থৈ থৈ করা জলরেখার দিকে।

প্রির ভেজা ভেজা চোখের সকরুণ চাহনির ওপরে নিজের চোখ রেখে মনে মনে ভাব-মোকাবিলায় বোঝালো কাকলি নিজেকেই যে,—আমার দেবল বড় ছেলেমানুষ! সত্যি সময়ে সময়ে কি যে ছেলেমানুষিপনাটাই না কোরে বসে, তা আজও আমায় ভাবায়। কেন দেবল এ রকমটা করে? ও ত' ছেলে, তা আমাকে যদি হারিয়ে ফেলে তাই নিয়ে ওর এত ভয় কেন! আচ্ছা, এটাও ত' সত্যি যে, ছেলেদের জীবনেতে যৌবন রাঙিয়ে ভালোবাসতে চাওয়ার মেয়ে রূপে এক কাকলি হারিয়ে গেলে পর—ঐ তাদেরই পক্ষে অতি সহজেই পরের মুহূর্তটিতে অন্য আরেক—নতুন আর আনকোরা কাকলিকে গ্রহণ করাটা—হয়ে ওঠে খুব সহজ। আর সোজাসুজি। বাঁকাচোরা ভাবে অবশ্য নয়।—তবে, হ্যাঁ, তবে দেবলের বেলাতেই যে তেমনটা হবে না তা কে বলতে পারে! আজকের কাকলি সরে দাঁড়ালে পর—ওরই দেবলের তাজা যৌবনখানাকে বন্দনা করার জন্য—অন্য এক কাকলি অতি সহজ রীতির ভেতর থেকে চলে আসবে। তবে, তবে কেন দেবল সব বুঝেও ভয় পাচ্ছে—আমায় যদি হারিয়ে ফেলে? যদি আমাদের মধ্যে ঘটে যায় ছাড়া-ছাড়ি—এই তারই জন্য?

মুখর হোল যুবতী প্রিয়া কথার আবেগে। আর প্রিয়র পাওয়া ভয়েতে—অভয় সঞ্চারের জন্য কাকলি হোল সচেষ্ট।

অভয়ঙ্করের স্বরে তাই কাকলি জানাল—

—না, না। এই দেবল, তুমি জেনে রাখ এটা যে, তুমি আর অন্য দশ জন ছেলের মতো নও। তুমি হোলে তুমি-ই। তুমি শুধু তোমারই মতো। আমার চোখে তুমি অনন্য। আমার কাছেতে নিশ্চয়ই। তোমার কাছেতেও তুমি তাই। তুমি এক। শুধু এক। দুই

হিসাবে নেই তোমার কোন জুড়ি। আমি তা জানি। আমার তাই হোল মস্ত এক বিশ্বাস।

বড় বেশী খুশীবিভোর হোয়ে দেবলের মাথার চুলের মধ্যে নিজের মুখের একটি পাশ ছুঁইয়ে রেখে ঘষতে লাগল। প্রিয়র ঘাড়ে আর পিঠে নরম আঙুলের শিহর ছড়ানো পরশ বুলিয়ে গেল। মাঝে মাজে দেবলের মাথার—ঘন ব্যাক্-ব্রাশ করা চুলেতে আঙুলের টানে টানে—বিলি কেটে দিল।

অনুরাগ রঞ্জিত কথার রেশ ঝরালো কাকলি মৃদু ভাবে। আর সুন্দর সুনিশ্চয়ে বলল—

—এই দেবল, মুখ তোল। আমার নিজের হাতে মুছিয়ে দিতে দাও তোমার চোখের ঐ জল। দাও, লক্ষ্মীটি।

কথা বলে চলার মধ্যেই আঁচলের একটা কোণা দু'আঙুলের ফাঁকে ধরে কাকলি সচেষ্ট হোল—দেবলের ভাসা ভাসা দুটি চোখেতে উপ্‌ছানো জলের রেখাখানাকে মুছে দিতে।

এবার সত্যি দেবলের ছেলেমানুষিপনা মাত্রা ছাড়ালো। সজোরে ঝড় হোয়ে ওঠা তাড়না থেকে—কাকলিকে দু'হাতের বাঁধন দিয়ে কঠিন কোরে জড়িয়ে ধরল। পরমুহূর্তেই তার প্রিয়ার ছন্দে ছন্দে নাচা—বুকের যৌবনাধারেতে ফোটা সুনিবিড় আর সুনিশ্চিত করা মধুরিম আশ্রয়তে নিজের মুখখানা রাখলো। আর তখনি ছোট্ট এক অবুঝ ছেলের মতন কোরে চোখের জল ঝরাতে লাগলো। সুস্মিত থাকা সুন্দর দেবলের চব্বিশটা বছরের যৌবন নিয়ে সবুজ আভায় ঝল্‌মলানো অভিলাষখানা—কান্নার মৃদুল দোলায় পাগলপারা কোরে তুললো আপন প্রিয়াকে। দয়িতেরই বয়েসখানা ছুঁই ছুঁই করা—কাকলির মাধুর্য্যে উপছানো বুকের শিহরণ পেয়ে, পুলক ধরে আরাম ঝরানো বসন্ত-সাজে সালঙ্কৃত—প্রায় চব্বিশটা একটানা বছরগুলোকে—সমবেত ভাবে লাজ মাখালো—-প্রিয়র এ হেন অবস্থা।

তারপর কাকলি অনেক কোরে বুঝিয়েও কিছুতেই শান্ত করাতে পারল না তাকে। আপন হৃদয়ের দীপ্তির রূপকাঠি ছুঁইয়েও দেবলের মধ্যে ব্যাপ্তি ফোটাতে সক্ষম হোল না সে।

তাই আবার ভাবনায় সাত-পাঁচ নিয়ে আকুল হোল কাকলি। হোল বিহ্বলে চমকিতা। অনিশ্চিতা। সুনিকেতনে থাকতে পেয়েও—এটা যেন অনিকেতাই কোরে তোলে—এমনি সেই ভাবখানা।

—সত্যি, সত্যি শেষ পযত্যন্ত কী দেবলের ছেলেমানুষিপনাটাই জয়ী হোয়ে তাকে আর হতে দেবে না ওরই কাছের সঘন তাপ থেকে অন্য কোথাও! তাই কী সত্যি! হ্যাঁ, বোধ হয় তাই।—কিন্তু আজ দেবলের একলা থাকার—ছোট্ট ফ্ল্যাটখানায় কাকলি এসেছিল ভালোবাসার একটি অভিজ্ঞান রেখে যাবার জন্য। দেবলের কাছ থেকে কাকলি শেষবারের মতো প্রণয় নিবেদনে সঁপে দিয়ে প্রার্থনা জানাতে চাইছে, শুধু একখানা অনুমতির জন্য। আর ঐ প্রার্থনাখানা হোল—যাতে দেবল তাকে নিজের ভালোবাসার বাঁধন থেকে দিতে পারে মুক্তি।—কেন জানি, কাকলি নিজেও জানে না—কেন ও হোতে চায়—দেবল থেকে অসংযোজিতা রূপে—মুক্তিপ্রিয়া! সত্যি,

সত্যি, দেবলের মতো এই সুন্দর আর শৌখিন ছেলেটির কাছ থেকে মিনতি ভরিয়ে চাওয়া ঐ বিরাট অনুমতিটুকু পেলেই হোল! আর, হ্যাঁ, ঠিক তার পরেই—না, না, না। ও কথা চাই না ভাবতে। চাই না, চাই না—

একটা রহস্য ঘেরা পরম বিস্ময়ে হাতছানি থেকে নিথর হোয়ে গেল কাকলির এই সব সাত-পাঁচ ভাব-ভাবনা।—ঈষ্!—মনে মনে শিউরে উঠলো সে—কী যা তা বলতে চেয়েছে নিজেরই প্রাণপ্রতিম—এই সুন্দর আর মধুর যৌবনেরই ছেলেটিকে!

না। না। না।—আর কিছু চায় না সে ভাবতে। চায় না সে বলতে। এমন কি জানাতে।—কাকলি বোঝালো নিজেকে তাই।

তাই তখন ও সব ভাবনা বহুদূরে সরিয়ে দিয়ে পুলকিত চঞ্চল মন নিয়ে—সোহাগে আর আদরে ভরিয়ে তুলতে লাগল কাকলি তারই দেবলকে। প্রিয়র ভয় পাওয়ার মধ্যে অভয়ের সুর ধরিয়ে দিয়ে গেল—তারই প্রিয়া। তারই সুজনা যুবতী।

কাকলি শুধালো—ভয় কী দেবল, তুমি যদি জোর কোরে আমাকে ধরে রাখতে পার, তা হোলে কী আর কখনো আমি ছন্দ হারিয়ে অন্যের হোতে পারি? এই বলি কি জান, একটু জোর কর, দেখবে তা হোলে তোমার কাকলি রয়ে গেছে তোমারই। একেবারে শুধু তোমারই। স্বত্বে আর যত্নে, মায় অস্তিত্বে আমি হোয়ে থাকব—শুধু তোমারই।

আর তারপর—মনের ভয় ভয় বিষাদ নিয়ে থাকা থেকে হঠাৎ—কাটিয়ে ওঠা দেবলের খুশীতে রিমঝিমানো, হাঁসি হাসি ঝলক ঝরানো মুখেতে আদর ঢেলে দিল কাকলি। তখন প্রিয়ার লাল লাল ঠোঁটের কিনারা ধরে মুক্তার মতো ঝক্‌ঝক্ করা শুচিশুভ্রতা উপ্‌ছে পড়েছে।

অনেকটা সময়ের নীরব থাকা ভঙ্গিমা থেকে জেগে উঠে জানাল দেবল—এই কাকলি, শোন। এটা ঠিক যে, তুমি বললেও আমি তোমার ওপরে কখনো কোন কিছু নিয়ে জোর কোরব না। কেন না কোন ব্যাপারে কারুর ওপরে জোর করাটা হোল একেবারে আমার স্বভাবের বাইরের জিনিস। আমি জানি যে, আমার কাকলি, তুমিও সেটি ভালো কোরেই জান। তাই ঠিক না? তবে, কেন আমায় বলছো তোমার ওপরে জোর করতে?

—না, না। শোন, দেবল। লক্ষ্মীটি, মাত্র একটি বারের জন্য আমার ওপরে জোর কর। আমাকে ফিরিয়ে আনতে হোলে তোমাকে সত্যি আমার ওপরে জোর খাটাতে হবে। এই। এই, সত্যি বলছি, তা না হোলে যে তোমার কাকলি...

কথা আর শেষ হোতে দিল না—হঠাৎ জাগা আবেগের করুণ মতো মূর্ছনাটি।

ওভাবে কাকলিকে কথা নিয়ে থেমে যেতে দেখে, প্রথম বিস্ময়ের ছোঁয়াখানা মুহূর্তেই কাটিয়ে উঠে বলল দেবল—জান কাকলি, আমি সব বুঝি। তবু কিন্তু জোর ক'রব না। তবে কি জান, একটা জিনিসের সত্য তোমার সামনে আজই প্রকাশ করাবো। আর সে সত্যটিকে জেনেছি আজই। হ্যাঁ, এটি জানবার পর তোমার তখন যা ইচ্ছা হয় তাই ক'রবে। আর তাই বলো করার জন্য। আর তারই মধ্যে দিয়ে তোমায় পাওয়াটাই হোল গিয়ে আমার পক্ষে—আমারই কাকলিকে সত্যিকারের কোরে পাওয়া। কী বল তুমি, এই মেয়ে?

অবাক হওয়া বিস্ময়ের রঙে রেঙে উঠে কাকলি জানতে চাইল—এই দেবল, খুলে বল, কি সত্যিখানা তুমি জেনেছ। বড় উৎসুক আমি তা জানতে। এই, জানাবে না? ওগো, বলবে না?

মুখেতে অধর ছাপিয়ে মধুর হাসির নাচন তুলে জানাল দেবল—বুঝলে এই কাকলি, আজকেই আমি জানতে পেরেছি মেডিকেল রিপোর্টটাকে।

—কী বললে? রিপোর্ট? তায় আবার মেডিকেল ব্যাপার। এই, কিসের ওটা? অসুখের? অসুখটা কার? তোমার নয় ত? বলে ফেল তাড়াতাড়ি কোরে। তোমার সত্যি কোন অসুখ হয়েছে কি না, এই, বল দেবল! কী অসুখ, আর রিপোর্টটাই বা কী?

কথা বলার ফাঁকে কাকলির ছবি হয়ে থাকা চোখ থেকে—আর মুখ থেকে—বিস্ময়-বিমূঢ়তা ঝরে ঝরে পড়লো।

হাসিতে গমকছড়াতে ছড়াতে বলল দেবল—বাঃ মেয়ে, বেশ ত' না বোঝার চেষ্টা ক'রছ! কাকলি, সত্যি তুমি ভারী দুষ্টু।

মধুতে বিভূষিত কথায় কাকলি ঝরনা হয়ে ছন্দ ফোটাল।—

—ও মা, দুষ্টুমিটাই বা আমি কি করলাম তা জানি না ত! যাক্, তুমি লক্ষ্মী ছেলের মতো বেশ ভালো কোরে খুলে-মেলে বুঝিয়ে দিচ্ছ না কেন—তা হোলেই ত সব আমার কাছে সরল হয়ে যায়। আর তা না হলে আর কি, ঐ তোমার কথা মাফিক, না বোঝার চেষ্টাখানাই কোরতে হয়।

কথার শেষে কাকলির মুখে টইটম্বুরে ভরা হাসির মধ্যে খেলে গেল—রঙীন এক ঝলকানি।

একজনের কথা থামায়—আর একজন অল্প একটু সময়ের জন্য স্তব্ধ হোয়ে পড়ে। মনের আঁধার ঢাকা আলোখানাকে আবরণ থেকে মুক্তি দেবার আগে—সাত-পাঁচ ভাবনা না ভেবেও—একটু নিশ্চুপ হয়েছিল ওরা। দেবল আর কাকলি—দু'জনে।

কিছু পলকের বিরতির পরে, হারানো ছন্দে যদি মেলাবার জন্য, ছবি হোয়ে ফোটা কাকলির উজ্জ্বল থাকা আর মধুর থাকা মুখখানাকে—হাতের মধ্যে তুলে নিল দেবল। তারপর প্রিয়ার মুখরুচির সুষমার প্রতি তাকিয়ে দেখতে দেখতে দুর্বার হোল তার মনের মধু-বাসর। কাকলির ভাসা ভাসা সুন্দর চোখ দুটির কাজল আঁকা রূপখানাকে—হিমেল শিহরণে কাঁপিয়ে তুলল দেবল—আপনার ঠোঁটের 'পরে দুষ্টুমির রঙে নাচানাচি করা হাসিটিকে—ঘনভাবে ছুঁইয়ে দেওয়ায়।

আনন্দ বিভাসিত সায়রে সমাহিত থেকে দেবল তার মঞ্জুলাকে জানাল।

—এই মেয়ে, শোন এবারটি। ওটা আমার, বা তোমার বা অন্য কারুর কোন অসুখের রিপোর্ট নয়।

অবাক বিস্ময়ে কাকলি শুধালো—তবে? তবে সত্যি কার?

—আরে, বলছি গো বলছি। এই মেয়ে, বলি মনে পড়ে?

—কী?—কাকলি চাইল জানতে।

তাই, সহাসে জানাল দেবল—জান কাকলি, মাস দেড়েক আগেকার কোন এক অসম্ভবেতে সম্ভাবিত ঘটনার প্রতিবেদনখানা, আজ পর্য্যন্ত কত দূরে এসে পৌঁছতে পেরেছে আর তার সত্যতাই বা কতটুকুন, বুঝলে,—এ হোল তারই রিপোর্ট।

—এই কী যে বলছ তুমি দেবল, সত্যি বলছি তার কিচ্ছুটি বুঝতে পারছি না আমি! সত্যি বলছি।

সহাস ভরা রূপ আরো ঘন কোরে নিয়ে জানাল দেবল—তুমি বুঝতে চেষ্টা কর কাকলি। এবার ভাল কোরে বুঝিয়েই বলছি। ওগো মঞ্জুলিকা, ওগো রুচিরা, তুমি শুনে আশ্চর্য্য হ'য়ো না এ জন্য, যে, মেডিকেল রিপোর্টটা তোমাকে নিয়ে। আর জান কী তুমি, যে, সেই রিপোর্টে তুমি এক অতি গৌরবময় আসামী বলেই হয়েছ সাব্যস্ত।

বিস্ময়ে-বিমূঢ়ে কাঁপানো এক মস্ত জিজ্ঞাসার ঝড়ে দুলতে দুলতে প্রতিবেদন কোরল কাকলি—না, না, না। এই দেবল, ওগো তুমি এ কী বলতে চাইছ? না, তুমি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে দুষ্টুমি কোরছ।

—না গো কাকলি। সত্যি সত্যি। সিরিয়াসলি বলছি।

কিছু হয় ত' বলতে চেয়েছিল তখনি কাকলি। কিন্তু পারল না। একটি দীর্ঘ করে টানা চুমা এঁকে দিয়ে—প্রিয়ার অধর থেকে বেরুতে চাওয়া কথা থামিয়ে দিল দেবল। কাকলির ঠোঁটের লাল রঙখানা সিক্ত করিয়ে রেখে বলল দেবল—ওগো রসমধুরা, ওগো সুবিনীতা, মনে পড়ে কী তোমার দেড়টি মাস আগের ঘটনা? সেই সেদিনকার ফলতায় বেড়াতে যাওয়ার কথাকে কী পেরেছো মনে করাতে? সেদিন ছিল অষ্টমীর পূজো। আর তারপর সেখান থেকে দেরী হওয়ায় অনেক রাতে গাড়ী কোরে কেন ফিরে এসেছিলাম, তাও কী গেছ ভুলে?

একটু থেমে কাকলির ছবির মতো মুখশ্রীর সর্বত্র—আপনার আঙুলের নরম ছোঁয়া লাগিয়ে আদর কোরতে লাগল দেবল। তারই মধ্যে বলল ধীরে আর মধুর কোরে—আমার কাকলি। আমার মঞ্জুলিকা। তুমি কী ভুলে গেছ, সেদিন আমার কাছেতে এক পরম আকস্মিকের প্রভাবে পড়ে তুমি নিজেই হোয়ে উঠেছিলে কতদূর পর্য্যন্ত প্যাশানেট? প্রণয় নিয়ে গভীরতম অন্তরঙ্গতার জন্য বিহ্বলা? তারপর, হ্যাঁ গো সুনন্দিতা, তারপর তোমাব এমন রূপ থেকে অপরূপা হওয়ার পথেতে বাধা দিতে চেয়েছিলাম আমি। কিন্তু সেদিন সেই অমা রঙ্ সাজানো পলে-অনুপলে, শুধু মধু আর মধু হয়ে বিভূষিতা মূর্তির নিরাবরণতার কাছে আমি আমার হাজার কাকুতি আর মিনতি জানিয়েও—তোমাকে তোমার অঙ্গরুচির আঙ্গিনা জুড়ে জোয়ারের মতো ভেঙ্গে পড়া উদ্দাম ঢেউয়ের পর ঢেউকে—বাধা দিয়ে পারিনি ঠেকিয়ে রাখতে। দেহরাগেতে ঝল্‌মল্ করা সেদিনের সেই প্যাশান ছিল অপ্রতিরোধ্য। সত্যি এরই নিরিখ ধরে তোমারই মনের সেই তপ্ত চাহিদাখানাকে—তোমারই অঙ্গের সাথে করা একান্ত একাত্মায় অবগাহন কোরে মেটাবার জন্য—আমাকে অমন রহস্য ঘেরা একখানা বিরাট প্যাশানের কাছে—স্বীকার কোরতে হয়েছিল আমারই বশ্যতাকে! সে কথা ভাবতে আজ কেন জানি জাগে—এক জানিত পুলক-ভরা-দোলন। সেদিনের ভুল আজ মনে হয়—ভুল নয়। বিভ্রান্তি নয়। নয় কো কোন চপল-বিহ্বলতা। আজ ভাবি এটাই যে, যেদিন তা কোরেছিলাম এই জন্য যে, আমরা দু'জনেই আমাদের দু'জনাকে জানতাম, অশেষে আর বিশেষে, একটা সুষম সমতা ধরে। দু'জনেই জানতাম—কত গভীর আর অকপট ছিল আমাদের পরস্পরকে ভালোবাসা 'বাসতে চাওয়ার রূপখানা। সেদিন

সত্যি দেখেছিলাম পরম এক নিভৃতের মায়ারাগ থেকে নিঝুমতা কাঁপিয়ে উঁকি দেওয়া—তোমারই দেহের সর্বত্র ঘন থাকা যৌবনের সুস্পষ্ট রেখায় রেখায় সাজিয়ে তোলা—ভালোবাসারই দুর্নিবার প্যাশানখানাকে। সত্যি প্রথমটায় আমার অজানা আর নিশ্চুপ অবস্থা একটু সময়ের জন্য হোয়েছিল বিস্ময় নিয়ে খুবই বিহুলিত। কিন্তু যখন বুঝলাম একান্ততায় আমিও আমার আত্মাকে মিলাতে চাই তোমারই সাথে—তখন আমার চেতনায় সাড়া জাগলো। বুঝলাম আমার কাছেতে ন্যায়ের রীতি ধরেই—তুমি নিজেকে অমন ভাবের অসম আন্তরিকতায় ধরা দিতে পেরেছিলে—এইটা নিশ্চয় জেনে, যে,—একদিন আমাকেই তুমি সাত পাকে বেঁধে আমারই গলায় অর্পণ করবে বিবাহের বরমাল্যকে। তাই ত' ঠিক না, এই কাকলি? হ্যাঁ কাকলি, অমিও বলি তাই ঠিক। আর তাই সঠিক ছিল বলে, আমি তোমার ইচ্ছার অপ্রতিরোধনীয় রূপখানাকে শেষ পর্য্যন্ত স্বীকার করার মধ্যে দিয়ে—পেয়েছিলাম অনেক কিছুই। একজন যুবক তার যুবকত্বের অয়নে নেমে—এভাবেই অজানাকে আর তারই রহস্যকে কোরতে পারে—জানার জিনিস, আর তীব্র এক অনুভবেরই অনেক কিছু। সত্যি তাই তোমার সাথে সঙ্গত থেকে—সেই নিভৃতির মধ্যে নিজেদের দিয়ে একে অপরের লাজকে নিজেরই মধ্যে বিলিয়ে দিতে দিতে—আর নিজেরই জন্য তা হরণ করাতে করাতে—ভালো লাগার যে চরম ধারার সমেতে ওঠা আনন্দখানার অশেষতা পেয়েছিলাম—তার তুলনা নেই অন্য যে কোন ভাবের বা অনুভাবের কী ধৃতিতে, কী কৃতিতে—তাই না কাকলি? জানি, এই মেয়ে, তুমি সত্যি সে মুহূর্তের অসম্ভব টানাপোড়েনের মধ্যে পড়েও তোমার ইচ্ছাখানার প্রবল প্রকাশকে বিন্দুমাত্র দমিয়ে দিয়ে রাখতে চাও নি এক অসহায়র মতো, এক দুর্বলচেতার মতো! এরই জন্য আমার আনন্দ আজ সব চাইতে বেশী। তুমি, হ্যাঁ গো কাকলি, এই তুমিই তাকে আমায় দিয়ে সহজেই শেষ পরিক্রমায় স্বীকৃতি দেওয়াতে পেরে, এই ধরনের হঠাৎ আলো-আঁধারির মতো ঝলকানো স্বত্বার প্রতি দিতে পেরেছিলে এক মহান রূপ। পুরোপুরি সাব্লিমেশন স্বীকারের মাধ্যমে। সত্যি, সত্যি, তুমি দিয়েছিলে এর প্রভাবের মধ্যে—এক সুন্দরতম আবেদন থেকে—আর এক মধুরতম প্রতিদান। রূপ ফুটিয়েছিলে মহান রীতিতে আর নীতিতে। তাই না, কি গো, আমার কাকলি?

কথার পর কথা নিয়ে লম্বা মতো পরিক্রমণের কিছু পরে কয়েকটা মাত্র পলকের জন্য থামল, প্রিয়তমের মুখের রেখা নিথর হওয়ায়। খুশীয়াল থাকায়। দেবল তাই অপলকে তাকাল তারই প্রিয়ার ছবি হোয়ে বিভূষিত মুখরুচিরার প্রতি। প্রিয়াকে রূপ-সুষমার মানদণ্ডে ছবির মতো দর্শন কোরতে—যে কোন যুবকেরই যৌবন নাচা হৃদয়ের আকুতি—না চেয়ে চুপ থাকতে পারে না। তাই এই ভাবের বিশেষতার কাছে দেবল হয় নি—ব্যতিক্রম।

ছবির মতো নিখুঁত হোয়ে প্রতিভাসিত মুখখানার প্রতি অপলকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে, দেবল হঠাৎ এক টুকরো আলোর ঝলক সমেত তারই জৌলুসে ঝলস্ লাগিয়ে প্রিয়ার অধরের বাঁকা-চোরা কোণের অভিমান নিয়ে ফোটা—লাল রঙ্খানাকে গলিয়ে দিতে চাইল—আপনারই অধরের কয়েকটি পরশের ভেজা ভেজা দাগ রেখে যাওয়া—আঁকি-বুঁকিতে।

কিন্তু অমন সলাজ মধুরতায় অভিবাদন জানানো অধর নিয়ে, অন্য আরেক অধরখানাকে জানাজানিতে নেমে চুমায় চুমায় আর মাতামাতি করালো না দেবল—দু জনারই যুগপত মিল করা দু'ধরার চারখানি—নিলাজিত ঠোঁটের মধ্যে।

মধুর কথার সেই রেশখানা ধরেই বলতে লাগল একাত্ম হয়ে পড়া প্রিয়ার কাছটিতে—বুকের আলিঙ্গন ঘন করাতে করাতে দেবল—এই কাকলি, তুমি নিশ্চয় কোরে জান যে, তুমি তা পূর্ণ এক মধুরিম স্বত্বার মধ্যে স্থিতির প্রতিষ্ঠা করাতে পেরেছিলে—নিজেরই ভালো লাগা ভালোবাসারই শারীরিক সুখরাশির মধ্যে টেনে এনে—তোমারই দেবলকে মনে-প্রাণে অভিষিক্ত করিয়েছিলে যৌবনেরই ধৃতিতে, আর যুবকত্বেরই কৃতিতে। বুঝলে কাকলি, তাই তোমার এই দেবল নামের ছেলেটির শান্ত স্বভাবে ধীরে ধীরে তোমার লাজ দিয়ে ঘোমটা টানা যৌবনায়নী মিথুনকে, তোমারই যুবতী রীতিকার সক্রিয়তায় এসে—উন্মোচন করাতে পেরেছিলাম। আমার যুবকত্বের থেকে সেদিন তুমি করিয়েছিলে কৌমার্য্যকে লাজাঞ্জলির মধ্যে—দিয়ে অভিষেকের রূপায়ণখানা। আর তুমিই কাকলি পেরেছিলে মিথুন দেশের রূপকথার মতো জীয়নকাঠির অনুসন্ধান জানাতে এসে,—শেষ পর্য্যন্ত আমার যৌবনকে শোভিত করানো—এক চরম ও পরম সুখ ও খুশীর রভসতায় মাতাল করাবারে মধ্যে। আর মাতোয়ারা রাখার মধ্যে।

প্রিয়তম যুবক-সুজন দেবলের মুখের কথা শুনতে শুনতে রূপস্নিগ্ধা কাকলিব রিমঝিম সন্ধ্যার মতো সুষমার প্রাখর্য্যে ঝল্‌মলানো, আর ঝক্‌মকানো দীর্ঘ চব্বিশটা বছরের ঋতু-ঘন বসন্ত নিয়ে বিভাস পাওয়া—যৌবন-মধুরিমাখানা যুবতীদের চিরন্তনী লজ্জাধারার আরক্তিম আভায় আভায় কোরে চললো—রূপস্নান। প্রণয়স্নান। আবেশস্নান। আরাধনায় আর ভালোবাসায় চোখের রেখায় প্রজ্জ্বলিত করা কাজল—হোয়ে পড়েছে মদির আর নিথর। অধরের লাল রঞ্জনী বাঁকাচোরা হাসিকে কোরে রেখেছে আরো বিহ্বল—হাসিতে আর নিশ্চলতায়। বিদিশার রাত্রির অপার রহস্য দিয়ে আবরণ দেওয়া—রূপবতী বুকখানার স্তবকভার আনম্র থাকতে পারে নি—শুধু বিস্ময়ের মায়ারাগে শিহর দিয়ে—তারই আপীন বিকাশকে পেশিলত মাধর্য্যে ধরা ওঠানামা করা—নাচের তালে তালে।

লাজভরা হাসিতে মুখর হোয়ে, মুখের ওপরে ছাপা লাল রঞ্জনীকে কাঁপিয়ে নিয়ে দেবলের কাঁধেতে আরাম কোরে মাথা এলিয়ে রেখে—কজ্জলিত চোখ দুটোকে আরাম পাওয়ায়—বুঁজিয়ে আনল কাকলি। গালের মসৃণ শুভ্রতায় গড়িয়ে গেল সুন্দর টোল খাওয়াখানা। লাল ঠোঁট জুড়ে হাসি দুষ্টুমিরই রঙ্ নিয়ে উঠলো ফুটে। আর ফোটালো কুসুম। জাগালো নাচানাচি করা হাসির—সেই শুভ্র ঝলমলানিকে।

মিষ্টি মিষ্টি রেশ টেনে কথার সুরেলা লহর ধরে জানালো কাকলি—ধ্যাৎ! এই দেবল, বলি কি জান? আমি বলি এই যে, তুমি, হ্যাঁ গো এই তুমি হোলে বড় শান্তটি যেমন, তেমনি একটু দুরন্ত আর দুষ্টু তাই না? শোন, শোন। যাক সে কথা। এই মধুর, বললে না কী আজ জেনে এসেছো তারই কথা? সত্যি না জানিয়ে তুমিই ত' দুষ্টুমি কোরছ! ঈষ্, ঈষ্, তুমি ভারী...

শেষ করালো না কথাকে। তারপর আর কিছু না বলে কাকলি তার দেবলকে নিজের দুটি নরম হাতের মধ্যে—আবেগে সুকঠিন করানো বাঁধন দিয়ে—খুশীতে আর মুঠো মুঠো লজ্জায় ভরাতে ভরাতে মাতোয়ারা থেকে জড়িয়ে ধরতে লাগলো। দয়িত দেবলেরও বুকের চব্বিশটা টানা বসন্তে আর বসন্তে রাঙানো প্রণয়াকুলতাকে এক —একটা আনম্রভাবে পেশলিত থাকা—পীনতার শিহর তুলে তুলে ঝলক ভরা পুলক-ভার ছুঁইয়ে রাখলো—তারই প্রিয়া মঞ্জুলিকা। লাজ নিয়ে ফোটা নরমে আর কঠিনে পীনোদ্ধ থাকা সুষমা দিয়ে কাকলি—বন্দনা জানালো দেবলের বুকের ওপরে তারই আসন পেতে—প্রিয়র প্রণয়ে আকুল কারুকাজখানাকে নিয়ে। প্রিয়া যখন আপন সক্রিয়তায়—প্রিয়কে ভালবাসার বশ্যত করা মিনতির আবেশ দিয়ে রাঙাতে রাঙাতে চলেছিল—তখন এরই প্রাপ্তির ভরা ব্যাপ্তিতে দীপ হোয়ে—খুশীতে আর পুলকে পুলকে বিভোর থেকে—দেবলও হোল চঞ্চলিত থাকা—এক প্রণয়-বিভাস।

ভালোবাসার ধৃতিসাঙ্গ রূপারূপখানাকে মধুর থেকে—আরো রসমধুরিক করাবার জন্য দেবল মনে মনে তখনি হোল তৈরী। চাইল প্রিয়ার অধর সমীপেতে—আবেশ নিয়ে বাদুলে বাতাস হ'য়ে উঠতে। তাই হোতে হোতে—কাকলির সুমসৃণ কপোল থেকে, চোখের কাজলরেখায় টানা পাতা হোয়ে রক্তিমাধর পর্য্যন্ত—লোধ্ররেণুর ওপরে ওপরে—দেবল তার ভেজা ভেজা ঠোঁট দু'খানার নরমতা দিয়ে ছড়িয়ে ছড়িয়ে, টেনে আঁকতে লাগল—লজ্জার দাগ-প্রসাধনীকে।—বড় দুষ্টু স্বভাবের শুধু মধু—ঃ ওয়া চুম্বনেরই সঘন আলিম্পনে। আরামঝরার রূপমহলে থাকার মতো আরো বেশী কুঙ্কুমিতা হয়ে উঠলো—কাকলির অঙ্গরুচিরার প্রতিটি সুষমায় ঘেরা—বিলোলতা। প্রতিটি দুষ্টু-রঙ্—হিলোলতা।

আবেশ জড়ানো গলায় বলল কাকলি—এই, এই দেবল, লক্ষ্মীটি বল, কী জেনেছ আমার সম্বন্ধে? এই, আগে জানাও ওটা, তারপর যত রাজ্যের দুষ্টুমি ক'রতে ইচ্ছা হয় তাই ক'রো নিশ্চয়—কোরে আমারই ওপরে, কেমন?—বলতে বলতে আগের মতোই আরামঝরার রূপের অতলে থেকে—ছবি হোয়ে আভাস দেওয়া কাজল আঁকা পাতাকে—আনলো বুঁজিয়ে আহ্লাদ থেকে। রূপ থেকে অপূরপেতে প্রণয়-স্নান সাঙ্গ করায়। তারই মধ্যে অনলস দীপ্তিতে সমাহিতা হওয়ায়।

—এই মেয়ে, না বলবই বা কেন? এই ত' বলছি। কিন্তু তার আগে তুমি অন্তত একবারটি নিজের মুখে বলবে না কি, সেদিন অষ্টমীর রাতে আমার কাছে কী চেয়েছিলে, আর তারই পূর্ণাহুতিতে করিয়েছিলে কী, তারই কথা? ঈষ্! থাক থাক। আর বলতে হবে না। এখন যে দেখছি অমন কথার জন্য নিজেরই মধ্যে হ'য়ে উঠছো লজ্জায় লাল! সত্যি তুমি যেমন মিষ্টি, তেমনি ভারী দুষ্টু।—বলতে বলতে আদর ক'রে দেবল তার কাকলিকে দারুণ এক শিহরে পুলক লাগালো, তারই সুছাঁদ নিয়ে ঘেরা ঘাড়ের মসৃণ রূপের মধ্যে—এক দীর্ঘ সময়ের সুগভীর চুমায়। একটু বিরতি টেনে বলল দেবল—এই কাকলি, এখন দুষ্টুমি না করে লক্ষ্মী মেয়ের মতো চোখ দুটো খুলে তাকাও। চোখ এভাবে বুঁজিয়ে রাখলে কিন্তু আমি তোমায় কিছুটি না জানিয়ে, ক'রব শুধু দুষ্টুমি। বুঝলে? জানতে যদি চাও, তা হোলে চোখ খোল।

ও কথার সঙ্গে সঙ্গে কাকলি তার প্রিয়র কাঁধের ওপর থেকে মাথা তুলে নিয়ে—চোখের ছবির মতো রূপখানাকে—বন্ধ রাখা পাতার ফাঁক থেকে মুক্তো করার পর—মদালসা চাহনীর রঙীন ঝলক নিয়ে তাকালো ঝক্‌মকিয়ে।

বলল কাকলি আদর মাখানো গলায় সুরেলা কোরে—বাব্‌বা, রক্ষা কর, লক্ষ্মীটি। তোমার কথাই মানলাম। বাব্‌বা, জানি ত' ভালো কোরেই, তোমার দুষ্টুমি মানেই ত' হোল আমার শরীরেতে বড় বেশী সুড়সুড়ি দিতে দিতে, সময়ে এমন অবস্থায় তুমি নিয়ে যাও যে, আমি তখন মুক্তি খুঁজতে গিয়ে অঝোরে কেঁদে ফেলি। সত্যি, তোমার এমন ধরনের দুষ্টুমিপনাটিকে আমার বাঘের মতো ভয় করে। সত্যি।

প্রিয়র অধরেতে কানায় কানায় টইটুম্বর হোয়ে থাকা দুষ্টু হাসির মধ্যে—একটু সামনে ঝুঁকে কাকলি নিজের অধর লুটিয়ে দিয়ে একখানা লাল দাগ ফুটিয়ে তুললো তখনি। আর তার পরেই জানালো—ঈষ্‌! বড় বেশী ভালো ছেলে সাজা হচ্ছে এখন, না? বলি দেবল, আমার আকাঙ্খিত জিনিস-কাজের মধ্যে সেদিন যে পরিপূর্ণতা পেয়েছিল, তা কী শুধুমাত্র একলা আমার জন্যই হোয়েছিল? শুধু তুমি বুঝি তাতে যোগ দিয়েছিলে, না? তুমি বুঝি হোয়েছিলে না সঙ্গত ও জানার সাথে মিতালি পাতাবার পর? ওগো দেবল, আজ তবে কেন তুমি তোমার বক্তব্যের মধ্যে তুলছো ফুটিয়ে এক নিরপেক্ষ থাকা ভাবখানাকে? ভারী দুষ্টু তুমি, সত্যি বলছি তা না হোলে কী আর দুষ্টুমি কোরছ এমন সময়ে?

অধরে আবার চুমার আবেশ ঝরিয়ে প্রিয়র দুষ্টুমিপনাকে শান্ত করাবার জন্য কাকলি কয়েক পলক না থেমে পারলো না। তারপর কথায় আবার ফিরে এসে জানালো কাকলি তারই দেবলকে, চিরন্তনী প্রিয়ার যৌক্তিকতার নিখুঁতে সুন্দর হওয়া সুভাষণ—দেবল শোন, তুমি ছেলে, আর তাই সেদিনকার সেই কথা ও কাহিনীকে তারই কারুকাজের পরম্পরা ধরে আমার সামনে উত্থাপন কোরতে, মোটেই কোনরকম লাজজনক বাধা পাওনি। তুমি অনায়াসে আর অকপটেই বলতে পেরেছো সে কথা। কিন্তু কী জান, তোমার ফরমাশ মতো নিজের মুখ থেকে ফুটিয়ে সে কথাকে জানাবার ব্যাপারে আমি সত্যি বাধা পাচ্ছি কোন না কোন কিছুটিতে। বিশ্বাস কর লক্ষ্মীটি। বুঝলে দেবল, আমি মেয়ে। তাই এটাই বলতে চাই যে, সেই সেদিনকারই মতো কাছের কী দূরের কোন ভবিষ্যতে বা কেন, ধর না এই আজকেরই এই মুহূর্তটিকে ঘিরে যদি আমাদের মধ্যে—ঐ দুর্নিবার আকাঙ্খার আবার পুনরাবির্ভাবখানা ঘটে যায় আজো অঘটন ঘটার মতো নিরিখ থেকে, তা হোলে—এটা ঠিকই যে, তখন হয় তা বা কেন,—নিশ্চয়ই ব্যবহারে, প্রকাশে ও কাজের বিভাসেতে তখনি আমি কোন রকম দ্বিধা বা সংকোচ না কোরেই—তোমার সঙ্গে, তোমারই জন্য মিল ধরে—লাজ হারিয়ে বেহায়া হোয়ে উঠতে পারি। আর পারবও তা শতেক বার পর্য্যন্ত! কিন্তু কী জান দেবল, যুগপতে ঐ আরাধিত করা, আর বন্দিত থাকা কারুকাজখানার নিভৃতে পাওয়া সমাধানের পর—তারই প্রকাশখানা নিয়ে যদি প্রিয় আবদার ধরে তার শ্রীমতীর নিজের মুখ থেকে শোনার জন্য—তা হোলে পর জেনে রাখ, যে, আমি মেয়ে হোয়ে যতই সাহসের কাজ কোরে থাকি না কেন, তবু

কক্ষনো কিছুতেই নিজের মুখ দিয়ে তোমার ফরমায়েশী কথা বলতে পারবো না। মেয়ে হোয়ে মুখ ফুটে তা জানানো সত্যি অসম্ভব। তুমি মেয়ে হোলে পর আমার অসুবিধাটা কী—তা নিশ্চয়ই পারতে বুঝতে?

যৌবন থেকে যুবতী হওয়া কাকলির নিখুঁত মেয়ের রূপখানা ঝল্‌মল্‌ করা থেকে—এমন কথা বলতে বলতে ঝড়ের ঝাপটা লাগানোর মতো কোরে—দেবলের হাসিতে নিভৃতে থাকা ঠোঁটের ওপরে ওপরে সজোরে আপন অধর গাঢ় ভাবে ছোঁয়ার মধ্যে—চুমায়ন করিয়ে লাজুক লাজুক ভাবে প্রিয়তমর শান্ত দু খানা চোখের তৃপ্ততার প্রভাসময়তার প্রতি তাকালো। আর তখনি বলল কাকলি—এই, তাড়াতাড়ি কোরে বল। জানাও। আর দেরি মোটেই ভালো লাগছে না! এই মিষ্টি, জানাও তোমার আজকেরই ঐ জানাকে!

প্রিয়ার সক্রিয়তার কাছ থেকে পাওয়া আদরের নির্য্যাস উপভোগ কোরতে কোরতে বলল দেবল—বুঝলে, এই দুষ্টু!—বলতে বলতে প্রিয়ার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলতে লাগল—সেদিন তোমার আহ্বানে আমি সাড়া দিয়ে কোরেছিলাম, তোমারই অভিলাষখানাকে এক বন্দনার বিষয়। আর তারই নিরালা ঘেরা নিভৃতটি পরম এক আশীর্বাদ হোয়ে তোমার-আমায় মিলিয়ে-মিশিয়ে, ভালবাসার চরম ও পরম সুখসম্ভারের প্রাচুর্য্য উজাড় কোরে ও পেয়েছিলাম ও তা দিয়েওছিলাম। যুগপতে দু জনেই দু'জনাকে! অর কী জান, তারই পরম্পরা ধরে অভিজ্ঞানে স্বাক্ষরিত না হোয়ে পারে নি তা। অন্‌ দ্যাট্‌ মিস্টিরিয়াস্‌ নাইট—উই টুগেদার লাভিংলি, ওয়ার্মলি য়্যাণ্ড প্যাশানেট্‌লি য়্যাম্‌ব্রেস্‌ড্‌ বোথ সেক্সেস্‌—ইন দ্য অ্যাক্ট অফ্‌ জেনারেশন্‌, বিইং কম্‌প্লিটলি ডিস্‌রোবেড্‌!—বুঝলে কাকলি, আর তারপরেই কি না আজ মেডিকেল রিপোর্ট থেকে তুমি ধরা পড়েছো, যে, ঐ সেদিনকার নিভৃতে ঘেরা কারুকাজ পরম্পরা সমেত—দাগ রেখে যেতে পেরেছে তোমারই মধ্যে, একজনা গরবিনী আসামী রূপে। সত্যি, সত্যি তুমি জান না হয় ত' যা এখনও, তাই আমি আজ এসেছি জেনে।

বলতে বলতে দেবল কাকলিকে তার দেহের সাথে জড়ানো কঠিন বাঁধনখানা থেকে আলগা কোরে—সোফার ওপরেতে আধ শোয়া অবস্থায় বসিয়ে দিয়ে—প্রিয়ার ছবি হোয়ে ফোটা মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লো আপন চোখের মধুর হওয়া চাহনি নিয়ে—অপলকে তাকাতে তাকাতে। আর তারপরেই কয়েকটি পলকান্তরে অবিরাম ভাবে ঝরা বৃষ্টির বাদুলে ধারার মতো কাকলির আয়ত চোখে, লাল রঞ্জনী আঁকা নরম নরম ঠোঁটের তীররেখায়, টোল গড়ানো কপোলের মসৃণতায়, সরু আর নিখাদ কালো ভুরুতে, শ্রাবস্তীর মুঠো মুঠো অন্ধকার নিয়ে থাকা রেশমের মতো কেশদামে, পুরুষ্ট গলার খাঁজে ও কাঁধে—এবং মাঝেমধ্যিখানে প্রিয়ার নরম সুষমার ঝলস্‌ আর ঝলক্‌ নিয়ে ছন্দিত থাকা বুকখানার দু'ধারার পীন লাজ-পেশলেতে—দেবল তারই প্রিয়তমর সানন্দ-অভিবাদনখানা জানালো নিজের অধর দিয়ে—অনেকটা কোরে সময় ধরা এক একটি টানা চুমার—অয়ন থেকে। তারই খুশী করানোর দুষ্টু-রাঙা রঙ্‌খানা সংখ্যাতীত চুমার আলপনা নিয়ে ফুটে ফুটে ওঠায়—ভেজা ভেজা অবস্থার

মধ্যে লম্বা ভাবে দীর্ঘতর কোরে টেনে টেনে যাওয়ার নিরিখ ধরে—মিষ্টি মিষ্টি তৃপ্তির ঐ দাগগুলো প্রিয়ার অঙ্গরুচিরার প্রসাধনকে ছাপিয়ে গেছে।

সুতৃপ্ততার দীপ্তি ভরিয়ে নিয়ে দেবল জানালো—আমার মিষ্টি মেয়ে, আমার কাকলি, বুঝলে গো তাই আর কী—আই হ্যাভ্ রিয়্যালি জারমিনেটেড্ ইয়োর ফার্টিলিটি অফ দ্যাট ভার্জিন ফিজিক্। দ্যাটস্ হোয়াই ইয়্যু হ্যাভ্ কন্সিভড্ এ নিউ লাইফ। সত্যি, সত্যি তাই নয় কী বল? এই কাকলি, কথা বল। আমার কাছ থেকে ত' শুনলে সবই। তবু চুপ কোরে রয়েছো কেন? এই, তুমি দুষ্টু পুরোপুরি!

কিন্তু কথা বলার মতো শক্তি হারিয়ে ফেলেছে কাকলি। এটা কেমন ধরনের পুরস্কার। আর কেমনতর ভবিতব্য! না কি পুরস্কারের চাইতেও এর স্থান, এর স্থিতি অনেক উঁচু, অনেক মহার্ঘ্যতার অধিকারী! সে যাই হোক, কাকলি বাকশূন্য হওয়ায় নিশ্চলা থেকেও মনে মনে মোকাবিলা কোরল—প্রিয়র বার্তা আজ যা নিবেদনে জানালো—এক মস্ত বড় সত্যের বন্দনা করার মতন কোরেই, সেই তাকেই তার মনে হোল—প্রিয়তম স্বয়ং বহন করা এই বার্তা—আকারে আর প্রকারে শুধু আনন্দ আর আনন্দেরই মূর্ত প্রভাস। স্ফূর্ত ব্যাপ্তি। তাই প্রিয়-সুজনকের হাসি ভরা মুখ থেকে ও-কথা শুনতে শুনতে, নিখাদ সুখেতে হিলোলে-বিলোলে মুখর হোল কাকলির প্রণয়-রভসের মায়াঞ্জনে রূপমদির থাকা দু'খানি আয়তা চোখের—সেই কাজল ঘেরা মধুক্ষরা চাহনি। ওরই শান্ত রুচিরায় স্নিগ্ধ করা শুধু অপলক চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে—সুন্দরকান্তি দেবলের সুস্মিতাধর সমেত মুখখানার খুশীয়াল থাকা ভাব ও বিভাব নেওয়া—সেই রূপাভাকে দেখতে লাগলো।

বরকন্যা কাকলি বিস্ময়ের সাজঘরে বিন্দুমাত্র, কণামাত্র বিহ্বল হোয়ে উঠতে দেয় নি—নিজেকে। হারালো না ছন্দ। ভুললো না স্বত্বায় রাঙা সত্যখানাকে। তারই রত্নত্ব নিয়ে হোয়ে ওঠা প্রজায়িতার দারুণ গরিমারই হাজার ধারায়—সুখঝরার কারণখানা মূর্ত এক রঙীন স্ফূর্তির—স্বতঃস্ফূর্ততায় ভরালো।

কাকলি জানে—যদিও আজ এ মুহূর্ত পর্য্যন্তও হোতে পারে নি—বেদের আর উপনিষদের মন্ত্রোচ্চারণার সাথে সাথে—সপ্তপদ পরিক্রমা কোরতে কোরতে—তিল আর তুলসী অর্পণ করার মধ্যে—দেবলেরই পরিণীতা! জায়া! অর্ধাঙ্গিণী! দ্যাট্ সুইটেষ্ট বেটার হাফ্! তবু, তবু, সেই রাঙা চেলীতে, আর লাল বেনারসীতে, আর চন্দনে-কুঙ্কুমে-অগুরুতে সেজে একখানা অশেষ মধুরিক ছবির মতন দেবলের হাতেতে হাত রেখে—"যদিদং হৃদয়ং তব"র সুললিত ভাবের ভেতরেরই দীপ্তির সঙ্গে ঝলমলিয়ে উঠে—ঠিকই কোরতে পারে নি এখনো—সম্বোধনের ঘনিষ্ঠতাটি! তাই বলে কী আজ যা স্বত্ব নিয়ে ওরই যুবতী দেহ-সায়রের মধ্যে করাতে পেরেছে পুষ্পায়ন—এই তাকে কী পরম এক আকস্মিকতারই ক্ষমাসুন্দর ব্যাপ্তিতে—কাকলি নিজে কোরবে না গ্রহণ? সত্যি—এটা কী ওর যৌবনের তাপে ঋতু সাজাবার কালে রীতির ভেতরেই—প্রিয় যুবকের সাহচর্য্যে আবাহন করার তালে তালে—কৌমার্য্য থেকে লাজহরণকারী শুভাশীষ নয়? নয় কী এমনটা—কাকলির প্রকৃতিতে ফোটা কেবলমাত্র যুবতী কানুনেরই প্রভাসিত 'one holy virginity'-র জন্য বন্দনা করা—

অচিরে বিবাহিত হোতে চাওয়ারই "pre-marital bliss"?

যাক্ সে সব সাত-তাড়াতাড়ি করা সাত-পাঁচ ভাবনার এলোমেলো পথ-পরিক্রমণ!—তাই ঠিক ঠিক কোরে ভাবলো কাকলি—প্রিয়র সুস্মিত মুখের থেকে কথা শোনার—শেষাশেষি!—এ যে শুধু আনন্দ, আর আনন্দেরই কথায় কথায় তৈরী ফুলঝুরি! তাই না?—নিজেই মোকাবিলায় প্রশ্ন কোরল নিজেকে তখন—নিখুঁত যুবতীত্বের স্বস্তিতে। আর তারই অস্তিত্বে।

আনন্দিতার মতো তৃপ্তির মধ্যে তপ্তালিকা থেকে কাকলি তার দেবলের খুশীর রঙ নিয়ে নেচে যাওয়া—দুটি শান্ত চোখের দিকে আপনার চাহনির কাজল দিয়ে আঁকা রূপ ধরে রেখে—মনে মনে নিজেকেই শুধালো—কত সুন্দর তুমি। কত মধুর। কত নিরুপম। তুমি দেবল, তাই নিয়েই থাকবে নিশ্চয় সময়ের পারাপারে অটল! আর অভঙ্গুর! স্থিতিতে, রীতিতে অনলস। থাকবে অনিদ্র প্রহরীর মতো আমাকে তোমারই জন্য সচলিতা আর সক্রিয়া রাখারই জন্য!

তাই ভাবতে ভাবতে কাকলির মনে পড়লো—কিছু দিন আগের এক আঁধারেতে ঘন তমসা নিয়ে নিঝুম থাকা সন্ধ্যার শেষ প্রহরেতে—প্রখর ধারার যৌবনায়ন ঋতু-বিপর্য্যয় থেকে—কাকলির দেহী যুবতীকার ঝল্‌মলানো মিথুনাভারখানা সমাপ্ত করাবারই জন্য— দেবলকেআরাধনার ভেতরে ভেতরে তারই যুবকত্বের সুরীতিকার মধ্যে নিজেকে সমর্পিতা করাতে পেরেছিল—রতির আরতিতে। কাকলি নিজেই। কেন না, কাকলি তার আগেই যুক্তি দিয়ে বারে বারে নিজেকে ও তারই প্রিয়কে অযৌক্তিকতার খণ্ডন করানোর মধ্যে দেখাতে আর বোঝাতে পেরেছিল—যৌবনেরই নানান রহস্য দিয়ে ভরা সাজঘরের যৌক্তিকতাগুলোকে।—নানান মধুবাতায় ঘেরা রুমুঝুম মুহূর্তেরই নিরালায়, আর নিঝুমতায় ভালোবাসাবাসির দীপায়নে আর রূপায়ণে—আবিষ্ট থেকে। আর পেরেছিল তা আশ্লেষেতে—অন্বিষ্ট থেকে।

বেশ অনেক দিন আগেকার একটা টুকরো কথা মনে ঝলমল কোরে উঠলো কাকলির। এই প্রসঙ্গেই। বিশেষ ভাবে প্রিয়তমর মুখ থেকে জানা—এই মুহূর্তের অসম সুখঝরার বার্তাখানা—আবেশ রাঙিয়ে হৃদয়ঙ্গম করারই নিরিখে। তা এই—

অনেক রূপবতী সন্ধ্যারই কোন একটি মধুময় সন্ধ্যায়—তারই জরির মতো আর চুমকির মতো হোয়ে ফোটা—তারায় তারায় ঝিলিমিলি করা সামিয়ানার নীচে—মাটিরই সবুজ মখমলের আরাম ছুঁয়ে অতি কাছাকাছির ঘনিষ্ঠ তাপের মধ্যে বসে ছিল—ওরা দু'জনা। দেবল ও কাকলি। ওরা বসেছে ফোর্ট উইলিয়মের পশ্চিম দিককার নির্জনেতে অতি নিঝুম এক কোণে। একটু দূরে স্ট্র্যাণ্ড। তারপরেই গঙ্গা। নানান দেশ-বিদেশের ও স্বদেশের জাহাজ থেকে জ্বলা আলো—হোয়ে আছে কোথাও মিটিমিটি। কোথাও বা প্রখরেতে জ্বলজ্বলে। মাঝে মাঝে জাহাজের—থেমে থেমে বেজে চলা বাঁশীর শব্দ শান্ত পারাবার ডিঙ্গিয়ে এসে নির্জন গড়ের চারধারের নিঝুমতাকে কোরে তোলাচ্ছে—অস্থিরে ভঙ্গুর।—তা হোলেও কিন্তু নির্জনতার প্রতি কোন অন্যায় করে না। কেন না, হঠাৎই বেজে ওঠা জাহাজের ঐ বাঁশী—নির্জনতাবিলাসীর দেহে-মনে ছাপিয়ে দিয়ে যায়—এক ধরনের—সহাস আর উচ্ছল

ধারারই রোমাঞ্চে। তারই বৈচিত্র্যান্বেষণে। সবে মিলিয়ে—উপস্থিতের মনে ছন্দ ফোটায়—সুদূরেরই পিয়াসের জন্য!

গড়ের জল-শূন্য শুকনো পরিখাটির বেশ কিছু ওপরের একটা রেলিঙের খুঁটিতে পিঠ হেলান দিয়ে বসেছিল দেবল। আর তারই কোলের কাছটি ঘেঁষে আড়া-আড়ি ভাবেতে কাকলি নিজেকে সঘন আবেশ থেকে সঁপে দিতে দিতে—প্রিয়র বুকের সাথে কঠিন কোরে ধরে রেখেছিল—নিজেরই অনিন্দ্য সুষমায় পেশলিত থাকা যৌবনায়নী বুকেরই নিলাজেতে দুষ্টু ছবির মতো—সলাজে ঘেরা শান্ত একটি নিটোল পাশ।

প্রিয়ার প্রসাধন করা রঙীনাভায় ঝল্‌মলানো ও তুলতুলে কপোলেতে আপনার মুখের একটি ধার ছুঁইয়ে রেখে—দেবল আদর জানাতে জানাতে বলেছিল সেই রঙীন সন্ধ্যাটিতে—এই, কাকলি। আমাদের পরিণয়ের পরে, হ্যাঁ, ঠিক বিবাহের শুভরাত্রিতে তোমার আমার যুগপতে যে অধিকার পাওয়ার মুহূর্তটি এসে পৌঁছবে—হ্যাঁ, ঠিক তারপর থেকে তুমি কতদিনের সময় নিয়ে—নিজেকে প্রস্তুত করাতে চাইবে—একখানা নতুন প্রাণেরই সেই সৃষ্টি-কাজখানাকে পুরোপুরি সুসম্পন্ন করাবার জন্য?—হ্যাঁ গো, কাকলি, তুমি কী তা নিয়ে আমায় জানাবে না কিছুটি? জান কাকলি, শৈশব থেকে যৌবনের ভুবনে অভিষেক পাওয়ার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত, অনেক কিছুকে জানায়, অনেক কিছুটি নিয়ে চিন্তা করায়, আর তাকেই বুঝতে সচেষ্ট হওয়ায়—এই তোমারই দেবল সেদিন থেকে দেহে-মনে যৌবনেরই অয়ন ধরে করেছিল—পরিকল্পনাটিকে। সেদিনই ঠিক করেছিলাম—আমার যৌবনের সবুজতা খুব তাজা থাকাকালীনই সুসম্পন্ন করাবো—আমার পিতৃত্বকে। আমারই সৃজয়নী কারুকাজখাকে—তারই একান্তা আর একাত্মা থাকা প্রিয়ার ততোধিক সবুজাভায় ঝল্‌মলানো—দেহী সমুদ্রের মধ্যে সাঁতার কেটে কেটে চলার জন্য। এই কাকলি তুমি, হ্যাঁ, তুমি কী জানাবে না, তোমারও এমন কথাকে—এই ব্যাপারে?

ওপরের নীল নির্জন থাকা অসীম আকাশ ঘিরে তখন ঝিলিমিলি করা সন্ধ্যা দোল খাচ্ছে।—রাত সঘন হোয়ে ওঠারই পারাপারে বিদায় নেবার জন্য। জরির মতো, চুমকির মতো জ্বলতে জ্বলতে তারাগুলো হোয়ে উঠেছে আরো প্রজ্জ্বল। সুন্দর হওয়ারই দীপায়নে। মধুর করা রূপায়ণে।

হাসির ছর্‌ররায় মাতাল প্রিয়র অধরেতে—নিজের নরম নরম আঙুল বুলিয়ে আদর করাতে করাতে সেই মুহূর্তে কাকলি বলেছিল—দ্যুৎ। এর উত্তর কী আমি নিজে মুখ ফুটে জানাতে পারি? ভারী দুষ্টু তুমি! এই দেবল, তোমার খুশী আর তোমার অভিলাষ যখন আমার মধ্যে তাই চাইবে আবদার করে,—তখন জানবে আমিও ডুব-সাঁতার কাটবো নিশ্চয়ই তোমার করা এই সুন্দরতম আবদারেরই দরিয়ায়। ঠিক, ঠিক! সত্যি বলছি।

আর ঠিক তার কয়েকদিন পরেই।......

আপনার সহাসে থাকা সলাজ-মধুর যুবতীত্ব নিয়ে অনুরাগের সাত রঙ্ ছোপানো দেহের—সঘন রহস্যে ঘেরা সায়রের প্রতিটি অঙ্গ আর প্রত্যঙ্গেরই তরঙ্গ-মুখর দোলায় দোলায়—সেদিন কাকলি উন্মোচন কোরে প্রিয়তমকে আরতি করাতে পেরেছিল—

বহুত করা মিনতির প্রতিবেদনে, প্রতিভাসে—"Oh, beloved! Please court my virginity up to the deep rooted mystery!"—ঐ কথাই জানাতে জানাতে সেদিন সুনন্দিতার মতো প্রিয়রা সুবিনীতা থাকার মুহূর্তে—কাকলি তার ভালোবাসায় রুমুঝুমু করা পবিত্র কুমারীত্বের অর্গল উন্মুক্ত রেখে, অভিমান ভরা লাজরাশি সরিয়ে সরিয়ে—বন্দিতার শক্তিতে সজীব থেকে আপনারই এই সুশান্ত আর সলাজুক দেবলকে যৌবনায়নে আহ্বান করাতে পেরেছিল।—প্রিয়ার যুবতীস্বভাবেতে ঝল্‌মলানো থাকা—প্রিয়াদেরই শাশ্বতী এক দুরন্তপনারই রূপখানা তাই ছিল। আর তাই দেখিয়ে, আর তাই দিয়ে বুঝিয়ে বুঝিয়ে, কাকলি শেষ পর্য্যন্ত করিয়ে তুলেছিল তারই শত সাধ, আর শত রকম আহ্লাদের দেবলকে—সবুজ ঘরেরই যুবক। আর সেই ঘরখানাকেই পলাশের মতো পবিত্র এক অভীপ্সার ঘন লাল রঙেতে রাঙিয়ে, সাজঘর করাতে চাওয়ার এই পুণ্যশ্লোকা যুবতীর ঘনিষ্ঠ তাপে পৌঁছে—আপন যুবকত্ব সম্পর্কে শাশ্বত অভিলাষেতে—দেবল হয়েছিল সুজনক অধিকারী। বিজনক হোয়ে দেবল যাতে সম্পন্ন করাতে পারে—তারই বুকের আশ্রয়ে ছোট্ট এক অসহায়া মেয়েরই মতো যুবতীর অতি সুন্দর, আর ততোধিক পবিত্র এক আবদার নিয়ে—দুরন্ত ঝড় হোয়ে সমর্পিতা এই শুচিস্মিতার অভিলাষখানাকে।—লাজহরণক প্রিয়ার ভূমিকায় নেমে এসে অনেক দিনেরই শতরূপে দেখা—এই শতভিষার মধ্যে থাকা—অজানা রহস্যকে উন্মোচন করানোর স্বত্বে সাজানো—সুমধুর আর সুন্দর অধিকারকরূপে—দেবল তাই শেষ পর্য্যন্ত সুসমাধান করাতে পেরেছিল। আত্মসমর্পিতা প্রিয়াকে তারই সাধ মিটিয়ে পরিপূর্ণা করাতে পেরেছিল শেষ পর্য্যন্ত—তারই দেবল। মুঠো মুঠো গরিমায়, আর রাশি রাশি লাজকণায় প্রিয়ার দেহী যৌবনকে সাজিয়ে, রাঙিয়ে, টক্‌টকে আবীর করিয়ে তুলেছিল। কাকলি হোয়েছিল সেই সুখঝরা খুশীয়াল হওয়া মুহূর্তটিতে—জ্যোৎস্নায় ঝল্‌মলানো রূপসী সন্ধ্যারই মতো—প্রিয়া নিলাজিতা।—তাই, বারে বারে, এই সুছন্দিত রাখা আর সুবন্দিত করা মিথুনাভিসারের প্রার্থনায় মঙ্গলাচারণ কোরে বলেছিল প্রিয়তম দেবল সুজনক বহুত নিবেদনেতে—"Oh; sweet! will we meet together in a flight for the unknown!"

মুহূর্তের হাজার রকম তরঙ্গ-দোলায় দোল খেতে খেতে সাত-পাঁচ ভাব-বিহ্বলতা নিয়ে কিছুটা এলো-মেলো হোয়েও—অল্প পরেই আবার কাকলি তার যৌবনান্বিত দেহ ও মনের মধ্যে—স্থিরতা আনালো। হোল—ঠির বিজুরিকা। মুঠো মুঠো সলাজে শ্রীরাধারই মতো গোরোচনা। আর মদালসা। মায় মদিরেক্ষণা।

—আর তাই সবুজ ঘরেরই রূপধন্যা কাকলি বুঝতে পারলো অতি সুন্দরের ও মধুরের নিরিখে, যে, এই রভস নিঙড়ানো মঞ্জুল-চঞ্চল মুহূর্তটিতে, তারই চব্বিশের টাটকা তাজা যৌবন-সায়র আস্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে গেছে—সুস্মিতকান্তি দেবলেরই ভালোবাসা 'বাসতে চাওয়ার সুছন্দিত যৌবনেরই সুবন্দনায়, আর আরতিতে। এ কথা জানলো সে—তারই সুজনকের মুখের থেকে ব্যক্ত হ্যয়া সুবচনে।

সুন্দর ছবি হোয়ে ফোটা আপনার রঙীন থাকা মুখে-চোখে—অযোধ্যার সেই সব চেয়ে সেরা সন্ধ্যার ঝলমলানি সাজিয়ে নিয়ে কাকলি আরো ভাবলো—এই সৌম্যদর্শন

আর প্রিয়ংবদ যুবক দেবলেরই তাজা সবুজ দেহের কাছ থেকে নিজের যুবতী রীতিকারই এক রহস্য ঘেরা চাহিদার পরিপূরণে নেমে—এক পরম আকস্মিকেরই শুভাশীষ পাওয়ায়—কাকলি তার দেহেতে গ্রহণ করেছিল এক তাজা ও ছোট্ট পরমাণুর মতো রক্তকণিকাকে।—যা আজ সেদিনেরই মধুরা প্রজাবতী রূপখানার কাছে সব বাধাই চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে।—তাই ভাবলো কাকলি।—আর তাই ছোট শিশুর মতো ঘর মাতানো সরব হাসির খিল্‌খিলানো রূপের মধ্যে বলে উঠলো কাকলি কান্নার ছন্দ নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে—আর মুষলে ঝরা চোখের জলে ভাসতে ভাসতে—

—শেষে, শেষে কিনা আমায় তুমি এ ভাবেতে কোরলে বন্দী? উঃ, কি দুষ্টু তুমি! তাই বুঝি সেদিন স্বেচ্ছায় তুমি শেষ পর্য্যন্ত এগিয়ে এসে আমার সেই অপ্রতিরোধনীয় দেহী-অভিলাষখানাকে পূর্ণতা দিইয়েছিলে। আমায় তোমার কাছ থেকে মুক্তিপ্রিয়া হোতে না দিয়েও, তুমিই আমায় মুক্তির আস্বাদন দিয়েছো এনে। হ্যাঁ তুমিই।—

বলতে বলতে আরো গভীর কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো কাকলি। দেবলের কাঁধেতে মুখ লুকিয়ে কাটা কাটা ভাবে বলল তখনি—জান দেবল, আমার, হ্যাঁ আমার মা মারা যাওয়ার আগে সেদিন আমায় একান্তে কাছে ডেকে নিয়ে বলেছিলেন আমাকে, যে, 'আমার মা'মণি, তুমি মনে রেখো একটা কথা, যে, যাকে তুমি একদিন না একদিন বিয়ে কোরবে,—সেই তাকে তুমি তোমার বুকের অন্তস্থলে বসিয়ে রেখে দেবতার মতো ভালোবাসা বাসবে। আর ওর ভালোবাসায় সাড়া দিতে গিয়ে তুমিও লক্ষ্মীটি মা' তারই কাছেতে নিজেকে দেবীর মতোটি কোরেই তুলে ধরাবে।"—

নিজের মা'র কথা স্মৃতির থেকে টেনে নিয়ে শোনানোর পর, কাকলি আদুরে গলায় দেবলের প্রতি নিবেদন কোরল—এই সুন্দর, এই দেবল। তবে কী জান, আমি তোমার কাছেতে আদপেও কখনো দেবী হোতে পারব কি না তা আমি জানি না!

একটু থেমে দেবলের কাঁধেতে—জামার ওপর দিয়ে আপনার ঠোঁট দু খানা দিয়ে ঘষে ঘষে আদর কোরে জানাল কাকলি—হ্যাঁ। তবে এটা ঠিক যে, আমি দেবী না হোতে পারলেও কোন দুঃখ থাকবে না আমার। কিন্তু দেবল, তুমি, হ্যাঁ তুমিই যে হোলে আমার—

কথাটা আর শেষ না কোরেই দেবলের কানের কাছে মুখ নিয়ে কাটা কাটা ভাবে আদুরে গলায় বলল—আমার দেবল। তুমিই আমার যৌবনের দেবতা!

—আর তা বলেই এক ঝৎকায় নিজেকে প্রিয়তমর হাতের ঢিলা থাকা বাঁধন থেকে আল্‌গা কোরে নিয়ে, নিজের ডান হাতখানাকে নীচের দিকে নামিয়ে দিয়ে একটি কিছু জিনিস ছোঁয়ার জন্যই—কাকলি তার শরীরখানাকে নীচেরই দিকে নোয়ালো।—কিন্তু দেবল তখনি ঝুঁকে পড়ে কাকলির কান্নায় বিপর্য্যস্ত মুখশ্রীর কাজলে-কুঙ্কুমে-ওষ্ঠরঞ্জনীতে একাকার হোয়ে থাকা অবস্থায়—দু'হাতের সঘন করা বাঁধনেতে তুলে নিয়ে—বাধা দিল আটক করায়।

—ছিঃ; কাকলি। বড় দুষ্টুমি হোচ্ছে।

—না গো দেবল।—এই শোন। একবারটি শুধু আমায় দিও তোমায় প্রণাম কোরতে। জান ত' এক বয়েসী দু'জনে হোলেও, তুমি আমার থেকে দু'টি মাস ধরে

এগিয়ে থাকায়—বয়েসে তুমিই ত হোলে আমার চাইতে বড়। তবে বাধা দিচ্ছ কোন? দেখ, আধুনিক দৃষ্টিতে আমার এই ইচ্ছাখানা সেকেলে রকম কিছুটি হোলেও—আমি কিন্তু প্রিয়ার অধিকারে এই রীতিটিকে বাজে বা সেকেলে ভাবতে পারি না কিন্তু! একবারটি শুধু দাও কোরতে।

—না। না। না, কাকলি। তুমি ওটা কোরতে পারবে না। কেন না, আমার কাছটিতে তুমি হোলে—দেবী। আমার যৌবনকে তুমি দেবীরই মতো কোরে করাও অভিষিক্ত।

একটু থেমে প্রিয়ার চোখের জলে ভেজা অধরেতে গভীর করে চুমার রেখা ফুটিয়ে দিতে দিতে বলল দেবল—এই দুষ্টু। এই কাকলি। তুমি ত' নিশ্চয়ই এখন বুঝতে পারছো যে, সেদিন ও-ভাবেতে করা তোমারই জারিজুরির কাছেতে আমার হার স্বীকার কোরতে পারার জন্যই, আজ তোমায় নিজের কোরতে পেরেছি। কী, তাই না?

কাকলি তার অধরেতে প্রিয়র থেকে নির্ঝরিত আদর পাওয়ার ঝলমলিয়ে উঠে জানালো—সত্যি, তাই। কিন্তু লক্ষ্মীটি আমার, তবু আমায় একটিবার শুধু তোমায় প্রণাম করতে দাও।—বলে হাসি মুখেতে আর সজল চোখেতে —বহুত মিনতিরই রূপ নিয়ে তাকালো।

—এই মেয়ে। বলি, খুব যে দুষ্টুমি কোরছো, তাই না? মজা দেখাচ্ছি।—বলেই দেবল তার কাকলির নীচের দিকেতে ঝুঁকে—শরীরের অশেষ ঢল খাওয়া রূপতরঙ্গি মাকে সজোরে টেনে নিয়ে—নিজেরই তাপঝরা বুকেতে শক্ত করিয়ে জড়িয়ে বাঁধলো—দু'টি হাতের সুকঠিন করানো বাঁধনে। আর ঠিক তার পরেই কাকলির পলাশ-রঙীন অধরে, আর কাজল রঙ্ ছোপানো চোখের ওপরে ওপরে—নিজের সুন্দর মতো মুখখানার লাজহর সেই সরব হাসিতে ঝলমলানো অধর দিয়ে—চুম্বনের মুষলধারার শিলাবৃষ্টি ঝরালো।

একটু পরে দেবল সুতৃপ্ততার ভেতর থেকে বলল—কাকলি, চল।

কাকলি আবেশেতে বিহ্বলিত গলায় জানতে চাইল—কোথায়?

—কোথায় আবার? কিছু বোঝ না, না? দুষ্টু কোথাকার। যাবে তোমারই দেবলের বাড়ীতে। মানে এরপর থেকে যেটি হোল তোমারও বাড়ী। এই মেয়ে, এই দুষ্ট, তুমি বুঝলে ত' আজ থেকে যে বাড়ীটিতে তোমার স্থিতি ও অবস্থান হোয়ে উঠলো চিরস্থায়ী। কেন না, ওগো, তুমি ত' এই মুহূর্তে জানতে পেরেছো যে, ঐ বাড়ীরই ভাবী বংশধরটিকে ছোট্ট মতন এক ডল পুতুলেরই রূপখানা দিয়ে সৃষ্ট করার স্বত্বে—নিজেকে করিয়েছো প্রজাবতী। অঙ্কুরিতা।

দেবলের সুস্মিতাধরে হাসির ঢল্ থেকে বেরিয়ে আসা কথা শুনতে শুনতে কাকলি ঘন হওয়া লাল জৌলুস ভরা লাজেতে প্রাগাঢ় ভাবে রেঙে উঠলো। দুটি কজ্জলিত চোখের মদির ভাবখানা কিন্তু হোয়েই আছে মুক্তার দানায় ভরা অশ্রুতে। এ অশ্রু হোল অপার সুখেরই প্রতিভাস ছাড়া অন্য কিছুটি নয়। অবশ্য এরই আরেক পরিচয় হোল—অভিমান। এত আনন্দের মধ্যেও অভিমান না কোরে থাকতে পারে না—মস্ত কানুন বলেই—গাঢ় সবুজের ঘরেরই—সব যুবতী প্রিয়ারা!

সজলতায় কাঁপা চোখের দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে, আর ভেজা ভেজা গলার সুর থেকে

জানালো কাকলি ছোট্ট প্রশ্ন—কিন্তু?

সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো দেবল—আর কোন কিন্তু নয় এর পর, বুঝলে? কাকলি, তুমি ত' জানই যে, আমার মা ও বাবা এই তাঁদের দু'জনাই তাঁদের এই একমাত্র আত্মজটির বৌ হিসাবে তোমাকেই পেতে চান। আর তোমাকেই ওঁরা বরণ করাবেন ওঁদেরই স্নেহলোকের পুত্রবধূটিতে। চল, আর দেরি করিয়ো না। তাঁদের খুশী করিয়ে তুমিই পারবে তাঁদের সুখী করাতে।—এ বিশ্বাস শুধু আমারই নয়, ওঁদেরও আছে তোমার ওপর।

ভেজা ভেজা গলায় আদুরে সুর টেনে নিয়ে অনেকটা সহজ হোয়ে বলল কাকলি—এই দেবল। আমার আবার না যাওয়ার কারণ কী আছে বল? এখন থেকে তুমি যেখানের, এই আমিও হোয়ে থাকবো ঠিক সেখানেরই। তোমাতেই এখন থেকে থাকছে আমার স্থিতি। আমারই সব পরিচিতি—প্রিয়ার মধ্যে। জায়ার মধ্যে। আর ঐ জায়া হওয়ার আগেই যে, তুমি, হ্যাঁ তুমি জেনে ফেলেছো, যে, তোমারই সৃষ্ট প্রাণ হোয়ে উঠেছে আমারই দেহী স্বত্বার অণু-পরমাণু ধরে অঙ্কুরিত!—বলতে বলতে চোখের কিনারা ধরে বৃষ্টির ঢল্ নামালো পুনরায়। তারপরই বলে উঠলো—তবে, তাই চল, তোমার মা-বাবাকে প্রণাম কোরে আর্শীবাদ চাইবো— তোমার-আমার দু'জনারাই জন্য। আর মনে মনে তা চাইবো তোমারই ভাবী আত্মজর জন্য।

দেবল বলল—ঠিক আছে। তবে কিন্তু তোমার এই এলো হওয়ার আটপৌরে বেশবাস নিয়ে যাওয়া চলবে না। বুঝলে, এই মেয়ে?

প্রিয়র কপোল আপন রক্তিমাধর দিয়ে আদর করার মতো কোরে বলল কাকলি—তবে? বল, কোন বেশেতে সাজ কোরলে পর তোমার সঙ্গে আমায় নিয়ে যাবে? ওগো,—এবার তুমি সত্যি দুষ্টুমি কোরতে আরম্ভ কোরেছো আমার সঙ্গে। তুমি সত্যি বড় দুষ্টু!

দেবল আদরের প্রতিবেদনখানা দিতে দিতে জানালো—আমি, দুষ্টু, না? বেশ আমি মানলাম তাই। আর তুমি তা' হোলে কি? দুষ্টুপনার রাণী? দ্যুৎ। বাদ দেও ও সব। শোন কাকলি, তোমায় যে বেশেতে আমি সাজতে বলছি তা হোল—এক নব-পরিণীতার ঝল্‌মলানো, আর রঙ্ বাহার ছড়ানো বেশখানা।

আস্তে আস্তে অনুযোগের মতো কোরে জানালো কাকলি—আচ্ছা দেবল, এখন এ মুহূর্ত্তটিতে তোমার এই শহরতলীর ফ্লাটে বসে থেকে, এমন পোশাকখানা পাবো কোথায়, বল?

—তুমি কাকলি, সত্যি কিছু বোঝো না দেখছি! তোমারই দেবল তার এই ফ্ল্যাট বাড়ীতেই ব্যবস্থা রেখেছে। বুঝলে, মেয়ে? তোমার বেশী অসুবিধা হবে না। শুধু তোমার পরনের ঐ লাল পাড় বসানো শাদা তাঁতের শাড়ীখানা বদলে, আমার আলমারীতে তোমারই জন্য এনে রাখা একটি জরিদার লাল রেশমের শাড়ী আছে—তাই তুমি পরবে। আর অন্য সব পরাগ ত' আমার ঐ ড্রেসিঙ্ টেবিলের টানার মধ্যেই আছে। তোমার জন্যেই আর কি আনিয়ে রেখেছি। এ ছাড়াও আছে আরো একটি জিনিস। তা হোল পবিত্র সিঁদুর। তুমি পাশের ঘরে গিয়ে সাজ সমাধা কর। তারপর

তোমার ঐ সিঁথিতে আমি আঁকবো আমার আঙুল দিয়ে—এই সুন্দর দেখতে সিঁদুরের রেখাটিকে। কেমন?

সিঁদুর সিঁথির শুভ্রতার মধ্যে না মেখেই কিন্তু সিঁদুর হোতে হোতে কাকলি জানালো—কিন্তু দেবল, আজ এ মুহূর্তে আমার হাত কাঁপছে। দেহ হোয়ে উঠছে অস্থির। আমি পারবো না বোধ হয় তোমারই ফরমায়েশী সাজখানা নিজের হাতেতে সম্পন্ন করাতে। এ অবস্থায় অন্য কেউ সাজায়। কিন্তু বল দেবল, কে আমায় সাজিয়ে দেবে এখন?

কাকলির চোখের জলেতে কাজল কুঙ্কুম-পাউডার-ওষ্ঠরঞ্জনীতে একাকার হওয়া মুখখানায় হাতের আদর বুলাতে বুলাতে দেবল বলল—এই মেয়ে, অসুবিধা কি? কেউ যখন নেই সাজাবার জন্য, আর তুমিও যখন পারবে না নিজেকেই সাজাতে—তখন আমিই সাজাবো তোময়, আমারই পছন্দ মতোটি কোরে। কী রাজী?

কাটা কাটা ভাবে কাকলি বলল— বেশ, তাই করো, আর তাই বলতে চাই, যে, আমার তোমার এই দুষ্টু কাকলিই সাজাবে তোমাকে।

দেবল বলল কাকলিকে আদর কোরতে কোরতে—এই মেয়ে, বেশ, তাই হবে। আর তাই কোরবে তুমি।

কাকলি আদর পেতে পেতে মিষ্টি করে জানালো—এই ছেলে, আমিও তাই কোরবো— তোমায় সাজাবার জন্য। তোমাকে, বুঝলে?

পরমুহূর্তেই বাদুলে হাওয়ার মাতাল হওয়া রূপ নিয়ে—কাকলির লাল লাল অধর ঝাঁপিয়ে পড়লো দেবলেরই সুস্মিতাধরের ওপর।

তারপর একটু বিরতির পর—কাকলি আবেশ ঝরা গলায় মধুরতা ঢেলে জানালো—এই দেবল, শোন! আমি বলি কি জান, এই, হ্যাঁ এই মুহূর্তের ঝল্‌মল্‌ করা সন্ধ্যাকে সাক্ষী রেখে আমার সিঁথিতে তোমার নিজের হাত দিয়ে পরিয়ে দেও,—পবিত্র সিঁদুরের লাল বিভূতিখানাকে। আর, হ্যাঁ, এই আমি যদি ইতিহাসের সেই শাশ্বতী নারী-রূপী শ্রীমতী রাধা রায় হোয়ে, হোতাম পরমানন্দ সেই শ্যাম রায়ের হ্লাদিনী শক্তির উৎস—তা হোলে হয় ত তোমার যৌবনের মধুর চোখ দু'খানার সুন্দর দৃষ্টির মধ্যে—নিজের বুকের সুষমাকে এই মুহূর্তে আবরণ থেকে উন্মুক্ত করিয়ে—তোমাকেই বলতাম দক্ষ শিল্পীর মতো আমারই বুকের ওপরে আলপনা আঁকার মতো কোরে কস্তুরি লেপনে ফুটিয়ে তোলাও—উরসিজের ওপরে—ওপরে—মৃগমদ চিত্রপাঁতি। এ অধিকার একমাত্র তোমারই আছে—স্বামীত্বের মঞ্জুলিক অধিকার থেকে। দ্যুৎ। বড়, দুষ্টুমি কোরছি, তাই না?

শেষে কথা থামিয়ে— দেবলের সুন্দর অধরে রিমঝিমানো হাসির উচ্ছ্লতাকে কাকলি নিজের লাল অধরেতেই কেড়ে নিল। আর গুনগুনিয়ে তখনি সন্ধ্যারতি জানালো—সুখী দেবলের যৌবনকে আদর করানোর ভেতরেই—

"সাঁঝ পড়ে দিন বীতরে / চক্‌রী দিন্‌হা রোয়।
চল চকরা বা দেশকো / জঁহা রৈন না হোয়।"

—৯ই জানুয়ারী—১৯৬০

প্রিয়ালের শখ্

বরবর্ণিনী শ্রীমতী ক্ষমা,—আমার আদরের মেয়েটিকে

কিছুদিন ধরে অশোকা লক্ষ্য করছিল তার স্বামী প্রিয়াল কেমন যেন হয়ে পড়েছে—একটু একটু অন্যমনস্ক।—রূপকথার মায়াপাহাড়ে পৌঁছে ক্ষণিকের জন্য রাজপুত্র হয়ে যায়—রূপধন্ধে দিশাহারা। প্রেম-সন্দর্শনে বিবাগী-ভ্রমর।—ঠিক তেমনি হয়ে উঠেছে অশোকারই স্বামী—এই প্রিয়াল।

সুন্দর মুখখানা থেকে উপছিয়ে থাকা সেই প্রণয়-বিহ্বল সুস্মিত রূপ—প্রিয়ালের অধর এড়িয়ে হয়ে পড়েছে ম্লান। ওরই টানা টানা গহন কালো চোখের মধুময় দৃষ্টির মদিরতা কেন জানি ক্লান্তি জড়ানো ভাব থেকে তাকায়—প্রিয়ার দেহের যৌবনরাগকে পলকের জন্য কাঁপিয়ে দিয়ে।

বারে বারে রূপধন্ধে ধাঁধানো ঐ চোখের চাহনিতে হাতছানি দিয়ে ডাকে—নিজেরই প্রিয়াকে। আভাসে ডাকে, কিন্তু তাকিয়ে শুধুই দেখে—সুনিশ্চিতা অশোকাকে সেই শ্রাবন্তীর সন্ধ্যার মতো—প্রথম যেদিন দেখেছিল প্রিয়াল তার যুবক-পরিচিতির কুমার বিস্ময়কে—প্রিয়ারই মতো সাজিয়ে। গুছিয়ে। রাঙিয়ে। বিলোলিত ভাবেতে, যেদিন প্রথম অশোকাকে প্রণয়-নিবেদিত অভিবাদন জানিয়েছিল ঐ সুচরিতার যৌবন সবুজতাকে এলোমেলো ক'রে, হিল্লোলিত ক'রে—ঠিক তেমনি ভাবেতে প্রিয়াল আজও তার প্রিয়াকে করাতে চাইছে—বিলোলে-হিল্লোলে—বিস্ময়-বিমুগ্ধা!

প্রিয় প্রিয়ালের অমন বিস্ময়-বিমূঢ় ভাব থেকে—তাকিয়ে তাকিয়ে দেখাটা কিন্তু—অশোকাকে মনে মনে কাঁদিয়ে তুলেছে। আদরের প্রিয়াল তার 'মিষ্টি অশোকা" ও "দুষ্টু অশোকা"র স্ত্রী রূপখানাকে —তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে শুধু পলকশূন্য বিহ্বলতায়—এটুকু তারই প্রিয়া স্ত্রী ভাবতে পারে নি। এমন কি ভাবতে চায়ও নি।

গতকাল রিমঝিম করা সন্ধ্যার—সোনাঝরা মুহূর্তের ঝিলিমিলির ভেতরেই—তখনকার নিরিবিলি থাকা নিশ্চল নিথরতাকে কাঁপিয়ে আর একটিবার অশোকার দিকে তাকিয়েছিল—তারই সুজনতায় সুন্দরতম স্বামী—এই প্রিয়াল রায়। এই—শিল্পী প্রিয়াল রায়।— যে শুধু ছবি আঁকে তুলির টানে টানে,—নানান বাহারে রঙেতে আরও রঙ মিশিয়ে মিশিয়ে—হয় জলে, আর না হয় ত' তেলে—ক্যানভাসের গায়ে খস্ খস্ করা টানা শব্দখানা—ছড়িয়ে ছড়িয়ে।

সত্যি যেন শেষবারের মতো ও-রকম একখানা বিস্ময়ে বিমূঢ় ভাবখানা নিয়ে—প্রিয়ার যৌবনান্বিত দেহরাগে ঝলমলিয়ে ছাপিয়ে ওঠা—অনুরাগবতী সন্ধ্যার রঙটিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছিল—স্বামী প্রিয়াল রায়।

ওকে অমন ক'রে তাকিয়ে থাকতে দেখে অশোকা বলেছিল—"ভারী দুষ্টুমি পেয়েছো, না? চুরি ক'রে দেখছো, বেশ! এই প্রিয়াল, লক্ষ্মীটি আমার, বল, কি দেখলে?"

প্রিয়াল কিন্তু কোন উত্তর দেয় নি—প্রিয়ার রাঙা অধর ছাপিয়ে বেরিয়ে আসা এই মিনতি ভরা কথা শুনে। আপন মুখের ম্লান হ'য়ে আসা—একটুখানি শরম ভরা হাসি শুধু দিয়েছিল সে—ছড়িয়ে। ঐ টুকুই। আর কিছুটি নয়।

তাই নিজের আদর পাওয়া, আর আদর ফিরিয়ে দেওয়ার সুজনকে ও-ভাবেতে তাকাতে দেখে, অস্থিরে অস্বস্তিতে চঞ্চলা হ'য়ে পড়েছিল—প্রিয়তমের সমীপেতেই—স্ত্রী অশোকার স্নিগ্ধ যৌবনাভায় রূপ ঝরানো সবুজ-গভীর শরীরের চব্বিশটা—টানা টানা বসন্ত-শোভিত বছরগুলো। সে মুহূর্তে শুচিস্নিগ্ধা সন্ধ্যার রুমঝুম করা স্বভাবেতে মিশে গিয়ে—অশোকাও অপলক চোখেতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছিল—নিজের চাইতে মাত্র মাস দুয়েকের মতো বয়সে বড় হ'য়ে এগিয়ে থাকা—স্বামী প্রিয়াল রায়ের মঞ্জুল রূপখানকে। আর তারই মধ্যে ভেসে থাকা ম্লানায়মান ধূসরবর্ণ চব্বিশটা বসন্তকে দেখছিল— যা প্রিয়ালের টানা টানা কালো চোখের দুটি মণিকুট্টিম থেকে এসেছিল বিভাসিত হ'য়ে। আর ছিল তারই মধ্যে—আবছা আবছা এক গোধূলির রঙ মাখানো—শান্ত-সমাহিত রূপখানা।

স্পষ্টভাবেই সে সময়টুকুর ভেতরে নিজের পলক না পড়া দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিল অশোকা, আর তা দেখতে দেখতে বুঝতে পেরেছিল—প্রিয়ারই স্ত্রী পরিচিতি রাঙিয়ে, যে,—প্রিয়তম প্রিয়ালের চোখের ঘন কালো মণিকুট্টিম দুটিকে ভরাট ক'রে ছাপিয়ে গেছে—এক সন্ধানী দৃষ্টি! প্রিয়ারই যৌবন-সায়রে প্রিয় অনুসন্ধান ক'রেছে—রূপকথার দেশের জীয়নকাঠিখানাকে।—যা দিয়ে ঘুম ভাঙ্গাবে প্রিয়—-তারই প্রিয়ার সবুজ-গাঢ় দেহ-বঙ্কিমায় থরে থরে প্রস্ফুটিত থাকা— যৌবন-কাঁপা শরমতার ঘুম ঘুম ভাবের রূপ-ঝলস থেকে।—তাই, সেই অজানা কিছুকেই প্রিয়াল খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আর তাই আপনার নিশ্চয় প্রীতিতে রেঙে ওঠা—সুনিশ্চিতা অশোকার মধ্যেই ক'রে চলেছে— সেই বিস্ময়-ঘেরা সুরীতির অনুসন্ধান।

আর, আর নিশ্চয়ই প্রিয়াল আজ এই সন্ধ্যা-রিমঝিমানো আমেজ দেখে—তারই স্ত্রী—এই অনিন্দ্যা রূপবতী অশোকার বড় বেশী শরমতা ভরা ছবির মতো চেহারার মধ্যে পেয়ে গেছে—যুবক স্বামীর যৌবনেরই অন্বয় ধরা—মধু ঋতায়ত সন্ধানটি। মধুরাংশ্চ অনুভাবটি।

তাই ত' প্রিয়াল তার এই বরবর্ণিকার আপাদমস্তক অমন ভাবে—চোখের ক্ষণিকের জন্য ম্লান হ'য়ে পড়ে দৃষ্টি বুলিয়ে বুলিয়ে দেখছিল। দেখতে দেখতে তার হঠাৎ হ'য়ে ওঠা চোখের সুসরতায় ফুটে উঠেছিল—সেই গোধূলির শ্রান্তশ্রী ঘেরা প্রতিচ্ছায়াটি। আর শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু মাত্র কয়েকটা পলকেরই জন্য—প্রিয়ালের চোখে, মুখে, ঠোঁটের আনাচে-কানাচে—হাসির মৃদু দোলার মধ্যে তা উঁকি মেরে উধাও হয়েছিল।

তারপর যেই গতকাল ছাড়িয়ে দেখা দিল—আজকের এই আলোর সোনা রঙ্

ছড়ানো প্রভাত। প্রিয়র জন্য প্রিয়ার মনের খুশী সুপ্তত্থিতা হয়ে সুপ্রভাত জানালো— লাল জবার মতো ঘন রঙীন সূর্য্যকে। খোলা জানালা দিয়ে ওদের বিছানায় ঝরে পড়েছিল এই—লাল সূর্য্য।

তাই সূর্য্যের রঙে স্নান ক'রতে ক'রতে—আজ এই মধুর সকালটিতে—অশোকা বড় বেশী রকমের একটা আরামের ঘুম ঘুমিয়ে উঠেছে। ওর মন থেকে আর দেহ ছাপিয়ে উপছে উঠেছে খুশী-ভরা রভসখানা—আনন্দধারার কলহাস মুখরাতা নিয়ে।—গতকাল রাতে নিজেদের লাজ-মাখা বিছানায় শোবার আগেতে— কোন এক মায়াবিনীর পরশে—প্রিয়াল তার রূপস্নিগ্ধা বধূ-রত্নার সুখ-ঝরা বুকের নিটোল আরামের মধ্যে ধরা দেয়—অশেষ এক হর্ষোজ্জল অবস্থয়।—ধরা দেওয়ার আগে প্রিয়ালের মানসিকতার দরজায় ঝড় তুলেছিল —একখানা অপরিহার্য্য গ্রন্থের বক্তব্য। সেদিন সন্ধ্যার আগে, বইখানার একটা পাতায়—পড়তে পড়তে এসে থেমেছিল প্রিয়াল। লেখকের বক্তব্যখানা ধ্যান-গম্ভীর আভাসে সাজানো থাকায়, তখনি সে লাল পেন্সিলে দেগে রেখেছিল—স্ত্রী আশোকাকে শোনাবার জন্য। পরে প্রিয়াকে সুন্দর ক'রে শুনিয়েওছিল অনেকটা তা মুখস্থ হয়ে যাওয়ায় ;— যেখানে ডাঃ এলিস নিবেদন ক'রেছেন—"Lovers in their play when they have liberated from the traditions which bound them to the trivial or gross conception of play in love....are thus moving amongst the highest of human activities, alike of the body and of the soul. They are passing to each other the sacramental chalice of that wine which imparts the deepest joy that men and women can know."

এমন কথার অন্তর্নিহিত নির্য্যাসটুকু হৃদয়ঙ্গম ক'রতে পেরেছিল—তখনি অশোকা। আর অশোকা তার প্রিয়ালের কানে কানে শুধিয়েছিল তখনি—

"Love makes those young whom age doth chill, And whom he finds young keeps young still."

প্রিয়াল ও কথায় মাথা দুলিয়ে জানিয়েছিল তার সম্মতিকে। আর অশোকা ও প্রিয়াল—স্বামী ও স্ত্রী—এই দুইয়ে মিলে মহাকবির ঐ অভিদার গভীরে উপনীত—কাব্যমঞ্জুষা হ'য়ে ওঠা যৌবনেরি ভালোবাসাবাসির রূপখানাকে উপলব্ধি করালো—যুগপতে।

আর তাই সহজ ও স্বাভাবিক ছন্দে অশোকা অনেকদিন পরে—প্রিয়ালের বুকের প্রণয়ে স্পন্দিত আশ্রয়ের কঠিন বাঁধনেতে নিজেকে করাতে পারলো সমর্পিতা। মুহূর্ত মধ্যে তারা নিজেরাই যৌবনায়নে সঙ্গত হওয়ার পবিত্র বিলাসে—বিলোলিত হয়ে হারিয়ে দিয়েছিল বিদ্যুতের আলোক-ধারাকে। লাজ দিয়ে মুখর করা ঘরের মধ্যে ঘন-ঘোর জমাটি অন্ধকার ডেকে এনেছিল—অশোকা নিজেই বেড়্-সুইচ্ টিপে দিয়ে!—নিজেরই স্ত্রী পরিচিতির অধিকারের রত্নত্ব অর্জন ক'রবে বলে!—সেই আঁধারের রূপ তখন দু জনকেই পরস্পরের দেহ-মনের ভেতর ও বাইরের সলাজ ঘোমটাটুকুনের উন্মোচন করিয়ে পাঠাতে পেরেছিল—মঞ্জুলিকা অশোকা ও সুমধুরিক প্রিয়ালেরই

মিতালি পাতানো—দুটি লাজ-বিধুর মন দিয়ে—ওদেরই দুটি নিলাজ-চঞ্চল দেহ নিয়ে অকপটে জ্ঞানাজানির—যৌবনায়নী অভিসার পর্য্যন্ত। ওই নিরিখ ধরেই, অনেক দিনের বিরতির শেষে, গতকালকার রাতের নিঝুম মোকাবিলায় ডুব দিয়ে—প্রিয়াল তার সুখলোভাতুর চোখের টানা টানা দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়েছিল অন্ধকারের জমজমাটি বুকেতেই। তারপর শেষ করেছিল ও-ভাবেতে মাতোয়ারা থেকেই। প্রিয়াল তার স্বামীত্বের গরিমাকে বিস্মৃত করাবার সাথে সাথে—আপন তিয়াস ভরা অধরেতে—নদীর প্রচণ্ড বানের তোড়ে বাঁধ-ভাঙ্গা অবস্থার মতোই প্রবল হয়ে ঝরা চুম্বনে চুম্বনে—ভাসিয়ে নিয়েছিল অশোকাকে। আর অমন করেই কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে প্রিয়ার দেহশ্রী ঘেরা—শান্ত ও সমাহিত যৌবনাভাসকে কোরে তুলেছিল-রঙীন। ঘন লালেতে।

গত রাতের মাঝের যাম পর্য্যন্ত এগিয়ে, প্রিয়াল তার মিষ্টি প্রিয়ার দুষ্টুমিতে আর বিহ্বলতায় সুরভি ভুরভুর বাসক সাজে সালঙ্কৃত করা—অঙ্গরুচির পেশলে প্রকটিত স্নিগ্ধতাগুলোকে তুলেছিল—শরম ছাড়া করিয়ে।—তাই শেষ অবধি রীতি মাফিক ়ই মুখর বর্ষার ঢল্ খাওয়া বসন্ত-বিভাসিত মূর্চ্ছনার মধ্যেই—স্ত্রী অশোকা সুখ দেওয়া, আর খুশী ফোটানো আরামে আরামে ঘুমিয়ে পড়েছিল।—স্বামী প্রিয়ালেরই কবোষ্ণতায় উর্ম্মি সাজানো বুকের আরাম ঝরা দরিয়ায়—ডুব সাঁতার কেটে কেটে।—আর প্রিয়ার ও-ভাবে রূপকথার ঘুমের রাজ্যে পাড়ি জমানোর কিছু পরেই—খুশীয়াল প্রিয়ালও ঘুমিয়ে পড়েছিল। —ঘুমিয়েছিল প্রিয়ারই নরম বুকেতে বুক—আর লাল অধরেতে আপন অধর ছোঁয়ানো— সেই মধুরেতে চিত্রায়িত সুন্দরম্ অবস্থাতেই।

আজ প্রভাতে ঘুম থেকে উঠে অশোকা দেখলো—তার সুন্দর কান্তি প্রিয়াল এখনও ঘুমিয়ে রয়েছে এক পরম আবেশময় শান্তিতে। ঠিক 'রূপকথার সেই সুখী রাজপুত্রটিরই মতো। আর তার চোখ ছাপিয়ে ও অধর গড়িয়ে ঝরছে—সুতৃপ্তির হাসি হাসি রূপখানা। এ সময়ে সব চাইতে কিন্তু সুন্দর দেখাচ্ছে—তার স্বামীর পরম তৃপ্তি নির্ভরতার মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় ফুটে ওঠা—শরীরের তরঙ্গিমা উপছানো ভঙ্গি মাটুকুন।—একটি ছোট ছেলের মতো জড়ো-সড়ো ভাবে বিছানার একটি ধারেতে ঘুমুচ্ছে। এমন মুগ্ধকর অবস্থায় শুয়ে থাকা প্রিয়ালকে—আরো সুন্দর লাগলো অশোকার। সদ্য ঘুম থেকে জেগে ওঠা অশোকার টাটকা মনেতে গুনগুনিয়ে উঠলো—কবি ব্রাইয়ান ডব্লু প্রোক্টারের কবিতার কটি চরণ—প্রিয়তমকে ও-ভাবে রূপদর্শন ক'রতে ক'রতে—

"As the man beholds the woman,
As the woman sees the man,
Cautiously they note each other,
As each other only can."

আর তাই ধীরে ও স্থিরে—প্রিয়কে অভিধা-সঞ্জাত করাতে চাইল অশোকা—আপনারই দেহী রাগানুরাগ ভরিয়ে— দেখতে দেখতে।

ওদিকে সচকিতা প্রিয়ার সাবধানী দৃষ্টির মধ্যে ধরা পড়লো—নিজেদের বিছানার বেহায়া হওয়া—এলো-মেলো অবস্থাখানা। দুধের মতো শাদা বিছানার চাদর ধরে—সর্বত্র কুঁচকে আসা ভাঁজগুলো দেখা দিয়েছে—ওদেরই দু'জনকার যৌবন প্রখরতায় টইটম্বুর—দুটি নিলাজ থাকা দেহেরই অজানাকে জানাজানি করার সময়কার—মাদক মাতামাতির, ঘন ছোঁয়াচে ছোঁয়াচে।—এরই দিকে তাকিয়ে থাকা অশোকার মদালসা চোখের দৃষ্টিতে কিন্তু— বেশী করে যেন তাদেরই সমাধা করা সেই "গ্লোরিয়াস প্রাইভেসি" ধরা স্বাক্ষর—প্রজ্জল থেকে লজ্জার রেশ ঝরাচ্ছে—দু জনকারই মাথার বালিশ দু'খানার—ফুল-লতা-পাতা আঁকা ঝালর দেওয়া—ওয়াড় থেকে। অশোকার সিঁথির সিঁদুর মেখে বালিশের ওয়াড় দু'খানাই রেঙে আছে—জায়গায় জায়গায়।—কোথাও আবছায়। কোথাও ঘন হ'য়ে।—কিন্তু লজ্জার সব চাইতে বেশী প্রকট ভাবখানা নির্জন-স্বাক্ষরে ফুটে আছে—স্বামী প্রিয়ালের ওপরে। প্রিয়ার অধর থেকে ঝরানো দুষ্টুমিগুলোর ছোঁয়ায় ছোঁয়ায়—মিষ্টিমাখানো ঠোঁট দুটিতে রাঙিয়ে গেছে প্রিয়াল। আপন মুখের গমক ভরা হাসির ফুল্ল রূপখানাকে—আঁচলের আড়ালে লুকিয়ে রেখে— দেখে দেখে চলেছে অশোকা।

আর ভাবছে অশোকা। তাই দেখে—নিজের হাতেই আঁচলের কোণা দিয়ে ঘষে ঘষে প্রিয়ালের দুটি ঠোঁটের ওপরেতে ছেপে যাওয়া লাল লাল দাগ ভরা ছবিটুকুন—মুছিয়ে দেবে কিনা! না দিলেই যেন ভাল হয়— কেন না তা হলে বেশ মজা লুট করা যাবে।—এমন অবস্থা নিয়ে ঘুম ভাঙ্গবার পর, প্রিয়াল ঘরের বাইরে বেরুনো মাত্রই অন্যদের চোখের দৃষ্টির কাছে পড়বে ধরা—স্বাক্ষর সমেত। মুঠো মুঠো লজ্জায় সাত সকালে রাঙিয়ে উঠে হবে সত্যি কম বেশী নাজেহাল। এমনটা ভাবতে কিন্তু ভালোই লাগলো। কিন্তু দ্যুৎ, অমনটা করলে পর ত সেটা তার নিজের পক্ষেও ত হয়ে পড়বে না কি লজ্জার কারণ?—অশোকার অধরের দুষ্টুমির দুরন্ত রূপখানা ত ভালোভাবেই স্বাক্ষরিত হ'য়ে গেছে তারই আদরের যুবকটির ঠোঁটে ঠোঁটে।—উপরন্তু প্রিয়তমর চোখে, কপালে আর গালেতে পর্য্যন্ত।—প্রিয়ার অধরের ছোঁয়াগুলো ভেজা ভেজা অবস্থায় ঝরে পড়ার সময়টিতে—সেখানকার আঁকা লাল রঙখানাকে—প্রিয়ালেরই মুখের আঙ্গিনা জুড়ে গলিয়ে ফেলার দরুণ।

আবার ভাবলো অশোকা—মুছিয়ে না দিলেই ত' ভালো হয়! ত' হ'লে পর—দরজা খুলে বাইরে বেরুলেই অন্যের চোখেতে জব্দ হবে তার প্রিয়াল—গত রাত্তিরেতে করা দুষ্টুমির জন্য। তাই দেখে সবাই ভাববে,—গত রাতে কত বেশী না জানি বেহায়া হ'য়ে উঠেছিল তার এই স্বামীটি! আর সেই সঙ্গে যুগপতে—অশোকাও ত!

—কিন্তু বাড়ীর ওরা সবাই মিলে তাদের দু'জনাকে নিয়ে অমন ধারার একটা না একটা কিছুকেই ভাবুক। এ রকমেরই কিছু একটা ধরে—অন্যেরা শুধু ভেবে ভেবেছ চলুক।—এ নিয়ে তাই অশোকা শুধু ভাবে—ওরা সবাই মিলে ওদের দু'জনকার সঙ্গ ত থাকা দম্পতি-রূপের ভেতরকার গভীরে—নিজেদের অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে—একদিন না একনি অসম রহস্যখানাকে ভেদ করাতে চাইছে! কিন্তু তা আর

পারছে কৈ?—সত্যি ওদের যুগল স্বত্বায়—আজও সম্ভব হ'য়ে ওঠেনি যে অপার এক ব্যাপক সম্ভাবনাটির—তাই তাকে নিয়ে যখন তারা ভেবে ভেবে ক্লান্ত হচ্ছে—ওদেরই সম্পর্কের নানান ঋতুবিচিত্রার কথায়,—তখন সে কথারই অসম্ভাব্যতায় অশোকার মন—দারুণ এক খুশীর চমকে দোলা-দেওয়া সপ্রগল্ভ হাসিরই বন্যায় ভাসতে ভাসতে—সুখের ঝড়ে আছড়ে না পড়ে হয় না—নিশ্চুপ।

—না। না। কখনোই না। পরম সাধের আর আহ্লাদের প্রিয়ালকে ও জব্দ করাবে না—অপরের চোখেতে। ও কথা ও চায় না আর ভাবতে। আর, আর সত্যি, এবার বাড়ীর অন্য লোকেদের মধ্যে অযথা এক ভাবনার আকুলতাকে পর্য্যন্ত করাবে না—সৃষ্টি।—এই ঠিক ক'রে বিছানার ধারটিতে বসে পড়লো অশোকা। বসে থেকে দু হাতের বাঁধনে জড়িয়ে ধরলো ঘুমিয়ে থাকা প্রিয়ালকে। মৃদুভাবে প্রিয়র পিঠেতে নরম আঙুলের টানে টানে কেটে গেল—সুড়সুড়ি। ঘুম অবশ্য ভাঙ্গলো তখনি। প্রিয়াল কিন্তু অশোকার কোমরখানা দু হাতে জড়িয়ে ধরে প্রিয়ার দেহ-সুরভির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন ক'রে—পুনরায় ঘুমাতে লাগল। প্রিয়র ঘুমের আমেজ জড়ানো মুখের ওপরে হেলে পড়ে—গালেতে নিজের গাল ছুঁইয়ে রেখে, কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো অশোকা—এই, এই প্রিয়াল, শুনছো। বলি, ঘুম থেকে উঠবে না? ওঠো এইবার। আর একটু পরেই বেলা বেশ বেড়ে যাবে। লক্ষ্মীটি আমার। ওঠো না গো। এই, ভারী দুষ্টু তুমি। ইচ্ছে ক'রেই শুয়ে আছ। ছিঃ, আমার লজ্জা ক'রছে। আমাদের এই বিছানা ছেড়ে উঠতে দেরী হচ্ছে দেখে সবাই ভাবছে যে,—আমরা দু'জনা সত্যি বড় বেশী শরমহীন যেন! বুঝলে, এই? ভাববে—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমরা না জানি দুটি দুষ্টুতে মিলে কতই না বেহায়াপনা ক'রছি! এই লক্ষ্মী ছেলে, কথা শোন। ওঠো এইবার।

—না। আমি শুনবো না। দেখ না, না উঠলে সত্যি বলছি ভারী মজাখানা হবে।—বলতে বলতে প্রিয়াল শক্ত ক'রে দু'হাত দিয়ে অশোকার কোমর জড়িয়ে রেখেই—সজোরে নিজের বুকের ওপরে কাৎভাবে টেনে নিয়ে আটকালো। তারপর বিছানায় শোয়া অবস্থায়ই বালিশ থেকে নিজের মাথা একটু ওপরে তুলে ধরে—প্রিয়াল তার দুষ্টু মুখখানাকে কঠিন ভাবেতে ছোঁয়ালো— প্রিয়া অশোকারই নিকোটোতায় পরিপূর্ণ বুকের—পেশল ভাবখানার ছন্দে-ছন্দে লহর-দলের মতো ওঠা-নামা করা প্রত্যেকটি সৌন্দর্য্যের মধ্যে। সেখানকার অসম মাধুর্য্যময়তাকে ঢেকে রাখা রেশমী ব্লাউজখানার ওপরেই—একটি ধারের কঠিন বঙ্কিমা ঘিরে অধরের সিক্ততা ঝরানো, আর আদর দিয়ে কাঁপানো ছোঁয়াচের ঘন-ঘোরে ভিজিয়ে তুললো। অশোকা তার প্রিয়কে বাধা দিতে চাইলেও, পারলো না কিন্তু বিন্দুমাত্র বাধা দিতে।

অশোকা শুধু বলালো—লক্ষ্মীটি। অনেক হোল। আর না, থামো এইবারটি।

সত্যি এবার থেমে গেল প্রিয়ালের এই দুরন্ত-মুখর দুষ্টুমিখানা। প্রিয়াল বলল—অশোকা। এই, একবারটি শোন।

—এই প্রিয়াল, বল। আমি শুনছি।

—আচ্ছা অশোকা, বলতে পার, এতদিন ধরে আমার মন তোমারই মধ্যেতে লুকিয়ে থাকা এমন কী জিনিস খুঁজে বেড়াচ্ছিল?

—পারি। সত্যি প্রিয়াল, বলছি পারি তা' বলতে! অহেতুক তুমি ভুল বুঝে নিজেকে এতদিন ধরে দিয়ে এসেছো—শুধু শুধু কষ্ট।

—কিন্তু অশোকা, শোন লক্ষ্মীটি, তা না দিয়ে যে আমার উপায় ছিল না কোনও। আমার শিল্পী মনের সঙ্গে ঝগড়া বেঁধেছিল—আমারই ভেতরকার দেহগত ঈপ্সায় প্রবলভাবে আলোড়ন তোলা—মনখানার। আমার এই সুন্দরী অশোকা যদি এমনি এক লিপ্সার আঙ্গিনায় পড়ে হয় বিকৃত, তা ভাবতে আমার মন উঠতো নীরবে কেঁদে। তাই সেদিন প্রিয়া, তোমার অমন মঞ্জুষায় আঁকা রূপবতী সুষমাকে নষ্ট করাতে চাইলাম না তিলমাত্র। আর কণামাত্র।—আমারই একটা শরীরী ইচ্ছার অভীপ্সা মেটানোর জন্য মাত্র কয়েকটা লাজ হরণ করা মুহূর্তের বিনিময়ে— দেওয়া ও নেওয়া সুখের চরমতায়, আর পরমতায়—মাতাল না হ'য়ে। আমার খালি ভয় হোত—ওতে যদি তোমার রূপ-সুষমার ক্ষতি হ'য়ে যায়, আর ওতে যদি মঞ্জুলা দেহরাগের স্নিগ্ধতা ম্লান হ'য়ে চিড় খায়—ছন্দপতনে ঘটে যাওয়া মিথুনাচারের মাদকতা থেকে;—তবে কি ক'রে সহ্য ক'রতে পারবো আমারধ প্রিয়ার এমন অবস্থাগুলোকে? তাই ভয়ে ভয়ে অজানিত রকমে উঠেছিলাম শিউরে। শঙ্কারই শিইরে। তবু, তার চাইতেও যদি আরো বেশী কিছু ঘটে যায় খারাপের দিকে পাল্লা ভারী রেখে,—তা' হ'লে তখন কি হবে, আমার প্রিয়া, বল?—সত্যি তবে? তখন? বল অশোকা, তখন যে আমার নিজেরও শিল্প-সৃষ্টির কাজ শেষবারের মতো শেষ হোয়ে যাবে, তাই নয় কি? তুমি হারিয়ে গেলে পর, তুমি আর না থাকলে পর, বল, তখন তোমার বদলে কে আর এগিয়ে এসে আমার কাছটিতে বসে থেকে—আমারই ছবি আঁকবার প্রেরণাখানা যোগাবে? এই ভয়েতেই আমি শারীরিক ছন্দে লহর তোলা—সুখলোভাতুর ইচ্ছাখানাকে দমিত রাখার মধ্যে—নিজেকেও যেমন দিতে পেরেছি অতৃপ্তির অ-সুখকে,—আর তেমনি তোমাকেও দিয়েছি তার চাইতেও বেশী আরেক রকমের—ব্যাথা আর কষ্ট! সত্যি বল, তাই না?—কিন্তু সত্যিই আমার ভ্রান্ত ধারণার সমস্ত ভুলগুলো ভাঙ্গলো এই একদিন কি দু'দিন আগের একটা মধুর থেকে আরো মধুরিক ছবির—আরো মধুর হয়ে ব্যঞ্জনা পাওয়ার কল্পনাটি—মনে দারুণ ঝড় নিয়ে তোলপাড় ক'রে উদিত হওয়ায়। বুঝলে অশোকা, আর তাই আমি—

কথা শেষ ক'রতে দিল না প্রিয়ালের। অশোকা মুখর হাসিতে ঝলমলিয়ে বলে উঠলো—বুঝেছি। খুলে বলতে হবে না তোমায়। এই লক্ষ্মীটি। প্রিয়াল শোন, আমার মুখ থেকেই তোমার বলতে চাওয়া কথাটা।—বলতে বলতে অশোকা তার প্রিয়ালের মুখখানা আপনার সুপ্রকটিত শিল্পশোভায় আরাম ঝরানো বুকের সুষমার মধ্যে ঢেকে দিয়ে—বন্দী করিয়ে রাখলো। তারপর অশোকা বলতে লাগলো—গলার মৃদুল স্বরে আদর মাখানোর মতো ক'রে—

—এই প্রিয়াল। জান, ভবিষ্যতের কোলে তোমার ঐ কল্পনার যে ছবিখানা লুকিয়ে আছে ব্যাপক এক চাওয়ারই সলাজ মাখা আড়ালেতে—আভাসে-বিভাসে,—ঐ তারই বিচিত্রিতায় ভরা আছে গাঢ় সবুজাভায় যৌবনান্বিতা—বিশেষ একজনারই ভেতরে উঁকি দিতে চাওয়া—ভাবী মায়ের লাজুক লাজুক মতন ব্যঞ্জনাখানা! তাই না,

কী গো বল? আমার দুষ্টু! আমার সুখ!

বলতে বলতে নিজের বুকের সুষম শিল্পাধারের উপাধানেতে ন্যস্ত প্রিয়ালের মুখখানাকে একবার সজোরে—উরোজ পেশলতার মধ্যে চেপে ধরেই হেসে উঠলো স্বতঃস্ফূর্ততায়— ছোট্ট এক মেয়ের মতো খিল্‌খিলিয়ে। ঝল্‌মলিয়ে। নাচের তানে ঝক্‌মকিয়ে। পরমুহূর্তেই বলল অশোকা—

—জান প্রিয়াল, তোমারই ভেতরের ঐ একান্ত আকাঙক্ষার ব্যঞ্জনাখানাকে আলো-হাওয়ার পৃথিবীর মধ্যে ডেকে এনে—রূপ দেওয়াবে, রঙ্ মাখবে, আর প্রাণ সঞ্চার করাবে তোমারই জন্য—এই তোমারই অশোকা—তারই দেহ থেকে। প্রাণ থেকে। তারই সৃজনের জন্য উন্মুখ থাকা শোণিত ধারা থেকে। ঠিক, ঠিক তোমারই বলতে চাওয়া কথাটাই জানলে না কি, আমার মুখ থেকে? শোন গো, আর কেউ নয়। একা আমি! আর সেই সঙ্গে সঙ্গত হওয়া তুমি!—হ্যাঁ, এই দুজনাতেই হ'ল—সৃষ্টি আর স্থিতি! আর শেষ বেলাকার সেই সব-শেষটুকু। তাই ত' তুমি শেষ পর্য্যন্ত—গত রাতের গহন কালো আঁধারকে কাঁপিয়ে আর দেখিয়ে দেখিয়ে, তোমার স্ত্রী-স্বত্বেতে রত্নত্বের অভিধায় সঞ্জাতা করাবার জন্যই পারলে এই অশোকার গোপন রহস্যে আড়াল করাতে। আবডালে রাখা বিরাট লজ্জার অসম রেশটুকুকে উন্মোচনের চাবি-কাঠি দিয়ে ভেঙ্গে ফেলতে। তারপর আমাতে তোমাতে—নিরাবরণতা ভরা নিলাজ-রঙীন যৌবন সজ্জার মধ্যে সাধিত হোল—প্রিয়ার জন্য প্রিয়র সুখাভিসারখানা।—ঋতুতে সুরীতি ফোটাবারই জন্য। ঐ ভাবেতে আমারই মধ্যে তোমার ছন্দখানাকে মিতাক্ষরে বাঁধিয়ে দিয়ে জাগিয়ে দিয়েছো—ভাবী মায়ের অঙ্কুরণেতে বিকাশ চাওয়া—ঐ সুমধুরিক আর সুমঞ্জুলিক থাকা—কল্পনার প্রখর আভিবঞ্জ্যনাটি!

কথা বলতে বলতে অশোকা ঝুঁকে পড়ে—প্রিয়ালের সুন্দর হাসি নিয়ে ভরা মুখেতে আদর ক'রার চেষ্টা ক'রলো। প্রিয়র অধরে আপন ঠোঁট যুগল লুটিয়ে দিয়ে—একটা সুগভীর চুম্বন এঁকে দিতে দিতে বলতে লাগলো মঞ্জুলিকা অশোকা—

—এই প্রিয়াল। জান, গত রাত্তিরে তুমি যে ভাবে তোমার প্রিয়া স্ত্রীর যৌবনাকাঙক্ষা ভরা সলাজ শরীরের প্রতিটি অণুতে আর পরমাণুতে পরম সুখের আদানে আর প্রদানে সৃষ্টি করাতে পারলে—সুতৃপ্তিকারই চরম আবেশময়তা,—তার জন্যই বলছি প্রিয়াল, শোন একবারটি যে,—আমার ভেতরে আর নেই কোন অভাব। নেই কো কোন অতৃপ্তি। আর রইল না কোন অপূর্ণতা। অসাধ। তোমায় দিয়ে আমি আজ হ'য়েছি খুশী। তুমিই করিয়েছো আমায় সুখী। তুমিই করিয়েছো আমায় রাগবতী। জানবে প্রিয়াল, স্বামীর কাছ থেকে তারই প্রণয়েতে বিহ্বলা, আর লাজে ভয়-জড়ানো প্রিয়া স্ত্রীর—যুবতী মনের আর যৌবনান্বিত দেহের পক্ষে এমন অমূল্য জিনিসটিকে পাওয়ার মধ্যেই নিহিত থাকে— সেই মধুরা বধূ-জীবনের রত্নত্ব। সাধকামায় শ্রেষ্ঠত্ব। একটি সজীব সবুজেতে যৌবনা-সালঙ্কৃতা যুবতী মেয়ের বিবাহিতাজীবনের চরম ও শ্রেষ্ঠ পুরস্কার—সহজ সুরেই এনে দিতে পারে তারই প্রিয়তম নামে রাঙা—যুবকটির খাঁটি যৌবনেরই অয়ন। এই প্রিয়তমটিই তার প্রিয়ার লজ্জা-ভারে অবগুণ্ঠন টানা দেহের সাথে মিতালি পাতাতে এসে—নিবিড়তম

দেহীরাগ দিয়ে ঘেরা আলাপনে ফুঠে ওঠা মিথুনের আল্পনা আঁকতে আঁকতে—বধূ-সুজনার আকার ঘেরা শেষ লাজকণাটুকু পর্য্যন্ত লুট ক'রে কেড়ে নেয় নিজেরই করিয়ে— শেষ অবধি করা অভিসার চালাতে চালাতে। হ্যাঁ গো প্রিয়াল, বুঝলে,—প্রিয়তমটি তার স্বামীত্বের গর্বখানাকে সুবিস্তারিত করিয়ে তোলায়—প্রিয়ারই দেহাভ্যন্তরের পরম রমণীয় রহস্যে গোপন থাকা রূপখানাকে—নীবিবন্ধ সমেত অস্বীকারের নিবেদনী আবেদন থেকে উন্মোচিতা রেখে। আর মধুরাতা ঋতুর মতো এক একটা আশ্লেষ নিয়ে সঙ্গত হওয়ার পরশে পরশে, অবিরাম ঝরা বাদুলে-বাদল-ধারার ঝরঝরানিতে সরব স্বাক্ষরে সেই প্রিয়তমই ফোটাতে পারে পাতায় ও ফুলে—সৃষ্টিরই চির-ঈপ্সিত, চির-কল্পনার—সুখতরঙ্গিমা! রূপতরঙ্গিমা!

কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে প্রিয়ালের অধরে—প্রিয়া লাল লাল ঠোঁট দিয়ে চুম্বনের রেখা আঁকতে আঁকতে চলেছিল—সুস্থিরে। একটু ছেদ টেনে নিয়ে বলল অশোকা—

—এই, তোমার অশোকা আজ বড় দুষ্টু হ'য়ে উঠেছে, তাই না? আর তখন থেকে শুনিয়ে চলেছি বড় বেশী আজো-বাজে কথা, ঠিক না? কিন্ত, এই প্রিয়াল, লক্ষ্মীটি শোন।—তুমি জান না, তোমায় আমি জানতে দেই নি তাই;—তা না হ'লে তুমি অচিরেই জেনে ফেলতে পারতে যে—কত রাতে আমি এ ব্যাপারে তোমার উদাসীন ভাবখানা দেখে দেখে—লুকিয়ে কেঁদেছি। আর কেঁদে কেঁদে ঝরিয়েছি চোখের জল। তোমার বুকের আরাম পেয়ে, তোমারই হাতের কঠিন বাঁধনেতে বন্দী থাকাকালে—আমি নিজেই কত অগণিত বারের জন্য—আমার যুবতী স্বভাবকে এলো-মেলো কোরতে চাওয়া— সেই অপ্রতিরোধ্য মিথুনেরই জোয়ারেতে—পাড় ভেঙ্গে ভেসে যাবার অভিলাষ নিয়ে—ঝাঁপিয়ে পড়েছি। দিতে চেয়েছি তোমারই সক্রিয়তার মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে লুটিয়ে দেওয়াতে। কিন্তু কিসের যেন বাধা থাকায়, তুমি তখন আমার ঐ অবস্থাকে কেন জানি এক পরম উদাসীনের মতো— দেখেও দেখতে না। প্রিয়াকে প্রিয়ারই সেই রহস্য-মুখর মুহূর্তগুলোতে—ছন্দ-যতি-মিল ধরে বুঝতে তা। আর জানতে না। বিছানায় শুয়ে রাতের প্রথম লগ্নেই তুমি আমায় বুকেতে বন্দী রাখা অবস্থায়—শুধু ওপর ওপর আদর মাখাতে মাখাতে—ঘুম পাড়াতে। আর সঙ্গে সঙ্গে নিজেও পড়তে ঘুমিয়ে। একটি যুবতী মেয়েকে ভালোবেসে পরিণীতা করার পরবর্তী রীতি মাফিক প্রিয়ার—রভস-উপছানো দেহ-গাঙ্গেতে গোপন থাকা রূপখানাকে—মুঠো মুঠো ভাবে নিলাজ ভরিয়ে নিজেরই ক'রে কেড়ে নিতে এসে—দেহাভিসার কোরবার জন্য যে কোন যুবক স্বামীর পক্ষে যা অতি স্বাভাবিক কানুন ধরেই ফুটে ওঠে—প্রথম রাতের মিলন ত্রিযামার প্রতিটি যামে যামে।—কিন্তু প্রিয়াল, তুমি তোমার মধ্যে মধুলোভী ব্যঞ্জনাখানাকে জাগতে দাও নি!—হয় সলাজ ভয়ে। আর নয়ত' নিলাজ বিহ্বলতায়! তাই না? — তোমাকে এ ব্যাপারে নিশ্চল আর নির্বিকার দেখে দেখে—প্রিয়ার অতৃপ্তির জগতে পড়ে যাওয়ায়—তখন আমি শুধু কেঁদেছি। তুমি ত' অতি স্থির নিশ্চয়ে ঘুমিয়ে পড়তে আমায় বুকে বন্দী রেখেই!—কিন্তু জান না বোধ হয় এটা, যে—প্রিয়াদের জীবনের একটা সুন্দর রীতি বলেই—প্রিয়তমর বুকেতে আরাম ভরা অতি নিরাপদ আশ্রয়েতে থাকাকালীনও—প্রিয়ারা হঠাৎই

অকারণে ভেঙ্গে পড়ে ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে ঝরে পড়া কান্নার মধ্যে। কেন যে ওরা কাঁদে, তার উত্তর আমিও পারবো না গো তোমায় দিতে। দেখ প্রিয়াল,—আমি মেয়ে। আমি প্রিয়া। আমি যুবতী বধূ।—হ্যাঁ তাই ত' তোমায় কত বেশী ভঅলোবাসি। তাই একটা বিরাট সাধ ছিল। জানবার জন্য ছিল একটা আহ্লাদ। কিন্তু, কিন্তু এতদিনেতে তুমি, হ্যাঁ তুমি কিন্তু......

বলতে বলতে কথা না শেষ করেই—চিরন্তনীকার যাদু ছোঁয়াচে ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেললো অশোকা। এ কান্না সুখের কান্না। এর রীতি আলাদা। এর ধৃতি আলাদা। একমাত্র সুখী মেয়েরা—সব সুখের আতিশয্যে বেপরোয়া হ'য়ে উঠলে পর—না কেঁদে পায় না তৃপ্তি। পায় না জীবনের বিবাহিত ব্যাপ্তি। লাল ঠোঁটগুলো তখন কাঁপতে থাকে মৃদুল দোলায়। চোখের কাজল টানা পাতার কিনারে কিনারে জমজমাটি হয়ে তখন দেখা দেয়—ঘন মুক্তার মতো সুমসৃণ জলকণাগুলো। সমস্ত মুখের মদালসা রূপখানা না হয়ে পারে না—একটুখানি করুণ। একটুখানি বিধুর।

এমন অবস্থায় প্রিয়া অশোকাকে অকারণে ঝরা চোখের জলে— বেপথুমনা দেখে ঝট ক'রে উঠে বসে—প্রিয়াল ঘন আলিঙ্গনে বেঁধে নিল। ও-দিকে খোলা জানালা দিয়ে ভোরের রাগিনী ফোটানো সোনা ঝরা সূর্য্যের লালচে বিভূতির মধ্যে স্নান ক'রে যাচ্ছে—অশোকা সমেত প্রিয়াল। গত রাতের পূর্ণ-বিকশিত শুকপক্ষের চন্দ্র ছিল—ওদেরই মিথুনাচারের দ্রষ্টা। তারই সাক্ষী। আজ সূর্য্য তার সকালের অরুণিমা দিয়ে ওদের দু'জনাকে সরব স্বাক্ষরে—সূর্য্যায়নের গতিমুখরতায় করালো—রূপস্নাত। ধ্যানস্নাত। সূর্য্য-বিভূষিত।

প্রিয়ার চোখে মুখে ভরাট জল, ও লাল ঠোঁটের কাঁপনরেখার ওপরে ওপরে আদর কোরতে কোরতে বলল প্রিয়াল—এই অশোকা, ছিঃ। দুষ্টুমি কোর না। এখন কাঁদতে আছে?

প্রিয়র গালে অধর ছুঁইয়ে রেখে বলল অশোকা—দ্যুৎ। এই, আমার চোখে জল দেখে ভয় পেলে বুঝি? বেশ, এখনি কান্না থামালাম।

প্রিয়াল বলল—সত্যি?

অশোকা তখনি ঝরঝরিয়ে হেসে উঠল খিল্‌খিল্‌ করা হাসিতে। ঝিল্‌মিল্‌ করা তৃপ্তিতে। বলল—হ্যাঁ।

প্রিয়াল বলল—কিন্তু অশোকা। কথা দাও যে, আর ত' তুমি কাঁদবে না? কেন না, আমিও তোমায় আজ এই সূর্য্য-সাক্ষী রেখে কথা দিচ্ছি যে— তোমার প্রিয়াল তার অশোকাকে আর ভুল বুঝবে না। আর তার জন্য ভুল ক'রবে না।

চোখের কাজল-রঙ্‌ রূপ ভরিয়ে বলল অশোকা—এই, ঠিক ত'?

—হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। সত্যি বলছি, অশোকা।

আনন্দ-হাসির আনচানানো সুখের দরিয়া থেকে জেগে উঠে—অশোকা বলল আবেশ ভরা গলায়—কাটা কাটা কথার পিঠেতে কথা সাজিয়ে—এই মিষ্টি। এই প্রিয়াল। তবে শোন। এরপর তুমি যেদিন আমাকে তোমার পরিকল্পনায় ডাক দেওয়া ভাবী ছবিটির জন্য—তোমার স্টুডিয়ো ঘরের শৈল্পিকতায় রাঙানো নিরিবিলির

মধ্যে—বসে থেকে আমায় পোজ্ দিতে বলবে—আমরাই দেহহীসুষমার নিরাবরণা করা, আর নিরাভরণা থাকা অবস্থায়—শিল্পীরই প্রেণরার সুদীপ্তি আর সুদৃপ্ততা নিয়ে,—এই সেদিন কিন্তু, হ্যাঁ প্রিয়াল, সেদিনটিতে আমায় আরেকবার....

প্রিয়াকে কথা শেষ না করেই থামতে দেখে বলল প্রিয়াল—এই অশোকা, তুমি থামলে কেন? কথা শেষ কর।

—এই, এই প্রিয়াল। বুঝলে আরেকবার...দ্যুৎ, আমি বলতে পারছি না গো। লক্ষ্মীটি, তুমি নিজেই বুঝে নেও। কি গো, তোমার অশোকাকে তুমি বুঝবে না নিজে থেকে? নিজেরই অধিকারে? নিজেরই অধিবাসে?

—হ্যাঁ অশোকা। আমি বুঝবো। আমি নিশ্চয় জানবো। আমার মধুরকে ত' আমিই বুঝবো। তুমি ঠিকই বলেছো। আমার শখ্ তোমার সুখে আর খুশীতে হাসাবে। নাচাবে। কাঁদাবে।—তাই না?

ঝল্‌মলানি ছড়িয়ে খিল্‌খিল্ হাসিতে লুটোপুটি কোরতে কোরতে বলল অশোকা—হ্যাঁ। নিশ্চয়ই। তোমার শখ্ মেটাবার কারুকাজে নেমে এসে আমি হাসবো। আমি নাচবো। আমি কাঁদবোই—নিশ্চয়। আমিই ত' তোমার মধুরা। তুমিই যে আমার মধুর ব্যাপ্তিকে দেবে অতি কাছেতে পৌঁছিয়ে—তাই না?

মিষ্টি মিষ্টি কথার বোল ফোটানো অশোকার লাল লাল অধর যুগলে শেষ বারের মতো একটা সঘন তৃপ্তি ধারার রুচিরা মাকিয়ে—দীর্ঘ চুমায় আচ্ছাদিত রেখে বলল প্রিয়ালের দেহ-মনের শখ্‌খানা—এই অশোকা, শোন। আমার শখ্ মাফিক আমায় একটা ছবি আঁকতে হবে। যে ছবিতে থাকবে এক মঞ্জুলিকা যুবতী বধূ।—এই যার অঙ্গসজ্জার সর্বত্র থাকবে নিরাবারণ আর নিরাভরণ করা। ওরই নিলাজিত যৌবনের বাঁকে বাঁকে—পাতায় ও ফুলে শোভিত হয়ে উঠবে ওরই প্রিয়তম যুবকটির জন্য দেহবিলাস সমাপনের ঋতু-সাজখানা! ওই সাজের ভাবে আর ভঙ্গিমায় রূপতরঙ্গিমা ফুটিয়ে—ঐ যুবতী বধূ শুধু চাইছে—তার প্রিয়তম কবে, কখন, কোন মুহূর্তের তাপিত অন্তরঙ্গতায় প্রিয়ার দেহী-সুষমার মধ্যে সঞ্চারিত করাবে—আপনাতে সঞ্চালিত ঋতুময়তার সৃজন!—এই, এই অশোকা, আমার শখ্ ভরা এই ছবিখানা আঁকার মুহূর্তগুলো ধরে ধরে—তুমি কী দেবে না— তেমন তেমন—পোজগুলো? তেমন তেমন আসনে বসে বসে—তোমারই এই শিল্পী স্বামীটির জন্য প্রেরণার উৎস হ'য়ে? আধার রূপে আমারই মতো আধেয়র জন্য?

—ওগো, মধুর, তুমি মধুর।—বলতে বলতে নিবেদনে বহুত মিনতি করা আশ্লেষ ঝরিয়ে জানালো অশোকা—চুমাচুমির চিত্রবিচিত্রার আলপনা সাজাতে সাজাতে—সূর্য্য প্রদক্ষিণ করা সোনা-ঝরা প্রভাতের আশীষ মেখে—আমার প্রিয়াল। আমার মধুর। নিশ্চয়-নিশ্চয়। তাই হবে। আমিই মেটাবো তোমার শখ্। আমিই দেবো ঐ সাজানো "পোজ"খানা। তুমি মধুর হ'তে যে আমায় মধুময়তারই দিয়েছো অনুসন্ধান। ওগো প্রিয়াল, তুমি হ'লে মধুর হ'তে সুমধুরিক।

—তাই প্রভাতেই ওরা দুজনে বিছানা ছেড়ে উঠে বসে— টেবিলের টানা খুলে বার ক'রে নিয়ে এলো—সিল্কের কাপড়ে বাঁধানো খাতাখানা— যে খাতাতে দেশী-

বিদেশী ভাষা থেকে চয়ন করা—সুন্দর সুন্দর সূক্তিসমুচ্চয়ে রয়েছে ভরা।—একটা সোফায় বসে প্রিয়া অশোকাকে বুকের বাঁধনে জড়িয়ে রেখেই—খাতাখানার এক একটা পাতা উল্‌টিয়ে চলেছিল প্রিয়াল। হঠাৎ একটা পাতায় এসে থেমে গেল ওর স্থির দুটি চোখ। সেখানটা সামনে মেলে ধরে—প্রিয়াল তার অশোকার গালের সুমসৃণতার মধ্যে—নিজের গালের ছোঁয়া লাগিয়ে রেখে বলল—এই অশোকা। এসো। আমার লিখে রাখা ইংরাজী এই ক্যোটেশন্‌টিকে দুজনে মিলে একই সঙ্গে পড়ি, কেমন?—বলতে বলতে ওরা—দুজনায় মিলে পড়তে লাগলো—আনন্দ-হাসির কল্‌কল্‌ করা ছল্‌ছলানো তৃপ্তির ভেতর থেকে—

"The wife hath not the power of her own body, but the husband ; and so like wise also the husband hath not the power of his own body, but the wife."

—২২শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার, ১৯৬০

রোমান্টিকা অরিজিতা

আদর্শবাদে বিশ্বাসী শ্রীমান পবিত্রকুমার বক্‌সি ও শ্রীমতী স্নিগ্ধাকে

বন্ধুরা বলতো—অরিজিতা, বড় বেশী রকমের রোমান্টিক তোমার স্বভাবখানা।

উত্তরে অরিজিতা জানাতো—ও তাই নাকি! জানতাম না। তাই আমায় বুঝিয়ে দিলে তোমরা সকলে মিলে।

আর একটু বলতো বন্ধুরা—তবে কি জান, অরিজিতা অমন ধারার রোমান্টিক স্বভাবেতে বিয়ের পর সুজন যুবকটিকে ভালবাসা'বাসাটা ভালো দেখায় না কিন্তু। সত্যি বলছি গো।

—কেন দেখায় না।—শুধাতো অরিজিতা।

ভেসে আসতো তাইতে অতি সাধারণ উত্তরটাই—অন্যে তা' দেখে ভাল বলবে না। খারাপ বলবে। হয় ত' তোমার মনের মানুষটিও ভাল নাও মনে করতে পারে এমনটিকে।

তা শুনে হাসতো অরিজিতা মধুর কল-কাকলি ছড়িয়ে দিয়ে। ভরিয়ে নিয়ে। মঞ্জুল শরীরের সবুজাভায় নিখুঁত ভাবে ফোটা রেখাঙ্কিত যৌবনের বাঁকে বাঁকে—নাচাতো একটা মধুরাগ ভরা ছন্দময়তাকে। আর তারই তালে তালে ঝরা রিমঝিমানি থেকে উচ্ছলা হ'য়ে শোনাতো—কাটা কাটা কথাগুলোকে— "দ্যুৎ! ভারী সমঝদার দেখছি! বুঝলে সিস্টাররা, অন্যে আমারটা কি চোখে দেখলো আর না দেখলো, বা দেখে ঈর্ষায় জ্বলে কি না কি বললো, বা বলবে—তেমন উরো কথার দিকে তাকিয়ে জুজুর মতো ভয় করলে পর সত্যি ভালোবাসা যায় না কোন সমবয়েসীকে। ওরই যুবকত্বকে। বুঝলে?"

—তবু, তবু কিন্তু দেখতে হয়। সব কিছুই সমঝে চলতে হয়।—ওরা আবার জোর করতো নিজেদের মতে অরিজিতাকে বশ করাবার জন্য।

দুষ্টু হাসির ছররা ছিটিয়ে বলতো অরিজিতা—তবে, বেশ ত', তোমরা নিজেরাই যার যার বেলায় সেটাকেই পরখ ক'রে দেখছ না কেন, বাপু? তাই নিয়েই যাও না থেকে চুপ! একটা চোখের মিষ্টি চাহনি ঝরিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে ভালবাসা বাসবে ভালোলাগা প্রিয়টির জন্য,—আর অপর চোখখানার দুষ্টুমি থেকে দাঁড় করাবে প্রহরীর মতো ক'রে—যা—লোকে কি বলল, আর অন্যে কি দেখলো—এই সত্যে আর মিথ্যায় রটনা করার ব্যাপারখানা দেখবে বলে!

—হ্যাঁ। তাই রাখা দরকার। তাই দেখা প্রয়োজন।

—বেশ। বেশ। তোমরা তাই রাখবে আঁকড়ে। তাই দেখবে ভাল ক'রে। বুঝবেও

তাকেই! কিন্তু জানবে, আমি যা করি, আমি যা বুঝি, আর আমি যা চাই—তার সবটাই মেনে চলে আমারই ইচ্ছায়।—কথার শেষে রাঙা হাসিতে নির্ঝর ফোটাতো অরিজিতা।

অরিজিতা কিন্তু এর পর থেকেও অটুট রাখলো আপনাকে সেই অরিজিতাতেই—যে অরিজিতা তার যৌবনে ঘেরা তাজা মনের আকুতিতে আর বহুত মিনতিতে—বসন্তে ঋতুবিভোর আঙ্গিনাকে সাজাতে প্রয়াসী—রোমান্টিকতায়। ওরই রহস্য ঘেরা রোমান্সে। প্রিয়াল এক যুবকের চকিত-চমক ভরা দৃষ্টির ব্যাকুলতায় রাঙাতে চায়—অরিজিতার কালো হরিণ চোখ থেকে নাচানো সবুজ চাহনিকে।—তাই রোমান্স-মুখর রোমান্টিক স্বভাব থেকে সরে যায়নি অরিজিতা বিন্দু মাত্র। তিল মাত্র। যা ছিল,—থাকলোও তাই শেষাশেষি। হাবে, ভাবে, বিভাবে—নট্ নড়ন-চড়ন। নট্ কিচ্ছু।

কিছু দিন হোল এই মঞ্জুলিকা অরিজিতার জীবনে জড়িয়ে গেছে প্রজাপতির নির্বন্ধটি।

ওর বিচিত্রান্বেষী যৌবন প্রণয়ের অন্বেষণে জীয়নকাঠির ছোঁয়াচ পেল পরিণয়ের সাত পাকে বাঁধা পড়ায়। আপন পছন্দেরই সুন্দর মতন, আর লাজুক মতন, আর শান্ত মতন ছেলেটির থেকে মাত্র কয়েকটা দিনে এগিয়ে থাকা—একই বয়েসী যৌবনের গলায় বিবাহের বরমাল্য পরিয়ে দিতে গিয়ে অবশ্য একটু সময়ের জন্য হাত দুটো—লজ্জার গমকে কেঁপে না উঠে পারে নি অরিজিতরা—যদিও যে অরিজিতা হোল স্বভাবে স্বাধীনা, আর রোমান্টিকা। আবার সেই সঙ্গে এটাও সত্যি ছিল যে—যৌবনের মধুক্ষরা অনুভাবের প্রতিটি বিভাব ধরে—সপ্তপদ পরিক্রমার সময় অতি জানা, অতি চেনা যুবকটির আকাঙ্ক্ষিত ভূবনে চিরন্তনীতা হতে এসে—অরিজিতা না হ'য়ে পারে নি যুবতী-দেহ-মনে—চিরন্তনীকার মতোই বেপমানা। সলাজুকার মতো দেহী সাজেতে পলাশ রঙীন।

তবু, তাই বলে কিন্তু অরিজিতা তার তেইশ বছরী যৌবনেতে স্ফূর্ত রোমান্টিক স্বভাবটুকুকে মুছে ফেলতে পারে নি—কণামাত্র—বিবাহের সাজঘরেতে অভিষেক পেয়েও।

বরং রোমান্টিক ছন্দের রিমঝিমানিতে নববধূ অরিজিতা আরো বেশী রকমে খুশী-বিহ্বলা হয়ে উঠেছে—নরেন, ওরফে বাব্‌লাদের বাড়ীতে।—এই নরেন মানে নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী ওরফে বাব্‌লাকেই নিজে থেকে পছন্দ ক'রে বিয়ে করেছে অরিজিতা নাম্নী এই রোমান্টিকা মেয়েটি! যদিও তা শেষ পর্যন্ত মধুরেণ সমাপয়েৎ হয়েছে দু তরফ থেকে— বেশ কিছু মাস ধরে যুগপতে ভালোবাসা দেওয়া-নেওয়ারই মধ্যে-ঠাস বুনোনেতে ফোটানো ভালোবাসাবাসির মায়াজালে বন্দী হওয়ায়।

আর নরেনকে বিয়ে করারই প্রসঙ্গ-কথায়—নিজের বয়েসী মেয়েদের যৌবন-রঙকে হাসিয়ে, নাচিয়ে, দুলিয়ে দিতে দিতে বলেছে অরিজিতা লাজুক হাসির গমক থেকে— আমি রোমান্টিক। আমি ভালবাসি তাই নিত্য-নতুন বৈচিত্র্যকে। আর তা থেকেই লাজুক মতন ও সেই সঙ্গে বড় বেশী শান্ত মতন নরেন, মানে তোমাদের

বাব্‌লাকেই আমার পছন্দ ছিল সব চাইতে। আর তাকেই অর্পণ করা হয়েছে আমার কুমারী হৃদয়ের বরমাল্যখানা।

পছন্দ মতোই অরিজিতা তার শুভ্র সিঁথিতে সিঁদুরের রঙকে লালে লাল করিয়ে আঁকতে পেরেছে—নরেনেরই অস্তিত্বে নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে। সুজন মনের নরেন, মানে বাব্‌লারই এতদিনকার নীরব আর আভাসে আভাসে জানানো প্রণয়ের দান প্রতিদান থেকে—আলিঙ্গন করেছে শত সাধের, আর শত আহ্লাদের, আর নানান রীতিকা ঘেরা আবদারেরই এই বধূজীবনকে।—সত্যি, এই লাজুক, এই শান্ত, এই সুচরিত বাবলার সঙ্গে পরিণীতা অরিজিতা —আজ নিজে খুশীতে আর সুখেতে পাড়ি জমিয়েছে রূপকথার অনেক সাগর, অনেক নদী পেরিয়ে যাওয়া—সেই তেরান্তরের সীমানাহীন মাঠের অজানা রহস্যের পথে। বাব্‌লার সুন্দরকান্তিতে প্রতিভাসিত সৌম্যরূপ থেকে ঝলস্‌ পাওয়ায় অরিজিতার বধূ-পরিচিতি তৃপ্তির সঘন ছোয়াচ্‌ পেয়ে মেতে উঠেছে—যৌবনেরই লাজ-মাখানো আর লাজ-হারানো—লীলাবাসরেতে।—আর তারই খুশীর ছোঁয়াচ্‌ লেগেছে দায়িতের বাড়ীর সকলেরই মনেতে তা রেঙে যাওয়ায়।

এবার ওদের প্রথম দিনের কথাতেই হওয়া যাক্—মশগুল!—বিশেষ ভাবে অরিজিতাকে ঘিরে ঘিরে যৌবনবাসর পরিণয়ে কেমন ক'রে করেছিল লাজে-নিলাজে—প্রথম রাতটিকেই কুসুমিত—তারই রোমান্স ভরা কথকতায় এইবারটি পৌছানো যাক্!—

সবুজে-লালে, আর তারই সজীবে-উচ্ছলে রূপ পাওয়া বসন্তেরই সেদিনকার রাতটিতে যৌবন-বাসরখানাকে ফুলেল সুবাসের মাদকতায় সাজাতে গিয়ে—সত্যি হয়েছিল তা' বিলম্বিত। আদর করাবার আর আবদার জানাবার দোসর রূপী বাব্‌লাকে—অতি কাছের সঘন তাপ সঞ্চারমান পীনোদ্ধতার বাঁধনে একান্ততায় পেতে—অপেক্ষার শবরীর ধ্যানে আবিষ্টা থাকতে হয়েছিল অরিজিতাকে।—এক এক ক'রে সবাই যখন ওদের রেহাই দিয়ে গেল সৌগন্ধ-বিভোর মদিরতায় আনচান করা ঘরের ভেতরে রাশি রাশি ফুলের বেহায়া হ'য়ে ছড়িয়ে থাকা—লাজ-ভরা বিছানায়—অধিকার বিস্তারের মধ্যে নিলাজিত দাম্পত্য-রহস্যকে উন্মোচন করাবার জন্য—তখন রাত একটারও বেশী হোয়ে গিয়েছিল—পলে-অনুপলে অতিবাহিত। সময়টা প্রায় দেড়টার কাছাকাছি ছিল।

কিন্তু আশ্চর্যকেও এক পরম আকস্মিকতায় মূর্ত বিস্ময়ের ঘোরেতে—হার মানালো। এই গত দিনেরই আগের দিনটির সানাইয়ের তানে-মানে বাসর জাগতে গিয়েও যে অরিজিতা জাগতে পারলো না,—যে সেই দিনটির আগে হ'তে বহু বছরের অভ্যাস হিসেবে রাতের প্রথম লগ্নতেই ঘুমিয়ে পড়তো—গভীর সুনিশ্চয়ের মধ্যে—সেই অরিজিতাই আজ ফুলেল বাস নিঙড়ানো এই মায়াবী রাতের মাঝখানেও থাকতে পেরেছে—বিনিদ্র। তার কাজল আঁকা চোখের টানা চাহনির মদির করা ছবি থেকে উঁকি দিতে পারেনি কণামাত্র—ঘুম ঘুম ভাবখানা।—আর ওদিকে কিনা প্রিয়া বধূর কবোষ্ণতায় উপছানো টাটকা-তাজা সবুজ যৌবনের দরিয়ায়—সাঁতার

কাটতে এসে—এখনই বাব্‌লার ডাগর ডাগর সুন্দর চোখ দুটি—ঘুম ঘুম ভাবেতে গেছে জড়িয়ে।,

লাজহরণ করা দাম্পত্য-বাসরেতে—দেওয়ালের সাথে লাগোয়া একখানা ডিভানের ওপরে বসে ছিল—অরিজিতা। তার যৌবনের বসন্ত-ঋতু-ছোঁয়া মাদকতায় নিঁখুত রীতিতে যৌবনান্বিত—ছোট্ট মতন দেহখানা মনোলোভা সাজ করা—গাঢ় লাল আভায় ঝলমলানো বেনারসীতে জড়ানো। সিঁথিতে টানা লাল পরাগের রেখাখানা ঝকমকিয়ে ছড়াচ্ছে—নববধূর সলাজ মহত্বকে।—তার মধুময় চোখ দুটির মায়ারাগ ছাপিয়ে সরু ক'রে টানা হয়েছে কাজলরেখাকে। আর ওরই তমসা ভরা তীর ধরে ভাসা ভাসা হ'য়ে ফুটেছে রোমান্টিক মেয়েরই যৌবন-মদির রহস্যটি। মদালসা করা লাস্যটি। মুখের হাসি ঝরানো দুটি লাল লাল ঠোঁটের পরাগ মধুছন্দ নিয়ে কাঁপনে কাঁপনে হ'য়ে উঠেছে—বাঁকা-চোরা তীর-ভাঙ্গা এক পাগলপারা ঢেউ! আর ঢেউ! অরিজিতার তেইশটা দীর্ঘ বছরের সাধনায় শিল্প-সুষমায়িত বুকের মধুশ্রী-ভরাট যৌবন পীন—পরিচয়ে রক্তবরণ আবরণকে জানিয়ে রেখেছে—অস্বীকৃতি। তাই স্বীকৃতি না নেওয়া নিরাবরণা মাধুর্য্যতে প্রকটিত বিকাশে—না হয়ে পারে নি—নিশ্চয়ে অতি চঞ্চল। অতি কম্পমান। অতি রেশরমে নিলাজিত। ঋতায়ত মিথুন আহ্বানেতে পরিশোভিতা। কুঙ্কুমিতা।—আর ঐ শান্ত মতন, লাজুক মতন, মধুরে সৌম্যদর্শন বাব্‌লার কবোষ্ণতা ভরা বুকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে—প্রিয়ার এই লাল আঁচলে লুকানো অনিন্দ্য-সুষমে শিল্পায়িত পেশলে-নিটোল আবেশখানাকে—পরশ-ছোঁয়াচ লাগাবার জন্যই—অরিজিতা না হয়ে পারলো না—দারুণ বিহ্বলতায় ঊর্ম্মি-ঘেরা সচঞ্চলা। যৌবনে অভিষিক্ত মধু, মধু, এই মধুতে ব্যাপ্ত দেহী বিলোলতার হেথায়-হোথায় প্রতিটি কানাচে কানাচে—উন্মোচিত করাতে চাইল অরিজিতার বধূ-স্বত্বা—প্রিয়তমর হাতে লাজ মাখিয়ে লাজ কেড়ে নেওয়ারই সুরীতির রুচির করা আহ্বানেতে।—তাই মিষ্টি চোখের তমসা নাচিয়ে, অরিজিতার রোমান্স-মুখর দেহের সীমানায় তার মনের রোমান্টিকতা থেকে বিভাসিত হ'ল—এক চির নতুন অভীপ্সাটির মুখর-রূপ।—প্রিয়া আজ এই ত্রিযামা রাতের শুরুতেই তার প্রিয়াল-সাথী, এই লাজুক ছেলে বাব্‌লার শান্তশ্রীতে, আর সলাজে পূর্ণ দেহী যৌবনত্বের মধ্যে ফুটিয়ে তোলাতে চাইল—সেই চিরন্তনী মধুবাস রাঙানো প্রিয়ার যৌবন-সায়রে অজানা রহস্যকে সন্ধান করার জন্য—পরম সৌন্দর্য্যেরই সমাধা করাও সেই—"দেহালাপি দেহদাহে শীতলি যতনে!"

তখন ওর থেকে একটু তফাতে একটা নানান রঙের আঁকি-বুঁকি ফোটানো কার্পেটের ওপরে দাঁড়িয়ে ছিল বাব্‌লা, ওরফে নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী। শুধু তেইশটা শরৎ-ঋতুর ওপরেতে মাত্র কয়েকটা দিন-রাতের হিসাব মতো এগিয়ে গিয়েছিল বাব্‌লার বয়েসখানা—পুরোপুরি তেইশটি বসন্তে রূপানুরক্তা অরিজিতার থেকে নামমাত্র একটু দূরত্ব রক্ষা ক'রে।—কেন না, তা' না হ'লে যে ছন্দপতন হ'ত প্রিয়ারই কাছাকছি প্রিয়র বয়েসখানা থাকায়! তাই দেখি, প্রিয়ার বয়েসে থেকে মাত্র কয়েক শত প্রহর এগিয়ে থাকা বাব্‌লা—সত্যিই নিয়ম মাফিক রক্ষা করাতে পেরেছে—প্রিয়তমর তরফ থেকে অতি প্রয়োজনীয়—"এজ্ সিনিয়ারিটি"-খানাকে।

বাব্‌লা তার সৌম্য-নির্ঝর যৌবনে সাজানো চোখে-মুখে ফুটিয়ে রেখে দাঁড়িয়ে ছিল বেশ লাজুক লাজুক ভাবখানাতে। তায় আবার প্রকৃতিখানা ছিল তার—বড় বেশী শান্ত আর ঠান্ডা স্বভাবের।—এদিকে কিন্তু রাত অনেক গভীরে গড়িয়ে যাওয়ায় তার প্রেমময় চোখ দুটোর পাতা ভারী হয়ে আসছিল—ঘুম পাওয়ায়।

টানা টানা চোখের ঘুম ঘুম ভাব থেকে আমেজ ঢেলে বলল বাব্‌লা—অরিজিতা, এই, বিছানায় এসো, ঘুমাবে না? বড় ক্লান্তি লাগছে। আমার বিছানায় শুলেই কিন্তু গাঢ় ঘুম এসে যাবে! এই মেয়ে, এসো এখানে। খালি দুষ্টুমি কোরছ!

—দ্যুৎ। এই বাব্‌লা! বলি, তোমায় ঘুমাতে দিলে ত'?—কথার শেষে খিল খিল করা হাসিতে মুখর হ'ল অরিজিতা। অন্ততঃ তার কাজল আঁকা চোখ দুটো থেকে ত' ঘুম গেছে পালিয়ে। গেছে রূপকথারই অচিনলোকেতে হারিয়ে।

দরজা বন্ধ ক'রে বাব্‌লা প্রিয়ার ও কথা শুনতে শুনতে গায়ের মোলায়ের রেশম জামাখানা না খুলেই বিছানায় শুয়ে পড়লো একটা গভীর তৃপ্তির প্রকাশ দেখিয়ে। বলল—এই, এসো। দুষ্টুমি করো না।

—বুঝেছি। বুঝেছি গো!—আর কিছু না বলে ডিভান ছেড়ে উঠে এসেই অরিজিতা ঝুপ্ ক'রে বসে পড়লো বিছানায়, সারা দেহ ঘিরিয়ে একটা নাচের হিল্লোল তুলে। বসেই নিজের হাতের নরম তুলতুলে আঙুলের ছোঁয়ায় বাব্‌লার শরীরেতে সুড়সুড়ি কেটে কেটে —ঘুমখানা নষ্ট করাবার জন্য হ'ল সচেষ্ট।

—বাঃ মেয়ে! দেখছি আমায় ঘুমাতে দেবে না। এই, এই দুষ্টুমতি, বলি তুমি কী চাও?

—আমি কী চাই! বোঝ না, না বাব্‌লা? এই একেবারে যে ছোট্ট এক ছেলেমানুষের মতোই কোরছ এমন প্রশ্ন! বিয়ে ত' করেছো! সবই বোঝও আবার! তা, বিয়ের পর এই ফুলেল রাতটিকে কি ভবেতে করা যায় মধু ছড়িয়ে আর ছিটিয়ে উপভোগ—তা কী জান না? তা কী বুঝেও চাও না বুজতে? না কী চাও না মোটেই? এই, এই বাব্‌লা, তুমি না হয় হয়েই থাক শান্তটি,—আর সেই সুযোগে আমি নিজে থেকে তোমায় জানাই আর বোঝাই—এই, এই মানে, এইবারটি কেমন রাজী?

রাঙা হাসির মদির করা বিহ্বলতা ছড়িয়ে ছড়িয়ে বাব্‌লার বুকেতে লুটিয়ে পড়লো অরিজিতা। দুটি হাত দিয়ে জড়ালো লাজুক ছেলের গলাখানা। তার প্রিয়াল মুখের ওপরে নিজের মুখখানা তুলে ধরে রেখে—ছোট্ট এক মেয়ের মতন দেয়ালা ভরা হাসিতে কল্‌কলালো অরিজিতা। আর ছল্‌ছলালো তার দুষ্টুপনায় ভরা চোখের চাহনি। একটু যেন ভেজা ভেজা ভাবে। অশেষ সুখের জন্য কল্পনা করা পুলকভারখানাকে সহ্য করতে না পারায়।

—কী? এবার? মুখ ফুটে বল বাব্‌লা, এবার সত্যি সত্যি সব কিছু ছেড়ে দিয়ে কি ঘুমাতে ইচ্ছা কোরছে?

—শোন অরিজিতা, বলি কি জান—তোমার মত দুষ্টু মেয়ের দুরন্তপনার কবলে একবারের জন্য বাঁধা পড়লে কি তার থেকে আর সহজে মুক্তি পাওয়া যায়! না যাবে, শুনি? বাব্ বা! আমার ত' ভাল রকমেই জানা আছে যে, একবার তোমার

মধ্যে দুষ্টু বুদ্ধির খেলা আরম্ভ হ'লে পর, সহজে হয় না তার সমাপ্তি টানা। এই মেয়ে, বলি, বিয়ের আগের কথা সব মনে পড়ে কি? তখন ত' কত দিন যে, মাথায দুষ্টু বুদ্ধি খেলিয়ে আমায় কত রকমে ব্যতিব্যস্ত করিয়ে তোলাতে—সত্যি তার শেষ ছিল না। তবে কি জান, সে সব পুরানো কথাকে ভাবতে কিন্তু ভালোই লাগে। ঠিক নয় কি?

কাকলিত মুখর হাসিতে উপছিয়া পড়া অবস্থা নিয়েই বলল প্রিয়া—বা, বেশ বাব্‌লা। এখন দেখছি হিসেব নিতে বসেছো বিয়ের আগে তোমার ওপরে কত দুষ্টুমি চালিয়ে এসেছি, তারই জন্য না? কিন্তু বলি, তখন লক্ষ্মী ছেলের মতন অমন ভাল মানুষটি সেজে চুপ ক'রে থাকতে কেন? বাধা দিলেই ত' পারতে। আসল কথা কি জান বাব্‌লা আমার করা দুষ্টুমিগুলো তোমার খুবই ভালো লাগতো, আর এখনও ভালো লাগে নিশ্চয়! কি গো বাব্‌লা, বল, সত্যি বললাম ত'?

—হ্যাঁ। সত্যি বলছি, অরিজিতা। তখন খুব ভালো লাগতো।—বলতে বলতে বাব্‌লা আদর ক'রে তার প্রিয়ার পিঠেতে হাত বুলিয়ে চলল।

—আর, আর কি জান বাব্‌লা, আমারও খুব ভালো লাগে তোমায় কাছে পেলে পর তোমার ওপরে দুষ্টুমি চালাতে! তাই ত' আমি দুষ্টুমি করি। এই, এই বাব্‌লা, বলি ঘুম ত' তোমার চোখ থেকে পালিয়েছে এতক্ষণে! তা' এবার, সত্যি এবার কি করবে বল? রাতটা ত' কাটাতে হবে। মধুর ক'রে। সুন্দর ক'রে। আবেশে, আবেশে। সুছন্দে। সানন্দে। রভসিত করিয়ে।

—এই, দুষ্টু মেয়ে! এই শোন, অরিজিতা। আমি কিন্তু কিচ্ছুটি কোরব না। আর করাতে বলবও না কোন ফরমাশ দিয়ে। তবে, তুমি নিজে থেকে যা পার আমায় দিয়ে করিয়ে নেও তাই। আমি পূরণ করাবো। দেবো না তাতে বাধা। কেন না, প্রিয়ার দেহ-মনে ঝরনা ফোটানো দুষ্টু দুরন্তপনাগুলো আমার ধারণাতিরিক্ত ভালো লাগে।—বলে নিজের হাতের বাঁধনকে আরো শক্ত করালো বাব্‌লা।

—ঠিক আছে, আমি কি করতে বলি জান।—কথা শেষ করাল না অরিজিতা। লাল আভা নিঙড়ানো খিল্ খিল্ হাসিতে ভেঙ্গে পড়লো তখনি দুষ্টু মেয়ের মতো।

ও ত' রোমান্টিকা। তায়, ও হ'ল বৈচিত্র্য-প্রিয় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রতায় বিশ্বাসী। এক কথায়—অনুসন্ধানী। এ্যাডভেঞ্চারাস্! তাই অরিজিতা কথায়, ব্যবহারে, আর কাজে বৈচিত্র্য তৈয়ার করাতে নেমে বাব্‌লার লাজুক হাসিতে অস্থির অধরের ওপরে নিজের নিলাজ হয়ে কাঁপা কাঁপা লাল ঠোঁট দুটিকে ছুঁইয়ে রাখার মতো ক'রে বলল—এই। এই বাব্‌লা। আমায় বুঝলে, মানে, মানে এই আর কি,—ধ্যাৎ, কিছুটি যেন বোঝো না দেখাচ্ছ এমন ভাবখানাকেই! এই, আমায় অধর ছাপিয়ে এঁকে দাও তোমার ঐ ঠোঁটের সিক্ততা ভরা চুমা! হ্যাঁ, আমার অধরেরই লাল রঙে রাঙিয়ে তোলাও তোমার অধরের সুন্দর হাসিকে!

—ও, তাই বুঝি? এই দুষ্টু মেয়ে, তা হ'লে—। শেষ হলো না বাব্‌লার কথা।

ঝড়ের বেগে মুহূর্তে মধ্যে দু জনারই অধর যুগপতে এক সঙ্গে রুচিরায় রীতি ঘেরা—চুমাচুমির কারুকাজে পাতালো মিতালি। প্রিয়ার অধরেতে প্রথম চুমাখানাকে

এঁকে দিয়ে এই মিথুনবাসরের শুভ-উদ্বোধনে—মঙ্গলাচরণ করেছিল প্রিয়তম। কিন্তু তারপর থেকে বাব্‌লা একবার অরিজিতাকে, আর তারপরেই আবার আরেকবার অরিজিতা হ'য়ে ওঠে সক্রিয়া—বাব্‌লার লাল হ'য়ে ওঠা অধরেতে চুমার লহর সাজাবার জন্য।

কিছু সময় পরে অরিজিতা বাব্‌লার লাল আভা মেখে সুন্দর হওয়া ঠোঁটের বিস্তৃতি ভরিয়ে একটা সুদীর্ঘ চুমা আঁকতে আঁকতে ওপরের দিকে মুখ তুলে চাইল। বলল—এই বাব্‌লা, এবার লক্ষ্মীটি তোমার সেদিনের কথাটা রাখ। মনে পড়ে না, কথা দিয়েছিলে যে?

—ভারী দুষ্টু কোথাকার! এই অরিজিতা, বুঝেছি। নিশ্চয় রাখব কথাটা। কেন না কথাটা দিয়েছিলাম আমি নিজে থেকেই।

বিবাহের কয়েকটা দিন আগে বাব্‌লা কথারই প্রসঙ্গান্তরে কথা দিয়েছিল অরিজিতাকে এই নিরিখে যে—বিবাহের সপ্তপদ পরিক্রমার পর—সেই ফুলসাজে সাজা, ফুলেল সুবাসে মনোলোভা রাত্রির বাসরেতেই—মিষ্টি মেয়ে অরিজিতার দুরন্ত যৌবনদেহের ইপ্সিত দুর্বার আকাঙ্ক্ষাকে পরিপূর্ণ করাবার জন্য। পাথরে তৈয়ার করা শৈল্পিক-প্রতিভূ নিয়ে বিকশিত সেই চিরকালের প্রিয় ও প্রিয়ার সঘন আশ্লেষ থেকে—মিথুন-পরিক্রমায় ধ্যানমগ্ন মূর্তিটির মধ্যে দিয়ে—যৌবনেরই সলাজ-সুন্দর প্রাণ-প্রতিষ্ঠার জন্য!

কেন বাব্‌লা এমন কথা দিয়েছিল তারই আদরের অরিজিতাকে?

দিয়েছিল নিজের মধ্যেও—ঐ একই আকাঙ্ক্ষার তিয়াস ব্যকুল ক'রে তুলেছিল বলেই। বাব্‌লা আজ হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারল যে—সেদিনের ভাবী স্ত্রীর অধিকারে স্বত্বময়ী হওয়ার প্রাক্-কালেতেই, অরিজিতা তার বিবাহের স্বাক্ষরে পাওয়া মিলন-বাসরের প্রথম রাতেতেই—যে ব্যাপক জিনিসটিকে পেতে চেয়েছিল—তাও যে বাব্‌লার চাওয়া ও পাওয়ার তালিকাতেও ছিল—বেশী উজ্জ্বল-বিভাসে—স্বাক্ষরিত হয়ে!

বাব্‌লার কলেজের, তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের সতীর্থানী ছিল—আজকের এই বধূ অরিজিতাই।—আর তাই বাব্‌লা ভাল ক'রেই অরিজিতাকে চেনে, বোঝে।—আর প্রাক্-কালই জানাজানি করেছিল, বা হয়েছিল পরস্পরের মধ্যে—অনেকটাই। —কেন না, বাব্‌লা তার প্রতীতি থেকে পাওয়া সুনিশ্চয়ে থাকা অচঞ্চল প্রণয়ের আভাস ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে জানিয়ে, বুঝিয়ে—জয় করাতে পেরেছিল এই প্রিয়াটিকে। বাব্‌লা তাই জানে—অরিজিতা পুরোপুরি হ'ল রোমান্টিক স্বভাবেরই মেয়ে। যে বড় বেশী ভালবাসে নতুন নতুন বৈচিত্র্যকে। তাই দীর্ঘ ছয়টি বছর ধরে অরিজিতা যেমন বাব্‌লার ছায়ায় ছায়ায় ফিরেছিল—চিরন্তনী প্রেমিকার ছান্দসী রূপখানায় ঝলমলিয়ে—তেমনি বিবাহের পরে সে হবে বাব্‌লারই পরমা আর চরমা রূপী—বধূ-স্বত্বাটি। বধূ-রত্নাটি।—আর সেই সঙ্গে যুবতী বর-বধূদের মতো চিরনতুনত্বে ফোটা—প্রজাবতীর মধুময়, গৌরবময় রূপটুকু পেতেও ছিল—আগ্রহান্বিতা।—অশেষে-বিশেষে।

বিয়ের আগে কত রুমঝুম ·সুখ ঝরানো কথার কাকলি ফোটাতো—বিয়ের পরের জীবনকে ঘিরে ঘিরে বাব্‌লা আর অরিজিতার মধ্যে—তা এক অসম বিস্ময়ের সাজঘরেতে শেষ পর্য্যন্ত হয়েছিল প্রতিষ্ঠিত।—সেদিন কত পরিকল্পনা হ'ত দু জনাতে— ভাবী বিবাহের ঋতু বিচিত্রারই চিত্র-চিত্রায়নে। বিবাহিত যৌবনের প্রজায়নী রহস্য ভরা জ্ঞানে ও অনুজ্ঞানে—ওরা না ক'রে পারেনি জল্পনা, কল্পনা—মায় পরিকল্পনা! আরো বেশী ক'রে পরিকল্পনা কোরত অরিজিতা—নিজের দেহ-মনের মাধুর্য্য ছড়িয়ে—বিবাহের আশ্লেষে বন্দী হবার পর—কেমনতর হবে তাদের দু জনার মিথুনকে জানাজানির লীলায়িত রূপারূপের মধ্যে খুশীয়াল সে জীবন আর যৌবনে?—কতটুকু পরিধির ব্যাপ্তি পাবে তাদের দু জনকার সুখ আর খুশী দেওয়া ও নেওয়ার ছোট্ট সংসারটি?—আর, আর সব চাইতে কোন এক লাজ কেড়ে নেওয়া রুমঝুম মুহূর্তে—ভবিষ্যতের জন্য নতুনের মধ্যে আনকোরা একটি ছোট্ট আকারের প্রাণ সৃষ্টি করার অভিলাষে—ঠিক কখন অরিজিতা প্রিয়া বধূর ছান্দস-দাবীতে— ধারা চাইবে সুন্দর দেহী বাব্‌লার তাপিত যৌবনের থেকে— মাত্র একবিন্দু শোণিতধারার সৃজনায়নী শক্তিটিতে?—এই তারই বহুত মিনতির জন্য। অরিজিতা ছোট বেলায় গ্রাম-বাঙ্‌লার কবি—গোলাম মোস্তাফা সাহেবের একটি বিখ্যাত কবিতায় পড়েছিল যে—"ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে।"—কিন্তু তখনি চিরন্তনী মেয়ে বলে ছোট্ট অরিজিতার ভেতরে চাগিয়ে উঠেছিল—আমাদের 'মেজকা' বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের অমর-সৃষ্টি, সেই ছোট্ট দেহ-মনের পরিধিতে পাকাগিন্নী হ'য়ে ওঠা—"রাণু"-ই যেন। তাই ছোট্ট হলেও সেদিন অরিজিতা—মোস্তাফা সাহেবের ঐ কবিতার মানে অনুযায়ী ভাবী পিতাদের সম্পর্কে জানানো একতরফা সুখ্যাতির বিরুদ্ধে করেছিল—বিদ্রোহ। "কেন?"—অরিজিতা ভাবতো—"মায়েরা কি ফেলনার জিনিস নাকি, যে কবি শিশুর মধ্যে ভাবী মায়েদের দেখতে পান নি লুকিয়ে থাকতে?"—যাক্‌, ও ত' কথায় সাজানো কবিতা, তাই আর বেশী কিছু ভাবতো না। পরবর্তী জীবনে কলেজে পড়ার সময় হঠাৎ অরিজিতার সাথে পরিচয় হয়—গভীর শিল্প-রসের দার্শনিক কারবারী—চার্লস্‌ ল্যাম ভবিষ্যতের কোন নতুন প্রাণের জন্য কি সুন্দর কোরেই না আঁকতে পেরেছিলেন—সন্তানেরই জন্য বুভুক্ষু এক পিতৃহৃদয়ের কথা। তাই মনে পড়লো মঞ্জুলা অরিজিতার—ল্যামের লেখা থেকে ঃ—

"Then I told how for seven long years, in hope sometimes, sometimes in despaire, yet persisting ever, I courted the fair Alice W–n ; and, as such as children could understand, I explained to them what coyness, and difficulty, and denial meant in maidens– When suddenly, turning to Alice, the soul of the first Alice looked out at her eyes with such a reality of re-presentment, that I become in doubt which of them stood there before me, or whose that bright hair was ; and while I stood gazing, both the children gradually

grew fainter to my view, receding and still receding nothing at last but two mournful features were seen in the uttermost distance, which, without speech, "We are not of Alice, nor of thee, nor are we children at all. The children of Alice call Bartrum father. We are nothing ; less than nothing, and dreams. We are nothing; less have been, and must wait upon the tedious shores of Lethe million of ages before we have existence, and a name"-and immediately awaking. I found myself quietly seated in my bachelor armchair, where I had fallen asleep, wth the faithful Bridget unchanged by my side-but John L. (or James Elia) was gone for eve.)."

অরিজিতা জানে—ওঁরা মানে, ল্যাম আর তাঁরই ছোটবেলার সে প্রিয়টি—এই তাঁরা কেউই যৌবন ধন্য করা বিবাহের রূপমহলে অভিষেক বর্ণ করাতে পারে নি—কার্য্য-কারণ সম্পর্কে। তবু ল্যামের প্রিয়া যখন অপর পুরুষের স্ত্রী হোয়ে—তারই পরবর্তীকালেতে হোয়েছিলেন সন্তানের মা—সে সম্পর্কে ল্যামের স্মৃতিচারণ তাঁকে আপনার পিতৃহৃদয় সম্পর্কে কোরেছিল—বুভুক্ষু! এই সুন্দর রণনখানা শিল্প হোয়ে উঠেছে ওপরের লেখায়। অরিজিতা তা পড়ে পড়ে মুগ্ধ হয়।

মধুরেতে সুন্দর এ সব পরিকল্পনার সব কিছুই অরিজিতা বাব্‌লার কাছের ঘনিষ্ঠ তাপে বসে থাকাকালীন—প্রিয়র আদর লুট করে নিতে নিতে জানাতো, আর বোঝাতো হাবে, ভাবে, কিভাবে। আর বাব্‌লা তার প্রিয়াকে আদরে আদরে পাগলপারার মতো করিয়ে—এই বরকন্যার সবেতেই ইচ্ছাপূরণের জন্য রাজী হ'য়ে যেতো। কেন না অরিজিতার রোমান্টিক মনের বিচিত্রা-ভরা আকাঙ্ক্ষাগুলো ছিল—এক একটি সুন্দরে-সলাজ—আর নিলাজে-মধুর—পরিকল্পনা!

আর ওদিকে অরিজিতা বোঝে ভালো করেই যে—সময় মতো বাব্‌লা পারবে—তারই প্রিয়ার বধূত্বে রত্নত্ব ফোটাবার জন্য—দেহেরই রহস্যকে উন্মোচনে টেনে—সুবিনীতা থাকা যৌবনাময়ী আকাঙ্ক্ষায়—মদির শোণিতে একটুকরো তাজা প্রাণকণাকে সঞ্চার করাতে। মনে মনে দৃপ্ত অরিজিতা এ জন্য যে—ওর বাব্‌লার সৌম্য-শান্ত দেহের সেই একবিন্দু শোণিতেই শেষ পর্য্যন্ত সৃষ্টিকাজের সমাপ্তিতে—অরিজিতার ভেতর দিয়ে আরেকটি দেয়ালা হাসিতে ছল্‌ছল্‌ করা, উচ্ছলিত নির্ঝররূপী—এক ছোট মতন আকারেতে সালঙ্কৃত—নতুন এক বাব্‌লাকে দিতে পারবে উপহার—আপনার একান্ত সুখ আর খুশী, এই পুরানো বাব্‌লারই জন্য।

আজ তাই বিয়ের এই শুভ, আর শুভ্রতায় ঝল্‌মল্‌ করা রাতে—অরিজিতা তার প্রণয়ের সবুজতায় পরিণীত বরপুরুষের কাছে—শ্রীরাধার মতো বহুত মিনতিতে প্রার্থনাখানা জানালো—আজই, এই শুভ রাতের মঙ্গলাচরণে নেমে, বাব্‌লা যেন তার পরিণীতার পিপাসিত যৌবনে—যুবতীরই চিরন্তনী ছন্দখানাকে ফুটিয়ে—সৃষ্টির বিরাট সত্বে যেন করায়—অঙ্কুরিতা।

রোমান্টিক সুখের অনুসন্ধানে, মিষ্টি মেয়ে অরিজিতা আজ হ'তে চেয়েছে আরাধনা

করা, আর আকাঙ্ক্ষা করা—প্রজাবতী। পুষ্পবতী।

তাই অরিজিতা আজ রাতের এই শুভ পবিত্রতার মায়াবেশে নিজের যৌবনান্বিত দেহ-সুরভির কানাচে কানাচে—তেইশটা ভরাট বসন্তকে মধুরিম ভাবে ফুটিয়ে রেখেছে লাল বেনারসীর ঝল্‌মলে সাজের বহ্নিতে বহ্নিতে—পবিত্রতারই স্বাক্ষর নিয়ে। যুবতীর দেহী-যৌবনায়নে প্রস্ফুটিত এই অভিলাষিত আকাঙ্ক্ষাখানা—হলো পুরোপুরি শুভ। পবিত্রতম। হোলি। মোস্ট্ সেক্রেড্।—বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে এমনই উক্তির—মধু, মধু,—আর মধুময় রসস্বরূপতা। আর আছে বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টে।

এমনি সুছন্দিত সুরীতির পবিত্র আকাঙ্ক্ষার দুরন্ত ছবিখানা স্বভাবে, বিভাবে হয়ে উঠেছে প্রজ্জ্বলিত। অরিজিতা যে আজ শুধুমাত্র বাব্‌লার প্রিয়া নয়। ও আজ প্রেমময়ী স্ত্রী। লাভিং কনসর্ট্। বাব্‌লার আধা-অস্তিত্ব। কন্‌সিডারেট্ বেটার-হাফ্! কবি মেরিডীথের ভাষায় অরিজিতারা হ'ল—

"Maiden still the morn is ;
and strange she is, and secret.
Strange her eyes ; her cheeks are cold,
as cold as sea shells."

এই তাদেরই একজনা রূপে অরিজিতা আজ নিজের যৌবন খচিত তাজা দেহের প্রতিটি প্রকটিত সন্ধিতে—আনন্দ-বিভাসিত মিথুনারতির দীপখানা জ্বালিয়ে রেখে—বাব্‌লাকে আহ্বান কোরল—অনয়া, রাধা, আরাধিতার আবেশে। রভসে।

আরাধনার বহুত মিনতি জানাতে জানাতে আপনার লাল ঝল্‌মলে আভা ছড়ানো বধূবেশ থেকে অরিজিতা তারই শত আদর ও আহ্লাদের বাব্‌লাকে—টেনে নিল আলো-আঁধারের সঙ্গমেতে ছন্দ পাওয়া—দেহারতির ঘনিষ্ঠতম মোকাবিলায়—লাজহরা এক পরিবেশের মধ্যে।—লাজুক মনের সুন্দর বাব্‌লা তার মধুরা প্রিয়ার লাল সাজের রেশম আবরণকে অস্বীকার ক'রে—অনিন্দ্যা দেহের সমস্ত রকম সুন্দরী লজ্জাগুলোকে কেড়ে নিল একেবারে নিজের মতো করিয়ে। আজ দাম্পত্য-জীবনের দরজায় দাঁড়িয়ে অজানাকে জানার অনুসন্ধানে—বাব্‌লার মনে পড়লো বেশ কিছুদিন আগে কোন একটা বই থেকে এমন এক মুহূর্তের অনুভূতিকে পাঠ করেছিল মনোযোগ দিয়ে।—তাই মনে পড়লো আজ—যেখানে লেখা ছিল—

"For the man, the moment he receives the first indication, which varies in different women from about two to fifteen or so, he should let himself go, and passionately kissing his wife as both plunge headlong, like leaping cataracts, into the foam of love."

এমন মাতাল করা যৌবনবাসরের প্রতিটি রূপানুভূতির কাছেতে—অরিজিতা নিজের শরমতাগুলোকে বিলিয়ে দিতে পারলো—শুধু বাব্‌লারই অনিন্দ্য সুখের কারণ হ'য়ে ওঠায়।—অরিজিতা যা আজ অভীপ্সা পূর্ণ করিয়ে পেল—তারই কারুকাজে মাতামাতি করা অচেনা আর আজানাকে জানাজানিতে—সমস্ত বধূ-

সুজনাদের মতোই অরিজিতা তার লাজুক স্বভাবের সৌম্যদর্শন এই বাব্‌লার তেইশটা বছরের বসন্ত আঁকা যৌবনদেহের উত্তপ্ততায়—শান্ত সায়রের আড়ালে আর আবডালে লুকিয়ে রেখেছে।—ওদের চারধারে তখন শুভ আশীষ মাখানো রেশরম হওয়া রাত—আলোয় আর তার আধারের পাখা মেলে ধরেছে। এমন মঞ্জুল মুহূর্তে বাব্‌লা-অরিজিতার একই ধ্যানে, একই আবেশে সঙ্গত হওয়ার বিচিত্রিত ছবিখানা থেকে—কবিরই বাক্‌-বিভূতি হয়ে উঠেছে সালঙ্কৃত।—

"Venus is spoilt by serving in darkness,
Surely you know, sight is the path of love."

তাই অমন পরিবেশেতে আঁধারও যেমন আছে। তেমনি আছে আলোও! সেই আলোতে লুকিয়ে যাওয়ায়—আঁধার হয়ে উঠেছে অলোরই অধিক।

অরিজিতা যে আজ প্রজাবতী হতে চেয়েছে।

—আর সে যে হোল রোমান্টিকা অরিজিতা।

—২৮শে ফেব্রুয়ারী-রবিবার-১৯৬০

লজ্জা

সুইটজারল্যাণ্ডপ্রবাসী ছোট ভাইটি—শ্রীমান মৃণাল গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীমতী অপর্ণাকে

লজ্জা। আর লজ্জা। মুঠো মুঠো আর রাশি রাশি। মিনতি ভরানো কিছু কিছু। তেমনি আছে প্রণতি করানো আরো কিছু। আছে তা রতির মধুরিক করা আরতিতে। আবার আছেও তা আরতিরই আনন্দিত করা রতিতে।

লজ্জার মানে হোল লজ্জাই—যতক্ষণ না বিভাব পালটিয়ে সেই লাজ হোতে পারে—নিলাজ। নিলাজক মধুর। নিলাজিতা সুন্দরী। অস্থির বিজুরির মতো—আলো-আঁধারেরই সঙ্গম! শুধু লাজের সুষমায় মাধুরী ছড়াতে ছড়াতে, আর মাধবীরাগ সিঞ্চন করাতে করাতে— কোন শুচিস্মিতা, যদি লাজবতীর আকারের মধ্যে থাকতে চায়—সলাজে অনিন্দিত, আর সহাসে আনন্দিতা—তা হোলে কী সে প্রণয় থেকে পরিণয়ের আলো নির্ঝরিত আঙ্গিনায় পৌঁছে—প্রিয়র ঘনিষ্ঠতম কবোষ্ণতার দরিয়ায় ডুব-সাঁতার দিতে যেয়ে হবে না—নিলাজে তপ্তালিকা? মিথুনের ধ্যান নিয়ে ভালোবাসারই রূপ মহালেতে দু ধারার তাজা যৌবন দুটিকে কী করাবো না—যুবকত্ব বনাম যুবতীত্বে—এক স্বত্বা? একই ধৃতি? একই কৃতি?—মায় কবিকৃতির মতো খোলাখুলি ঋতুচয়নী এক মহাকাব্য?

তবে হবে। হবে। হবে। তা করাবে। আর তা করাবেই।

শ্রীমতী আভাও নিশ্চয় তাই-ই হবে—রীতির সুন্দর প্রভাসে।—আর শ্রীমতী আভা এইটিও নিশ্চয় প্রীতিতেই করাবে—নানান বর্ণসমারোহে ঝলসে থাকা ঋতুবিপর্য্যয়ের দুনিয়াতে—অস্তিত্বে আর স্বস্তিতে সঙ্গত হোয়ে।

তবু কিন্তু শুধু অসম লজ্জার সুবিস্তারিত লাল রঙে ঝলমলানো আবরণ দিয়ে এক রকমেরই রূপ-প্রসাধনের মধ্যে শ্রীমতী আভার পঁচিশ বসন্তে মাতামাতি করা যৌবনান্বিত প্রতিটি অঙ্গ ঘিরে ঘিরে বারণ করার মতোই—আবরিত রেখেছে। সে মনের রহস্য ঘেরা সাত-পাঁচ অনুভবের বিষয়ই হোক ;—আর তা দেহের সুরীতিকায় আনচান কোরে ওঠা অন্য কিছু আহ্লাদই হোক্ না কেন—সব কিছুকেই ঘেরাটোপের মধ্যে ঢেকে রেখেছে—মুঠো মুঠো হয়ে ছড়িয়ে থাকা লজ্জা। আর লজ্জা!

এমন কি আকারে আর প্রকারে—আভার সবুজাভ যৌবনের টাটকা সুরভিতে ভুরভুর করা যুবতী-স্বভাবখানার প্রতিটি সবুজ ধারার প্রকাশ—না থেকে পারেনি—নিখুঁত এক লজ্জারাশির মধ্যে—স্থির। ধীর। মঞ্জুরিকা। সুস্নিগ্ধা। বিহ্বলা। সিঁদুরেতে লাল।

শ্রীমতী আভা নিজেই হোল একখানা বিরাট লজ্জার মতো! পঁচিশটি বছরের প্রহর থেকে প্রহরান্তর ধরে ধরে প্রগাঢ় হোয়ে উঠেছে তাই—এই যুবতীকার শারীরি যৌবনের দুধে-আলতায় মিল খাওয়া রঙখানার দ্যুতিতে দ্যুতিতে উপছাতে পেরেছে তাই—লজ্জা আর লজ্জা!

লজ্জার গভীরতা সুস্পষ্ট স্বাক্ষরে শুধু সিঁদুর করিয়ে রেখেছে আভাকে—তারই দেহেতে আর মনেতে মিলে-জুলে। সুছন্দিত থাকা নিটোল এক গীতি-কবিতার সুর-লহর ধরে ধরে তা—আভার শ্রাবন্তীর মতো সুন্দরী সন্ধ্যায় রূপান্তরিতা দেহের প্রতিটি বাঁক ঘিরে—লজ্জারাগেরই কোন বীঠোভেনী সিম্‌ফনির সৃষ্টি কোরেছে।

আভাকে দেখলে কিন্তু তার সবুজেতে তাজা যৌবনখানার মধ্যে থেকে বুঝতে পারা যায় অনায়াসে, যে,—লজ্জারও আছে একটি সবিশেষ সৌন্দর্য্য আর অশেষ মাধুর্য্য! এ ছাড়াও আছে আরো একখানা সুষমায়িত রূপ। সেটি হোল রূপঝরার দেশের কোন এক স্নিগ্ধা যুবতীর মধুরিকা রূপখানা! শুধু মধুরিকা!

তাই লাজুকলতার মতো স্নিগ্ধতায় মদির হোয়ে আভা তারই অন্তরতম যুবককে জানিয়েছে—এই, জান রতন, এমন কিছু হিসাবে এই দুটির প্রভাব আমাদের মতো যে কোন মেয়েরই মধ্যে থাকাটা হোল সব চাইতে স্বাভাবিক। কি বল, আর না থাকাটাই ত' হোল আমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক, তাই না?

এই কথারই রেশ ধরে দয়িত রতনের কাছেতে আভার স্বভাবখানা ব্যঞ্জিত হোয়ে ওঠে এই নিরিখেতেই, যে,—বিশেষ কোরে সুন্দরী ও সেই সঙ্গে যৌবনভারে ঢল্ খেলানো যুবতীকার কাছে তারই মানসিকতা থেকে উপছানো—শারীরিক লজ্জার মধ্যে টইটম্বুরে করা এই দু''য়েরই অবস্থানটি হোয়ে ওঠে—ঐ সুনন্দিতারই এক সুন্দরম্ শখ! মধুরিম খুশী!

তবে এটা সুন্দর বলেই ঠিক যে,—রূপস্নিগ্ধ প্রিয়ার যুবতীত্ব ঘেরা যত কিছু বিলোলতা আর হিলোলতায় মিলেজুলে—লজ্জা থাকাটা যেমন ওর নিজেরই তৃপ্তির জন্য একান্ত এক সুসমঞ্জস করা প্রয়োজন,—তেমনি সেটার প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রভাসখানা কিন্তু হোল—তারই প্রিয়তমর ঘনিষ্ঠতম নির্লাজ মধুর সান্নিধ্যের কাছেতে ব্যাঘাতকারী!

রতন তার সুমধুরিক চাহিদার মঞ্জুল করা সাজঘরটিতে—বধু সুস্মিতা এই আভকে লাজ থেকে একটু তফাতে সরে দাঁড়াবার জন্য কোরেছিল—সুজনকের সুন্দরতম মিনতি!— কেন না—প্রিয়র সুছাঁদে সাজানো মধুরিক অধিকারকে প্রিয়ার ওপরে সুবিস্তারিত করাবার মুহূর্তে বুঝেছিল যে,—মধুরা রতি আর আরতির আবেশিত আঙ্গিনায় প্রিয়ার আর্তি না ঝরিয়ে, আভা যদি লজ্জার রেশ নিয়ে থাকতে চায় অনড়—তবে তা দাম্পত্য-বিচিত্রার প্রাঙ্গণ জুড়ে ঘটিয়ে যায়—অতি সূক্ষ্ম এক বিঘ্নকে। বাধাকে। প্রতিরোধকে।—আর তারপর রতন যদি প্রতিরোধ থেকে আভাকে নিবৃত্ত করাতে গিয়ে—ওদেরই যুবকত্বের রীতিমাফিক থাকা

জারিজুরি করে—তবে, তখন বোধ হয়—না ঘটে যাবে না—দু'জনারই মধ্যে—দাম্পত্যিক বিরোধাভাস।

রতন তাই আলো-আঁধারির সম্মিলনে প্রণয়াচার নিয়ে লুকোচুরি করার আগেতেই—আভার কাঁপা কাঁপা হাসির হিলোলতায় ছোপানো রাঙা অধরের মধ্যে দুষ্টুমির রঙ লাগাবার জন্য বলেছিল—"শোন। সবার আগে আমাদের মধ্যে চাই—পারস্পরিক বোঝাবুঝিখানাকে। জান ত', আমরা যে বাঁধনে বাঁধা পরেছি, তা হোচ্ছে পুণ্যশ্লোকের ব্যাপার। মোস্ট হোলি!"

জানিয়েছিল তখনি আভা—"ওগো। নিশ্চয়ই। তবে কী জান? আমায় সময় দিতে হবে তোমাকে। কী, দেবে না?"

তবে বলে এই একটা কিন্তু নিয়ে জড়ানো প্রশ্ন জুড়ে দিয়েছিল অবশ্য আভা—তারই প্রিয়র প্রতি। আর তাইতে পলকের জন্য অজানা অস্বস্তিতে উঠেছিল দুলে রতনের মনের খুশীখানা। প্রিয়াতে আর অপনাতে অন্তরঙ্গতায় সঙ্গত থেকে—সজীব সবুজে ঝলমল্ করা যুবক হোয়েও যদি জানা যায়—দু'জনারই দু'ধারার অজানা রূপ-পরস্পরাকে—তবে? তখন? পথ পেয়েও কী হারিয়ে ফেলবে পথেরই নিশানাকে?

আলতো করা বাঁধন দিয়ে কাছে টেনে নিয়ে রতন বলেছিল—"কেন তুমি তবে বলে বলে, তুলছো এই কিন্তুখানাকে? দ্যুৎ। বাদ দেও, ওগো, আনন্দিতা আমার।"

কিন্তু বলেই যেই প্রিয়র অধিকার বিস্তার করার জন্য—নিজের সুমন থেকে চালিত হয়ে রতন সচেষ্ট হোয়েছিল—আভার কাঁপা কাঁপা লাল হাসির স্নিগ্ধতা নিয়ে ছাপা অধরেতে চুমার বাদুলে রূপখানাকে —ঝড়ের মতো কোরে লুটিয়ে দিয়ে—তৃপ্তিকণার অশেষতাকে লুট করবারই জন্য—ঠিক তখনই বাঁধা এসেছিল—প্রিয়ার ভেতরকার ভয়-কাতর করা ভাবখানা থেকে।

—"না। না। না। ভাল নয়। এ চাহিদা হোল অপবিত্র। ওগো, ভুল বুঝো না আমায়!"—আভা তার কুমারী-হৃদয়ের ভয় জড়ানো আর্তিখানাকে না জানিয়ে থাকতে পারে নি—ঠিক সেই মুহূর্তটির নিলাজ হোতে যাওয়া পরম নিভৃতের ভেতরে ভেতরে—সুন্দরকান্তি এই রতনেরই স্বামীত্বের যুবক-স্বত্বে দুরন্তমুখর থাকা যৌবনায়ন থেকে—প্রিয়ারই মধুর কৌমার্য্যকে আরো মধুর করাবারই—এক একটি সোনা ঝরা সন্ধ্যালি আলোকেতে, আর তারই আঁধারেতে। রতনের শান্ত আর সৌম্য স্বভাবখানাকে ওরই টাটকা পঁচিশের যুবকত্ব—অরোধনীয় তরঙ্গ সমাকুলে দুরন্ত প্রবাহ-ধরা ঈপ্সাকে সম্পূর্ণ করাতে চায়—ন্যায় ও ধর্মের ভেতরেই—আপনারই বিবাহিতা এই আভার "মোস্ট সেক্রেড্ ভার্জিনিটি"র আভ্যন্তরিক—অজানা আর অদেখাকে—জানা ও দেখার শুভক্ষণে—বন্দী করিয়ে। অসম লাজের টান টান করা— ঘোমটাখানার উন্মোচন করিয়ে—স্ত্রী আভারই সবুজ সবুজ সুষমায় যঘন থাকা শরীরী শিল্পখানার—লাল লাল লজ্জা ভরা প্রতিটি স্থান জুড়ে!

কিন্তু ন্যায় মাফিক স্বাধিকার পাওয়া—স্বামী রতনের এই ইচ্ছার কাছে কেন জানি কারণ ছাড়াই—আভা প্রিয়া-স্ত্রীর অধিকারের কথা এক রকম ভুল কোরে—ভুলে থাকার মতোই—ওসব ভাব-তরঙ্গিমায় ফুটিয়ে ফুটিয়ে রাখতে চায়—একখানা অস্বস্তির, আর অনিছার মধ্যে মুঠো মুঠো লজ্জা, আর লজ্জারই ঘনতা নিয়ে জড়ো-সড়ো রূপটিকে। বয়েসের আর যৌবনের দিক থেকে—যদিও আভার দেহের সুন্দরী আকারখানা, আর মনের মাধবীরাগস্নাত প্রকারখানায় ছাপ নিয়ে নিখুঁত এক বরবর্ণিনীর রূপধৃতিতে সাজানো,—তবুও কিন্তু ঐ বসন্ত-মাদক দীর্ঘ পঁচিশটা শীতে-গ্রীষ্মে টইটম্বুর থাকা আভা—আজ তার এই পবিত্র-বিবাহের স্বত্বে ধ্যানস্নাতা ও রূপস্নাতা থেকেও—না হোয়ে পারলো না—ছোট্ট এক শিশুরই মতো অবুঝ। আভা জানতে চেয়েও—দাম্পত্য রূপকলার নিলাজ করানো মহালে মহালে—অপার রহস্যকে ভাঙ্গ-তে ভাঙ্গতে ভালোবাসার মিথুন-পরম্পরা— কেন আর কী ভাবে ওদের দু'জনার মধ্যে সলাজ বিভূষণকে অস্বীকার করাতে পারে—এই তাই নিয়ে তারই শেষটা কোথায়, কখন, কেমন কোরে কবিতার মতো সাজাবে, রাঙাবে আর আহ্লাদিত করাবে—তা আর জানা ও বোঝা হোয়ে ওঠে না—আভার এই অবুঝপনার জন্য। কণামাত্র, বিন্দুমাত্রও না।

তাই প্রিয়া স্ত্রী যখন যৌবনেরই সবুজ ঘরের যুবতী হোয়েও—থাকতে চায় না কবিতার মতো সুছন্দিত প্রণয়াচারেতে বিহ্বলা আর মশগুলা—তখন উপায় আর সুযোগ কোরে দিতে দিতে রতনই হোয়ে ওঠে সচেষ্ট, তারই আভার জন্য। মিথুনের আলো ঝরা ভুবনে প্রিয়া তার পথ পেয়েও,—হারিয়েই যখন ফেলতে চাইছে সেই পথখানাকে—ঠিক তখনই রতন মরিয়া হোয়ে ওঠে—তার একই বয়েসী পরিণীতার—লজ্জার প্রগাঢ়তায় আড়াল রাখা টাটকা যুবতীত্বখানাকে—জড়ো-সড়ো অস্বস্তির থেকে মুক্ত করাবার জন্য।

দুরন্ত হয়ে ওঠা প্রণয়াচার নিয়ে—পঁচিশের যুবক রতন আদর করাতে চায়—আরেক পঁচিশেরই আভাকে—খুশীয়াল করা সুখের তাড়নায়।

তাই প্রিয়ার নুয়ে থাকা লাজ-রাঙা মুখখানার সুষমায়—আদরের দুরন্তপনাতে শিহরিত করাবার সময় রতন বলে সুমধুর করা কথায়—"এই। এই। না। না। তুমি, হ্যাঁ, তুমি সাড়া দেও—আমার অধরে তোমারই অধরের লাল লাল ঐ ঠোঁট ধরে কাঁপিয়ে রাখা মধুরের পরিচিতিখানাকে ঘন ভাবে এঁকে দিয়ে! না, না, আমি তোমার কোন মানা শুনবো না! আপত্তি শুনবো না! বুঝলে মেয়ে?"

কথা না শুনলে পর—প্রিয় খুবই যদি জারিজুরি কোরে অনুরাগ ফোটাবার চেষ্টা করে—তাই অগতি দেখে নিরুত্তাপ ভরা একটি কি দুটি চুমাকে—অনেক যেন আয়েস থেকে করার মতো কোরেই—আভা একরকম প্রতিদান দিয়ে থাকে।—কিন্তু, তার পরমুহূর্তেই নিজের কাজল আঁকা ছবির মতো চোখ দু খানাতে—ছল্‌ছলানো ভাব নিয়ে একবারটি তাকাতো প্রিয়র হাসি উপ্‌ছানো চোখের দিকে—পালক মাত্র। আর তখনি মুক্তার মতো জল ঝরাতে ঝরাতে মৃদুল

কান্নায় দুলে উঠে—মুখ লুকিয়ে নেয় রতনেরই বুকের মধ্যে—তাপ দিয়ে আড়াল রেখে। '

কোন কিছু বলার মতো খুঁজে পায়না রতন—এমন মুহূর্তটিতে। আভাকে প্রাণ দিয়ে, মন দিয়ে ভালোবাসে—তারই এই যুবক সুজনটি! তাই স্ত্রীকে অমনভাবে ব্যতিব্যস্ত হোতে দেখলে পর—রতনও ক্ষণিকের জন্যহোয়ে পড়ে—হতচকিত। বাকরহিত।

রতন নিজেকে ঠিক রেখেই প্রিয়াকে স্বস্তির মধ্যে নিয়ে যেতে যেতে, শুধায় আদুরে গলায়—"এই মেয়ে। এই মিষ্টি। ছিঃ, ছিঃ! আমি কি তোমার কাছে ভালো নই? না কী আমায় লাগে না তোমার মোটেই ভালো? কথা বল লক্ষ্মীটি। একটুতেই তুমি অবুঝের মতো হ'য়ে কোরে ফেল এত ছেলেমানুষী! বলতে পারো কী, কেন এমনটা কর? ছিঃ; তুমি কেঁদে ফেল। এই একটুতেই? এই যে কান্নায় চোখের জল ঝরালে, তা এইটি দিয়ে তো আবার আমায় ভালো লাগে না বলেই, জানান দিতে চাও? এই আভা, মৌনতা ভেঙ্গে কথাটি বল। জান আভা, এভাবে কোরো না দুষ্টুমি! জান, আমাকেও কী এভাবে সরিয়ে দিতে চাও তোমারই কাছ থেকে দূরে? চাও কি, আমিও অন্তরে কষ্ট নিয়ে আমারই প্রিয়াকে না বুঝতে পারারই জন্য, গোপনে আর বিজনে ঝরাবো চোখেরই বাধ না মানা জলধারাটিকে? আমার প্রিয়া কাঁদতে পারে অকারণে ও অনায়াসে! সেই তারই প্রিয়টি কী সেই নিরিখেই কারণ আছে বলেও, পারবে না বুঝি ছেলে হোয়েও—যুবকের পরিচিতিটি ভুলে গিয়ে— কেঁদে ফেলাটা? দ্যুৎ, অমন কর কেন, ওগো আভা, ওগো দুষ্টুটি?"

কথা বলতে বলতে চলার মধ্যে, রতনেরও গলার স্বরখানা হোয়ে ওঠে—ভিজে ভিজে অবস্থার। আভার চোখে, মুখে, গলায়, মাথায় ঘন তমসা ভরা চুলে হাতের পরশ দিয়ে—বুলনো আদর মাখাতে মাখাতে—রতন ঐভাবে প্রিয়াকে নির্ভয়ে আর সলাজেতে পৌঁছিয়ে দেয়।

প্রিয়র গলা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে লজ্জাবতীর আনচান করানো স্বভাব নিয়ে মুখর হোয়ে—কিছু বলার জন্য তাকায় আভা। চোখ ছাপিয়ে, আর কাজল রঙ্খানা ধুয়ে দেওয়া মুক্তার মতো জলকণা—সত্যি তখন অপূর্ব এক মায়ারাগ নিয়ে বিভূষিত করায় আভাকে—মদালসাতে। মদিরেক্ষণেতে।

"এই, মানে এই আর কি।"—বলতে বলতে মধুর ক'রে আভা জানায়,—"না। না। ওগো রতন। ভুল আমি তোমায় বুঝি না কখনো। কেমন জানি এমন মুহূর্তে আমি অবুঝ হোয়ে উঠি। আর কেন জানি, তারই ফলে আমি তোমার আদরের দুরন্ত রূপখানার কাছেতে, নিজেকে পারি না উজাড় কোরে সমর্পণ করাতে। এই রতন, আমি তোমার আদরের মধ্যে ইচ্ছে কোরে কিন্তু অস্বস্তির প্রকাশ দেখাই না। কেন জানি, আমি পারি না তোমারই মনের মতো কোরে নিজেকে তুলে ধরতে! সত্যি বলছি। তবে রতন, তাই পারি না বলে তুমি আর কখনো এ কথাটি আমায়

বলো না, যে, আমি তোমায় ভালো লাগে না বলে, ভালোবাসতে গিয়েও ঠিক ঠিক সাড়া জাগাতে পারি নি বলে, বুঝলে? না। না। রতন, লক্ষ্মীটি। শোন, ও কথা আর শুনিয়ে কষ্ট দিও না আমায়। এই রতন, আমি সত্যি তোমার আদর করার মধ্যে কেমন যেন জড়ো-সড়ো হোয়ে পড়ি যে, সেটা ঠিকই। তবে, হ্যাঁ, তবে রতন তুমি জেনে রাখ, যে, তোমার আভা তোমায় সত্যিই খুব ভালবাসে। তবু, শুধু তোমার আদর করার সময়টায় নিজে থেকে সাড়া দিতে পারি না বলেই ত....."

কথা শেষ না কোরেই দারুণ আবেগের মধ্যে আছড়ে পড়ে আভা ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলল। শুধু আজ নয়,— যেদিন রতন তাকে এমন ধারার ব্যাপারে প্রশ্ন করেছে সেদিনই আভা কোন আশ্রয়ের নির্ভয় করা তাগিদে—রতনেরই বুকেতে লুটিয়ে দিতো নিজেকে— চোখের মধ্যে বাদুলে ধারার বর্ষণ ফুটিয়ে রেখে।

আর সেটিই তখন হোয়ে উঠতো এমন একটি নিলাজ মুহূর্ত—ভালোবাসা জানানোর আর দেওয়ানোর পরিপ্রেক্ষিতে—যখন সত্যি সেই মুহূর্তটির জন্য আভা রতনকে সাড়া জানায়—প্রিয়তমরই আদর পেয়ে পেয়ে—আবার আদর করানোর জন্য।

আভার তখন চোখের কাজল ছেড়ে আষাঢ়ী ঢল্ মুষলধারায় হচ্ছে নির্ঝরিত। কপোলের পরাগ একেবারে গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে আসা জলের রেখায় ধুয়ে-মুছে যাওয়ার মতো হয়। কান্নার সেই অকারণ রীতিকা বড় বেশী মধুর হোয়ে ছবি ফোটায়—আভার কাঁপা কাঁপা ঠোঁটের লাল প্রসাধনের কিনারা ধরে। অভিমান না কোরলেও,—তখন নিখিল প্রিয়াদের যুবতীত্ব সমেত, আভার মুখশ্রীর রুচিরা ভরিয়ে অভিমানখানার ছান্দসী রূপটিই ঝলমলানি ছড়াতে থাকে।—কিন্তু সব চাইতে বড় কথা—এমন সময়েতে রতনও জানে তারই এই মিষ্টি প্রিয়াটি সম্পর্কে এটাই, যে,—এখন আভা তার সব রকম জড়তা কাটিয়ে—শ্রাবন্তীর সন্ধ্যার দ্যুতি নিয়ে, আর বিদিশার মতো রাতের রঙ্ মাখানো প্রগাঢ় অভিমানখানা নিয়েই—স্বামী রতনের সুন্দরকান্তি মুখখানার তৃষ্ণা জড়ানো অধরেতে ঝড়ের মতো হোয়ে, আভা তারই স্ত্রীর প্রণয়কলা ফোটাবার জন্য—অশেষ ভাবে মধুর করা চুমায়ন দিয়ে প্রিয়রই ঠোঁট দুখানাকে— কোরে তোলায়—লালে ছেপে যাওয়া—লাল রঙীন। প্রিয়া তার কান্নার সুন্দর করা আর্টখানা নিয়েই নিজের সমস্ত শরীরী যৌবনখানাকে কাঁপানো অবস্থার ভেতরেই—চুমায় চুমায় সাজিয়ে তোলায় সৌম্যদর্শন রতনকে।—এই শুধুমাত্র এমন ধারারই কোন কোন বিশেষ মুহূর্তে!—একটা কথা রতন বুঝতে পেরেছে, যে, তার আভা চোখের জলে মুষলধারে ভাসতে পারলেই— হোয়ে ওঠে বিবাহের স্বাধিকারে পাওয়া—প্রিয়া নিলাজিতাটির কিছু অংশ।

প্রিয়র অধরে—আপনার লাল প্রসাধনে জ্বলজ্বল করা অধর লুটিয়ে রেখে—ঝড়ের মতো আদর মাখাতে মাখাতে—কান্নার সেই মুষলধারার মধ্যে থেকেই—কাটা কাটা ভাবে জানায় আভা—"না। না। ভুল বুঝোনা গো আমায়। আমি, হ্যাঁ,

আমি তোমায় খুব ভালোবাসি! তবু, তবু, তুমি যখন—"

অবশ্য কথা আর শেষ করে না আভা—এমন সময়টিতে। আভা শুধু অকারণে ঝরানো—প্রিয়াদের ঐ একচেটিয়া অভিমানী কান্নায়—দুলতে দুলতে শুধু আদর কোরে যায়—স্বামী রতনের—সন্দর ও মধুর অধর দুটিকে।

যুবক রতন তখন তার প্রিয়ার লাজে আর লাজে ঘেরাটোপ দেওয়া শরীরেতে উঁকি মারা ভয়-কাতর ভাবখানাকে—নির্ভয়ে পোঁছে দিতে গিয়ে—আদর করিয়ে, আর আদর পেয়ে আভার কানের কাছে মুখটি নিয়ে মৃদুলে জানায়—"এই দুষ্ট। এত ভয় পাও কেন? ছিঃ, অমন আর কোরো না! কথা দাও, এই আভা, যে তুমি আর কখনো আমায় ভয় পেয়ে তোমার কাছে থেকে দূরে সরাতে চাইবে না? কী, কথা দিলে, এই দুষ্টু মেয়ে? আভা, তুমি সময়ে সময়ে হোয়ে পড়, এত অবুঝ আর এত দুষ্টুমতি, যে, তোমার ভেতরের মধুরা যুবতীটি যেন হারিয়ে যায় অন্ধ হোয়ে! কী, তাই কী?"

বলতে বলতে রতন তার স্বামীত্বের সুজনক অধিকার—শুধু সুবিস্তারে ছড়িয়ে দিয়ে বিপর্য্যস্ত করিয়ে তোলাত—আভার ছবি হোয়ে থাকা মুখখানার সর্বত্র। আর এই একটুখানি অন্যত্র হিসাবে—প্রিয়ার গলায়, সুমসৃণ থাকা ঘাড়ে, আর সজ্জায় ঢাকা কাঁধের কিনারে কিনারে। ওদের এই কিছুদিনকার বিবাহিত জীবনের যৌবন খচিত দাম্পত্য-রূপকলার একান্ত হওয়ার, আর নিলাজ নিয়ে ঐ নিলাজিত পবিত্র থাকার বিবর্ধনে—ওরা দু জনায়—এর চাইতে আর বেশী দূর পর্য্যন্ত এগিয়ে যেতে পারে নি।—কারণ দুজনার কেউই—কারণ মাফিক ঠিক ঠিক নিজের নিজের স্বাধিকারকে—একজন আরেকজনার ওপরে বিস্তার করাতে চেয়েও যেন—পথ ফেলেছিল হারিয়ে। আর ফেলতো তা—সত্যিই হারিয়ে।

অবশ্য এমন ভাবে পথ হারাতে দিয়ে দিশেহারা কোরে তোলাতো আভা নিজেই।—প্রথম থেকেই নিজে নিজে পথ হারিয়ে ফেলায়। কাজেই—প্রিয়া যখন হারিয়ে যায় বেপথে—ভ্রান্তিবিলাসখানাকে অকারণে আক্রে ধরে—তখন প্রিয়ও না হোয়ে পারে না—পথ পেয়েও—পথভ্রষ্ট। ঋতুতে ঋতুতে রঙ্-বাহার মিথুনেরই পবিত্র করা মহালে মহালে—আর তাই আজও পায় নি কেউই—প্রবেশাধিকার।

রতন অনুযোগ কোরতে চেয়েও, কোরে তোলে তাকে স্নিগ্ধ এক মিনতিরই আহ্বান।—রতন শুধায় আদর করাবার ফাঁকে ফাঁকে—"এই আভা, কই তুমি কেন নিজেকে তৈরী কোরে নিচ্ছ না আমারই জন্য? এই মিষ্টি, বলি কী জান, তুমিও কি বুঝতে দিচ্ছ না নিজেকে, যে, তোমারও সুখের আর খুশীর কারণ হোয়ে উঠবে—আমারই এই চাওয়া-পাওয়ার ছোট ভুবনটিতে নেমে এসে—যদি জানাতে পারো আমার এই ইচ্ছাখানার প্রতি— তোমারই স্বীকৃতিকে? ওগো আভা, অবুঝ হোয়ো না আর। ট্রাই টু বি কন্‌সিডারেট।"

"এই রতন। শোন। বুঝি সবই। ঠিক ঠিকই বুঝি।" কথা শোনায় আভা রতনের চোখে-মুখে নিজের নরম নরম আঙুল দিয়ে বুলানো পরশ ছোঁয়াতে ছোঁয়াতে।

কিন্তু তখনি নিজের সজল হোয়ে ওঠা চোখের দৃষ্টিতে মুক্তার দানা ফুটিয়ে নিয়ে, জানায় আভা মধুর কোরে—"জান রতন। সব কিছু বুঝলেও, একটা বুঝতে না পারার মতোই ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে, ঠিক ঠিক তোমার চাওয়ারই—রঙীন মুহূর্তগুলোতে।"

নিময় মাফিক ঐ কথা শেষ কোরেই—অঝোরে অভিমান নিয়ে সাজানো কান্নায় দোলায়িতা হোয়ে রতনের কপোলে নিজের মুখের একটি পাশ ছুঁইয়ে ঘষতে ঘষতে জানায়—"আর সত্যি পারি না এভাবে লুকোচুরি খেলা কোরে যেতে। ওগো, তুমিই আমার নিচ্ছো না কেন তোমারই মতোটি ভাবে তৈরী কোরে? পারো না কি, ও ভাবে তৈরী করাতে—আমায়? এই রতন, আর ভাল লাগে না। শুধুই বুঝি তোমার একলারই কষ্ট হয়? আর আমার বুঝি হয় না, না?"

প্রিয়ারা যখন তাদের সুন্দরী দেহের যৌবন নাচিয়ে কান্নার অকারণ দোলা ফুটিয়ে তোলায়—তখন তা নিখুঁত এক গীতি-কবিতারই মতো—সুরেলা ভাবে রিদ্‌মাস্ হোয়ে ওঠে।

রতন আদর করাতে করাতে তাই আভাকে জানায়—"মধুর। ঠিক আছে। তবে কি জান, তুমি সাড়া না দিলে যে, আমার প্রচেষ্টাই পথ হারাবে বারে বারে, আবার সেটা কী মনে আছে?"

রিমঝিম করা অযোধ্যার— সেই সব চাইতে সেরা সন্ধ্যাটির মতো ঝলমলিয়ে উঠে, আভা বলল—"ওগো রতন। আমায় একটু সময় দিও। তা হোলেই হবে। আর কিছুটি চাই না।"

আবেগের সাতরঙ্ ঘেরা আলিঙ্গন দিয়ে প্রিয়াকে নির্ভয় করার জন্য রতন তখন নিবেদন করে—"আমার আভা, শোন। সময় তুমি পাবে। নিশ্চয়, নিশ্চয়। তবে মিনতি থাকছে, হেলায় হারাতে দিও না আর কোন মধুর করা মুহূর্তকে! ঠিক ত? ভুলো না কিন্তু। এই, আভা। এই, দুষ্টু।"

প্রিয় রতনের গলা—দু হাতে জড়িয়ে রেখে আভা বলে ওঠে—"আশ্বাস যখন দিয়েছো, তখন তুমি তোমার আভার ওপরে রেখো কিন্তু আস্থা। কেমন?"

টাটকা সবুজ যুবতী পরিচিতিকে নিয়ে ঝলমলানো আভার পঁচিশটি টানা বসন্তের মাদকতায় বিভোর হয়ে—স্বামী রতনের স্নিগ্ধ স্বভাবে তাজা আরেক ধারারই তাজা যৌবনের পঁচিশটা বসন্ত-বিহ্বল বছরের ভাবনা আকুল করায় আজ—যুবকেরই যুবকত্ব সম্পর্কিত এই পরিণীত করানো—দাম্পত্যিক দৃষ্টি-নিমেষে। রতন তাই আজ কারণ বলেই স্মৃতির রোমন্থনে আপনার প্রিয়া স্ত্রীর প্রতি—সুজনকে থাকা স্বামীর অধিকারখানাকে বিস্তৃতি করাবার নিরিখে—ও দেশের চিন্তাশীল গল্পকার ও প্রাবন্ধিক, আঁদ্রে মারোয়াঁর কথাতে মনে করায়—

"It is banal but fairly apt to compare the impulses of a woman's soul to the movements of ocean. The wise husband never becomes exasperated. Like the mariner in a storm, he slackens

sail, waits, hopes, and the sorrm does not prevent him from loving the sea."

ঠিকই। বক্তব্যখানা খুবই জোরালো। নিটোল মুক্তার মতো খাঁটি। তাই রতন একটা স্বস্তির সন্ধান পেয়ে যায়—কথাশিল্পী মারোয়াঁর সুবচনী প্রমিতি-বোধের ভেতর থেকে। আভা যদি আজ অযথা ভয় পেয়ে আর ভুল কোরে—দূরে দূরে সরেই থাকতে চায়—অতি অন্তরঙ্গে পৌঁছে মিতালি পাতানো মিথুনের শিল্পরূপবিবর্ধনে—নিজের যুবতীত্বকে প্রিয়তমর যুবকত্বের আশ্লেষেতে সঁপে দিয়ে করাবে না—প্রিয়ারই স্ত্রী রূপখানাকে—নিলাজিতা। লাজহরা।— বেশ, ঠিক আছে। তাই থাকুক আভা, যদি ওর এমনটাই পছন্দসই হয়।—রতন ভাবে তাই তারই প্রিয়া সম্পর্কে।

ভাবতে ভাবতে চলে—রতন নিজেকে বোঝায়,—এমন এমন অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হোলে আভাকে তারই এই রতনের ওপর রাখতে হবে—যুবতী স্ত্রীর আস্থাকে। আভা ত' আজ আর কুমারী-কন্যাটি নয়। যদিও—আজ ও আর নয়—হোলি ভার্জিন! তবু ত' এটা ঠিক যে—এই ওরই সেদিনের দেহ-মনের ঐ পবিত্রতা, বা হোলিনেস—বিবাহের পরেও হারিয়ে যাওয়ার নয় বিন্দুমাত্র। কেন না,—এই এক দাম্পত্য জীবনেরই মধ্যে যে আভা ছাড়পত্র পেয়েছে—পুণ্যবতী স্ত্রীতে। হোলি কন্‌সর্ট-এ। পুরোপুরি—কনসিডারেট্‌ বেটার-হাফ্‌—হওয়াতে।

সত্যি, সত্যি। এটাই ঠিক যে,—রতনের ওপরে স্ত্রীর স্বত্বে আভাকে রাখতে হবে—ওরই বিবাহিত যৌবনের আস্থা! কোরতে হবে—প্রিয়র দেহদেউলে মিথুন সাজাবার জন্য আপনারই যুবতীত্বের মহাল ধরে—লাজ হারিয়ে দেওয়ার পর—ঐ সুজনক স্বামীর প্রতি অবিচল রাখা—বিশ্বাসখানাকে।

মাঝে মাঝে রতন শুধায়—"আভা, আমায় বিশ্বাস কর? আমার ওপরে আছে তোমার আস্থা?"

—"হ্যাঁ। হ্যাঁ। নিশ্চয়ই আছে। খুব আছে।"—আভা তাই জানায় অভয়ঙ্করে।

দু'হাতের শক্ত কোরে ধরা মুঠোয় আভার মুখখানা তুলে নিয়ে রতন বলে—"আমার ওপরে তাই যেন থাকে অবিচলে। অভঙ্গুরে। শোন, আমি স্থির থাকবো। আমি ধীর হোয়ে চলবো। আর কোরব না কোন রকম জোর। ওগো আভা, এই সুযোগে তুমি তৈরী কোরে নেও নিজেকে। কেমন, সেটাই ভাল নয়?"

বলে ও অভয় দিয়ে অতি মৃদুলভাবে আভার লাল পরাগে সাজা অধরে—রতন ছোট মতন কয়েকখানা চুম্বন এঁকে দেয়। তাইতে কী আভার যৌবন-তাজা শরীরের খুশী হোয়ে ওঠে না—সুখ পেয়ে ঝলমলানো—আর রিমঝিমানো?

স্বামী রতন তারই স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছিল তাই জানবার জন্য—এক আবেশ মাখানো মুহূর্তে—"আচ্ছা, আভা। একবারটি বল ত' এর ভেতর থেকে কি তুমি সুখ পাও? খুশী হোয়ে ওঠ? লক্ষ্মীটি, মুখ ফুটে বলে জানাও তোমারই রতনকে। জানাও একবারটি শুধু। ওগো, অনিন্দিতা, জানাও।"

ধীরে ধীরে আদুরে গলার সুর ঢেলে দিয়ে আভা জানায় তারই আদরের রতনকে—"এই রতন। বড় দুষ্টুমি কোরছ কিন্তু কথার মারপ্যাঁচে! আচ্ছা, কেন আনন্দ পাব না, বল? খুশী আমার দেহ-মনে ঠিকই নাচানাচি করে। তবু রতন, মুস্কিল হয় কী জান তোমার আদর করাবার রীতি-নীতিগুলো একটু বেশী মাত্রায় ঝরে পড়ার মুহূর্তে, সত্যি আমার শরীর ঘিরে জেগে ওঠে একরকমের অস্বস্তি! আর তাতেই আমি হোয়ে পড়ি জড়ো-সড়ো। আর তারই জন্য তখনি সহ্য কোরতে না পেরে কেঁদে ফেলি অঝোরে। এই আর কি! আর অন্য কিছুটি নয়। ওগো রতন, তুমি আমার মধুর স্বত্বা। সেই মধুরেরই আস্বাদন দিয়ে তুমি আমায় করাতে চাও, আরো সুন্দর! আরো সবুজ! তোমার প্রতি থাকা আমার অটুট বিশ্বাস থেকেই আমি এটা বুঝি। তুমি জানবে, তোমার ওপরেতে থাকা আমার আস্থা কখনো হবে না টুকরো। প্রহরে প্রহরে থাকবে তা অভঙ্গুর।"

কিন্তু কথার শেষে আভা প্রিয়র অপরূপ হাসির ঝলমলানিতে আরো সুন্দর হোয়ে ওঠা মুখরুচিরার প্রতি তাকালো—সজল দু'খানা চোখ নিয়ে।

রতন তাই দেখে বুকের বাঁধন সঘন করাতে করাতে—আভার চোখেতে চুমার কয়েকটা শিহরণকে পরপর এঁকে দিয়ে বলল—"দ্যুৎ, তোমার আবার দুষ্টুমি আরম্ভ হোল দেখছি। ওগো আভা, এ কি তোমার ছেলেমানুষি বল ত'? নিজের সজল চোখ দেখিয়ে তুমি কী আমাকেও কাঁদাও না? ভুলে যাও কেন, যে, তোমার কষ্ট দেখলে পর আমারও পায় কান্না? অনেক হোয়েছে! এই লক্ষ্মীটি, আর কোরো না বেশী কিছু দুষ্টুমি।"

প্রিয়াকে শান্ত করিয়ে, আর নিজেও শান্ত ও সুস্থির হোয়ে ওঠার পর রতন না ভেবে পারে না— যে কোন মধুর আর সুন্দর যৌবনেরই দুই দোসর দু ধার থেকে এগিয়ে এসে অতি কাছের ঘনিষ্ঠতায় পরিণীত হোয়ে—নিজেদের ঠিক তারপরের পরিক্রমারই—দাম্পত্য-রীতিকার সাজঘরেতে আস্থা আর বিশ্বাসের মধ্যে—গ্রহণ করায় দাম্পত্যিক শপথখানাকে। তারই নিরিখেতে রতনের মনে পড়ে—আভার তারই ওপরে করা ও রাখা অটুটু ভাবের আস্থা থেকে, আর বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে—এটাই যে—"Confidence is such a precious thing that, physical desire, it lends charm to the most insignificant acts. In their young days a man and a woman sought moments of solitude that they might embrace ; now they seek them in order to confide in one another" (Andre Maurois)

রতন তাই মন দিয়ে আর দেহ দিয়েই এমনটাই বোঝে যে,—যার থেকে আভা স্ত্রীর সেই লাজ হারানোর ঋতু-বিপর্য্যয়কারী মধুবাতার কাঁপা কাঁপা মিথুন-বাসরে—শেষ পর্য্যন্ত কোন এক মঞ্জুলিত মুহূর্তে—ঠিক ঠিকই স্বামীর দেহ-সায়রেতে সুখের খুশীয়াল রাখা রিদ্‌মাস্ লহরে লহরে নিজেকে করাবে—বধূ নিলাজিতা। হবে সুরভিতে ভুর ভুর করা যুবতীত্ব নিয়ে—সঘন হওয়া শুধু

সবুজেতে—বধূ তপ্তালিকা। ঠিকই হবে আস্থায়, আর সুনিবিড় বিশ্বাসের মানদণ্ডে—বধূ রভসিতা। মায় বধূ আনন্দিতা থেকে বধূ অনিন্দিতা পর্য্যন্ত।—শুধু দয়িত সুজনক রতেনরই বিজন প্রহরগুলোকে—দুটি প্রাণেতে এক হোয়ে লাজাঞ্জলি দিয়ে—প্রমত্ত আর পুণ্য করাবার জন্য।

এমনটি ঠিক হবে আভার তরফ থেকে—অচিরে, ধীরে ধীরে।—রতন আজ তাই বুঝেছে। আর প্রিয়াকেও তাই এটা নিজে থেকে বুঝিয়েছে। আর জানিয়েছে শেষাশেষি। জানার পর আভাও তাই বুঝেছে। তাই প্রিয় সুজন যখন হোয়ে উঠেছে বোঝদার,—তখন প্রিয়া কি আর থাকতে পারে অবুঝ?

তবু সুছন্দিত রাখা প্রণয়াচারে সাঁতার কাটার কোন কোন মুহূর্তে—রতন ধীরে-সুস্থিরেতে এক সুন্দরমন যুবকের অনুযোগখানা জানায় প্রিয়াকে—"এই আভা, বলতে পার, কবে থামবে তোমার এই দুষ্টুমি কোরে বিহ্বলা হাওয়ার ব্যাপারগুলো? না, না, শোন লক্ষ্মীটি, ডোণ্ট বি ফ্রিজিড! ওগো, আভা, তুমি আমায় জানাও কেন তোমার আজকের পরিচিতিতে এই আমারই সাথে বিবাহিতা হোয়েও— থেকে গেছে তোমার যৌবনাকুতি এত বেশী ঠাণ্ডা স্বভাবের— কেন? ওগো দুষ্টু, তুমি কি কোরতে জান না,—হাউ টু ওভারকাম দিস্ শর্ট অফ্ ফ্রিজিডিটি? না, না এত শীতল হোয়ে থেকে তোমারই রতনের মনে—শুধু তোমারই শুভর জন্য—এক অজানা ভয় ধরিয়ে দিয়ে কাঁদিয়ো না আর।"

অনুযোগ জানাতে জানাতে প্রিয়ার মুখে-চোখে ঝড়ের মতো হোয়ে ওঠা আঙুল দিয়ে বুলানো পরশ থেকে আদর কোরে—আভাকে মনের দিক থেকে করাতে চাইল—ব্যতিব্যস্ত।

সেই অনুযোগে সাড়া দিতে গিয়ে আভা প্রিয়র সুখের নির্ভয়তা ভরা আশ্রয়ে নিজেকে সঁপে দিয়ে—ওরই কাঁদের একদিকে মুখ লুকোতে চাইল। পরমুহূর্তে রতন অনুভবের অভিষেক পেল—ঐ কাঁধের ওপর ওপর, পোশাকের ভেতর দিয়েই।—আভা তার অধর দিয়ে তখন সজোরে চেপে রেখে আদর করার চেষ্টা কোরছে। আর ঐ ভাবে রতনের জামার ঐ অংশটা ভিজিয়ে দিচ্ছে। শুধু সিক্ত হোচ্ছে অধরের ছোঁয়াতেই নয়। উপরন্তু প্রিয়া যে তারই রীতি মাফিক চোখের অঝোর ধারায় হোয়েছে—প্রবাহিতা।—তারই উষ্ণতা ফোঁটা ফোঁটা হোয়ে রতনের ঘাড়ে, গলায়, জামার পেছনে, ঢিলে কলারের ফাঁক দিয়ে পিঠ পর্য্যন্ত ছুয়ে গেছে। ওরই ক্রন্দসী অবস্থায় প্রিয়া জানালো কাটা কাটা ভাবে—"ক্ষমা কর আমায়। আমি পারি না বলে। ওগো রতন, আমি আর বাধা দেবো না, কথা দিচ্ছি। তুমিই আমায়—তোমারই মতোটি কোরে তৈরী করিয়ে নেও। লক্ষ্মীটি, তাই নেও। দেরি কোরো না।"

প্রিয়ার এই ভয় জড়ানো—আর কান্নায় এলোমেলো অবস্থার সুভাষণ শুনতে শুনেত—রতন অসম ভাবে স্নিগ্ধতা ভরানো আদরে আদরে আভাকে কোরে তোলাতে চাইল—বধূ হ্লাদিতা। বধূ রভসিতা।

সহাস আনন্দে উছ্‌লে উঠে রতন বলল—"দ্যুৎ। ভারী পাগলামি কোরছো কিন্তু, এই আভা। তুমি কথা দাও আমাকেও, যে, আর কাঁদ্‌বে না এমন ভাবেতে—অসময়ে আর অকারণে?"

—"আচ্ছা। আচ্ছা। কথা দিলাম। তবে জান নিশ্চয় এটি, যে, যুবতী প্রিয়ারা যখন তাদের প্রিয়তমের কাছ থেকে অশেষ সুখের আর তৃপ্তির মধ্যে হোয়ে পড়ে অন্তর্লিনা, তখন কিন্তু তারা তারই আনন্দধারায় সুখী হওয়ার পরিচিতিখানা জানাবার জন্য, ঐ তোমার ধারণার মতো অকারণে হোলেও—জানবে রতন, সুখের দেশের এক মস্ত বড় কারণ হিসাবেই—আমরা কেঁদে ফেলি। আর এই কান্নার মধ্যেই পেয়ে যাই আরেক রকমেরই মস্ত এক—আনন্দ লহর। এই তাই হোল আমাদের বেলায় ঠিক, তুমি জানবে রতন।"

প্রিয়ার জলে থৈ থৈ করা চোখেতে নিজের অধর ছুঁইয়ে আদর করার পর বলল রতন—"ওগো, তুমি এখন যা বলবে, তাই আমার কাছে সুন্দর না হোয়ে যায় না। তুমি যেমন মধুর, তেমনি সুন্দর হোচ্ছে তোমার উক্তি। শোন আভা, আমি তোমায় কথা দিচ্ছি। তোমায় আমিই নেবো নিজেরই মতো তৈরী কোরে। কেমন?"

তারই সায় আভার সুন্দর আর সলাজ ঘেরা ছবির মতো মুখখানাতে ঝল্‌মলাতে দেখে—রতন খুব খুশীয়াল করা এক ভাবনার স্রোতে তখন গা ভাসায়। এবারেও আগেরই মতো রতনের স্মৃতিতে আলোড়ন তুলে ভেসে এলো—কথাশিল্পী মারোয়াঁর সূক্তি—যাতে লেখা আছে—

"A woman does not altogether understand a man's need for action. His proper functions are active : building, engineering, hunting, fighting. In the first weeks of marriage he thinks, because he is in love, that love will replace everything. He refuses to admit that he is bored and complains of having married an invalid who is obliged to rest continually and who doesn't know what she wants. The woman is ill at ease with her new companion who nervously paces the hotel bedroom—the classic behaviour of a couple on their honeymoon. In the majority of cases this sort of situation is unimportant and can be handled easily with a little afection and a sense of humour. The will to preserve the marriage must be constantly active and the vow ceaselessly removed."

রতন তাই ভাবে মধুরের কথাতেই, যে,—আভা ঠিক ঠিকই পারবে অচিরেই কোন একটি দিনেতে—তারই প্রিয় যুবকের দেহ-মনে সুছন্দিত থাকা স্বামীত্বেরই স্বাধিকার থেকে—সৃষ্ট আকাঙক্ষাখানার সুখ প্রদায়িনী সায়রেতে—আপনার যুবতীত্ব নিয়ে ঘেরা স্ত্রীর অধিকার সমেত লাজাঞ্জলির ভেতরে ভেতরে—ভাসিয়ে

দেওয়াতে। সেই সঙ্গে হাজার ধারার সুখ দেওয়া-নেওয়ারই ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারবে—রতনকেও। কেন না আজই যে মিনতি ভরিয়ে তাকে আভা জানিয়েছে—"ও নিজে থেকে কেন তৈরী করিয়ে নিচ্ছে না—নিজেরই এই যুবতী পরিণীতাকে?"

মধুরিকার মতো আভা তাই সেদিন রতনকে যুবতী রীতিকায় সাজাতে প্রয়াসী হোয়ে এটাও জানিয়েছিল, যে,—"আমায় একটু সময় দেও তৈরী হওয়ারই জন্য! আর তারই ভেতরে ভেতরে আমাকে যেন তৈরী করাতে সহযোগিতা দেয়—আমারই আদরের রতন!"

এ সব কথায় বস্তুত মিনতির রূপ-পরম্পরা ভাবতে ভাবতে আর বুঝতে বুঝতে—এবং সেই সঙ্গে আভার যুবতী স্বভাবখানাকে অকারণ ভাবে ধরে থাকা জড়িমাগুলোর থেকে মুকত করাতে করাতে—ক্লান্তি এলেও, ক্লান্ত হোতে দেয় না নিজেকে—রতনের সুজনক স্বামী রূপ। প্রিয়র স্বাধিকারে পূর্ণমিদম্ মন্ত্রেচ্চারণাটি না করা পর্য্যন্ত—অজন্তার ছান্দসী রূপ-তরঙ্গিমাগুলোকে প্রখর রাখা দেহী যুবতীকায় সাজিয়ে—ঘুম ঘুম ভাব নিয়ে অনড় থাকার মধ্যে যতক্ষণ না এই মধুরিকাকে দেহী-সায়রের মিথুনাভিসারে আশ্লেষে লাজ হারিয়ে সঙ্গত করাতে পারছে—ঠিক ততক্ষণ রতন থাকবে—অনলস। অনিদ্র। অক্লান্ত।

তবু, হ্যাঁ, তবু তারই মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে না পড়ে পারে না—যুবক স্বামীটি!—রূপকথার সেই অভঙ্গুর ঘুমের দেশেতে বহুকাল ধরে বিছানার কোন একটি ধারাতে—রতন শেষ পর্য্যন্ত ঘুমিয়ে পড়তো। আর তারই একটি ধারেতে তখন আভা ঘুমাচ্ছে—গভীর এক নির্ভয়তার মধ্যে। একই বয়েসের যৌবন দিয়ে সাজানো—পঁচিশেরই দু'টি ছেলে-মেয়ে—ছটা মাত্র ব্যবধানে ঘুমিয়ে থেকে যেন সৃষ্টি ক'রে তোলে—কয়েক শত ক্রোশের ব্যবধান। দূর সুদূরের মতো।—রতন ঘুমায়—অভিমানী যুবকত্বর পথ হারিয়ে ফেলায়! আর মিষ্টি আভা ঘুমায়—পথ খুঁজে না পাওয়ায়। হয় ত বা পেছন ফিরে শোয়ার পর—কখন এক সময় শোয় দু'জনেই—মুখোমুখি হোয়ে। অবশ্য ব্যবধানটি ঠিকই দূরত্ব বজায় রাখে। একজনের মাথা হয় ত থাকে বালিশের 'পরে। আরেকজনার হয় ত গড়িয়ে যায় বালিশ থেকে। আর সেই একজনাই দুরন্ত ঝড়ের দোলায় পড়ে—বালিশের সুখটুকু পর্য্যন্ত হারায়— সে হোল রতন নিজে। আর ও-দিকে—আভা পরম এক নির্ভয়তার মধ্যে স্বস্তি নিয়ে ঘুমায়। যদিও প্রিয়ার সবুজ দেহের যৌবন-ঘনতাকে লুকিয়ে রাখার—সাজ-পোশাক সবাই অবিন্যস্ত হোয়ে থাকে। পাট পাট করা, আর ছিমছাম মতন পরিপাটি থেকে ঝরে—এলো হওয়া রূপ। এলোমেলো হোয়ে পড়েও ফুটিয়ে তোলে ছন্দময়তাকে। বিদিশার ঘন অন্ধকার নিয়ে জড়ানো আভার মাথার রাশি রাশি চুল—অজন্তা ছাঁদে বাঁধা খোঁপার বাঁধন ছেড়ে—বালিশের চারধারে ছড়িয়ে যায়। জড়িয়ে পড়ে। চোখের কাজল আর ঠোঁটের রঞ্জনী, আর সিঁথি ও কপালের সিঁদুর—একাকার হোয়ে ছাপিয়ে যায় তারই মুখরুচিরার

সর্বত্র।—স্বামী রতনেরই রাতের নিঝুমতাকে সরব করানোর মতো—অধরেরই দুরন্ত ঝড়ে ভেসে যাওয়ায়। সন্ধ্যায় প্রসাধন করার— সেই ইস্তিরি ভাঙ্গা শাড়ীটির আঁচল—তখন আভার পিঠ ছাড়িয়ে বুকের অনিন্দ্যতায় ঝল্‌মলানো দুই উপত্যকার গড়ান থেকে—গড়িয়ে যেয়ে—লুটিয়ে থাকে মেঝের আশ্রয়ে—প্রায়ই। আর সেখানকার যৌবন-ঘন আপীন শরমতাকে ঢেকে রাখা রেশমের ব্লাউজ অবশ্য—আবরণ হোয়েই থাকে। তবে একটু ব্যতিক্রম নেয়। প্রিয় যুবকের দুষ্টুমিপনার কাছেতে বিপর্য্যস্ত হোতে হোতে—আপনার বুকের ঐ অঙ্গরাখার বোতাম কখন যে খুলে যায়—ত্বক্-যৌবনায়নী পেশলতাকে আবীরে-সিঁদুরে নিলাজ করারই জন্য ঘেরাটোপ ছাড়িয়ে—তার খেয়াল থাকে না আভারও। থাকে না তা রতনেরও। কেন না—রতন সময়ের পারাবারে বসে থেকে থেকে—প্রহর থেকে প্রহরান্তর গুনে গুনে চলেছে—"কবে হবে, প্রিয়া আভারই সুবিনীত করা সাড়া থেকে সেই প্রহরগুলো—প্রমত্তয়ী ঝড়! মিথুনিক তুফান! যৌবনিক দেহাভিসার!"

"হবে। হবে। তা হবে!"—মনে মনে বলে নিয়ে প্রিয়ার অধরেতে—রতন ঘুমিয়ে পড়ার আগেতে দীর্ঘকরা বিলম্বিত লয়ের চুমাখানা আঁকতে আঁকতে চলে।—আর প্রিয়াকেও ঘুম পাড়াতে পাড়াতে নিজেও পড়ে শেষ অবধি ঘুমিয়ে। এর বেশী আর অন্য কিছুটি আপাতত চায় না—এই যুবক স্বামীটি।— কেন না—প্রিয়াই ত' তার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছে—কিছু সময়।—প্রিয়রই চাওয়ার মতোটি কোরে নিজেকে তোয়ের করাবার জন্য। সাজাবার জন্য। নারী ও নদীর সাথে মিল থাকায়—পদ্মার মতো আপনাকে ঠিক ঠিক প্রমত্তা করাবার জন্য! রতন তাই তারই শুচিস্মিতার প্রতি রেখেছে এই সুন্দর আস্থা।—রতন সেদিন পড়ার টেবিলে একখানা বই দেখেছিল। সেখানা পড়ছিল তারই স্ত্রী আভা। পাতা ওল্‌টাতে ওল্‌টাতে রতন দেখল যে, একটি পাতার এক জায়গায় কয়েকটি লাইন ধরে—আভা নিজের হাতেই লাল পেন্সিল দিয়ে দাগিয়ে রেখেছে। আর লিখে রেখেছে—বিউটিফুল য়্যাণ্ড ইন্টেলিজেবল্। রতনের তাই মনে পড়ে—আপন প্রিয়ার দাগ দেওয়া, আর বক্তব্য লিখে রাখা ঐ লাইগুলোতে ডাঃ ডিকিন্‌সন্ যথার্থ লিখেছেন, যে,—"A woman should be assured that there is nothng in the fullest sweep of passion that is incompatible with her highest ideals of spiritual love, and that all mutual intimacy of behaviour is right between husband and wife."

এটা ঠিকই হোল। আভা তা হোলে এ ব্যাপারে পেয়েছে—দাম্পত্যিক ঋতুচয়নী মিথুনাবাসরেরই সম্পর্কে—আলোকসম্পাত। পথের নিশানা।

এর কয়েকটি দিন পরেই—সারা দিনের পর রাত নিয়ে প্রতিদিনকার মতো—ধৈর্য্যের সায়রে অপেক্ষায় থেকে থেকে—প্রিয়াকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে—রতন নিজেই পড়েছিল—গভীরেতে ঘুমিয়ে। সেদিন তার যুবকত্ব এত ক্লান্ত আর শ্রান্ত হোয়ে উঠেছিল, যে,—তাড়াতাড়ি না ঘুমিয়ে পারে নি—স্বামী রতন। অন্য দিন

নিজে ঘুমিয়ে পড়ার আগের মুহূর্তটিতে দেখে নিত—প্রিয়া ঘুমালো কি না তাই। আজ কিন্তু ভুলে গেছলো—-তা দেখে নিয়ে—তারপর নিজে ঘুমের মধ্যে পাড়ি জমাতো! ভুল,—সত্যি রতন আজ ভুলই কোরে বসলো—নিজে ঘুমিয়ে পড়ে।— আর ওদিকে প্রিয়াকে জাগিয়ে রাখায়!

অবশ্য প্রিয়া তার বুকের খাছটিতেই শুয়েছিল—ঘুম ঘুম ভাবটুকুন জড়ানো চোখ দু'খানাকে বুঁজিয়ে রেখে।— কেন জানি, আজ আভার মনের অনুসন্ধানী দৃষ্টি—ঘরের আঁধারের মধ্যেও খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছিল—কোন এক আকস্মিকতাকে। আর তারই সবুজ দেহের মধ্যে মুঠো মুঠো করা, আর রাশি রাশি থাকা লজ্জার টইটম্বুর করা রূপধৃতি—আজ আভাকে কেন জানি মোটেই—স্থির হোতে দিচ্ছে না। কোরে তুলেছে বড় বেশী অস্থিরা। চঞ্চলা। রূপবিহ্বলা। দেহে-মনে নেই যেন কোন—স্বস্তি! নেই যেন কোন—স্থিতি!—সত্যি, এ কেমনতর এক অস্বস্তি!—তাই ভাবতে ভাবতে চোখ খুলে ঘরের চার ধারের স্তূপীকৃত ঘন অন্ধকারের দিকে তাকালো—যুবতী আভা—পঁচিশেরই টাটকা প্রাণোচ্ছলতায় ধাঁধিয়ে থাকা দৃষ্টি মেলে।

এ যে শুধু আঁধার। আর আঁধার। মুঠো মুঠো করা। রাশি রাশি থাকা। চোখের দৃষ্টি বেশীদূর পর্য্যন্ত যায় না। আর যেতেও পারলো না তাই—আভারও। দৃষ্টি দূরে যেতে পথ না পাওয়ায়—আপনারই কাছের পাশটিতে ঘুমিয়ে থাকা প্রিয়তমকে দেখতে চাইল। দেখলো আভা—রতনের স্বস্তিতে ঘুমিয়ে থাকার মতো—অনড় আর নিশ্চল অবস্থাখানাকে। অবশ্য অন্ধকার ঘন থাকায়—এর বেশী আর কিছুটি চোখের দৃষ্টিতে ধরা পড়লো না আভার।

আঁধারেতে আঁধারেরই মতো—স্তূপ স্তূপ অন্ধকার হোয়ে ঘুমিয়ে থাকা রতনকে—আকারে প্রকারে যে ভাবে শুয়ে থাকতে দেখলো—তাতে আভার দেহ-মনের অস্তস্তি আরো ঘন হোয়ে উঠলো। চোখের অনুসন্ধানী দৃষ্টি হোয়ে উঠলো সজল। আর সমস্ত মন জুড়ে একটি মেয়েলি রীতি ফুটিয়ে তুলল।—মিষ্টি যুবতীরই মূলধনরূপী—অভিমান—রাগে আর অনুরাগেতে। কেন জানি—কান্নার দোলা ফুটতে চাইল আভার মধ্যে।

নিজেকে সামলে নিয়ে বিছানায় উঠে বসলো আভা। অন্ধকারের মধ্যেই রতনের বুকেতে হাত ছোঁয়ালো। ছুঁয়ে ধরে বুঝতে পারলো—খুব স্বস্তিরই এক নিভৃতে—শান্ত হোয়ে ঘুমাচ্ছে তার এই প্রিয়। বুক থেকে হাত তুলে নিয়ে—রতনের মুখেচোখে হাত বুলাতে গিয়েই—পরম এক বিসমেয়ের ঘোরেতে চমকিতা হোল আভা। এ কি! প্রিয়র মুখের একটি ধারের সমস্ত কপোল, আর গলার নীচ ধরে বালিশের ওয়াড় পর্য্যন্ত—উষ্ণতা ভরা জলেতে ভেজা ভেজা কেন? সঙ্গে সঙ্গে রতনের পাতা বোঁজা চোখের ওপর আঙুলের ছোঁয়া রাখতেই বুঝতে আর বাকি থাকলো না আভার, যে,—আদরের রতন কাঁদছে!

—"এ কি! রতন ঘুমিয়ে পড়ে কাঁদছে কেন? এমন ত' দেখিনি আগে! হ্যাঁ,

তা হোলে কি, আমিই ওকে তুললাম কাঁদিয়ে? আমার রতন যে আমারই কাছে বলছিল সেদিন—আমারই চোখের জল না কি ওকেও কাঁদায়। সত্যি, তাই সত্যি হোল শেষে!"

অশেষ আবেগের ঢেউ ওঠা-নামা কোরতে থাকায়—আভার যেন বাক্‌রোধ হোল। ইচ্ছা হোল একবার চারধারের ঐ স্তূপীকৃত অন্ধকারকে খান খান কোরে ভেঙ্গে দিয়ে চিৎকার করার মধ্যে—ঠিক এই মুহূর্তটিতে আদরের রতনকে জানিয়ে দেওয়াতে যে—"ওগো মধুর। ওগো রতন। আজ কি না তুমি আমারই কাছ থেকে ন্যায়তঃ না পাওয়ার অপ্রাপ্তি, আর তারই অতৃপ্তিকে সহ্য কোরতে না পারারই দরুণ— চোখের জল ঝরালে? কিন্তু আমার আদরের রতন, তুমি এই আজই একবারটি কী খোঁজ নিতে পারলে না,— কেন আমি না ঘুমিয়ে জেগে জেগে শুয়ে ছিলাম তোমারই পাশটিতে? একটু খোঁজ নিলে পর দেখতে পেতে—আজ, হ্যাঁ, এই আজই সন্ধ্যার পর থেকে আমি এই প্রথম—সত্যি সত্যি নিজেকে নিয়ে তোমারই চাওয়ার আর পাওয়ার নিরিখেতেই তৈরী হোয়ে উঠতে পেরেছি। সত্যি সত্যি! কিন্তু মধুর, আমি যখন সত্যিই আজ হোয়ে উঠলাম প্রস্তুত—ঠিক তখনি কিনা তুমি অন্য দিনের চাইতে সত্যি তাড়াতাড়ি আঁধারের জগতে আলোকে নির্বাসনে পাঠিয়ে—অতি অনির্লিপ্ততার প্রকাশ দেখিয়েই কিনা ঘুমিয়ে পড়লে? আমি যখন হোলাম প্রস্তুত,—ঠিক তুমি তখন নিজেকে আমার চোখের কাছটিতে তুলে ধরালে—অপ্রস্তুতের মতো?"

অবশ্য আভা চিৎকার কোরে কিছুটি জানাতে পারলো না—তারই আদরের যুবককে। আবেগের ভেতরে তীব্রতা থাকায় তার গলার স্বর তখন উঠেছিল কেঁপে কেঁপে। কিছুটি মুখ ফুটে অভিযোগের মতো কোরে জানাতে না পারলেও—যুবতী বরবনিকা তারই সুন্দরম্ রীতিকার সেই অভিমানী বিহ্বলতায় আনচানানো—মুষলধারে নির্ঝরিত চোখের জলে ভাসতে ভাসতে—কান্নার মৃদুল সরবে ফুঁপিয়ে ওঠা মধ্যে—স্তূপ স্তূপ অন্ধকারের কঠোর নীরবতাকে অস্থির করালো। ওরই ছড়িয়ে থাকা কালো পর্দার রঙ্‌খানাকে কাঁপালো।

সুস্মিতা রূপেতে ঘেরা চোখে-মুখে কান্নার গমক ধরেই আভা মনে মনে বলল—"অমি এতদিন কেঁদেছি তার কারণ নিজের ইচ্ছা থাকা সত্বেও, আমারই রতনের চাওয়ার রঙীন ভুবনকে আরো রঙীন করিয়ে সাজাতে আর গোছাতে পারছিলাম না বলেই ত'! কিন্তু এটা কেমন হোল! রতন এ ব্যাপারে পারঙ্গম হোয়েও—কেন কাঁদলো আজ! ও ত' তা পারে, আর পারবে বলেই আমার কাছ থেকে চাইত। আর আমি তা দিতে, বা করাতে পারবো না বলেই ত' চাইনি এতদিন পর্য্যন্ত। কী আশ্চর্য্য, আজই যখন পারবো বলে ওরই কাছে চাইতে যাবো বলে ঠিক কোরলাম,—ঠিক তখনি কি না ঘুমিয়ে পড়ে রতন কোরে বসলো—এমন ছেলেমানুষি— চোখের জলে ভাসতে ভাসতে!"

রতনের এভাবে চোখের জল নিয়ে ভেসে যাওয়াকে ছেলেমানুষি বলে মনে

হোলেও—আভা আজ এই যুবক সুজনের কান্নাকে—আর ভাবতে পারলো না—কোন রকম অকারণের চোখের জল। প্রিয়ার সবুজে-লালে ঝলমলানো দেহের সঙ্গে—অজানাকে জানার আর অচেনাকে চেনারই— যৌবনান্বিত তাগিদ থেকে পরিচালিত হোয়েও—যখন প্রিয়া তারই প্রিয়র সাহচর্য্যে আপন যুবতীকার বাঁকে বাঁকে ধরে রাখা— সেই মুঠো মুঠো আর রাশি রাশি লজ্জাকে—নিলাজেতে হারিয়ে দিতে পারলো না। আর তাই করাতে পারলো না তার আদরেরই রতনকে—যুবকেরই দেহী-যৌবনায়নী প্রভাসে—সুতৃপ্ত তপ্তালিক!—তাই তারই বহুদিনকার—অপ্রাপ্তি আর অতৃপ্তি শেষ পর্য্যন্ত—রতনকে কাঁদিয়ে না তুলে পারলো না। এটা যে সত্যি কারণ জড়ানো—তা স্ত্রীর অধিকারেব রত্নত্ব নিয়ে এই আজই বিভূষিতা হোতে চাওয়া বধূ আভা—বুঝতে পারলো ঠিকই।

আর তাই আভা সুনন্দিতার মতো নিজেকে এই মুহূর্তে সব স্বত্বারই স্বস্তি সমেত সঁপে দিতে চাইল—আদরের রতনেরই তাপ ভরা যৌবন-সজীবতার—মিথুনাভিলাষী আঙ্গিনায়। কোরলো না আর তাই কোন অনুযোগ। জানালো না তাই অতি সরব করানো— কোন আহ্বান। দেহ তার তখন কাঁপছে। মন দুলছে। অবিরাম ধারায় তখন ঝরছে চোখের জল।—বাদুলে হাওয়ায় ঝাপ্‌টা খাওয়ার মতোই জাগছে অল্প অল্প কান্নার ঢল্‌ ধরে ধরে—ফুঁপিয়ে ওঠার শব্দ। আভা অনুভব কোরল—তার অসম রূপঝরার মতো আপন বুকেতে— বোতাম খোলা থাকায় জামার আঁট বাঁধন ছাড়িয়ে—তার আঁট-সাঁট মাপেতে তৈরী কাটিংয়ের টান টান করা অবস্থার অস্বীকৃতির মধ্যে—নিলাজক হোয়ে উঠেছে পেশলে নিটোলে ছবির রূপেতে বিভূষিত—দুই উপত্যকা। অবিরল ধারার চোখের জল—আভার কপোল দিয়ে ভাসতে ভাসতে গলা পর্য্যন্ত নেমে এসে—তারই সুন্দরী বুকখানার মাধুর্য্য পর্য্যন্ত তুলেছিল—ভিজিয়ে ভিজিয়ে। চোখের উষ্ণ জলধারায় ভিজতে ভিজতে—মঞ্জুলা আভার মধুর দেহের ষেহ্ জড়তা ধরে রাখা— সেই শুধু মুঠো মুঠো আর রাশি রাশি লজ্জাকে—ধুয়ে-মুছে মুহূর্তেই যেন—করালো জড়তাশূন্য। ভয়শূন্য। অহেতুকী লাজশূন্য।

আর কিছুটি আভা ভাবতে চায় না—আজ ঠিক এই মুহূর্তটিতে। ও আজ হোয়েছে ঠিক তৈরী। হোয়েছে সক্রিয়া। আর হোয়েছেও সে রকমটি—তারই আদরেরই রতনের জন্য। ওরই মধুর যুবকেরই —তপ্তালিকতায় সাজানো দেহী যৌবনেরই জন্য।

আর তাই—আদরের রতনেরই—একই বয়েসী প্রিয়া-বধূটির স্বত্ব নিয়ে আর যত্ন নিয়ে—আজকের এই স্তূপ স্তূপ করা আঁধারের মধ্যেই—আভা তার ছবির মতো দেহের প্রতিটি বাঁকে ঝল্‌মলিয়ে—ফুটিয়ে তুলেছে—মিথুনকেই জানতে চাওয়ার, মিথুনকেই বুঝতে চাওয়ার—রূপসাজ। তারই রূপাভাটি।

—তাই রূপবতী আভা—তার মাথার বিদিশার অন্ধকারের মতো রঙীন আর ঘন কেশদামের খোঁপা-ভাঙ্গা এলো অবস্থাকে—হাত দিয়ে চারধার থেকে জড়ানো

কেশ জড়ো কোরে নিয়ে—সুষমায়িত বুকের ওপরের ডান দিক দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছে। তারই আজানুলম্বিত প্রায় থাকায়—কাঁধের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে বুকের ওপর দিয়ে ঝোলানোর পর—তা আর কোমরের নীবিবন্ধ ছাড়িয়ে বিছানা পর্য্যন্ত ছুঁয়ে গেছে।—তাই মাথার এলো করা চুল সামনে ঝুলিয়ে দিয়ে—মুষলধারে প্রবাহিত চোখের জলে ভাসতে থাকায়—এমন ভাবের কান্না প্রসঙ্গে আভার নিজেরই মনে হোল—মহাকবি কালিদাসের কথা।—অভিমানিনী যুবতী প্রিয়ারা না কি—মাথার খোঁপা বাঁধা চুল এলো কোরে—তবে বাদুলে বর্ষার মতো ঢল্ নামিয়ে—কাঁদতে হয়।

কান্নার মধ্যে আভা অস্ফুট স্বরে বলল—"দ্যুৎ। আমার রতন, এই মধুর। ছিঃ, তুমি কাঁদলে আজ। এই দেখ না, আমি যে তোমায় কথা দিয়েছিলাম সময় মতো নিজেকে তৈরী করিয়ে নেবো,—তাই আজ করিয়েছি নিজেকে প্রস্তুত। এই শোন। এই দেখ।'

বলতে বলতে অভিমানী আভা—তার মাথার চুলে, দেহের ব্লাউজে আর শাড়ীতে এলোমেলো হওয়া এক বিপর্য্যস্ত রূপ নিয়েই—দারুণ এক ঝড়ের মতো হোয়ে আছড়ে পড়লো—ঘুমিয়ে থাকা আদরের রতনেরই বুকেতে।—আপনারই মতো—এক মধুর করা রীতিরই কান্নায় কান্নায় কাঁপা— দেহী যুবকত্বের তপ্তালিকতার মধ্যে। আছড়ে পড়েই প্রিয়া আভা তার কান্নার সুছন্দিত আবেগকে আরো বাড়িয়ে দিতে দিতে—সরব করিয়ে তোলালো—বধূ আনন্দিতারই সুন্দর, আর হ্লাদিত হোতে চাওয়া পরিচিতিখানাকে। আর তখনি—প্রিয় সুজনের তাপিত বুকের ওপরেতে—যুবতীর অপার সৌন্দর্য্য নিয়ে, আর মাধুর্য্য নিয়ে ভরাট সুষমারই পীনোদ্ধ যৌবন অর্গল মুক্ত থাকায়—সঘনতে স্থাপন করিয়ে জানালো—লাজ হারানোর মধ্যেই—যুবকের আনন্দ-বিভূষণ করাবার জন্য—যুবতীর যৌবনায়ন।—তাই দু'হাতের বাঁধনে রতনের চোখের জলে ভেজা গলা জড়িয়ে ধরতে ধরতে বলল বধূ আভা—"আমার রতন। আমার মধুর। এই যে, কথা দিয়েছিলাম না, তোমায়, যে, আমি আস্তে আস্তে নিজেকে করাবো তৈরী! আজ, তাই হোয়েছে। জান, আমি তোমারই জন্য হোয়েছি তৈরী। ওগো, নেও, নেও আমায়। এবার কেমন ভাবে নেবে আমায়— দেখবো আমি তাই।"

ততক্ষণে পরম এক বিস্ময়ের চাইতেও বড়—এক অতি স্বাভাবিকতারই রূপমহল থেকে জেগে উঠে—মুহূর্তেই রতন তারই মধুক্ষরা আভাকে—যুবকের স্বাধিকারে অর্জিত আলিঙ্গনে বেঁধে নিল—আষ্টে-পৃষ্ঠে। যুবকের আবেশ দেওয়ানো দুটি হাতের কঠিন করা বাঁধনে—প্রিয়া পড়লো বাঁধা।

আলিঙ্গন আরো শক্ত করাতে করাতে নিবেদন কোরল রতন—"আভা! আমার দুষ্টু আভা! বলি, তা হ'লে এত দিনে আমার ওপরে ক'রে রাখা সব ভয় থেকে তুমি মুক্তি পেলে, সত্যি সত্যি?"

আদরের রতনের গলা কঠিনভাবে নিজের হাতেতে জড়িয়ে রেখে, প্রিয়র

চোখে-মুখের ভেজা ভেজা অবস্থার ওপর ওপর আপনার ক্রন্দসী মুখখানার একটি ধার দিয়ে ঘষতে ঘষতে—আভা কথা বলল কাটা কাটা ভাবে—'দ্যুৎ। তোমায় ভয় কোরব? এটা ভুল! আসল কথা বিবাহিতা জীবনের এই একটি ব্যাপারেই শুধু আমার ছিল জড়তা। এ ছাড়া আর কিছুটি নয়। আর তুমি এর পর থেকে অন্ততঃ এ কথাটি মুখ ফুটে বলো না, যে, আমি তোমায় ভয় পেতাম বলেই— কোন দিন সাড়া দিতে চাইনি। ও কথঅটি বলো না, বলো না, লক্ষ্মীটি। ওটা, আমি সহ্য কোরতে পারি না।"

একেতেই আগে থেকে— চোখের মুষলধারার বর্ষণে ভেঙ্গে পড়েছিল আভা! তাই প্রিয়র কপোলের নীচে দিয়ে কাঁদের ওপরেতে মুখ রেখে—আরো করুণভাবে কেঁদে উঠলো—তারই মুখের কথায়—তারই যুবতী প্রিয়া!

অবশ্য একটু পরেই প্রিয়াকে আদর করার মধ্যে দিয়ে শান্ত করালো,—প্রিয় নিজেই তার ভুল মেনে নিয়ে।

রূপবতী আভার ক্রন্দসী মুখখানার জলের রেখার ওপর ওপর দিয়েই—সুজন রতন গভীর কোরে আঁকা—অনেকগুলো উষ্ণতা ভরা চুমার আল্পনায় দিল সাজিয়ে। রাঙিয়ে। আর খিল্‌খিলিয়ে হাসিয়ে। দেহে-মনে খুশীর মধ্যে ডগ্‌মগিয়ে নাচিয়ে।

সুস্মিতকান্তি রতন বলল—"এই, আভা, শোন। আজ থেকে প্রতিজ্ঞা কোরছি এই বলে যে, আর কোনদিন আমরা আর কাউকে অকারণে ভুল বুঝবো না। ভুল বোঝাবো না পর্য্যন্ত। কেমন, রাজী?"

ওরই মধ্যে কথা বলতে বলতে একটা হাত নিজের মাথার দিকে তুলে ধরে ঝোলানো বেড্-সুইচটা টিপে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আলো জ্বলে উঠলো। আর মুহূর্ত মধ্যে—আলোর অধিক কিছু যে আঁধার— সেই রহস্য ভরা আঁধারই কিনা পুনরায় মিলিয়ে গেলো—আলোরই সুস্পষ্টতার মধ্যে!

আর তাই মনের সব আঁধার তাদেরও কেটে গেল—তখনি—যখন আলোর শুভ্র দ্যুতির মধ্যে চোখাচোখি হোল—রতন ও আভা—দুজনারই।

আরি ওই আলোর ঝলসের মধ্যে চক্ চক্ কোরে উঠলো—দু'জনার চারখানি জলে ভেজা চোখ।

রতন একটু আগে কেঁদেছিল। এখনও শুকিয়ে যায় নি তা। কয়েক ফোঁটা জল এখনও তার যুবক পরিচিতি ছাপিয়ে—দু'খানা আয়ত চোখের মধ্যে জমে আছে।

আর ক্রন্দসী আভার টানা টানা, কাজলেতে ডাগর চোখ দুখানার মধ্যে মুক্তার মতো জল এখনও ভরা রয়েছে— থৈ থৈ অবস্থায়।

ওদের দুজনার চোখেতেই ভরা রয়েছে—স্বস্তি প্রদায়িনী কান্নার সুন্দর রেশ! এ হোল সেই কান্না— যে কান্না কেঁদে ফেললে পর—কষ্ট তাড়াতাড়ি লাঘব হয়! মনে হয়—প্রিয়া যেমন তার দাম্পত্য বাসরেতে অকারণেই ঝরাতে পারে চোখের এমন জলধারাকে,—ঠিক তেমনি তারই প্রিয় যুবকটির অধিকার আছে কারণ

ধরেই কষ্টের শেষ সোপানেতে পৌঁছে—কেঁদে ফেলার!

আর মনে হয়—যৌবন-সবুজ এক দাম্পত্যিক ভালোবাসার ঋতায়নে নেমে এসে—দু'জনাই যখন দুজনাকে পরস্পরের কান্নায় কাঁপা চোখের ভেজা ভেজা অবস্থায়— কোরতে পারলো চার চোখের মিতালি—তখন মনে হয়—প্রিয় ও প্রিয়ার জীবনেতে—এমন মুহূর্তটি না হোয়ে পারে না—অনিন্দ্য। তুলনা শূন্য।

আগেরই মতোই কাটা কাটা ভাবে আভা বলল—"এই রতন। অনেক চোখের জল নিয়ে আমি এতদিন ভেসেছি। সময়ে অসময়ে। তাই বলে, আমি কিন্তু তোমায় কাঁদাতে চাই নি। আমার রতন, তুমি আমার শুধু আদরেই। তাই বলি, তোমার আদরের কাছেতে আমার আদর নিয়ে প্রতিদান দেওার সময়ে আর হবো না সত্যি—পথহারা। কথা দিলাম। এই, এই রতন, ভালো কোরে এবার তাকাও আমার মুখের দিকে।"

বলতে বলতে যুবতী প্রিয়া এবার সক্রিয়া হোয়ে রতনের হাসি-খুশীতে ঝল্‌মলানো চোখের আর অধরেতে—এক একবার কোরে নিজের লাল অধরকে লুটিয়ে দিয়ে আদর করাতে লাগলো।—আজ এই শুভ আশীষ ঝরানো রাতের দ্বিতীয় প্রহর হোয়ে উঠলো—শুধু মধুরিম। আর শুধু রিমঝিম।—বধূত্বের স্বাধিকারেতে সালঙ্কৃতা হওয়া শ্রীমতী আভার যুবতী দেহ-মনের হ্লাদিত করা সক্রিয়তায়। সহযোগিতায়। বধূর অনুরাগরঞ্জিত মনের শতভিষার ধৃতি—লাল রঞ্জনীতে ঝল্‌মল্‌ করা অধরের—ঘন ঘন টানা আলিম্পনে—প্রিয়তমর মনের বিষাদ ভরা ক্লান্তিকে ছাপিয়ে—পরম স্বস্তিকর আর শান্তির রূপ ফুটিয়ে তোলালো।

শ্রীমতী আভা ঘরের ঝলকিত আলোক-দ্যুতির মধ্যে—আপন মদালসা মুখরুচিরার সিঁদুর-কুঙ্কুম-কাজল- লৌধ্রেরেণু-ওষ্ঠরঞ্জনীতে স্বর্গের অপ্সরার মতো যেন এই মুহূর্তে ঝক্‌মকিয়ে আর ঝলমলিয়ে উঠেছে! ও যেন প্রিয়ার বধূ পরিচিতিতে রত্ন-শোভিতা হোতে চেয়ে—সক্রিয়া হোল প্রিয়তমর সাথে—অসম অন্তরঙ্গতারই মিথুন দিয়ে সাজানো লীলাবাসরেতে ডুব-সাঁতার দিয়ে—আপন আপন শরীরময়তারই রূপতরঙ্গিমা ধরে নাচানাচি করার মধ্যে সঙ্গত থেকে—স্বর্গ-খেলনা রচনা করাবারই জন্য।—তাই এতদিন বাদে—বহু শববীর প্রতীক্ষার পর—শ্রীমতী আভার বিবাহিতা যৌবনেরই পঁচিশের প্রাঙ্গণটিতে হিলোলে-বিলোলে আবরিত হোয়ে উঠেছে—প্রণয়াচারেরই জন্য মুঠো মুঠো রহস্যের মধ্যে—যুবতীত্ব নিয়ে বধূ-নিলাজিতার নেশাখানা।

তাই মুঠো মুঠো আর রাশি রাশি হোয়ে জড়িয়ে থাকা লজ্জার অর্গল হঠাৎ মুক্ত হওয়ায়—পরম স্বস্তির ভেতর থেকে নিলাজিতা হোতে পেরে—বধূ আভা তারই শত আদরের, আর শত আবদারের স্বামী—এই রতনেরই যৌবনের হাজার তরঙ্গিমায় সাজানো-গোছানো বুকের আশ্রয়েতে—নিজেকে দিয়েছে সমর্পণ কোরে, পরম স্বস্তিতে।

সুবিনীতা আভার যৌবন নাচা সুখ—খুশী, দেশেতে আদরের রতনকে নিয়ে

ঋতুচয়নী মিথুনবিলাসে সঙ্গত হোয়েছিল—এ ভাবেতেই শেষ পর্যন্ত। কেন না, এটাই ত' হোল যৌবনায়ন করা রূপধৃতি। জীবনায়ন ধরা কবিকৃতি। শ্রীমতী আভা কিছুদিন আগে প্রিয়তম রতনের বুকের তাপঝরা আশ্রয়ে নিজেকে সঁপে দিয়ে—আদর লুট কোরতে কোরতে—একখানা ছোট্ট বই থেকে পড়েছিল ডাঃ এলিসের কথা— যেখানে অতি সুন্দর ক'রে লেখা আছে—

"Many a girl has found on marriage that the knowledge she was confident she possessed has failed to carry her far. From the wedding-night—and indeed specially then—onwards, throughout the whole course of marriage, the maintenance of love is an art and in that art has a golden rule on both sides is always to give ad never to demand. Since no two human beings are alike, the only guide to the art is experience."

—আভা তাই-ই বুঝেছিল সে মুহূর্তে।—ঠিক-ঠিকই। আর তাই শেষ পর্য্যন্ত পেরেছে—নিজেকে তৈরী করাতে এই সুবচনেরই আলোকে। এই নতুন অনুজ্ঞানেরই রূপকাঠি ছুঁয়ে আভা বলল—"ছিঃ রতন, আমার ওপরেতে আর কখনো ক'রো না অভিমান। আর শোন্, কখনো কিন্তু এমন ভাবে লুকিয়ে চোখের জল ঝরাবে না, কেমন?"—বলতে বলতে রতনের অধরেতে লুটিয়ে রাখা—আপন অধরের কারু-কাজকে আরো গভীর করালো—মধুরে-সুন্দরে। সহাসে-নিলাজে।

—"এই রতন। একবারটি ভালো কোরে আমায় তাকিয়ে দেখবে না—তোমার ঐ জলেতে ভরা সুন্দর সুন্দর চোখ দু'খানার ছেলেমানুষিপনায় রাঙা চাহনি দিয়ে, কেমন? কি দেখবে না? কি বুঝবে না? জানবে না? আর তা দেখিয়ে দেখিয়ে আমায় দেখাবে না কি? আর জানিয়ে জানিয়ে আম্‌য়ায় জানাবে না কি? এই মিষ্টি ছেলে, বলি, এবার থেকে ঠিক আজকেরই এই সুন্দর রাতখানায়—তুমি জানাও আমার ওপরে তোমারই দুষ্টুমিপনাকে! বিপর্য্যস্ত করাও আমার দেহকে তোমারই দুষ্টুমিপনার মাতাল থাকা ঝড় তুলে। ঝাপটা লাগিয়ে। বিলোলতায় এলোমেলো ক'রে। সত্যি বলছি, আমি আজ তোমাকে আমারই দেওয়া কথা মতো—নিজেকে করাতে পেরেছি তোমারই চাওয়ার মতোটি কোরে।"

আভা অপার আনন্দের আঙ্গিনায় এসে পৌঁছাতে পারায়— সেই আনন্দেরই শিহরিত করা ভাব-ভাবনায় দোলা পেয়ে—আনন্দিতার পরিচিতিখানাকে জানালো কথা শেষ করাতে না পেরেই— চোখের বাধ না মানা সেই অকারণে নির্ঝরিত কান্নার গমকে ভেঙ্গে পড়ায়।

ভালোবাসার মহালেতে অপার মায়ারাগের বিভূতি ও বিস্ময়ে মুগ্ধ হোয়ে ওঠা—সুজন রতন এবার প্রিয়াকে সমস্ত অনিশ্চয়তার হাত থেকে উদ্ধার কোরে—পরম এক নির্ভয়ের নিভৃতিতে পৌঁছে দিতে চাইল।—তা চাইল হঠাৎ

ঘুমিয়ে পড়া আপনার যৌবনাকুতির জাগরণে।

প্রিয়াকে বুকের বাঁধনে তৈরী করা নিভৃতির নির্ভয়ে বন্দী কোরে আদর করাতে করাতে বলল রতন—"এই মেয়ে, বলি, তুমি নিজেই আমাকে জানাচ্ছ, চোখের জল না ফেলার জন্য! আর কি না কথা বলতে বলতে,—কথা শেষ না করার আগেই নিজেকে ভাসিয়ে নিচ্ছ সেই চোখেরই জলেতে? এই দুষ্টু, এটা কেমন হোল?"

অবশ্য প্রিয়ার কোন উত্তরের অপেক্ষা না কোরে—স্বামী রতন আপন শুচিস্মিতার ছবির মতো মুখরুচিরার সর্বত্র—মুঠো মুঠো লজ্জার শিহর ঘেরা সিক্তুতায় ভরিয়ে তোলালো—যুবকের প্রণয় রীতিকারই ছন্দে, ছন্দে। যতিতে, যতিতে। মিল ধরে।

ওরই মধ্যে একটু বিরতি পাওয়ায়—আভা নিজের সুস্মিতাধরেতে প্রিয়র থেকে আদর লুট কোরে নেবার মধ্যেই জানালো—"তুমি কষ্ট পেও না, রতন। আমার এ কান্না হোল আনন্দেরই পরিচিতি। এত আনন্দ, এত সুখ কি আমার সহ্য হবে! তাই ভাবতে ভাবতে আমি কেঁদে ফেলেছি এই আর কি! অন্য কিছু নয়। রতন, এই?"

শুধালো রতন তখনি—"কী?"

সুস্মিতাধারে দুষ্টুমির রূপ নাচাতে নাচাতে বলল আভা—"আজ আমায় খুব ভালো কোরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে না? এই, কী?"

—"নিশ্চয়। নিশ্চয়। তোমায় আমি জানি। তুমি একবারেতেই দেখায় শেষ হওয়ার নও। তোমার আছে দেহেরই ওপর—শত রূপেতে শত রকমে দেখার মতো—শুধু সৌন্দর্য. শুধু মাধুর্য্য। তোমার রতন তা ভালো কোরেই জানে। জান আভা, তুমি এই মুহূর্তে নিজেকে রূপে-যৌবনে সাজে-পোশাকে যে ভাবে আলুলায়িতা কোরে তুলেছো, তাই দেখতে দেখতে আমার মনে পড়লো কবির কথা। তোমাকে তাই জানাই কবিরই কথায়—"আজ রচয়ে বাসক সেজ,..

ফুলের আচির,/ফুলের প্রাচীর/ফুলেতে ছাইল ঘর,
ফুলের বাহির / আলিস কারণ, / প্রতি ফুলে ফুলশর।"

— সে কথা শুনতে শুনতে, আর বুঝতে বুঝতে—হ্লাদিতা থেকে শ্রীমতী আভা জানালো মধুর কোরে—"ওগো রতন। ওগো মধুর। কথা শুনতে শুনতে আমারও তাই কবি বিদ্যাপতিকে মনে পড়লো—

"মাধব বোলল মধুর বাণী/সে শুনি মৃদু মোঞে কান।
তাহি অবসর ঠাম বাম ভেল/ধরি ধনু পাঁচবাণ।।
তনু-পসেবে পসাহনি ভাসলি/পুলক তৈসন জাগু।
চুনি চুনি ভএ কাঁচুঅ ফাটলি/বাহু-বলয়া ভাগু।।"

—বুঝলে রতন। আমার মানসিক অবস্থা সেদিনও শুধু লজ্জার ঘেরাটোপে বন্দী থাকেলও, আমি দেহের প্রতিটি অণুতে অনুভব না কোরে থাকতে পারিনি—

এরই কাব্যিক বর্ণনা নুভূতিটিকে। আজ কিন্তু তোমার মুখের সুমধুরে ডাক দেওয়া একটিবারের সম্বোধনেই—আমিও হোয়ে উঠেছি বিদ্যাপতির সুরঝঙ্কারে সুবন্দিতা—শ্রীরাধা। কী, ঠিক বলছি না? এই, বল।"

থামলো আভার কথার রিমঝিমানি। আর তখনি রতন বলল—"ঠিক। ঠিক। কথায় তোমার জুড়ি পাওয়া মুস্কিল ব্যাপার! যাক্, আমি বলি কি জান, লক্ষ্মীটি কথা দাও, আর ত' তুমি অকারণে কাঁদবে না, বল?"

রঙীন হাসির ছর্‌ররায় দুলতে দুলতে জানালো আভা—"সে কথা আমি তোমায় দিতে পারবো না। আগেই ত' বলেছি তোমায়, যে, আমরা মেয়েরা সুখের মধ্যেও— তারই আতিশয্যটিকে সহ্য না করার মতনই তৃপ্তির পরিচয় জানাতে গিয়ে—অকারণেই কেঁদে ফেলি। তাই ভবিষ্যতে আরো শতেক বার ধরে কেঁদে ফেলতে পারি ঝরঝরিয়ে, এই তোমার বুকের সুনির্ভয়ে ঘেরা আশ্রয়েতে বাঁধা থেকে— তোমারই দুষ্টু হওয়া অধরের দুরন্ত ঝড় নিয়ে আদর করাবার প্রতিটি রীতিতে। প্রতিটি তৃপ্তিতে। কিন্তু, তুমি রতন, আমায় কথা দাও, যে, তুমি ছেলে হোয়ে আর কাঁদবে না? বল। এতদিন না হয় তোমার প্রিয়া তারই দেহের অভ্যন্তরে লুকিয়ে ছিল—লাজের কারাগারেতে তারই যুবতীত্বকে বাঁধা রেখে—নিলাজিতা না হওয়ারই জন্য! কিন্তু, আজ থেকে সে নিজেই যখন তোমারই কাছেতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সঁপে দিতে পারলো—তখন আশা রাখি যে,—তোমারই অতৃপ্তির জন্য বা অপ্রাপ্তির জন্য আর অন্য কোন কারণ অবশিষ্ট থাকলো না— তোমায় যুবকত্ব সমেত কাঁদিয়ে তোলাতে! কি, তাই ত?"

বলতে বলতে প্রিয়তমর টানা টানা চোখেতে এখনও লেগে থাকা জলবিন্দুগুলো—নিজের অধর দিয়ে আলপনা আঁকার মতো কোরে মুছিয়ে দিল—পরম এক সুখের খুশী নির্ঝরে নাচতে নাচতে।

রতন তারই একান্তা আর একাত্মা এই আভাকে জানালো—"এই, এই মেয়ে। আগেই ত' বললাম না, যে, কথায় তোমার সঙ্গে পেরে ওঠা কারুর সাধ্যটি নয়! তাই তোমায় এই আজ থেকেই কথা দিচ্ছি, এরপর থেকে আর ঝরাবো না চোখের জল। কে না, তুমিই ত' এনে দিয়েছো—আমার অশেষ প্রাপ্তি। আমারই অশেষ তৃপ্তিধারার নির্ঝরিণীটি। সুখের মন্দাকিনী রূপধারাটি। আমার আভা, যুবক হোয়ে আর সত্যি ঝরাবো না চোখের জল—অন্য কোন কারণ আজ থেকে আর অবশিষ্ট থাকলো না বলে। সত্যি সত্যি।"

স্বামী রতনের মধুর হোতে রসমধুরিক রীতি নিয়ে তাপঝরা যুবকত্ব—রাঙা-দেহী যৌবনের মিথুন-সায়রেতে আত্মসমর্পিতা আভার—তপ্তালিকা রূপখানার নিলাজিতা আবেশ মুঠো মুঠো ক'রে আহরণ ক'রতে চাইল। সুজন রতন তারই সুন্দরম খুশীতে আবদার ভরিয়ে আদর করাবার নিরিখেতে—একটু নুয়ে পড়ে প্রিয়ার রূপে-অপরূপে শৈল্পিক বসন্ত-সাজ নিয়ে উন্মোচিত থাকা—সুন্দরী বুকের লাজহীন লাল আধারের আপীন উপাধানে—দুষ্টু যুবকের স্বামীত্বের স্বাধিকার

পাওয়া ঋতুচয়ন সম্পন্ন করালো—আপনারই সুস্মিতাধরের সংস্থাপনা কোরে। তারই স্থিতির শিহরে শিহরে—এক একটি যুবতী-লাজকে পীন বৃন্ত থেকে—কুসুম চয়ন করারই মতো ক'রে আপনার মধ্যে গ্রহণ করালো—স্বামী-মঞ্জুলিক—এই রতন।—আর তাই, আত্মসমর্পিতা এই রূপধন্যা আভা—আপনার কবিতার মতো যৌবন-দেহের প্রতিটি বসন্ত-লহরের ওপর ওপর ঘেরাটোপ দেওয়া—সেই মুঠো মুঠো আর রাশি রাশি লজ্জাকে পরাজিত কোরে—প্রিয়তমর দুষ্টু-দুরন্তপনার মধ্যে থেকে গ্রহণ কোরলো—মুঠো ভরিয়ে, আর রাশীকৃত করিয়ে—শুধু বিলোলিত আবেশ। শুধু আলুলায়িত নিলাজতা। শুধুই হিলোলিত ভাবেতে খুশীয়াল করারই তা হোল—সুখ আর সুখ।

তবু শুধু কিন্তু—বাক্-রহিতা হোয়ে উঠলো—এই মধু ও মধুময় ধৃতি সাঙ্গ ঋতুচযনী কারুকাজের সান্ধ্যা-বিলাসে পৌঁছে যাওয়ায়—এই বধূ আভা। মুখের কথা তার সচলতা হারিয়ে নির্বাক না হোয়ে পারলো না। কথা হারিয়েছে তারই ছব্‌ররা ভরা রেশ! এটা যেমন এমনই এক অবস্থার আর পরিস্থিতির—অরোধনীয় কিছু ; — তেমনি অন্য এক অসম সত্য হিসাবে—এই মুহূর্তের বাক্-রহিতা আভা—তারই বধূত্বের নিলাজ-সুন্দর আর নিলাজ-মধুর কৃতির কর্তব্য অনুসারে—রতন নামী এই আদরের যুবক-স্বামীর একই বয়েসী যৌবনকে—আপনার যুবতীত্ব নিয়ে প্রগাঢ় ভাবে ঝল্‌মলানো সক্রিয়তায় আর সহযোগিতায়—ঋতুতে ঋতু ফোটাবারই জন্য— দেহ-মনে হোয়েছে—ব্যস্ত। বিপর্য্যস্ত। এ লামেলো।

সত্যি— কোন এক অচিন লোকেতে যেন হারিয়ে গেছে—এই রূপবতী আভার ছবির মতো দেহ-সায়রের তরঙ্গ-মুখর ঢেউয়ে ঢেউয়ে—আবরিতা থাকা— সেই মুঠো মুঠো করা আর রাশি রাশি ভরা—শুধু লজ্জা। আর লজ্জারই—দারুণ প্রভাসগুলো!

—আর তারই বদলে—পারস্পরিক যৌবনায়ন সুসম্পন্ন হওয়ার জন্য—প্রিয়া আজ তৈরী হোতে পারায়—তারই যুবতীত্ব ঘেরা আকার— পেয়েছে প্রভাসময়তা।—শুধু যৌবনান্বিত রতিতে। আর আরতিতে। আর সর্বোপরি—রতিরই আরতিতে।—শুধু সুন্দরে ও মধুরে ছবি হোয়ে সমাহিতা হওয়ায়। হ্লাদিতা থাকায়।

তাই শেষ পর্য্যন্ত—প্রিয়ার সুন্দর সুন্দর লাল ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে আর কোন কথাটি ঝল্‌মলিয়ে উঠতে না দেখায়—প্রিয়তম তখন—বধূ আভার মঞ্জুল-বিহ্বল উরসিজের আধারেতে—আপনার মুখের স্থিতিখানা ধরে রেখেই—জানালো চুমায়নী আলপনা ফোটাতে ফোটাতে—"এই আভা। এই দুষ্টু। শোন। আর আমরা ভুল কোরে, আর ভয় পেয়ে পথ হারাবো না। সত্যি সত্যি। তুমি, হ্যাঁ, তুমি নিভৃতির মধ্যে পরম নির্ভয়ের সঞ্চার কোরে— থেকো প্রহরে প্রহরে—আমারই জন্য হ্লাদিত করানো শক্তি হোয়ে। কেমন?"

একটু থেমে—পুনরায় কথা নিয়ে বন্দনার মতো কোরে প্রিয়াকে জানালো—

তারই স্বামী, এই সুজনক রতন—

—"এই্। এই। শোন লক্ষ্মীটি। আমাদের দুজনরাই একই বয়েস ধরে, আজ এই পঁচিশের অঙ্গনে দাঁড়িয়ে—আমরা দু জনাই সুসম্পন্ন করাতে পেরেছি—দু'জনারই যৌবনের রজত-জয়ন্তীখানা। তাই আমি তোমায় বলতে চাই যে, আজ থেকে সেই অনাগত ভাবীকালের পথেতে— যৌবনেরই্ সরণি ধরে চলতে চলতে—আমরা যেন মনে রাখি—আমাদের ভালোবাসার ঋতুতে ঋতুতে মিথুনচয়ন সুসম্পন্ন করাতে হবে—ঠিক এই ভাব-রূপতায়, ভাব-নিরুপমতায়—যেমন আমি কবির কথাতেই বলি—

"After twenty day and night
After thirty day or night
After forty now and then
After fifty god knows when."

—শোন আভা। এই লক্ষ্মীটি। ঠিক ঠিক এমনটাই হবে, আমাদের ভালবাসার ঋতুচয়ন। ভালবাসারই যৌবনায়ন।"

প্রিয়তমর সুন্দর এই কথা শেষ হো্ল—গভীর একঅনির্বচনীয়তার অন্বেষণে। গভীরতর এক ভাবব্যঞ্জনারই—আশ্লেষিত করা আঙ্গিনায়।

সত্যি,—রূপবতী আভার দেহ থেকে হারিয়ে গেছে—মুঠো মুঠো থাকা আর রাশি রাশি করা— সেই অনামী লজ্জা। আজ যা এসেছে রূপ ধরে—তার নাম—দাম্পত্যিক নিলাজতা। তা মধুরিম। তা সুন্দরম। তা মুঠো মুঠো আর রাশি রাশি করা রভসে ভরা। তার তুলনা নেই। তাই আজ রতন আভাকে বুকের তাপঝরা আঙ্গিনায় বন্দিনী রেখে—ওরই সম্পর্কে ভাবলো কবি কান্তি ঘোষের খৈয়াম ভাষ্যতে—

"এই যে কোমল দুব্বা যাহার বুকের ঘেরা আঁচলটুকু
সদ্য শীতল শয়ন মোদের—সব্ জিয়েছে নদীর মুখ—
আস্তে সখি পাশ ফিরে নাও, কী জানি এর ব্যথার ফের্—
কোন রূপসীর পাৎলা ঠোঁটের জিয়ন রসে জন্ম এর।"

—১৬ই নভেম্বর, ১৯৬০

স্বর্গ রচনার পরিকল্পনা

দুই গল্পলেখক—"কয়লাকুঠির দেশে"র শ্রীমান অরুণকুমার রায় ও গ্রাম বাঙলার আদর্শ শিক্ষক শ্রীমান নিমাই মণ্ডল—অতি আদরের দুটি ছোট ভাইকে

বিবাহ জিনিসটা স্বর্গে অনুষ্ঠিত হয়, বা হবে কি না—এই প্রসঙ্গে যৌবনের ছেলেদের মধ্যে, আর ওদেরই মনপসন্দ্ করা মেয়েদের মধ্যে কোন সন্দেহের অবকাশটি থাকলেও—এটা ঠিক যে,—বিশেষ ক'রে ওদের দু'জনার কিন্তু এ নিয়ে বেশী ভাববার কিছুটি নেই।

ওরা মানে—যুবক সুজনক—পলাশ। আর যুবতী মঞ্জুলিকা—সুপ্রিয়া।—এই পলাশ ও ঐ সুপ্রিয়া—আজ পুণ্যশ্লোক থেকে অভিনন্দিত বিবাহের সপ্তপদ পরিক্রমায় নিজেদের কোরে তুলেছে—দুই হোয়েও এক! একই স্বত্বা! একই স্থিতি! এই ব্যাপ্তি! একই নিরালা ভরা নিভৃতিরই নিলাজক দম্পতি! একটি মিথুনের—মিতাক্ষর কবিতা।

সুস্মিত পলাশ সুন্দর কোরে তারই প্রিয়ংবদাকে বলেছিল—"স্বর্গ আমাদের হাতেতেই ত' রয়েছে। সেই ও-পারের পারিজাত কাননেতে আমাদের বিবাহ সম্পন্ন না হোলেও—এটা ঠিক যে, আমরা আমাদের এই ছোট্ট পৃথিবীটির মধ্যেই পারবো—স্বর্গটিকে রচনা কোরতে। কেন সুপ্রিয়া, তুমি কি মনে কর তা রচনা করা সম্ভব নয়—আমাদের পক্ষে? বল, প্রিয়া? বল, মধুর?"

ওরই সাথে বিবাহের জন্য বাগদত্তা সুপ্রিয়া—ওর এই কথার উত্তর দিতে গিয়ে—দু'হাত দিয়ে সুস্মিত সুজনকের গলার ওপর নরম বাঁধন বিস্তারিত রেখে বলেছিল—"তাতে কি এসে যায়? পলাশ, আমরা নিজেরা স্বর্গ গড়ে নেবো—নিজেদেরই মনের মাধুরী মিশিয়ে। মিলিয়ে। আমি তোমায় পরিকল্পনা যোগাবো। আর তুমি পলাশ, সেই পরিকল্পনাকে পরিণত করাবে বাস্তবে। আমি তোমারই কাছ থেকে পাওয়া ভালাবাসায় হ্লাদিতা থেকে— তোমারই মধ্যে পৌছিয়ে দেবো সহাস আর সানন্দ ভরা প্রেরণাকে।—আর তুমি তখন অনলস ভাবে কোরে যেও—আমাদেরই দাম্পত্যিক সাজ-ঘরের জন্য স্বর্গ রচনা। কেমন?"

সুন্দর কথা বলতে বলতে আর হাসতে হাসতে—প্রাক্-বিবাহ কালে নিজেদের জানাজানি করার আর বোঝাবুঝি করাবরই—"দি আর্ট অফ্ ডেটিঙ্" থেকে ঝল্মল করার মধ্যে—মঞ্জুলিকা সুপ্রিয়া তারই বাগদত্তার চুম্বনটিকে পলাশের সুস্মিতাধতে এঁকে দিয়েছিল—প্রায়ই।—ওরই মধ্যে সুপ্রিয়ার মনে হোত পলাশেরই চিন্তার

সাথে সাথে, যে,—বিবাহের জন্য স্বর্গ রচনা ত' এই পথেতেই এসে পৌঁছবে!—পলাশের প্রিয়া—এই সুপ্রিয়ার ওরই প্রতি বাগদত্তা থাকা পরিচিতিটি ভেবে রেখেছে তাই। আর তাই—"প্রি-ম্যারিট্যাল ব্লিশ" ভরা এই "Bethroted kiss'টিকে প্রিয়ার থেকে পেয়ে পেয়ে—পলাশও জানিয়ে জানিয়ে এসেছে—তারই সবুজ গভীর যুবকাধরের—চুমায়ন।

তারপর পলাশ বলতো "ডেটিঙ্" নিয়ে মেতে উঠে—প্রিয়া সুপ্রিয়াকে লজ্জার রেশ দিয়ে আবরণ দিয়ে অযোধ্যার সেই শ্রেষ্ঠ সন্ধ্যাটির মতো রাঙাতে রাঙাতে—"এই, প্রিয়া। শোন, শোন। একবারটি মধুর কোরে শুনে নেও, যে, আমরা দু'জনাই বিবাহের পর স্বর্গ রচনার কাজেতে নিজেদের যৌথ প্রয়াসটিকে অর্পণ কোরবো। আর এমন স্বর্গ রচনা আমরা কোরবোই। কেন না, বলাই ত' আছে, যে, 'Marriages are made in Heaven!"— দেখবে পলাশ,ঠিক ঠিক তাই কোরব আমরা।"

পলাশের সে সব সুন্দর সুন্দর কথার অনুধ্যানে নিজেকে তৈরী করাবার জন্য—প্রিয়া সুপ্রিয়া তার দেহের তাজা সবুজ রঙ্টিকে—ত্বক্-যৌবনেরই বাঁকে বাঁকে লাল লজ্জায় উপ্‌ছে পড়েও—প্রিংয়বদ পলাশের মধুরতায় উচ্ছলিত করা অধরেরই দুষ্টুমি ভরা হাসির মধ্যে আলপনার মতো সাজিয়ে সাজিয়ে এঁকে দিত—ভাবী বধূরই মধুরিকা রূপটি থেকে ঝরা—শুধু চুমা। আর চুমা।

বাগদত্ত হোয়ে থাকা—এই পলাশ ও সুপ্রিয়ার পরিকল্পনা ঘিরে—ভবিষ্যতের বিবাহিত ভুবনে—স্বর্গ রচনা করার অভিলাষটিকে সম্পন্ন করানোর ফাঁকে ফাঁকে—ঐ জীবনেরই নানা রহস্য-বিচিত্রার জ্ঞান ও অনুজ্ঞান পর্য্যন্ত—ওদেরকে ভালোবাসার খাতাতে নজরবন্দী কোরে রেখেছে।—সেদিনকার বিবাহিত জীবনের এক রচম সত্যের দরজার উপনীত হোয়ে—যাতে কোন ভয় বা কোন জড়তায় বাধা না পায় ওদেরই স্বর্গ রচনার কাজটি—তারই জন্য পলাশ এখনি তার প্রিয়াকে সাবধানী সংকেতটি জানিয়ে রেখেছে। সুপ্রিয়ার প্রতি কোন ভ্রান্তি যাতে দেহী যৌবনের সুষমার আড়ালে মিথুনচয়ন করার জন্য—পলাশের স্বামীর মধুরিম অধিকার সমেত কোন সংকটের পরিস্থিতিকে অযথা আহ্বান না কোরে বসে!—এই তারই জন্য। পলাশ তারই সুপ্রিয়াকে এ সম্পর্কে ওয়াকিবহালা করাতে করাতে জানাতে পেরেছে, যে অদূরের ঐ দাম্পত্যিক জীবনের সবুজ চাহিদাটি যা নিয়ে আবদার কোরতে পারে—তা জি. কোর্টনে বীলের ভাষায় হোল—"In human beings the physical union of real lovers becomes the vehicle and symbol of a spiritual union which cannot in any ohter way be so completely effected and expressed. From the bodily coalescence of lover and beloved, from the thrill and ecstasy, kindled and rekindled in that close embrace, the full mutual surrender and uttermost delight in

one another, there springs emotions and sympathies that are quite unattainable save in ths manner."

বই থেকে পড়ে পড়ে—এমন বক্তব্য প্রিয়াকে শোনানোর পর—প্রিয়া সুপ্রিয়া হোয়ে উঠেছিল—রাঙা আভায় টক্ টক্ করা লাজবতী। শুধু উত্তরে সুপ্রিয়া পলাশকে বলেছিল—"আগে আমাদের বিবাহ সুসম্পন্ন হোক। তারপর তুমি দেখবে এসব কথার অনুজ্ঞানটিকে আমি কতটা অনুধ্যান কোরতে পেরেছি। আর কতটা পারিনি, কেমন?"

লাভলক্ প্লেসের আলোকমালার হাজার বাতির ঝল্মলানো ও ঝক্মকানো রোশনাই নিয়ে—রাতের বিরাট কালো সামিয়ানার নীচেতে—ছবির মতো আমেরিকান স্টাইলের দো'তলা বাড়ীটির রূপ-প্রসাধন শেষ পর্য্যন্ত একটু একটু ক'রে ম্লান হোয়ে আসছে। প্রয়োজনহীন হোয়ে ওঠায়—এখানে- সেখানের বেলোয়ারী কাঁচের ঝাড়-লণ্ঠন একের পর এক নিবিয়ে দেওয়া হোচ্ছে। দপ্ দপ্ ক'রে শেষ বারের মতো আপনার আলো বিকিরণ করার পর—নিবে-নিবে চলেছে—মানুষেরই চোখের আলোর নেশা মিটে যাওয়ায়। দেওয়াল-গিরির বাতিদান আগেই নেবানো হোয়েছে।—ফলে, আস্তে আস্তে সৃষ্টি করিয়ে তুলেছে তারই অন্তর্ধানরে সাথে সাথে—আলোকে হারিয়ে দেওয়া—সেই আঁধারেরই মায়াজাল। তারই মায়াবেশ। তারই মায়া-বিভূতিকে।

স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দধারার কল্ কল্ আর ছল্ ছল্ করা শুধু কাকলী দিয়ে ঘেরানো এই সরব পরিবেশটি কখন যে মিলিয়ে যেতে পারলো— কেন না, এই বাড়ীর বড় ছেলে যে—সেই পলাশেরই বধূ-বরণের মধুর উৎসবটি আজ সমাপ্ত হোল। তাই ছোট-বড় সকলেরই মিল ধরা হাসিতে-খুশীতে, আনন্দেতে, আর তারই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশেরই মধুরিম করা রূপেতে তা রূপপাওয়ায়। পরচিতি নেওয়ায়। সকলেই একই ধারার সুখের মধ্যে ভেসে যেতে পেরেছে।—ওরা তাই নিজের নিজের আনন্দের ছন্দকে মিলিয়ে দিতে পেরেছে—নব বিবাহিত পলাশেরই দেহ-মনের উর্ম্মি-আহ্বানে সাজানো চঞ্চ লতারই সাথে।—পলাশেরই খুশীয়াল থাকা সুখাতিশয্যের মধ্যে। তারই নব-বধূর প্রতি উপছানো প্রণয়াকুলতার বিহ্বলতাতে।—ঠিক ঠিকই ওরা এই পলাশেরই—এই মুহূর্তের অভিধা সঞ্জাত মুঠো মুঠো ভরানো আর রাশি রাশি করানো—আবেশেরই প্রাচুর্য্যতার সঙ্গে হোয়ে উঠেছে—এক!—বাঙলা দেশের—বিশেষ ভাবে বাঙালীর এই জাঁক-জমক-পূর্ণ ও নিয়ম-নিষ্ঠা-পুণ্যশ্লোকেতে সাজানো—এই সামাজিক সংস্কৃতি বনাম "রিলিজিয়াস্ রিচ্যুয়াল"টি—পৃথিবীর যে কোন সংস্কৃতির দরবারেতে—বিবাহের এমন সুন্দর অনুষ্ঠানটিকে প্রদর্শন করিয়ে—অন্য দেশীয়দের সত্যিসত্যি হার মানাতে পারে!—নব বিবাহিত পলাশ মুখোপাধ্যায় তাই আজ এ কথাটির যথার্থটা—নিজেরই এই ব্যাপার দিয়ে অনুভব কোরতে পেরেছে।

প্রহরে প্রহরে দোল খেতে খেতে—এই ফুলেল রাতটি আরো অনেক ধীরে তখন গড়িয়ে পড়েছে। শুধু নিভৃতির মুঠো মুঠো অন্ধকারে জড়িয়ে পড়ছে—রাতেরআকাশেতে মিটি মিটি ক'রে জ্বলা তারাদের বিভাব থেকে—তারই বিরাট সামীয়ানা ছাড়িয়ে যাওয়ায়।

তারই এমন মায়াবেশের মধ্যে ফুল আর ফুল দিয়ে সাজানো ঘরটির ভেতর থেকে বাহারে আলোর অপূর্ব হওয়া রেশনাইয়ের ঝলমলানি—দুষ্টু মাধবীরাগের ঝিকিমিকিতে মাতা খেলায় হেসে-গড়িয়ে-ছড়িয়ে আবছা আঁধর জড়ানো বারান্দায় এসে ঠিক্‌রে পড়েছে—ভেজিয়ে রাখা কাঁচের জানালা বসানো দরজা দিয়ে। আর বারান্দায় দাঁড়ালে পর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, যে, দরজার ওদিকে ঝোলানো গোলাপী রঙের পাতলা পর্দাখানা—ঘরেরই ভেতরের বিদ্যুৎ-পাখা থেকে ঝরানো বাদুলে হাওয়ায় দোল খাচ্ছে। নাচছে। পাখাটি পুরো গতিতে চলছে। তাই তার এত বেশী ঝটপটানি। পাখার হাওয়ায় হাওয়ায়—মসৃণ পর্দার অবস্থা হোয়েছে তাই এত দোলায়মান। আর থম্ থম্ ভাবখানা নিয়ে যেন কাঁপছে তারই গোলাপী রঙ্।

—আর এই ফুলে ফুলে ফুলময় ঘরেতে—নিথর করা চঞ্চ লতারই রাশি রাশি উর্ম্মি-আহ্বান নিয়ে বসে আছে—পলাশেরই দেহমনের খুশীয়াল সুখ—বধূ সুপ্রিয়া। পবিত্র দ্যুতির ঝলস্ ঝরা—লাল বেনারসীর মোলায়েম আবরণিকায়—সমস্ত শরীরেতে দুধে-আলতায় সুন্দরম্ হোয়ে মিল খাওয়া রূপাভায় ফোটা লজ্জার শিহরণগুলোকে আড়াল কোরেও—বধূ সুপ্রিয়া তার চব্বিশ বছরের অক্ষত যৌবন নিয়ে কিন্তু সত্যি সত্যি আপন যুবতীকার প্রতিটি অণু পর্য্যন্ত হোয়ে উঠেছে—তপ্তালিকা। আরাধিকা!—অবশ্য একটু বিলম্বিত হোয়েছে আজকের এই ফুলেল রাতের আশ্লেষিত আঙ্গিনায় প্রণয়াভিসার নিয়ে—বর পলাশেরই দেহী কবোষ্ণতার সায়রে নেমে রূপস্নানেতে—নিজেকে সব স্বত্বা সমেতে লীন করিয়ে—ওরই পঁচিশের যুবকত্বকে খুশীয়াল করাবার কারুকাজটি! সত্যি বিলম্বিত লয়েই এতক্ষণ পর্য্যন্ত—রাতের নিশুতিলগ্ন নিথর হোয়েই এগিয়ে যাচ্ছিল।

—"দ্যুৎ। আর ভালো লাগে না। নীচে ও নেমে গেল কিছু তদারক করার জন্য। তা এত দেরি কোরছে কেন পলাশ!"—বধূ সুপ্রিয়া নিভৃতির মায়া-পরিবেশেতে পলাশেরই প্রতীক্ষায় রাগবতী থেকে—বিহ্বলা হোয়ে ভাবলো তাই। এ প্রতীক্ষা হোল অসম এক তিতিক্ষা। কয়েকটি পলককে যেন মনে হয় কয়েকটি দিন। আর তারই একটি প্রহর যদি ওভাবে কেটে যেতে থাকে—গভীর রাতের আরো গভীরেতে তলিয়ে যাওয়ার পথেরই প্রতি—তখন এমনি এক দারুণ প্রতীক্ষার জন্য প্রহরের প্রতিটি মুহূর্ত গুনে গুনে চলার ব্যাপারটি—বধূ সুপ্রিয়া কাছে মনে না হোয়ে যায় না—ঠিক একটি মাসের—অদর্শন! আর অপ্রাপ্তি!

"তাই ত'—খুশীয়াল মনেতে টইটম্বুর স্রোতধারার মধ্যে তরঙ্গ-দোলায় দুলতে দুলতে—দয়িত পলাশেরই তাপঝরা আর আরাম ভরা বুকেতে বন্দিনী থেকে—বধূ

সুপ্রিয়া ভসে যেতে পারবে নোঙ্গর শূন্য কাণ্ডারীহীন নৌকারই মতো—বেপরোয়া হওয়া গতি নিয়ে!"—এই ভাবনাতেই চালিতা হোয়ে এমন চিন্তাকে নিজের যুবতী মনের মধ্যে গেঁথে রেখেছে ও। সুপ্রিয়া তার পলাশের কাছ থেকে লুট কোরে নেওয়ারই প্রাপ্তি থেকে—নিজের দেহী যৌবনের প্রণয়েরই মুষলধার হোয়ে ফোটা বৃষ্টি আর বৃষ্টির তোড়ে।—তারই উষ্ণতায় আর সিক্ততায় সাজা পবিত্র পরশেরই—প্রতিটি বিবাহিতা ছোঁয়াচে ছোঁয়াচে। এ সবই ত' হোল পলাশেরই দান—তারই বধূর জন্য!

কিন্তু এই তারপরেই ত' আসছে প্রণয়ের সংকটটি! পলাশ ছেলে, তায় লজ্জার বাধা ওর কিছুটি নেই বলে—যেমন ও সহজে যতটা নিলাজ সুন্দর হোতে পারবে—প্রিয়ারই সলাজ মধুরতাকে লাজ-হারানোর ছন্দ ফুটিয়ে—নিলাজিতা মং্রিকা করাবার জন্য;—ঠিক তারই পরিপ্রেক্ষিতে—সুপ্রিয়া অত সহজে, আর এত তাড়াতাড়ি কী পারবে তারই মেয়েলি রীতিকার অন্তরঙ্গতা থেকে—লাজের আবরণটিকে উন্মোচন করাতে?—প্রিয় পলাশকে বধূরই রূপকলায় সাজাতে আর রাঙাতে চাওয়ার প্রতিদানী মুহূর্তটিতে কী সুপ্রিয়ার চোখের চাহনি বন্ধ হবে না? অধরের দুষ্টু হোতে চাওয়া হাসির লাল আভা কী কেঁপে উঠবে না—ঠোঁটের কিনার ধরে? বুকের আপীন মাধুর্য্য কী শরমতা হারাবে বলেই হ'য়ে উঠবে না—ঘন লজ্জারই গমকে আরো দোলায়িতা?—হবে নিশ্চয় তা!—অল্প-বেশী এই আর কি! আস্তে আস্তে সব ঠিক হোয়েই যাবে!—সুপ্রিয়াই মেয়েলি রীতিকার সুন্দর সুন্দর ঋতুর ঋতায়নে—তা করাবে শুধু মধুরিম! শুধু সুন্দরম্!—আরো অনেক কিছুরই ছোট-বড়-মাঝারি কথা উঁকি দিয়ে গেল—বধু সুপ্রিয়ারই সুজন—প্রিয়র জন্য ভাবাকুল করা—প্রতীক্ষার মধ্যে।

ও দিকে কিন্তু পলাশ তখন বারান্দায় রেলিঙ্ ঘেঁষে আবছা অন্ধকারের মধ্যে একটু সময়ের জন্য বসে ছিল—একখানা ডেক্ চেয়ার টেনে নিয়ে। ইচ্ছে ক'রেই বসেছে। তবে লজ্জার ধারই তাকে এ ভাবেতে এখানটায় বসিয়েছে। পলাশের নববিবাহিতের মন বড় আনচানিয়ে উঠছে—সুপ্রিয়ারই জন্য। কিন্তু যুবক হোয়েও, আর যৌবনেরই বয়েস ধরে ধরে পঁচিশের কোঠায় —রজত জয়ন্তীটিকে সুসম্পন্ন করিয়েও—মৃদু-মন্দ লজ্জারই প্রভাব দেখা দেওয়ায়—তাড়াতাড়ি পারছে না কিছুটি ক'রতে। ওর থেকে বছর খানেকের ক'রে ছোট—পর পর দুটি বোন আছে। বাব্ বা, তারা যা দুষ্টু! একজনা ওদের মধ্যে বিবাহিতা। ওরা আগেই শাসিয়ে রেখেছে অগ্রজের প্রতি।—ওরা এই ফুলেল রাতটিতে অগ্রজ কজায়ার মন জানাজানি, আর দেহ জানাজানির সবুজ বাসরেতে—দুষ্টু বুদ্ধির প্যাঁচে ফেলে বিঘ্নতা দিয়ে অস্বস্তি জাগিয়ে রাখবে। দেবে না স্বস্তি পেতে!—বাব্ বা! এমনটা কি ভুলে যাওয়ার?—সত্যিই এই তারা যদি দুষ্টুমি ক'রে কোন উপায়ে দাদা ও বৌদিদির নিলাজ রূপকলার কারুকাজের কিছু না কিছু লুকিয়ে চুরিয়ে দেখে ফেলে, তবে? সত্যি এভাবে দেখলে

পর, সেটিত বড় বেশী লাজ দেওয়নো ব্যাপার হ'য়ে উঠবে!—তাই বারান্দার দক্ষিণ খোলা অবস্থায়—নিঝুম সুরের মধ্যে চুপটি করে বসে থেকে ইচ্ছা ক'রেই অযথা দেরি ক'রছে—সকলেরই ঘুমিয়ে পড়ার আশায়। ওরা কতক্ষণ আর জাগতে পারে? অচিরে ঘুমাতে বাধ্য। পলাশও তাই দুষ্টুমি খেলালো দেরি ক'রে।—ওদেরই ঠিক করা দুষ্টুমিকে এমন ভাবে সফল হ'তে না দিয়ে।

ও ভাবেতে চুপটি ক'রে বসে থেকে পরম নিভৃতিটির অনুসন্ধান কোরতে থাকলেও কিন্তু—পলাশেরও মনের অবস্থাটি হোয়ে পড়েছে—বধূ সুপ্রিয়ারই মতো। — সেও ভঅবছে—আপনার পরিণীতা এই প্রাণের সুপ্রিয়াকে কীভাবে, আর কেমন সোহাগের ভেতরে ভাসিয়ে নিয়ে সুখেরই প্রাচুর্য্যতার মধ্যে—চরম রূপেরই ধ্যানে ক'রে তোলাবে—তপ্তালিকতায় সুতৃপ্তা। আবেশিতা। নিলাজিতা। মায় মিথুনাভিসারিকা।

পলাশ ও সুপ্রিয়ার কাছের অতি ঘনিষ্ঠতাটি মিল ধরাবার আগেতে—এই আজকেরই ফুলেফুলে ছয়লাপ করা দিনটিতে ওদের দাম্পত্যিক ভালোবাসার—আদরের আর আবদারের অভিব্যক্তি যা হবে—তা মোটেই নতুন নয়। দু'টি বছরের পুরানো হোল—এই মধুবাসরেরই দান-প্রতিদানী অভিব্যক্তিগুলো। আর সেই সেই সপ্রগল্‌ভ ভাবের ব্যঞ্জনাগুলোও। —ঠিক দুটি বছর আগে— তেইশ বছরী পলাশের সাথে পরিচয় হ'য়ে যায় অতর্কিতে—বাইশ বছরী সুপ্রিয়ার। ঠিক ঠিক—পঞ্চ শরের প্রভাবে, বা দুষ্টু দেবতা কিউপিডের কোন রকম কারসাজির ফলে—ওরা দু জন অবশ্য কাছের ঘনিষ্ঠতায়—প্রণয়ের দীপ জ্বেলে এসেছিল না।— প্রথমে ওরা দু'ধারের দুই আজানা দেশের—না জানার শরিক হিসাবেই—দূরে দূরে ছিল। কিন্তু পরস্পরের বাড়ীর কথায় ওদের জীবন—ঠিক ঐ দুটি বছর আগে বাগদানের বিষয় হোয়ে ওঠে। পরস্পরেরই পারিবারিক আত্মীয়তার ভাবী বন্ধনের কথাকে পাকাপাক করার মধ্যে।—আর আধুনিক সমাজের মা-বাবা তাদের দু'তরফ থেকেই অধিকার দিয়েছিলেন—ঐ দুটি বছর আগেতেই কথা পাকাপাকি হওয়ায়—যাতে পলাশ ও সুপ্রিয়া ভবিষ্যতের পরিণয় বাঁধনে বাঁধা পড়ার আগেতে— যেন নিজেদের মেলা-মেশার ভেতর দিয়ে—পরস্পরকে চিনে নিতে পারে! জেনে নিতে পারে! সব চেয়ে বড় কথা—ওরা যাতে নিজেদের মধ্যে 'প্রি-ম্যারিটাল ব্লিশ" হিসাবে—স্থাপন করাতে সক্ষম হয়—পারস্পরিক বোঝাবুঝির ব্যাপারখানাকে। মিউচ্যুয়াল্‌ আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং-কে।—এই এরই ধৃতির জন্য কৃতির জন্য!

বোঝাবুঝির আর জানাজানির এই ধৃতি নিয়ে চলতে চলতে—নিজেদেরকে কৃতির কর্তব্যে যথাযথ করাতে করাতে—তারপরের এই দুটি বছর কেটে গেছে—নানান রকম মধুর আর সুন্দর করার পরিচিতিরই যোগাযোগে। আদর ও সোহাগ—নিজেদের জন্য পলাশ ও সুপ্রিয়া প্রচুর পরিমাণেই দিয়েছে ও নিয়েছে।—একজন তারই অন্যজনার কাছ থেকে।

—কিন্তু প্রাক্-বিবাহকালে—পরস্পরের জন্য বাগদান করা এই দুটি সবুজ প্রাণের যৌবনায়ন—ভালবাসাকে কষ্টিপাথর দিয়ে জানার পর, আর চেনার পর—যত কিছু রীতি-নীতি ফুটেছিল মুকুলিত হোয়ে—তারই দুটি বছরের এ সমস্তই পুরানো হোয়ে উঠলেও—আজকের এই বিশেষ রাতটিতে তার আভাস জানালো—সম্পূর্ণ অভিনবত্ব দিয়ে সজানো প্রভাসটিকে। এই রাত, এই ত্রিযামা মুহূর্ত তিনটি, তার ফুলের সুবাস, আলোর আর আঁধারির মিলিত মায়ারাগ—পলাশ ও সুপ্রিয়ার কানে কানে জানাচ্ছে—

"নতুন করিয়া লহ আরবার
চির পুরাতন মোরে
নতুন বিবাহে বাঁধিবে আমায়
নবীন জীবন ডোরে।।"

এ রাত আশ্চর্য্যরকমের নতুন।—পলাশও তাই বুঝেছে। আর সুপ্রিয়াও ভেবেছে সেই একই কথা।

তারই অভিনবত্ব আর চিরন্তনত্ব—এই পঁচিশ বছরের পলাশকে আজ বড় বেশী লাজুক ক'রে তুলেছে।— বোধ হয় সুপ্রিয়ার রাঙা চেলী পরা বধূত্বের ওপর ছাপিয়ে ওঠা আজকের এই লাজবতীর কাঁপন ধরা দেহ রূপখানার থেকেই—তার যুবক পরিচিতি আরো বেশী উজ্জ্বল। সেই লাজুক ভাবটি আরো জ্বল্‌জ্বলে হয়ে প্রকাশ পেয়েছে পলাশেরসুন্দর মুখটির খুশীয়াল তৃপ্তির মধ্যে।—পরনে তার রেশমের ধূতি। তাতে সূক্ষ্মতম সোনালী জরির পাড় বসানো। গায়েতে ক্রীম রঙের মোলায়েম রেশমের ঝল্‌মলে জামা। তাইতে পঁচিশের রজত জয়ন্তী নিয়ে অভিষিক্ত যৌবন—এই পলাশ নামী. সুন্দর ছেলেটিকে বেশী রকমেই মধুরিম করিয়ে রেখেছে। —চেহারায় আর সাজেতে। পঁচিশের বসন্ত-নির্ঝর ভরা গভীর গমকে ওর যৌবন টইটম্বুর হোলেও—এই সময়টিতে পলাশকে বয়েসের অণুপাতে—খুবই ছোটটি বলে মনে হচ্ছে।

ছেলেরা যেমন যৌবনের নিখুঁজ রূপসাজ নিয়ে—তাদেরই প্রাণের মিষ্টি বনাম দুষ্টু দয়িতাদের ছবির মতো শরীরী ঢল্ কাঁপানো প্রতিটি বঙ্কিমায় উপছানো ভরাট যৌবনের রূপ-সুষমাকে দেখতে চায়—পরমা ও চরমার মধ্যে—মঞ্জুলিকা কি শুচিস্মিতার বন্দনায়—ঠিক, এই তেমনি নিরিখ ধরে যৌবনের ছোঁয়ায় ঢল্ নাচানো যুবতী মেয়েরাও তাদের পরম প্রিয়তমকে—সুন্দর আর শান্ত চেহারাতেই দেখতে ভালোবাসে। —কী আশ্চর্য্য! কালো বরণ যে ছেলে— সেও চায় শুভ্রা কোন কন্যাকে! আর যে ছেলের আকারগত রূপ নেই— সেও কিনা আশ্চর্য্য রকমেই স্পর্ধা রাখে— কোন না কোন ডানা কাটা পরীর জন্য!—যদি তাই মেনে নেই, তা হোলে এটাই বা মানবো না কেন, যে,—রূপবতী কন্যা-যুবতীকরা সত্যি বলেই চাইতে পারে—শুধু রূপবানকে? মহাকবি কালিদাসে লেখা আছে—"কন্যা বরয়তে

রূপম্।"—ঠিকই ত। এটাই হোল নিয়ম।—এদিক দিয়ে পলাশের মধ্যে কোন ঘাটতি নেই। আকারে সবটাই ওর ছিমছাম। সুন্দরম্।—এই পলাশেরই পঁচিশ বছরের যৌবনকে মধুরিমায় ভরিয়ে তোলাবারই জন্য—এক প্রাণ এক মন নিয়ে বিবাহের পুণ্যশ্লোকেতে ঘেরা কঠিন বাঁধনেতে বাঁধা পড়েছে—বধূ সুপ্রিয়ার চবিবশ বছরেরই যুবতী দেহের আর মনের—দৃপ্ততার দীপ্তিকা।—এ সব কথার ভাব-ভাবনা মনে হোতেই খুব খুশীয়াল হোয়ে উঠলো—পলাশেরই শরীরময়তায় সাজা সুজনক ও লাজুক লাজুক—ভাবটুকুন।

রোশনাইয়ে অলকাপুরী হোয়ে ওঠা এই বাড়ীর আবহাওয়া এখন এত পরে ঠিকই হয়ে উঠেছে নিথর। নীরব। আর দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগলো না পলাশের—এই নিরালাকে আরো নিরালা করাতে থাকায়। আস্তে আস্তে ডেক্ চেয়ারটি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। কাঁচের দরজা আস্তে করে ঠেলে, কোন শব্দটি হোতে না দিয়ে ফুলেল সুবাসে ভরভুর করা সাজানো ঘরটির মধ্যে—পা টিপে টিপে ঢুকলো পলাশ। বেশ অনেকটা তফাতে—তারই জন্য পলক গুনে গুনে—অশেষভাবে প্রতীক্ষারতা সুনন্দিতা এই সুপ্রিয়াকে—নিজের ভেতরে আসার কথা টের পেতে দিল না।

মঞ্জুলিকা সুপ্রিয়া ও-দিকে তখন ঘরের ফ্লুরোসেন্ট আলোর চোখ ধাঁধানো ঝিলিমিলির মধ্যে থেকে—নিজেকে সরিয়ে নিয়ে ঘরের শেষ প্রান্তে—বাগানের দিককার বড় বড় পাল্লা বসানো, প্রশস্ত জানালাটির মোজাইকের ওপরেতে — জড়োসড়ো ব্রীড়াবনতার ভাবটি নিয়ে বসেছিল।—পাথর বসানো সুমসৃণ মেঝের ওপরেতে বাহারে স্লিপার দু'খানাকে খুলে রেখেছে। বসে বসে জেগেই ছিল। কিন্তু এই একটু আগে আলতো ভাবে ঘোমটা টেনে রাখা মাথাটি দেওয়ালেতে হেলান দিয়ে—অনেক কিছু সুন্দর সুন্দর আর লাজ মাখানো কথা ভাবতে ভাবেতে—ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমুচ্ছে ঠিক অতি অসহায়া এক ছোট্ট শিশু-কন্যার মতো।—কতকটা যেন ভয়ে। আর কতকটা যেন বিহ্বলতারই জন্য জড়োসড়ো হোয়ে। বিরাট জানালার খোলা অবস্থার ভেতর দিয়ে বাইরে থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া শিহর ছড়াতে ছড়াতে চলে এসে—তার এই ঘুমিয়ে পড়া শরীরেতে লাস্যে ভরা যুবতীকায় শিহরণ দিয়ে। ঝালর দেওয়া নীল রেশমের পর্দাটিকে জানালার স্প্রিং থেকে এক ধারে সরিয়ে দিয়েছে নিজেই।—পলাশ দু'চোখ ভরিয়ে এই প্রথম দেখতে পেল—প্রিয়ার ঘুম জড়ানো শরীরময়তার মধ্যে ছন্দিত থাকা—এক নামহীন অনির্বচনীয়তাকে। লাস্যে আর হাস্যে ডগ্‌মগানো অবস্থায়—হাঁটুর ওপরেতে হাতের ভর রেখেই—এ ভাবে ঘুমানোর ছান্দস্ ভঙ্গি মাকে—ফুটিয়ে তুলেছে সুপ্রিয়ারই মদালসা মন-বিহ্বলতাগুলো। দু'চোখে তৃপ্তি ভরিয়ে ক্ষণকাল অবলোকন ক'রল পলাশ—তারই প্রিয়ার ঘুমানো এই পুতুল-প্রতিম রূপখানাকে। এরই শিশুময় প্রভাসময়তাকে।—তাই দেখতে দেখতে পলাশের মুখেতে ফুটে উঠলো—আনন্দ-হাসিরই খুশীয়াল করা তৃপ্তিধারাটি। তারই কল্‌কলানো

ঝরনাধারাটি।

তাই অপলকে প্রিয়ার শ্রাবন্তীর সন্ধ্যার মতো অনুরাগ ঝরানো রূপ দেখতে দেখতে—পলাশ খুব সন্তর্পণে টুঁ শব্দটি হোতে না দিয়ে দরজায় খিলখানা লাগিয়ে দিল। মনে ক'রলো—"এবার সাত্যি সত্যি এই অর্গল বন্ধ হওয়ায়—এই সুসজ্জিত ঘরটি সারা পৃথিবীর কাছ থেকে যেন একটা কক্ষপথ ভ্রষ্ট নীহারিকার মতো—সব সংশ্রব ছিন্ন ক'রে—ছিটকে বেরিয়ে এসেছে। কারু সাথে এর এখন আর যোগাযোগ হবার সম্ভাবনা নেই। এই ছোট্ট ঘররূপী পৃথিবীটি শুধু উপস্থিত দু'জনার জন্যই যেন তৈরী হোয়ে উঠেছে। এর এখানকার বাসিন্দা হ'বে ওরা ছাড়া—শুধু নিভৃতি। শুধু নিস্তব্ধতা। আর দাম্পত্যিক যত কিছু সলাজ আর নিলাজ হোতে পারে—এমনি সব রীতিকার রূপচর্চা। তা অন্তরঙ্গতার গভীরে সুসম্পন্ন হোতে হোতে—হবে নির্জন-স্বাক্ষরিত।"—তাই এই নিজেদের ছোট্ট পৃথিবীটির কথা ভাবতে ভাবতে—পলাশ আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে এগিয়ে এসে সুপ্রিয়ার সামনে দাঁড়ালো।—ও তখনও ঘুমুচ্ছে সুতৃপ্তিকার দীপ্ততায়। তাই সুপ্রিয়া কিন্তু কোন রকমে টের পেল না—তারই মঞ্জুলিক এই অন্তরতমর মধুর উপস্থিতিকে।

দাঁড়িয়ে থেকেই—আলতো ভাবে সুপ্রিয়ার পরম-শোভিত, আর লাজরাগে অনুরঞ্জিত শুচিস্মিতার মতো মুখশ্রীর রূপসজ্জার ওপরেতে—পলাশ তার হাসিতে ঝক্‌মক্ করা চোখের চাহনি নিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগলো। এতক্ষণে—বধূর রাশি রাশি করা কেশদামে তমসাবৃত মাথার ওপর থেকে জরিদার বেনারসীর লাল ঘোমটা—একটু একটু ক'রে পেছন দিয়ে সরে গিয়ে হেলে পড়েছে—ছান্দসী খোঁপাটির ওপরে। সেখানে গোঁজা সোনার চিরুণীতে আটকে যাওয়ায়। কানের ঝক্‌মক্ করা পাথর সেটিং দুলেতেও পড়েছে তা আঁটকিয়ে।—যুবতী বধূর মাথায় রাখা আধা ঘোমটারও আছে—সময় বিশেষের কিছু বৈশিষ্ট্য! যেমন আছে সুন্দরী কেশবতীর খুব ভাঙ্গা চুলের বিশিষ্টতা!

শুচিস্মিতা সুপ্রিয়ার বধূ জীবনেতে পদার্পণের স্বাক্ষরটি জ্বলজ্বলে প্রভায় প্রগাঢ়তা নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে—সিঁথির ওপর দিয়ে টানা লাল রেখাঙ্কনটি ধরে।—স্বামী পলাশকে দেখে যেন সেই সিঁদুরের রেখাটি তার লম্বা বিস্তৃতির আঁক ধরে ধরে—আরও যেন টক্‌টকে জৌলুস ফুটিয়ে হেসে উঠেছে—পুণ্যশ্লোকের পরিচিতিটি জানাবারই জন্য। কপালের ওপরে, মাথায় সামনের চুলেতে পরা টায়বার সোনার মধ্যে বসানো আছে— ছোট ছোট কয়েকটি লাল চুনি। ওরাও ঝরাচ্ছে ঝিকিমিকি করার দ্যুতি। কপালের মাঝখানে সিঁদুরের সিকির মতো বড় টিপটির রূপ যেন আরো বাড়িয়ে তুলেছে—সমস্ত কপালের মাঝখান থেকে আরম্ভ ক'রে দু'ধারের কপোলের মাঝ বরাবর পয্যন্ত —লবঙ্গর ছাপ দিয়ে আঁকা শ্বেত চন্দনের বিন্দুগুলো। সুমসৃণ গলায় পরা সোনার চিক্‌টির মাঝখানে

সেট্ করা হীরকখণ্ডটির তীক্ষ্ণ আলোর ঝক্‌ঝক্ করা ছটা সোজা ভাবে ঠিকরিয়ে পড়লো—পলাশেরই এই মুহূর্তের প্রিয়ার প্রতি প্রসারিত রাখা মদির করা দৃষ্টির মধ্যেকার—ডাগর হোয়ে থাকা—লাজুক লাজুক চোখ দুটোতে। হীরকেরই বর্ণচ্ছটা আলোয় আলোয় প্রিয়াকে মায়াজালে ধরে রাখলো।—আর সুপ্রিয়ার এ ভাবেতে ছান্দস্ রূপ নিয়ে ঘুমানো অবস্থাটির ভাবতরঙ্গিমা ছাপিয়ে তার লাল লাল ঠোঁটের কানায় কানায় ঝরে পড়েছে দুষ্টু মতন হাসিরই ফুল্ল ছবি। ছবির মতো ক'রে ঠোঁট দুটিতে লাল পরাগ মাখানো। আর ঐ মিষ্টি অথচ দুষ্টু হাসিটিও তাই ঠোঁটের রঙের পরশে—গাঢ় লাল আভায় আলোকিত হ'য়ে উঠেছে। সুপ্রিয়ার শুচিস্মিতা মুখখানির এ হাসি যেমন মিষ্টি ঝরানো— তেমনি তা আমেজ মেশানো। আবেশ দেওয়ানো। নিলাজ ভরানো।

শ্রাবন্তীর সন্ধ্যার মতো অনুরাগবতী—এই সুপ্রিয়ার অনিন্দ্য মুখশ্রীর সব সুষমা ভরা স্নিগ্ধতার থেকে—তারই শুচিস্মতা পরিচিতিতে ঝলমলানো লাল লাল ঠোঁট দুটির শোভা ও স্নিগ্ধতা দেখতে দেখতে—পলাশের সবুজ মন রিমঝিম ক'রে নেচে উঠলো—একটি আকস্মিক ভাব-তরঙ্গিমার টানে স্মরণের মধ্যে দেখা দেওয়া—সুখেরই গমকে খুশীয়াল থাকা কথয়। আর সুখ নাচানো চিন্তায়।

মধুর আর সুন্দর যৌবনের অধিকারী এই পলাশ তাই অনুভব কোরল—তার নিজের ঠোঁট হঠাৎ এক পরম অনির্বচনীয়তার আহ্বানে সাড়া দেবার জন্য—একটা জানা ও চেনা আবেগেরই তাড়নায় কেঁপে গেল থর্ থর্ ক'রে।—তাই পলাশের ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে মিষ্টি ঝরানো হাসির সঙ্গে মিলে-মিশে বেরিয়ে এলো—যৌবনান্বিত ঈপ্সারই একটি আবছায়া ভরা ছবির—ছন্দময়, গতিময় মৃদুল আভাসখানা।

তারপর পলাশের যৌবনে মদির হওয়া—স্নিগ্ধ চোখের মিষ্টি চাহনির ওপর ওপর বার কয়েক পলক ওঠা-নামা ক'রল। ঠোঁটের কাঁপন তাকে স্বস্তি দিল না। করালো ব্যতিব্যস্ত।

বাগানের দিক্‌কার ঐ প্রশস্ত জানালাটির উঁচু জায়গার চওড়া মোজাইকের ওপর—আর একজনের পাশাপাশি ভাবেতে বসবার মতো জায়গাটুকুকে খালি রেখেই—গ্রিলের সঙ্গে আপন শরীর ঘেঁষে বসেছিল বধূ সুপ্রিয়া।

সেদিকের খালি জায়গাটুকুর দিকে পলাশ তাকিয়ে একটুখানি কি যেন ভাবলো। তারপর অতি সন্তর্পণে আপন মঞ্জুলিকার একরকম বসে বসে ঘুমিয়ে থাকার পাশটিতে—পলাশ মুখোমুখী হোয়ে বসলো।— মেঝের ওপর প্যাডের স্লিপার পরা পা দুটি ঝুলিয়ে রেখে।

বসবার পর কয়েক সেকেণ্ডের বিরতি দিয়ে—সুপ্রিয়ার কাঁধের ওপরেতে আলিঙ্গন বিস্তার করার মতো ক'রে পলাশ নিজের হাত দুটি রাখলো।—গলার ত্বক-মসৃণতার মোলায়েম ভাবের মধ্যে দিয়ে—যুবক তার ঐ হাতের আঙুল

বুলিয়ে আদর জানালো। প্রায় ঘুমিয়ে পড়া প্রিয়ার দেহী-গাঙ্গেতে সাড়া জাগাবার চেষ্টা ক'রলো।

সত্যি, সত্যি—এ যেন ঠিক বিদিশার নিশা শেষ হওয়ায়—আর প্রিয়তমরই হাতেরই শীতল ছোঁয়া পাওয়ায়—রূপকথার ঘুমের দেশ থেকে মুহূর্ত মধ্যে মুক্তি পেয়ে গেল—পলাশেরই এই রাজকন্যাটি।—তন্দ্রার মধুছন্দা ভাবটি তখনি প্রিয়ারই সুষমায়িত শরীর থেকে কেটে গেল। কিন্তু বিদিশার আঁধার মাখানো ঘুমের ঘন রেশটুকু কিন্তু এখনি ভারী হ'য়ে থাকা টানা টানা চোখের পাতা থেকে উধাও হোল না। হোতে পারেনি বলেই ডাগর ডাগর বিলোলতা ছড়ানো চাহনি মেলে দিয়ে—তাকালো না এই বধূ সুস্মিতা।—জাগা, অথচ ঘুম ঘুম ভাবের জড়িমা জড়ানো চোখে-মুখে—অবশ্য পরাগ রঞ্জিত প্রসাধনের ওপর দিয়ে ঝল্সে উঠলো—হৃদয়েরই মনসিজ করা হাসিটি। ঝলকে ঝলকে এরই ঝলস্ আরও গাঢ় রঙেতে রাঙালো—সুপ্রিয়ারই ঠোঁটেরই শোভাময় লাল রেখাঙ্কনকে। লাল পবিত্রতাকে।

আপন শুচিস্মিতার সেখানকার নরম নরম ঠোঁটেতে রঙটি গভীর হবার সঙ্গে সঙ্গেই—স্বামী পলাশেরই হাসিতে আনন্দেতে স্বতঃস্ফূর্ত থাকা মুখটি—প্রবল হওয়া আবেগেরই আবেশ ফোটাবার জন্য—সুপ্রিযার মুখশ্রীর একদম ঘনিষ্ঠতার মধ্যে ঝুঁকে পড়লো। অঘটন না ঘটারই মতো ঘটনা ঘটালো—যুবক স্বামীরই উচ্ছ্বলিত ধারার দুষ্টুমিপনায় থাকা তপ্তালিক পরিচিতি!—পলাশের হাসি-খুশীতে ঝক্মকানো অধর স্পর্শ করলো—প্রিয়া সুপ্রিয়ারই নরম নরম ঠোঁটের রাঙা আভাকে। তারই নম্র স্নিগ্ধতাকে। তারই দুষ্টুমিকে।—তাই প্রিয়র নিজস্ব দুষ্টুমিপনায় স্ফূর্ত মুখটিতে জেগে ওঠা অভীপ্সার সেই আবছায়া ঘেরা ছবি—সিক্ততায় ভরা ছোঁয়ার ভেতর দিয়ে ভেসে উঠলো স্পষ্ট ভাবরূপটির মধ্যে—সুপ্রিয়ারই হাসিতে-খুশীতে ঝক্মক্ করা মুখের লাল লাল রেখাঙ্কনের ওপরে।—আর তারই ঝড় হোয়ে ওঠা মাতাল অবস্থার মধ্যে—মুঠো মুঠোতৃপ্তিতে তপ্তালিকা হোয়ে জানালার মোজাইকের ওপরেতে বসে থেকেই—সুপ্রিয়া নিজেকে স্তূপ স্তূপ করা বিলোলতায় এলো করাবারই জন্য ছোট্ট শিশুটির মতো কোরে—স্বামী পলাশেরই কোলের মধ্যে সমর্পণ করালো। প্রিয়র সুনির্ভয়ের আর সুনিভৃতির তাপ জড়ানো কোলের আশ্রয়েতে এ মুহূর্তের নিবৃত্তি ধরে সুপ্রিয়া কুঁকুড়ে মুকড়ে উঠতে লাগলো—পলাশেরই কঠিন বাহুবন্ধনীর নিগড়ে। আর টক্টক্ লাল ঝলস্ ছড়ানো বেনারসীর পবিত্র ভাবের আবরণ থেকে—লাজুকলতাটিরই মতো আদরে আদরে গড়িয়ে পড়েছে প্রিয়ার

নরম তুলতুল করা যৌবন তরঙ্গিমা—প্রিয়রই কোলের সুতৃপ্তিকায় ঘেরা সুনিভৃতিতে। সুনিশ্চয়তার মধ্যে।

এই মদির করা ছোট্ট পৃথিবীর নিথরতাকে ভেঙ্গে দিয়ে প্রথম কথা বললো—খুশীয়াল হোয়ে ওঠা সুজনকে যুবক। ও চাইলো—তারই মন-ময়ুরী এই যুবতীর লাজমাখা লাল অধরেতে ঝিলমিলিয়ে উঠুক—কথার ফুলঝুরি!—তারই প্রিয়া আদুরে গলায়, আর কাটা কাটা ভাবে বলা কথায়—ঝরাক প্রণয়াকুলতা!

পলাশ তাই কথা বললো তারই আদর করার কারুকাজটুকু শেষ ক'রে। কথা শোনাবারই জন্য দু হাতেতে সুপ্রিয়ার এলো হওয়া মুখখানার মধুরতা ভরা রুচিরাকে তুলে ধরলো। লজ্জাবতীর মুখের আঙ্গিনা উপছিয়ে তখন সপ্রগল্ভ হাসি নাচানাচি কোরে উঠেছে।— সেই হাসির রঙীন আভার মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে পলাশ জানালো—"আমার মধুমিতা। আমার আনন্দিতা। তুমি আজ পুরোপুরি সুখী? কী, বলবে না? আমার দুষ্টু?"

প্রিয়র নিলাজ অধরের আঁকিবুঁকিতে ছাপা লাজ মাখানো নিজের মুখটিকে একটু নুইয়ে রেখে সুপ্রিয়া কাটা কাটা কথায় আদরের রেশ ফুটিয়ে বললো—"তার আগে বল, তুমি নিজে সুখী হোয়েছো? জান পলাশ, তুমি আমাকে অসম সুখী মেয়েদের মধ্যে থেকে খুশীর যৌবনধারায় ভাসিয়ে রেখে কোরে তুলেছো—সুখেরই ঝরণা। শোন, এই পলাশ?"

প্রিয়া সুপ্রিয়ার মধুর কথা শুনতে শুনতে—তারই পরাগ সুষমায়িতা গালেতে নিজের মুখের একটি ধার ছুঁইয়ে রেখে পলাশ জানালো তখনি—"এই প্রিয়া। এই মেয়ে, বলি তুমিও সুপ্রিয়া আমাকে আমারই তৈরী ঝরনাধারায়ই প্রতিনিয়ত ঊর্মিমালায় ঘিরে ঘিরে রাখছো না? তোমাতে আমাতে থাকা অভঙ্গুর সুখেতে? তোমাতে আমাতে থাকা অভঙ্গুর খুশীতে? আচ্ছা প্রিয়া; বলি কি জান, যে, তুমি—"

নিজেই শেষ কোরল না নিজেরই বলতে চাওয়া কথাটিকে। শুধু রাশি রাশি হোয়ে ঝরে পড়া দুষ্টু হাসির গমক ধরে ভেঙ্গে পড়লো প্রিয়া সুপ্রিয়ার সুজনকে স্বামী—এই পলাশ!

—"এই। এই ছেলে। বল না, কি বলতে চাইছ?"—আদর-ছন্দিত থাকা গলার রেশ থেকে সুপ্রিয়া জানতে চাইল, কথায় কথায়।

সবুজ গাঢ় যুবক-দেহের মধ্যে ধরে রেখে হাতের বাঁধন আরো শক্ত ক'রে নিয়ে পলাশ বলল—"কি যে মেয়ে বাব্‌বা! তোমায় যেন বুঝে ওঠা ভার, তেমনি অন্যকেও তুমি যেন বুঝতে চাও না? এই সুপ্রিয়া। এই দুষ্টু। বলি,

দুস্টুমির মধ্যে একটিবার লক্ষ্মীটির মতো, হ্যাঁ গো, এই আর কি আমাকে তুমি নিজে থেকে শুধু একটিবার—"এবারও বলতে চাওয়া কথাটি শেষ হোল না। স্বামী পলাশ—তার বধূকে সেটি পারল না—জানাতে। দুষ্টু রঙ্ ভরা হাসিটা আর একটু !উজজ্বল হোল। আর একটু নিলাজ হোল।

ভালোবাসার মাদকতায় ঝল্‌মলাতে থেকে ঝক্‌মকিয়ে উঠে সুপ্রিয়া বলল—"কি মুস্কিল! ভারী দুষ্টুমি কোরছ কিন্তু। কি, সেটা মুখ ফুটে জানাবে ত', না খালি বলতে নেমেও থামিয়ে থামিয়ে দেবে কথা বলা! খুলে বল। তবে ত বুঝবো।"

এবার অবশ্য পলাশ আর নিজে থেকে কথা বলার চেষ্টা ক'রল না। তার ঠোঁটে ঠোঁটে উপছে থাকা দুষ্টু হাসিটি কাঁপা কাঁপা ভাবটিই আরো সরব উচ্ছলিত হোয়ে জানালো ইঙ্গিতে—"দ্যুৎ মেয়ে! তুমিও কম নও। বলি আদরটা কি শুধু আমি নিজহে কোরব? আর তুমি? তুমি কি থাকবে তোমায় আদর জানানোর পরে, এই তারই জন্য পালটা আদরেতে নিথর। নির্বাক। বল সুপ্রিয়া।"

হাসিতে রঙীন ঝলকানি খেলিয়ে সুপ্রিয়া বলল—"এই, দুষ্টুমি হোচ্ছে। খোলাখুলি ভাবে বলেই ফেল না কথাটা। জানাও না তোমার আবদারটি। ঠিক-ঠিক দুষ্ট ছেলের মতো ক'রে।"

প্রিয়র মুখের দুষ্টুমির ঝরন্যধার থেকে তখনি প্রিয়ার প্রতি ঝরে পড়লো উক্তিটি—"এই প্রিয়া। এই বৌ। আমার আবদার চাইছে তোমারই অধরের লাল লাল ঠোঁট দু'খানা থেকে নির্ঝরিত হওয়া সিক্ত ছোঁয়াচটিকে! বুঝলে, না বুঝলে না, কি গো মেয়ে? বলি, এমনি ক'রতেই তুমি হোয়ে ওঠো না লাজবতী? আর মুখে এনে বলার জন্য কেঁপে কেঁপে উঠলো না লজ্জার মুঠো মুঠো করা রেশটি তোমারই অধরের বাঁকাচোরা হাসিতে? বাব্‌বা, কী মেয়ে যে তুমি!"

পলাশের মুখের এই মধুর করা কথাগুলো শুনতে শুনেত—সপ্রগল্‌ভিতার হাসিতে ভেসে গিয়ে সুপ্রিয়া জানালো—"ওগো পলাশ। শোন। সব হবে। নিশ্চয় হবে। কিন্তু তার আগে।"—বলতে বলতে কথা অবশ্য সম্পূর্ণ না ক'রে সুপ্রিয়া অতি সহজে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল মুক্তিপ্রয়ারই মতো—স্বামী পলাশেরই বাহুপাশের কঠিন করা বাঁধন থেকে। ছাড়িয়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জানালার ওপর থেকে ঝুপ ক'রে নীচের মেঝেতে নেমে পড়লো সুপ্রিয়া—নাচের ছন্দ ধরে সমস্ত শরীরময়তায় হিল্লোল তুলে।

"আরে! এই মেয়ে! কি হোল? এমনভাবে নামলে কেন?"—বলতে বলতে জানালার ওপর থেকে পলাশ নিজেও নেমে পড়লো। আর নেমেই দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে ধরতে গেল সুপ্রিয়াকে।

প্রিয়র হাতের প্রসারিত ঝরানো আশ্রয়েতে নিজেকে ধরা পড়তে না দেওয়ার মতো ক'রেই বেশ একটু অনুনয়ের ভঙ্গিতে সুপ্রিয়া বলল—"লক্ষ্মী পলাশ। এখন আর নয়। একটু পরে আমি নিজে থেকেই তোমার কাছেতে ধরা দেবো। তাই বলে এখন একটু বিরতি দিয়ে আর ধরো না আমায়। বুঝলে, লক্ষ্মীটি? আমাকে শুধু এইটি একবারটি ক'রতে দাও।"

প্রিয়া সুপ্রিয়ার এমন করা অনুনয়টির জন্য কোন রকম কথা বলল না পলাশ। যুবকের পরিতৃপ্তি ভরা মুখ থেকে হাসির তীব্রতা ছড়িয়ে দিয়ে—প্রিয়ারই কথা মাফিক চুপ ক'রে দাঁড়ালো। দাঁড়ানোর পর পলাশের চোখের পলক পড়তে না পড়তেই—সুপ্রিয়া মেঝের ওপরেতে হাঁটু মুড়ে বসে পড়েই প্রণাম কোরল পলাশকে। সমবয়েসী হোলেও—একটি বছরের বসন্ত নিযে প্রিয়র থেকে পিছিয়ে থাকায়—এই সুপ্রিয়া পলাশকে শ্রদ্ধা করে। এটা তারই মেয়েলি রীতিকার একটি বিশেষ গুণ। একটি বিশেষ মেয়েলি আধুনিকতা! প্রাচীন হোয়েও যা ওর কাছে আজ মনে হোল—নতুন।

প্রিয়া সুপ্রিার এমন সুছন্দিত ধারা মঞ্জুলিত ব্যবহারে পলাশের প্রাণেতে অভূতপূর্ব আনন্দের সঞ্চার হোল। সুপ্রিয়া আধুনিকা হোয়েও যে এমনটা ক'রে বসতে পারে—তা তার কল্পনার বাইরের জিনিস ছিল। অশেষ রকমে অবাক হোয়ে উঠলেও—তারই বিস্ময় ধরে পলাশ পেয়ে গেল অসম তৃপ্তিকা।—তাই দাঁড়িয়ে থেকে থেকে হঠাৎ নীচের দিকে ঝুঁকে পড়ে সঙ্গেসঙ্গে দু'হাতের প্রসারিত রাখা বাঁধনে ক'রে সুপ্রিয়াকে তুলে ধরলো আপনার বুকের মধ্যে। তারই মধ্যে ধরে রেখে আটকালো। কোন বাধা না দিয়ে, আর কোন কথাটি না বলে—সুপিয়া স্বামীর কাঁধের একটি ধারে—নিজের মাথাকে শুইয়ে রাখলো—আরাম ভরিয়ে।

সুতৃপ্ত পলাশ প্রিয়ার কপোলের ওপরেতে নিজের একধারের কপোল ঘষে নিয়ে আদর করার মধ্যেই জানালো—"এই সুপ্রিয়া। এই মিষ্টি। কি গো, খুব ঘুম পাচ্ছে বুঝি?"

সুজনক এই স্বামীর কথায়—সদ্য প্রস্ফুটিত রজনীগন্ধার মতো হাসি ঝরলো সুপ্রিয়ার ছবির মতো মদালসা হোয়ে ওঠা মুখটি থেকে। প্রিয়া বধূ আবেশ ভরিয়ে মাথা তুলে লাজুক পলাশেরই শান্ত চোখ দুটোর দিকে তাকালো—যুবতী মনের সমস্ত সুখ ছড়িয়ে দিয়ে। শুভ্র ফুলের সৌরভ ঢেলে দিতে দিতে সুপিয়া বল—"না। সত্যি একটুও ঘুম আমার চোখে আসছে ন। এই, বলি তোমার আসছে না কি?"

—"না। না। দ্যুৎ, ঘুম এলেই হোল বুঝি।"— ছোট ক'রে উত্তর দিল পলাশ—রঙীন হাসির গমকেতে ভেঙ্গে পড়বার ঠিক আগের মুহূর্তটিতে। শেষে আর একটু বলল পলাশ—"এই মেয়ে, শোন। বলি, তাই বলে কি আজকের এই রাতটিতে একটুও না ঘুমিয়েই কি কাটিয়ে দেবে সুপ্রিয়া?"

ও কথার উত্তর জানাতে গিয়ে নিজের শুচিস্মিত মুখের রূপঝরা হাসিকে—তৃপ্তির ছবিতে ফুটিয়ে নিয়ে শত ধারায় ভাগ ভাগ ক'রে দিয়ে সুপ্রিয়া বলল—" সে কি? এমন মধুর ফুলেল রাতটিতে কি ঘুমানো বন্ধ রাখার কথা আছে? না, সে রকম কোন মানা নেই। তবে কি জান, আমাদের বিবাহিত জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে এটাই ত' হোল প্রথম লাজবাসরের দাম্পত্যিক লাজহরণ করার মধু-রাত! তাই বলি কি ঘুমিয়ে পড়াটাকে যতটা দেরি করানো যায়, ততই তা হোয়ে উঠবে মধুর। আর সুন্দর। ওগো মিষ্টি, আমার কিন্তু এই ফুলে ফুলে ছাওয়া রাতের পরম নিভৃতির মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তে মোটেই ইচ্ছে ক'রছে না। সত্যি, সত্যি।"

তখনি পলাশ বলল—"এই সুপ্রিয়া, বল, তা হোলে আর ঘুমোবে না, এই ত'?"

নিজের মাথাটিকে আবার পলাশের কাঁধেতে আরাম ক'বে রেখে দিয়ে আদর মাখানো গলায় জানালো সুপ্রিয়া—"এই দুষ্টু, বলি এক সময়ে ঠিকই ঘুমিয়ে পড়বো। বুঝলে, নিশ্চয়ই ঘুমোব—যদি এখনি আরম্ভ ক'রে তুমি আমাকে তোমারই যুবকত্ব দিয়ে নিরূপিত আদরের রীতিধারার মধ্যে ভাসিয়ে—ঘুম আর, ঘুম আয় বলে ছোট্ট এক মেয়ের মতোই আমায় শেষ পর্যন্ত ঘুমটি পারিয়ে দাও। কেমন?"—বলতে বলতে শেষটায় প্রিয়া সুপ্রিয়া ছোট মেয়েটির মতো শিশুর দেয়ালা হাসি ঝরিয়ে আবদার ক'রে বলল—"এই পলাশ। চল। বিছানায় শোবে চল। ঘুম পাচ্ছে। আর দাঁড়াতে পারছি না। পলাশ, লক্ষ্মীটি আমার। ঘুমাবে চল।"—কথা শেষ না করার মতোই ক'রে আবার হাসির সেই শুভ্র সৌরভ সুপ্রিয়া ছড়ালো খিল্‌খিলিয়ে। কাজল আঁকা রূপের মধ্যে মদিরা টল্‌মল্ করা চোখ দুটো বন্ধ ক'রে ফেললো সুপ্রিয়া—চিরকালীন প্রিয়ারই দুস্টুমিতে ঝল্‌মলানো ঘুমের মহলা দেখিয়ে—আধ বোঁজা পাতার ফাঁক থেকে।

—"এই, এই। দুষ্টু মেয়ে। চল ঘুমোবে। বিছানায় লুটিয়ে পড়ে তুমি ঘুমোবে যে কত, তা আমার ভালো রকমেই জানা আছে। বাব্ বা, এ ত বোঝাই যাচ্ছে যে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে ত' যত রাজ্যের যত রকমের দুষ্টুমি আছে, তার সবই করার মধ্যে দিয়ে জানাতে থাকবে আমারই প্রতি। সত্যি বল, তাই না?"—বলে

এক রকম জোর ক'রে প্রিয়া বধূকে নিজের তাপঝরা বুকেতে সঘন ক'রে বাঁধন দেওয়ালো। ক্রমে ক্রমে জোর দিয়ে বাঁধনকে করালো—আরো শক্ত।

—"উঃ। উঃ। অত জোরে ধরে না গো। দেখছি ত' তুমি সবই জান। তবে আর প্রশ্ন করা কেন? এই দুষ্টু! জানই ত' যে মেয়েরা তাদের জীবনের এমন প্রথম মধু-রাতটিতে যৌবনের জন্য লাজ-হরণক করা নিলাজ-বাসটিকে সাজাতে চেয়ে—লাজ-বিছানাটিতে শুয়ে শুয়ে তারই প্রিয়র বুকেতে জড়ান অবস্থায় শুধু দুষ্টুমি কোরতেই ভালোবাসে! লক্ষ্মী পলাশ, বলি কি আমার সাথে যোগ দিয়ে তুমিও দুষ্টুমি কোরো হাজার বার, কেমন? আর পারছি না গো। কথায় শুধু কথাই বেড়ে যায়। চল, এইবারটি।"

আর কোন কথাটি হোল না এর পর। দু'জনে এগিয়ে গিয়ে বিছানায় উঠে বসলো। তারপর কয়েক পলক পরে একই সঙ্গে নরম বিছানায় পাতা ভেলভেটের শুভ্র আচ্ছাদনের ওপরেতে গড়িয়ে পড়লো। শোয়ার আগে কেউই নিজেদের পরনের শৌখিন পোশাকাদি পরিবর্তন কোরল না। সুপ্রিয়াই শুয়ে পড়ে হাত বাড়িয়ে আলোর সুইচ্‌টিকে অফ্ ক'রে দিল। আলোকে বিজয় ক'রে আসা সঘন অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই—দারুণ খিল্‌খিলানো হাসির ঝরনা ফুটিয়ে—সুপ্রিয়া তার ছবির মতো যৌবন-ঘন অনিন্দ্য শরীরের অপার বিস্ময় নিয়ে ঝল্‌মলানো বুকের—টইটম্বুর লাজ-পেশলতায়—আবরণ টানা শাড়ীর অংশটা চওড়া জরিদার আঁচল সমেত—বিছানার একটি ধারে ছড়িয়ে দিল। তারপরে বিছানার থেকে নিজেকে একটু ওপরের দিকে তুলে নিয়ে মুহূর্ত মধ্যে—সুন্দর পলাশেরই যৌবনের প্রখরতায় তপ্তালিক থাকা—বুকের ওপরেতে সজোরে নিজেকে লুটিয়ে দিয়ে রাখলো। আর ততখনি এক সপ্রগল্‌ভা বন-হরিণীর মতো চঞ্চ ল উর্মিমলালায় নাচতে নাচতে প্রিয়া সুপ্রিয়া নিজের লাল শোভায় মদির করা ঠোঁট দুটি দিয়ে মঞ্জুলিক পলাশেরই সুস্মিত মুখেতে চেপে রেখে—ঘন ঘন চাপ ছোঁয়াচে—আঁকতে আঁকতে চুম্বনের মদিরা পান করাতে লাগলো। আপনার ঠোঁটের রঙেতে লাল করিয়ে তুললো—প্রিয়তমর অধরকে।—আর ওদিকে সুপ্রিয়ার বুকের আঁট-সাঁট মাপের রেশমী ব্লাউজটার প্রায় নিরাবরণা রূপটির ভেতর থেকে— শ্বেতশুভ্র স্তনবাসের কঠিনতর করা বাঁধনের টানে টানে—সেই মাধুর্য্য—পীনোন্নতায় রিদ্‌মাস্ কবিতা হোয়ে রূপ পেল।—লাজ-পেশলেতে প্রস্ফুটিত নিলাজ-নিটোল সুন্দরী স্তনযুগল সত্যি সত্যি পলাশের সবুজ বুকের ওপরকার যুবকত্বের মধ্যে—সুছন্দিত ওঠা-নামায় আপীনতার শিহরকে মুঠো মুঠো ক'রে লাগিয়ে লাগিয়ে—অভিষিক্ত করালো সুপ্রিয়া—তারই যৌবনখচিত

শৈল্পিক বুকখানার "That warm, white, lucent, million-pleasured breast"—সত্যি, সত্যি, দাম্পত্যিক রীতি মাফিক ক্রিয়ার ছান্দসী বুকের খুশী—সেখানকার আপীন ছোঁয়ায় ছোঁয়ায়—স্বর্গসুখের মন্দাকিনী ধারায় প্রবাহিত মুঠো মুঠো আরাম—পীন ভাবের শিহরে শিহরে প্রিরয়াল যুবকেরই—বুকের তপ্ততার মধ্যে বসিয়ে দিয়ে দিয়ে—অভিনন্দন করালো মঞ্জুল পলাশেরই সবুজ আবদার ঘেরা বুকের—খুশীযময়তাকে! প্রিয়রই বুকের আহ্লাদ ভরা যুবকত্বকে!—তাই এরই পুলকেপুলকে দোলনের ঝুলন খেলায় মাতামাতি ক'রে—স্বামী পলাশের খুশীয়াল থাকা মনটি দাম্পত্যিক রস-সায়রেতে বেপথুমন নিয়ে—ছুটে চললো। বধূ সুপ্রিয়া নিজেও তখন বেপথুমনা আর সপ্রগল্‌ভা হোয়ে উঠেছে। লাল অধরের সিক্ত-ছোঁয়াচ্ আর গীতি-কবিতার মতো রিদ্‌মাস বুকের নিটোলতায় ঝক্‌মকানো পীন-ভাবতরঙ্গিমার মধুর বিলোলিত পরশ দিয়ে—স্বামী পলাশেরই জন্যে—প্রিয়া মধূর থেকে নির্ঝরিত অনিন্দ্য ভালোবাসার আঙ্গিনায় থেকে এই মধুবাতায় কাঁপা কাঁপা রাতটির প্রথম যামের প্রথম পদক্ষেপেই প্রতিদান দিয়ে যেতে পারলো—এই লাজ-বাসরেরই অধিশ্বরী—বধূ সুপ্রিয়া। আজ সত্যি সত্যি, এই ফুলে ফুলে ছাওয়া মধু-রাতটিতে নিজেদের দু' বছরের পুরানো ইতিহাসকে মহান থেকে আরো মহীয়ান ক'র তুললো—সুপ্রিয়া নিজে।—কেন না বধূ সুপ্রিয়া প্রিয়ার আরতিতে প্রণয়ের আর্তি নিয়ে বুঝেছে যে—"ওগো পলাশ। শোন, তোমার গরবে গরবিনী আমি। আর রূপসী তোমারই রূপে।"

আর তাই সুনন্দিতা রধূ-রত্নার আবেশিত দেহের আশ্রয়েতে—স্বামী পলাশকে হ্লাদিত রাখার মধ্যে দিয়ে—আপনার মঞ্জুলিত বুকেরই রূপাধারের আপীন লাজ নিয়ে সাজানো হৃদি-সিংহাসনেতে বসিয়ে বসিয়ে—প্রিয়তমকে জীবন-দেবতারই ধ্যানে আহ্বান জানালো—পরম নিষ্ঠার এক মাঙ্গলিকী দিয়ে। অতি আধুনিকারূপী এই চিরন্তনীকা।

আদরে আর তারই আবেশে—ও তারই জন্য আবদারের মিলন-বাসরে ঝুলন নিয়ে মাতোয়ারা থাকতে থাকতে—বহু পল হোয়েছিল অতিবাহিত। পলাশ তারই পরিণীতা এই সুপ্রিয়াকে নিয়ে—মিথুনের কারুকাজকে শিল্পসমৃদ্ধ করাবার ছন্দ-যতি-মিল ধরে ধরে—ক'রতে চেয়েছে দাম্পত্য-জীবনেতে পারস্পরিক যৌবনায়ন করা—স্বর্গ রচনার পালা। তারই কর্তব্যের রূপরীতি! তারই ধর্তব্যের কবিকৃতি! দেহ ও মনের চাহিদা ও তাগিদ—পলাশকে তারই আনন্দিতা বধূর রূপ-সুষমায় ঢল্ কাঁপানো অনিন্দিত বুকের মুঠো মুঠো কোরে আরাম ছড়ানো—নরম আশ্রয়ের মধ্যে হ্লাদিত রাখায়—স্বামী পলাশ দেহ ও মনের রূপ-পরম্পরাকে একাকার

করার মধ্যে মনের স্মৃতিপটে জ্ঞানের প্রমিতি জড়ানো দীপ জ্বালালো।-প্রিয়ার ঘুম ঘুম জড়ানো আবেশিত দেহের নিরাবরণ প্রায় তাজা যৌবনকে অধরের চুমায়নে অথির বিজুরি করাতে করাতে ভাবলো "The psychic and physical disimilarity between man and woman does not mean that she is in any way inferior, but that she is his complement, required to make him whole. But for successful married love the man must generally occupy the aggressive role, woman the submissive one. The bride no longer needs to promise to obey unless she whishes to make this promise. On the other hand, if she dominates her husband the marriage has small hope of success. To be the submissive partner is truthfully woman's greatest privilege, for although is ruled by the man, at the same time she holds him captive "

"হ্যাঁ। হ্যাঁ। তাই ঠিক। তাই পরম সত্য—দাম্পত্যরীতিকায় ঝল্‌মল্‌ করা—যে কোন যুবতী বধূর মধ্যে সুন্দর হওয়া, আর মধুর থাকা চাহিদা ও তাগিদের মিলন মুহর্তৃটি।"—পলাশ তাই ভাবলো সুসমঞ্জস ভাবনার নিরিখ ধরে—আপন বধূ মঞ্জুলিকার এই মুহূর্তের দেহীসায়রের সৌন্দর্য-সঘন রেখায় রেখায় শতবার হোয়ে ফোটা—নিলাজিতা রূপটি একটু নিথর হোয়ে পড়ায়। সুপ্রিয়া যেন চাইছে—ঘরের চারধারের আঁধার থেকে আলোর মুক্তি!—সত্যি সত্যি—হাবে-ভাবে-বিভাবে সুপ্রিয়া তার আদরের পলাশকে—ভালোবাসার এই ছোট ঘরেরই—ততোধিক ছোট্ট পৃথিবীটির মধ্যে করা স্বর্গ রচনার পরিকল্পনায—পথের অনুসন্ধান পৌঁছিয়ে দিতে চাইছে। এ চাওয়া হোল—আনন্দিতা এক প্রিয়ারই চাওয়ার ভুবন। পাওয়ার পৃথিবী।

ও কথা ভাবতে ভাবতে—পলাশ হাত বাড়িয়ে সুইচ্‌ টিপে ঘরের আঁধারকে পুনরায় ফেরৎ পাঠালে—ঝলমলে আলোর কারাগারেতে বন্দী করিয়ে। প্রিয়া সুপ্রিয়াকে বুকের আরাম ঝরা তাপ দিয়ে, আবেশ দেওয়াতে দেওয়াতে—বালিশ থেকে মাথা বেশ কিছুটা ওপরের দিকে তুলে ধরে—স্বামী পলাশ তার অনুসন্ধানী চোখ দুটোর শান্ত চাহনি ছড়াতে ছড়াতে ঝুঁকে থাকলো—বধূ আনন্দিতা-রূপী এই মঞ্জুলিকার ছবির মতো—মুখরুচিরার প্রতি।—হঠাৎ আঁধার সরে গিয়ে আলোর পুনরাগমনে—ধাঁধিয়ে পড়েছে আপন রূপধন্যা। তাই কজ্জলিত হরিণ খোরে পাতা ওঠা-নামা ক'রতে থাকায়—ওর চাহনি চকিত চমক ভরা বিদ্যুৎলতার মতো কোরছে—মিটি মিটি। লালাভা উপছানো অধরাধারও হাসির তীব্র ছর্‌ররায় প্রভাস না পেয়ে— যেন কাঁপছে মৃদুল দোলায়। পরাগ প্রসাধিত কোপলেতে ছন্দিত টোল আর পারছে না—গড়ান ধরে গড়িয়ে যেতে।

প্রিয়ার চোখ মদালসা হোয়েও নিথর। দুষ্টুমির ঘন করা রঙ্‌টিকে হারিয়ে ফেলারই

দরুণ—অধর থরে থরে কাঁপন ধরা।—তাই প্রিয়ার অধরের কাছাকাছি মুখ নামিয়ে এনে—আলোর ঝল্‌মলানো সঙ্গ উপভোগ ক'রতে ক'রতে পলাশ কথায় মুখর হোল—"কী মেয়ে! এত নিথর হোচ্ছ কেন? ও বুঝেছি, আমায় না ঘুমানোর ফিরিস্তি জানিয়ে, এখন দেখা যাছে, যে, উপদেশদাত্রী নিজেই ঘুম ঘুম চোখেতে—জড়িয়ে পড়ছো? বলি প্রিয়া, বল, হ্যাঁ, নিজে থেকেই নির্দেশ দেও সহযোগিতা দিয়ে আর প্রেরণা যুগিয়ে— কেমন ক'রে আর কখনে সত্যি সত্যি আমাদের পরিকল্পনায় ধরা স্বর্গ রচনার কাজটিকে—করাতে পারবো বাস্তব? করাতে—পারবো আমাদের ছোট পৃথিবীর চার দেওয়ালের মধ্যেই—মিথুনিক রীতি ও ঋতু ধরে ধরে নিশ্চয়—ঐ স্বর্গ রচনা? কিগো, ঠিক না? ওগো সুন্দর, আজই থেকে আমরা আমাদের প্রেরণা যোগান দিয়ে এরই পরিকল্পনার সমাধান করাবো, কেমন?"—কথার শেষে প্রিয়ার সুস্মিতাধরে বলতে চাওয়া কোন কথাটিকে সুপ্ত হোতে না দয়ে—আপনার অধর তার মধ্যেই লাল রঙ ধরে স্থাপন করানোর ভেতর দিয়ে—গভীর ভাবে অধরালিঙ্গন সমাধা করালো—স্বামী পলাশ।

"এই। এই। পলাশ, শোন শোন।"—কাটা কাটা আদুরে সুরেতে প্রিয়তমকে আহ্বান জানাতে জানাতে, আপনার এইমাত্র চুমায় চুমায় আলপনা হোয়ে ফোটা মুখের কথায় ঢল্ নামালো—বধূ সুপ্রিয়া। স্বামী পলাশের অধরের চুমায়ন যে গতির খুশীয়াল উর্ম্মিমালায়—প্রিয়ার মুখরুচিরাকে আদর কোরলো এই একটু আগে— সেই তারই আদর পাওয়ার রেশ থেকে ঝকমকিয়ে উঠে সুপ্রিয়া জানালো—"ওগো পলাশ। স্বর্গ কে বলল রচনা করা হোচ্ছে না? শোন মিষ্টি, এই যে এই মুহূর্ত ধরে আমাদের দাম্পত্য-রীতিকাগুলো যত রকমে আমাদের একজন থেকে আরেকজনাতে ভালোবাসার ঋতুসাজে সাজায়েছে— সেই সবই কি স্বর্গ রচনার ইঙ্গিত এনে দিচ্ছে না? এই দুষ্টু। বলি, এই যে তুমি এই মাত্র আদর করার মধ্যে আমার অধরের কিনারায় কনারায় নানানভাবে চুমারই চুমকিলতায় সাজালে, সেইগুলো কি স্বর্গের পারিতাজকে ফোটালো না থরে থরে আমারই ঠোঁট যুগলে? তোমার চুমা হোল পারিজাতকে ফুটিয়ে তোলার ছন্দ। সত্যি সত্যি। এই মিষ্টি। আর আমার মতো দুষ্টু মেয়ের অধরের ঐ পালটা ছোঁয়ায় যে পারিজাত পেয়ে— যায় অমরত্ব।"—কথা বলতে বলতে আর তীব্র হওয়া হাসির ঝল্‌মলে ছর্‌ররায় নাচতে নাচতে—সুপ্রিয়াও তখন তার থুব ভাঙ্গা মাথার বিদিশার ঘন আঁধার নিয়ে, আর এলো হওয়া রাশি রাশি কেশদামে মায়ারাগ ফুটিয়ে—স্বামী পলাশেরই লাল হ'য়ে ছেপে ওঠা মুখের শুচিস্মিত রূপের অতি কাছটিতে নিয়ে রাখলো—আপনার নিলাজিত মুখ।

"এই যে, একেই বলে স্বর্গ রচনার পরিকল্পনায় ফোটা নন্দনের পারিজাত;"—বলতে বলতে প্রিয়া সুপ্রিয়া আর একটুমাত্র মুখ নিয়ে এগিয়ে স্বামী পলাশের অধরাধারে ন্যস্ত করালো ঘন ভাবেতে নিজের লাল ঠোঁট দু'খানাকে। শ্রাবস্তীর সন্ধ্যার মতো অসম অনুরাগ দিয়ে প্রিয়তমর যুবকধরকে রাঙিয়ে তুলে—বেশ কছু সময় পরে বধূ সুপ্রিয়া তারই প্রাণাধিক সুজনকে জানালো মুখের আবেশ জড়ানো অবস্থায় কাটা কাটা গলায়—"এই। এই। বলি মনে পড়ে—কবি সত্যেন দত্তের সেই কবিতাটির—জাপানী নায়িকা কুমারী ও' হারুর কথা? প্রিয়র জন্য যার যৌবনখচিত বুকেতে ফুটতো পারিজাতের কুসুমদল? বলি আমার বুকেতেও কি তাই বিকশিত হবে না, থরে থরে দোল খাওয়া পারিজাতগুচ্ছ? আমার বুকেতে কি আঁকা হবে না— চন্দনের ওপর কুঙ্কুমের প্রলেপ দিয়ে ফুটিয়ে তোলা—শাশ্বতা-নায়িকা শ্রীরাধার মতো মৃগমদ চিত্রপাতি? আমার কঞ্চু লিকায় কি সীবন-শিল্প প্রকাশ করা হবে না—মঙ্গ লকাব্যের যুগ-সুষমা ধরা স্বর্গের আর নন্দনের পরিচয় লিপিতে? ওগো, আজ আমি তোমায় নিয়ে মাতোয়ারা হয়ে পড়েছি ঐ স্বর্গ রচনারই ঝুলন খেলায় দোদুলা হ'য়ে। দেহ ধরে। মন নিয়ে। ওগো পলাশ, বলি— তোমার কি ঐ চেরীফুলের দেশের প্রণয়াভিলাষিণী ও'হারু ছাড়া মনে কি পড়ে—রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি—"চার অধ্যায়ে"র নায়িকা—এলার কথা, ও কাহিনীর শেষ চমকটিকে? দেখ পলাশ, আমি ঐ এলা নই। আর তুমিও নও অতীনের মতো। আমরা অন্তরে বিপ্লবী। আর ওরা ছিল বাইরের সব কিছু নিয়ে—বিপ্লবের পথী। তাই বোধ হয় ভালোবাসার ব্যাপারে ওরা শেষ পর্য্যন্ত নানান তত্ব আর তথ্যের চাপে পড়ে থেকে গেছিলো অতি নিরুত্তাপ ভরা। অতি শীতল। কিন্তু, শেষঅবধি এলা ভ্রান্তি দূর করে সত্যকে উপলব্ধি করাতে পেয়েছিল—অসম এক সংকেটরই সংহারময় রূপের—প্রজ্জ্বল হওয়া মুহূর্তটিতে। আর তাই সর্বনাশের পথ থেকে অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক ঐ অতীনকে সুন্দরের আর মাধুর্য্যের বিজয়কেতনে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে—তারই প্রিয়া যুবতী এলা—এগিয়ে দিয়েছিল প্রকৃতির চরম অস্ত্রটিকে। আঁচলহীন ভরাট বুকখানার আবরণ দেওয়া জামার বাঁধন ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ছিন্ন-ভিন্ন কোরে—এলা আপন যুবতী-বুককে তুলে ধরেছিল অতীনেরই রূপ-বিহ্বল চোখের সামনে—মায়াঞ্জন ছড়িয়ে দিয়ে। জান ত' পলাশ, তাইতেই অতীনের সর্বনাশী ইচ্ছা সংহার থেকে নিবৃত্ত হোয়েছিল পলকমাত্রেই। আচ্ছা পলাশ, এই যে এক সংকটময় সংহারময় মুহূর্ত প্রণীয়দের জীবনে এসে পৌছয়, তা থেকে এমন কৌশলে নিবৃত্তিকে—

যে যুবতী আহ্বান ক'রে আনতে পারে, সে কি তাদের প্রণয়-লোকে স্বগ রচনা কোরল না—সত্যি সত্যি? ওগো পলাশ, বল,তাই না?"

প্রিয়া সুপ্রিয়ার স্বর্গ রচনার পরিকল্পনায় সমৃদ্ধ কথা শুনতে শুনতে পলাশ খুশীর ঝরনায় মন-বিহ্বল হোল—এমন এক মধুরাগ ভরা রাততিতে। প্রিয়ার কপোলে অধরাধার ন্যস্ত ক'রে বলল পলাশ—" শোন, শোন। জাপানী মেয়ে, কবি সত্যেন দত্তের ষেই ও'হারুর কথা আমিও পড়েছি কবিতারছি ছন্দ মিলিয়ে যতি ধরে। আর 'চার অধ্যায়'? সে ত' আমাদের কে সময় পড়া হয়েছিল পাল্‌টা-পাল্‌টি ক'রে। কিন্তু বলি কি জান? বলি এই যে, তোমারই কথা মতো মেনে নিলাম এটাই যে, একজন তার প্রিয়র জন্য বুকে ফুটিয়ে রাখতো পারিজাত, আর একজনা নিজের বুকেতে কুসুমিত সেই পারিজাতকে অর্গলমুক্ত করিয়ে সংকট আর সংহার থেকে মুক্তি দেওয়াতে পেরেছিল নিজেরই প্রাণাধিকের জন্য! তোমার মতে, স্বর্গ রচনার এটাও হ'ল একটা দিক। বিশেষ রকম। কিন্তু মেয়ে, আমার মন তবু বলছে..."

অতর্কিতে নিজের হাত দিয়ে—স্বামী পলাশের মুখ চেপে ধরে বধূ সুপ্রিয়া থামিয়ে দিল—প্রাণাধিকের মনের কোন না কোন বিস্ময় জড়ানো কথা জানাতে চাওয়াকে।

আর ঠিক তারপরেই—এক ঝট্‌কায় নিজেকে পলাশের বুকের বাঁধন থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে—বিছানার একটি ধারে, একটু তফাৎ রেখে আপন দেহখানাকে' চিতভাবে এলিয়ে দিয়ে রাখলো—বধূ সুপ্রিয়ার আর্তিখানা। ঘরময় ঝল্‌মলে আলো মায়ারাগ দিয়ে অনুরঞ্জন করাচ্ছে। চার ধারের ফুলেল সুবাস মদিরতায় ভরাচ্ছে।

একই বিছানার ওপরে—প্রিয়র অবস্থান থেকে একটু মাত্র তফাতে থেকে—বিস্তর ব্যবধানেরই মতো ক'রে তোলালো এই মুহূর্তটিকে—স্ত্রীর যুবতী দুরন্তপনা—যা সুপ্রিয়ার কাছে অতি স্বাভাবিক। যুবতী বলে। লাজ-বিসর্জনে নামা—পরিণীতা বলে।

এই সময়টিতে বিছানারই অন্য ধারে বসে থাকা পলাশ রূপের মায়াঞ্জন মাখা চোখের ডাগর করা চাহনিকে স্থির রেখে—প্রিয়ার মদালসা চোখে-মুখে আন-চানিয়ে থাকা মদিরেক্ষণা হোয়ে ঝক্-মক্ করা দেহী বিপর্য্যয়ের তরঙ্গিমা দেখতে লাগলো—খুশীয়াল বিহ্বলতায়। সত্যি প্রিয়ার একি রূপ? না, একি নন্দনেরই শৈল্পিক বিভূতি? প্রিয়ার ছবির মতো মুখরুচিরা এখন কাজলে সিঁদুরে ওষ্ঠরঞ্জনী নিয়ে লোধ্ররেণুর ওপর দিয়ে ছাপ ফুটিয়ে তুলেছে—স্বামী পলাশেরই দুষ্টুমিতে

মাতাল থাকা—অধরায়নের। যুবকেরই চুমায়ন ঘেরা যৌবনায়ন। সুন্দরী ছাঁদের মস্ত খোঁপাখানা কখন জানি ভেঙ্গে—গড়িয়ে পড়েছে রাশি রাশি কেশের আঁধার করা রূপ ছড়িয়ে দিয়ে। বালিশে, চাদরে, সেখান থেকে সুবিস্তৃতি নিয়ে অনেকটা পর্য্যন্ত ছড়িয়ে আছে—ঐ ঘন তমসা রঙ্ ভরা বিদিশার নিশা—রাশি রাশি কেশদাম নিয়ে। তা দেখাচ্ছে অনির্বচনীয়। দেখাচ্ছে শ্রাবস্তীর সন্ধ্যার মতো মায়াবিনী। তায় মদিরেক্ষণা। তার আবার আবরণ বেনারসীতে হোয়ে উঠেছে ঝলস্ ঝল্কানো—লালবসনা সুন্দরী।—আলোয় আলোয় ঝল্মল্ করা এই লাজহরণকারী বাসরেতে জেগে থেকে—দু'চোখের তৃপ্ততায় আনচানিয়ে দেখে চলেছে—স্বামী পলাশ। কিন্তু একি! প্রিয়ার ভরাট বর্ষায় টইটম্বুর বুকের যৌবনাধার থেকে অনেক আগেই—লাল আঁচলখানা গড়িয়ে পড়েছিল বিছানার মধ্যে। তবু, সেই সুযমায়িত আপীন বুকের দুই পেশল উপত্যকা ছন্দ নিয়ে বন্দী ছিল—অতি আঁট গঠনে তৈরী করা— সোনালী জরির বুটিদার রেশমেরই ঘন ক্রীম কলারের ব্লাউজের ততোধিক কঠিন হওয়া আবরণিকায়। সত্যই ত' কি জানি কি মনে হওয়ায়—এরই মধ্যে কখন অতি দ্রুততালে ছন্দ ফোটাতে ফোটাতে—প্রিয়া সুপ্রিয়া আপনার রূপসী বুকখানার দুই লাজবতী আপীন পেশলাধারকে রেশম জামার কঠিন বাঁধন থেকে মুক্ত কোরে তুলেছে—অতি সন্তর্পণে চালিত আপন হাতেতেই—গলার কাছ থেকে নীবিবন্ধ পর্য্যন্ত লাগানো প্রতিটি টিপ বোতাম—যতি ধরে ধরে রিদ্মাস্ লহর ঘেরা—ছোট্ট ছোট্ট অতি ছোট্ট শব্দ তুলে তুলে। ব্লাউজের উন্মুক্ত রূপ বাঁধন হারা হওয়ায়—দু'ধারের পাশে গড়িয়ে পড়েছে তারই রেশমী প্রান্ত। শ্বেতশুভ্র কঞ্চু লিকারও বাঁধন সরিয়ে দিয়েছে—ব্লাউজেরই ঐ পাশ বরাবর সরে যাওয়া দুই—প্রান্তের অভ্যন্তরে।—আর তাইতে—সুপ্রিয়ার আবরণ ছাড়া রূপসী বুকখানার স্বাধীনা ভাব-তরঙ্গিমা হোয়ে উঠেছে—শুধু কুন্দশুভ্র। আবরণের কারাগারেতে বন্দী থেকে যে রূপের অন্বয়—অস্বাভাবিক লজ্জার জড়িমা ঝরাতো—এখন সম্পূর্ণ নিবাবরণায় ফিরে পেয়েছে যেন প্রাকৃতিক রীতিতে কুসুমদল নিয়ে প্রভাসিত—অতি স্বাভাবিক যুবতীকার রঙ্ ও রূপ। সাজ ও প্রকাশ। দেহী প্রজ্ঞা ও প্রমা।—তাই প্রিয়া সুপ্রিয়ার এই অনির্বচনীয় রূপ-সায়রেতে স্বামীত্বের যুবক-স্বাধিকারটিকে প্রতিষ্ঠা করাবর জন্য—পলাশকে অবশ্য বিন্দুমাত্র এলো করালো না হাবে ও ভাবে।—শুধু তা দেখতে দেখতে—স্বামী পলাশের মনে হোতে লাগলো এটাই, যে,— যে প্রিয়ার রূপঝরা বুকেতে এমন রূপ পারিজাতের প্রতীক ফুটিয়ে তুলেছে— সে কি বাস্তবের কাছে কখনো হেরে যেতে পারে— তারই প্রিয়কে নিয়ে দাম্পত্যিক সর্গ রচনার কারুকাজেতে? না.

না, না। এমন প্রিয়া কখনো হয় না পরাজিতা। ও চিরকালই থেকে যায়—নীল বিভূতির দ্যুতি ভরা—শুধু অপরাজিতা।—তাই এরই এমন কথঅয় স্বামী পলাশের যৌবনায়ন মোকাবিলা কোরতে চাইল—আপন অধরাধারের চুমায় চুমায় শিহর ঝরাতে ঝরাতে—আপন প্রিয়ার ঐ রূপসায়র হোয়ে ঝল্‌সে থাকা— পেশলে পেশলে সুষমায়িত ঐ দুটি উপত্যকার বৃন্তে বৃন্তে পুষ্পায়িত—দুটি পারিজাতের রেণু পর্য্যন্ত। হ্যাঁ, হ্যাঁ—আর তাই স্বামী পলাশের মনের সরণিতে—উঁকি দিয়ে গেল তাই দেখারই দাম্পত্যিক নিলাজ-বিহ্বলতায়—ওল্ড টেস্টামেন্টের সেই সুললিত আর পুণ্যশ্লোক "সঙ্‌ অফ্‌ সঙসে"র—বাক্‌-বিভূতি। প্রিয়া সুপ্রিয়ার রূপসায়রের ঢল্‌ নিয়ে তরঙ্গসমাকুল রূপবতী বুক খানাকে—স্বামী সুজনকের সুন্দর লিপ্সা জড়ানো চোখের স্বাধিকারে থেকে—দেখতে দেখতে তাই মঞ্জুলিক পলাশ তপ্তালিক ছোঁয়ায় ভাবলো, "Let hm kiss me with the kisses of his mouth, for the love is better than wine...thy two breasts are ike two young roes of that are twins which feed among the lilies ...how beautiful are thy breasts my sister, my Spouse, Thy breasts are beautiful than wine, and the sweet smeel of thy ointments above all aromatical spices "

বাইবেলের সূক্তি-সমুচ্চয়ের "সঙ্‌ অফ্‌ সঙ্‌স" থেকে পাওয়া দর্শনে সাজানো ভাবনায় বিভোর হ'য়ে —সুজন পলাশ তার মধুকর যৌবনেতে অভিষেক নেওয়া—এক মঞ্জুলিক স্বামীর অতি একান্ত অধিকারের পরিমিতি থেকেই—আপনার মদির থাকা চোখের ভাসা ভাসা কালো কুট্টিম দুটি প্রসারিত রেখে—অপলকে দেখতে লাগলো নিজের পরিণীতার মাধুর্য্যে আর সুষম ছন্দে নেওয়া—পীন পেশলতায় রিমঝিম করা অতি শুভ্র বুকখানার দুই সৌন্দর্য্য-কুট্টিমকে—যুবতী বুকেরই রেশমী জামা অর্গল মুক্ত হোয়ে দু'পাশ বরাবর সরে থাকায়। সত্যি—প্রিয়া সুপ্রিয়াই যে এ ভাবে নিজে থেকে আপন রূপসায়রেতে ঢল্‌ খাওয়া বুকের পরিজাতগুচ্ছ—নিজের হাততে উন্মুক্ত করানোর মধ্যে দেখাতে পারলো—আপন জীবনদেবতারূপী সন্দুর পলাশকে। এইটি কিন্তু যে কোন প্রণয়রাগবতী যুবতীকারই স্বাধিকার ঘেরা দাম্পত্যিক রীতি। ধৃতি। মায় এক নিটোল রকমেরই ছন্দ ঘেরা—কবিকৃতি। কেন না,—প্রিয়া স্ত্রী যে ভাবে আপন চোখের চাহনিতে লজ্জা ঝরাতে ঝরাতে, অধরেতে মিটিমিটি দুষ্টু হাসিকে দোলাতে দোলাতে, আর সলাজ আবেদনে কাঁপা কাঁপা হাতটি দিয়ে ভাব-ব্যাকুলতায় নিলাজেতে রিমঝিমিয়ে—আবরণ্যের মধ্যে শুধু সলাজ প্রভাসে যৌবনের ঢল্‌ নিয়ে ওঠা-নামা করা ভরাট—দরিয়ার মতো বুকটিকে ধীরে ধীরে বাঁধনের আঁট-গঠন থেকে মুক্ত করিয়ে—অনাবারণ আর নামধেয় বজ্রশ্রীর নিটোলতায়,

সুজনকেরই চোখের মধুবর্ষী তিয়াসাকে শুচিস্নিগ্ধ করাবার জন্য—তা, প্রিয়া যবুতীরাই এ হেন দুষ্টু অভিলাষে জড়নো নিলাজক ধৃতিটিকে—ক'রে করে তোলায় গীতি-কবিতারই মতো—মিল ধরা। ছন্দ নিয়ে আর যতি ধরে—সুষমায়িত।

তাই অপলক চাহনির কালো কালো কুট্টিম ঘিরে ঘিরে, যুবতীর দেহীসায়রের লুকানো রত্ন-সম্ভারকে দেখতে দেখতে—জুড়িয়ে এলো স্বামী পলাশেরই প্রিয়ার জন্য থাকা—রূপের তিয়াসা।—অর তাই মায়াঞ্জন মাখা দৃষ্টিতে অরূপরতনের প্রকাশটিকে—প্রিয়ারই যৌবনান্বিত বুকখানায় প্রস্ফুটিত থাকা পারিজাতের মধ্যে দর্শন করায়—স্বামী পলাশের মনে পড়লো সমৃতিচারণারই বিষয়। এই কিছুদিন আগে— সেদিন তারই জন্য বাগদত্তা এই সুপ্রিয়া তার লাইব্রেরীর জন্য নতুন কেনা শ্রীমতী রেবেকা ওয়েস্টের—একখানা উপন্যাস দেখাচ্ছিল। এই রেবেকার লেখা বিখ্যাত সেই "The Thinking Reed" নামী বইটি পলাশের খুবই প্রিয় ছিল। তাই পলাশ সেই মুহূর্তে তারই প্রিয়াকে অনুরোধ করেছিল বইটি থেকে কোন কোন ভালো প্যাসেজ—পড়ে পড়ে শোনানোর জন্য। বইটির নাম এখনও ওর মনে আছে। উপন্যাসটির নাম ছিল —"Black Lamb and Grey Falcon." তারই ভালো ভালো জায়গা থেকে পড়ে পড়ে শোনানোর মাঝখানে—একটি প্যাসেজকে বার কয়েক ক'রে পড়ে শোনালো সুপ্রিয়া। পলাশের মনে আছে এখনও— সেটি বার বার করে —পড়ে পড়ে সুপ্রিয়া সুপ্রিয়া সুন্দর ক'রে, লয় ধরে ধরে, জানিয়েছিল—"এই পলাশ। শোন। ভালো ক'রে শুনবে কিন্তু। দুষ্টুমি কোরো না কিন্তু। বাব্বা। যা দুষ্টু তুমি! আমি হয়ত একটা বেশ মজার কিছু পড়ছি, আর তখন কিনা তুমি আমার ঠোঁটের গতিকে বাধা দিয়ে বসো—তোমারই মুখের দুষ্টু ছোঁয়াচ্‌টিকে ঝৎ ক'রে—বসিয়ে দিয়ে। লক্ষ্মীটি, অমনটা কোরো না, বুঝলে? এই শোন্, পড়ছি—'I will pour myself in devtion to you, I will empty myself without hoping for return, and I can do this serenely, for I know that as I empty myself—I shall be filled again.''—কি পলাশ, কেমন লাগলো এমন উক্তিটিকে? আমাদের যখন বিয়ে হবে, তখন দেখবে ঠিক এই ভাবেতেই আমি নিজেকে তোমার দেহ ও মনের একান্ত কাছটিতে অর্পণ কোরবো। সব স্বত্বায়। সব স্থিতিতে। তোমার জীবন-যৌবনেতে হ্লাদিত রেখে করা আমার এই সমর্পণ হবে—শ্রীরাধারই মতো তিল-তুলসী দিয়ে করা—আরাধনা। হ্যাঁ। তাই ঠিক-ঠিক। তুমি জানবে পলাশ! তুমি তাই পাবে পলাশ, আমারই কাছটি থেকে। কেন না, এমন ভাবেতে দুইয়ে মিলে একাত্ম

হোতে না পারলে যে, আমাদের বিবাহিত জীবন সম্পর্কে যা পরিকল্পিত— সেই স্বর্গ রচনার শুভকাজটি যে সমাধা হবে না।"

বেশ কিছু আগেকারই—সেই প্রাক্-বিবাহকালীন কথার ইতিকথা এই মুহূর্তে মনের মণিকোঠায় ঝক্‌মকিয়ে গেছে—স্বামী পলাশকে খুশীয়াল করাতে করাতে। সে খুশীর ছন্দময় শরীরী চেতনায় সুখী হোয়ে পলাশ ভেবেছিল যে, সুপ্রিয়াকে বিবাহের সাত পাকে বরণ কোরে নেওয়ার পর—অনিবার্য্য রূপে ওদেরই দাম্পত্যিক যৌবনানয়ন—দুটি সঘন সবুজ মনের মোকাবিলায়, দুটি আলাদা আলাদা সুষমায়, আর অলঙ্করণে যৌবনান্বিত দেহের সাথে—অপরা দেহের মিথুন নিয়ে পূর্ণতা সন্ধানের নিরিখেতে—সলাজকে নিলাজেতে ফিরিয়ে, আর আলোকে ঐ আলোরই অধিক আঁধারেতে নির্বাসন পাঠিয়ে—দুই দেহ সায়রের মিলন ঘটবে—অতি অন্তরঙ্গতারই বারণ না মানা—সেই আবরণতার অনাবরণতায়, তারই উন্মোচনে।—হ্যাঁ, ঠিক তখনি কি তা কোন বাধা পাবে ওদেরই পরিকল্পিত স্বর্গ রচনার জন্য?—এমন ভাবনায় দুলতে দুলতে পলাশও কোরে তুলেছিল তারই আনন্দিতা যুবতীকে পর্য্যন্ত—দোলায়মানা। তাই এই বিবাহ পরবর্তী যৌবনে কবিতা হোয়ে ছন্দিত হোতে চাওয়ারই অতি—অনিবার হওয়া— সেই মিথুনিক লীলাবাসরেরই পূর্ণমিদম্ স্বত্বায়—আহ্বান করাবার জন্য হাজার ভাবে বিলোলিত করা আর হিলোলিত রাখা— যৌবনিক অতি নিলাজতা সম্পর্কে!—তাই তখনি পারস্পরিক বোঝাবুঝির ঋতায়ণে নেমে—দাম্পত্যিক যৌবনেতে স্বর্গ রচনার ব্যাপারে—যাতে লক্ষ্য ভ্রষ্ট না হোয়ে পড়ে—শুধু মিথুনিক বাসরে ফোটা—নিলাজ দেহী কবিতা দুটিকে—ছন্দে আর যতিতে সাজাতে সাজাতে—তারই ভয় থেকে অভয়ঙ্করের পথেতে এসে পলাশ ও সুপ্রিয়া—ঠিক সেই সময়েতে স্যার আলেকজাণ্ডার ম্যাগুনের মনীষা ঘেরা বক্তব্যটিকে গ্রহণ কোরেছিল—এইভাবে, যে, 'Cohabition ought not to be mutual satisfaction ; it should be mutual satisfaction ''together''.—To enjoy one's spouse is not necessarilly also to enjoy giving enjoyment to one's spouse. It is not just going to be together that matters ; it is going as the expression of a shared emotional unity.''

সত্যি, সেদিনকার এমন সুসমাধান করার চিন্তা আজ এই ফুলেল সুবাসে মাতাল থাকা রাতটিতে—স্বামী পলাশের তাপঝরা বুকের মধ্যে শায়িতা রেখে —মনে দোলা জাগালো বধূ সুপ্রিয়ার। নিজের তাজা সবুজ রঙেতে প্রগাঢ় ঝলস্ নিয়ে ঝলকানো দেহীসায়রের পবিত্র কুমারীত্ব—অশেষ অজানাকে আপনারই মধ্যে জানবার জন্য বিহ্বলা হোয়েও—প্রিয়া সুপ্রিয়া আজ তারই স্বামী পলাশের

মধুময় দেহ ঘিরে জল্‌জ্বলে ভাবে মূর্ত থাকা যৌবনকে কিন্তু করাতে চাইলো না—এত তাড়াতাড়ি বিলোলিত। বিপর্য্যস্ত। অলাজুক। নিজেও চাইলো না তা হোতে—এই সাত তাড়াতাড়ি আপন যুবতীকায় মিথুনিক সাইক্লোনটিকে বেপরোয়া ভাবেতে—জাগতে না দিয়ে। তাপ ভরা দুটি পবিত্র দেহের টাটকা সবুজতা ও সুন্দর সলাজতা—থাকুক আরো কিছুদিন— কৌমার্য্যেরই আবরণতায়—সলাজ মধুর। সলাজ সুন্দর।

এ এমন এক অজানাকে জানা—যা একবার জানার পরই—দুটি দু' ধারার দেহ নিয়ে চেনা— প্রথম কুমার-বিস্ময়টি আসবে না ফিরে।—ঠিক সেই প্রথম মিথুনায়নে দেহে-দেহে সুসম্পন্ন করা—যৌবনেরই অতি লাজহরণক কবিতার মতো কারুকাজকখানা।—হ্যাঁ, তাই এমন ভাবনায় চালিতা হোয়ে—বধূ সুপ্রিয়া তারই স্বামীকে বলল—রঙীন তৃপ্তিতে ঝলমলিয়ে উঠে—"এই পলাশ। শোন। একটা অতি লাজ ভরা কথা তোমায় জানিয়ে কিছুটি জানাতে চাই। শোন, ঠিক-ঠিক উত্তরখানা দেবে কিন্ত।"—বলতে বলতে সুপ্রিয়া একটু থামলো। একটু নিজেকে ঠিক ক'সর নিতে চেষ্টা কোরলো। এখন তারই রূপবতী বুকখানার অনিন্দ্য সুষমায় ঝলকানো সেই নিটোল পারিজাতগুচ্ছ— ছন্দময় ওঠা-নামায়, হোয়ে আছে অনাবৃতজতা। আবরণহীন অনির্বচনীয়তা। উন্মুক্ত জামার দু'ধারের প্রান্ত—এখনও দুটি পাশ বরাবর রয়েছে ন্যস্ত। একবার নিজের বুকটি দেখে, আরেকবার প্রিয়তমর মুখের মধুর ভাবতরঙ্গিমা দেখে দেখে—হঠাৎ অসম কাঁপন অনুভব কোরল সুপ্রিয়া তার এই আপীন পেশলাধারেরই বেতাল হওয়া—ওঠা ও নামার—দোলনে পড়ায়।—"এই। এই দুষ্টু। এই পলাশ। বলি, আর দেখো না। তুমি অপলকে এতক্ষণ ধরে ত' দর্শন ক'রেছো। কিন্তু তাইত যদি আমার এ রূপ তোমারই অধরের পুণ্য যৌবনায়নে না হয় অভিষিক্ত, বল, তা হোলে আমার বুকের সুখ কি কোরে হবে খুশীয়াল করা এক বিরাট লজ্জা? বল, পলাশ?"

প্রিয়ার এমন লাজহরা কথায়—স্বামী পলাশ যেন মুহূর্তের জন্য হারিয়ে ফেললো—সমস্ত কথা বলতে চাওয়ার গতিকে। তারই আবেগকে। মুখের সুস্মিত হাসি ঘেরা কাঁপন যেমন কথা বলতে না পারায় হোল নিশ্চল— তেমনি ওর যুবকত্ব নিয়ে ঝল্‌মল্‌ করা ভাসা ভাসা চোখের লাজুক রঙ্‌ মাখানো চাহনিটি—হঠাৎই পাতার আড়ালে পথ হারালো।—তাই দেখতে দেখতে সুপ্রিয়া খিল্‌খিলানো হাসিতে মেতে উঠে বলল—"এ কি, মুখে কথা নেই কেন! চোখে নেই কেন কোন দৃষ্টি! বাব্‌ বা, কী যে দুষ্টু বুদ্ধি মাথায় আঁটছো তা' ভগবানই জানেন। এই, চোখ খোল বলছি। ভালো হবে না কিন্তু।"

ভালোই কিন্তু হোল প্রিয় চোখ না খোলায়। চোখ বন্ধ রাখায়। পলাশের মনের সুন্দর ইচ্ছা লজ্জার ভার থেকে মুক্তি পেল। আরও ভালো হ'ল এদিক থেকে,যে,—ওর যুবকত্ব এই মুহূর্তে যে রীতিতে—পৌঁছে আপন যুবকাধরের চুমায়নী ঋতুসাজে সাজাতে যাচ্ছে প্রিয়া স্ত্রীর রূপবতী বুকখানার পারিজাতকে—তাতে মঞ্জুলা সুপ্রিয়ার লাজবতী হওয়া, কাঁপা কাঁপা দেহী তরঙ্গিমাটিকেআর দেখতে পাবে না। চোখ মেলে দেখা মানে—প্রিয়াকে নিলাজতায় ভরা এক ধরনের মেয়েলি অস্বস্তিতে ভরিয়ে তোলা আর কি! এই সাত-পাঁচ মনে ক'রে, তখনি সুস্মিত পলাশ তার শত রূপেতে শতেক বার কোরে দেখারই মতো বধূ সুপ্রিয়ার রূপস্নিগ্ধ বুকের যৌবনাধারের ওপরেতে—অতি কাছাকাছি আপন মুখটিতে দুষ্টু রঙ্ ছেপে ওঠা অবস্থাটিকে নামিয়ে এনে—তারপর পলক পড়তে না পড়তেই পাতা বন্ধ চোখের চাহনি না মেলেই—সুন্দর পলাশ তার স্বামীত্বের স্বাধিকার থেকে প্রিয়ার ঐ আবরণহীন বুকটির সঘন যৌবন-অঅপীনতায় ফোটা পাবিজাতরে মধ্যে—অধরায়নেতে সাজালো শিহর ঝরানো কয়েকটি রিমঝিম করা—চুমায়নী নিলজাতা।—সলাজতারই প্রগাঢ় থাকা যুবতীত্বকে ঘিরে ঘিরে।—এ.রই যৌবনায়নী ঋতু ফোটাতে থাকায় প্রিয়ার রূপঝরা দেহ বঙ্কিমাগুলো কেমন ভাবে বেপমান হ'ল, তা বন্ধ াচেখেতে দেখতে না চেয়েও—পলাশ কিন্তু তারই অনুভূতির অণু ধরে ধরে অনুভব কোরল ঠিক-ঠিক—আপন প্রিয়ার দেহী-তরঙ্গি মায় নাচা-নাচি করা—সব বিলোলতাকে। সব হিলোলতাকে। সব নিলাজ আবেশকে।

সত্যি-সত্যি, প্রিয়তম চোখের দুষ্টু চাহনিটিকে প্রসারিত না রাখায়—প্রিয়া সুপ্রিয়া তাই মেয়েলি রীতিকায় থাকতে পারলো স্বাভাবিক। কেন না—ওদের যুবতী স্বাভাটটি হোল বৈচিত্র্যপূর্ণ! তাই ওরা প্রিয়তমর সাক্ষাতে নিরালা ঘেরা নিঝুম এক ছোট্ট পৃথিবীরই অর্গল বন্ধ অবস্থায়—আপন যুবতীকায় পরিধান করা সমস্ত সাজ ও আবরণ থেকে নিজেরই অভিলাষে উন্মুক্ত হোয়েও—আপন আপন সুজনকে সেই অকপট রূপসায়রেতে ঝল্‌মলে ঝলস্ ছড়াতে থাকার—দেহী নিলাজতা দেখিয়েও—ওরা তারই মধ্যে পেতে চায়, আর হ'তে চায়—শুধু লাজবতী!—ঠিক ওদের এই ব্যাপারটি নিয়ে একদিন কথা ওঠায়, সেদিনের সুপ্রিয়া তার আদরের পলাশকে বুঝিয়ে বলেছিল—"জান পলাশ। আমরা অনেক দুষ্টুমি কোরে যা চাই, তা পাওয়ায় আবার না চাইবারই প্রকাশ দেখাই। তোমার সামনে পড়লে পর অতি স্বাভাবিক বলেই আমি আমার বুক থেকে ঠিক-ঠিক হোয়ে থাকা আবরণী আঁচলটিতে নিজের হাতেতেই— বেঠিক করার চেষ্টা

করি। কিন্তু তারপর যেই তোমার সুন্দর সুন্দর চোখ দু'খানার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রলাম, অমনি যেন বৈদ্যুতিক শক্ খাওয়ারই মতো হোয়ে লজ্জায় রাঙিয়ে—পুনরায় আমারই বুকের দুষ্টুমিপনাকে ঠিক-ঠিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনি। ঐ ক্ষণিকের জন্য বেঠিক হওয়া আঁচলটি থেকে। জান ত' আমরা মেয়ে বলে যেমন সলাজ থেকেও নিলাজ হোতে চাই, তেমনি তার পরেই আবার ফিরে যেতে চাই নিলাজ থেকে সেই সলাজেতেই। এটাই আমাদের বৈশিষ্ট্য। বৈচিত্র্য। অবশ্য তা হয় আর থাকে, এই তোমাদেরই জন্য। তোমাদেরই রূপতিয়াস নিয়ে দুষ্টুমিরই রঙ্-গভীরতায় উপছানো—এই অনুসন্ধানী চাহনিটির জন্যই।"

প্রিয়ার মুখ থেকে সেদিন নির্ঝরিত এমন সুন্দর কোরে মেয়েলি রীতিকাটির সম্পর্কে—গোছানো কথার স্মৃতিচারণা—আজ সেই মধু ঋতায়ত মুহূর্তটিতে—স্বামী পলাশ নিশ্চয়ই না কোরে পারে নি। তাই ত' অতি আন্তরঙ্গতার অধরায়ন সমাপ্ত হোল এক সুজনক স্বামী থেকে তারই প্রিয়া মঞ্জুলিকাটির রূপবতী বুকেতে—থরে থরে সাজানো উরোজ সুষমার আধারে—যুবক-চোখের দুষ্টু-দুষ্টু চাহনিকে পলাশ বন্ধ রেখে।

আর তাই ত শেষ পর্য্যন্ত এক অনির্বচনীয় আনন্দসায়রের ঢেউয়ের পর ঢেউয়ে দুলতে দুলতে—নিজেদের বিবাহিত আঙ্গিনায় স্বর্গ রচনারই কথায়—আবার ঝল্‌মলিয়ে উঠলো প্রিয়া সুপ্রিয়া।

"সত্যি ত! এখন ত আমি শুধু আর বাগদত্তা নই! আমি এখন ওরই পরিণীতা। বেদের মন্ত্রোচ্চারণায় গ্রহণ ক'রেছি—আমারই জন্য বাগদত্ত থাকা এই বর-যুবককে। সুতরাং আমার আজ থেকে হোল এক মস্ত অধিকার। কী, তাই না?"—ভাবতে ভাবতে নিজেকেই প্রশ্ন কোরল সুপ্রিয়া—তারই প্রাণপ্রতিমা সুজনের হাসিতে আর খুশীতে ঝকমকানো—মুখখানার প্রতি অপলকে তাকিয়ে থেকেই।

সেই অধিকার সঞ্জাত ভাবনাটি ধরেই ঝল্‌মিলয়ে থেকে প্রিয়া—সুপ্রিয়া নরম নরম দুটি হাত প্রসারিত কোরে স্বামী সুজনকের গলায় বাঁধন দিয়ে—নিজেকে সামনে ঝুঁকিয়ে, আর কপোলেতে কপোল লাগিয়ে আদর জানাতে জানাতে বলল—এক চিরন্তনীকার অতি স্বাভাবিক-স্নিগ্ধ কথাটি—"এই। এই। জান পলাশ। আমাদের বিবাহিতা এই যৌবন ঘিরে ঘিরে যে ভালবাসা প্রকাশ পাবে বা পাচ্ছে, তাই কিন্তু ধাপে ধপে স্বর্গ রচনাকে কোরবে—তরান্বিত। মহিমা-ভূষিত। সুশোভিত। জান পলাশ, তারই মধ্যে আমি সময় মতো তোমার কাছেতে—দারুণ এক তিতিক্ষারই অভিলাষখানা ভরিয়ে—প্রার্থনা জানাবো— এমন বিরাট

কিছুর,—যার প্রতিদান নিয়ে জাগা রণন শুধু একমাত্র তুমিই করাতে পারবে—অনুরণিত। ওগো, তুমি আমার জীবনদেবতা। আমারই যৌবনের মধ্যে নতুন জীবন সৃষ্টি করাবার জন্য তুমি হোলে—স্রষ্টা বিশ্বকর্মা। তুমি দেবতা। তাই আমি ঠিক-ঠিক যেদিন এক দেবিকার মতো আমার এই তনুরাগ থেকে সব আবরণ সরিয়ে, আর স্বর্ণাভরণ খুলে, শুধু অগুরু-চন্দন-কুঙ্কুম-পরাগ আর ফুলসাজে সাজিয়ে তোমারই সুন্দরতম দেহসায়র থেকে—এক বিন্দু শোণিতধারাকে—আমারই মধ্যে পুষ্পায়নের জন্য—জানাবো হল্লাদিতার—আবদার করা আরাধনা, ওগো দেবতা, তখন কি তুমি আমায় পরিপূর্ণা করাবে না? বল, পলাশ? তুমি জান ত'—আমাদের পরিকল্পিত স্বর্গ রচনায়—একটি কি দুটি দেবশিশুরও—আছে অপরিহার্য্যতা। অতি প্রয়োজনীয়তা। কেন না, আমাদেরই মধ্যে করা মিথুনের ঋতুচয়নী কারুকাজে প্রবাহিত থাকবে যে অপার সুখ-নির্ঝরিণী নামধেয় খুশীযময়তা, সেই তারই উজান বেয়ে একদিন—না একদিন আমরা দু'জনেই সম্ভব করাবো—ঐ দেবশিশুরই আগমনী প্রজায়নখানা। ওই আনন্দিত বন্দনায় করাবো মিথুনিক সুষমাতেই সৃজিত হওয়া—এক অনিন্দিত কুমারসম্ভব! ওগো, কথা বল।"

"এই। এই। ওগো দুষ্টু। এখনই স্বর্গের দেবিকারই মতো জানাচ্ছো এই অনির্বচনীয় প্রার্থনাকে? সত্যি, তুমি দেবী। তুমি, হ্যাঁ, আমার আনন্দিতা, তুমি নিশ্চয়ই আমায় নিয়ে এক'দিনে সত্যি হোয়ে উঠবে কুমারসম্ভবের কবি-স্রষ্টা। ওগো, লক্ষ্মীটি জানাও, কবে আর কত দিনে—তুমি চাও এমন এক দেবশিশুকে মর্ত্যের আলোতে সৃজন করাতে— যে আমাদের স্বর্গ রচনাকে আরো দৃঢ় করাবে? বল, এই?"

আর তখনি কথা থামিয়ে প্রিয়ার—লাল ঠোঁটেতে গভীর করা চুমায়নে আবরিত কোরে গেল স্বামী পলাশ। ওরই এই মধুরাভিলাষী রূপ পরিগ্রহণের কথা জানাবারই অশেষ গরিমায়—আপন যুবকত্ব পর্য্যন্ত রেঙে রেঙে ওঠায়। তাই তখন প্রাণপ্রতিমকে জানাতে পারলো না সুপ্রিয়া কোন কথাটি। ওর কথা বলা বাধাজনক হোয়েছে। কেন না, ওর লাল অধরখানা স্বামীর উষ্ণতা ভরা অধরায়নেতে বন্দী হোয়ে—তখন হচ্ছিল শুধু চুমায় চুমায় আলপনা ফোটানো বিলোলতা।

কিছু বিরতি দিয়ে তাই প্রিয়া সুপ্রিয়া তারই আদরের পলাশের লাল রঙ্ নিয়ে ছেপে ওঠা ঠোঁটেতে একটি সুদীর্ঘ করা প্রতিদানী চুমায় আদর করিয়ে—কথা বলল তখনি—" শোন পলাশ, তুমি আমায় যখন অকপটে জানাতে বলছো এই সৃষ্টি কাজের লাজ ঘেরা কথাটিকে,—কখন ও কবের ঠিক-ঠিকানাতে,—তখন

আমি নিশ্চয়ই তোমাকে জানাবো। এই মধুর। শোন, আমি কম্ভ আমাদের স্বর্গ রচনার আনুষাঙ্গিক রূপেই ঐ দেবশিশুকে সৃজন করাতে অত্যুৎসাহী। তবে কি জান, আজই নয়। আর মাস দু'তিন পরেও নয়। এত সাত তাড়াতাড়ি আমি চাই না নিজের মধ্যে কেমন এক মহৎ শিশুর বিন্দুর মতো প্রাণটিকে—সৃষ্টির কারুকলায় ফুটিয়ে তোলাতে। ওগো পলাশ, এ ব্যাপারে আমার কিন্তু করা আছে রূপ-পরিকল্পনা। আজ থেকে পুরো দুটি বছর পর্য্যন্ত, মানে দু'বছর পরের সেই দ্বিতীয় বিবাহ-বার্যিকীতে—যে নতুন ফুলের বিছানা পাতা হবে—ফুলে ফুলে শুধু ফুলেল করা রাতটিকে উদ্‌যাপনের জন্য, হ্যাঁ পলাশ, ঠিক আজ থেকে দুটি বছর পরেকার সেই নিশীথ ও নিঝুম মুহূর্তটিতে তোমার কাছে নিজেকে সমর্পণ করবো—সকল লাজ আর সব আবরণেরই উন্মোচনে। আর তখনি যুবতীর দুষ্টুমিতে আর যৌবনের মিথুনেতে এলোমেলো হয়ে, আর তারই তালে তালে ছন্দ রেখে তোমায়ও তেমনি করাতে করাতে অতি নিলাজ রভসিতার মতোই বলবো,—এবার তৈরী ওগো, তুমি তোমারই প্রাণোচ্ছল থাকা শুধু এক বিন্দু শোণিতে আমায় কোরে তোলাও—প্রজাবতী। অঙ্কুরিতা। তারপর, হ্যাঁ, তারপর আমি চাই আমাদেরই তৃতীয় বিবাহবার্ষিকীতে আবার নতুন কোরে ছাওয়া—ফুলেরই বিছানাটিতে সেই পুরনো হোয়েও, যা থাকে চির-নতুন, এমনি এক বিবাহের দীর্ঘ তিন বছরের পটভূমিতে ঐ একই বিছানার মাঝখানটিতে—থাকবে কিন্তু প্রায় মাস দুয়েকের ছোট, হ্যাঁ অতি ছোট আকারের এক দেবহিশু। ও থাকবে ঘুমিয়ে। বুঝলে, ওগো পলাশ? কিন্তু, কী জান, ঐ দেবশিশুকে ছোট এক কবিতার মতো সৃষ্টির রূপটি দেওয়ার আগের—ঐ দু'টি বছর ধরে—শুধু অমাাতে আর তোমাতে এক ছন্দ ধরে যতি রেখে মিল ফুটিয়ে এগিয়ে এগিয়ে যাবো দাম্পত্যিক ভালোবাসাকে বাসতে বাসতে—একেবারে গভীরের নিতল পারাবার পর্যন্ত। চাই কি শেলী, রুশোর পরিকল্পিত স্বর্গরাজ্য সেই—ইউটোপিয়া পর্যন্তও যেতে পারি। শুধু কি তাই? আমরা দু'জনা মিলে অনাগত কালের পটে ফিরে আসতেও পারি। এই দাম্পত্যিক প্রণয়ের নৈষ্ঠিকতায় সেই জি.বি. এস. প্রবর্তিত 'ব্যাক্ টু ম্যাথুশিলা'ও বাদ যাবে না—আমাদের ভালোবাসারই স্ফূর্ততা থেকে। দ্যুৎ। আর পারছি না। এই, এবার তুমি কথা বল। ওগো অনির্বচনীয়।"

কথা নিয়ে থেমেই কিন্তু প্রিয়া সুপ্রিয়া নিজের লাল আঁক ছাপানো সুস্মিতাধরটিকে—প্রিয়াল স্বামীর অধরেরই আদুরে সমীক্ষার মধ্যে ধরে দিল। কিছু সময়ের অমন লাজহর সমীক্ষান্তে বধূ-রত্নাকে সুতৃপ্তা আর সুদীপ্তা করিয়ে খুশীয়াল পলাশ বলল, "ওগো মধুমিতা। সব শুনলাম। সবই বুঝলাম। তবু বলি,

আমরা আমাদের দাম্পত্যিক আঙ্গিনাটিকে স্বর্গ কোরে তুলতে পারবো কি না— তাই নিয়ে কিন্তু তোমার মতো যুবতী-রত্নাটির পক্ষে নিজেরই মনেতে কণামাত্র সন্দেহ রাখা উচিত নয়। আমি বলি, তুমি যত সুন্দর কোরে, আর গুছিয়ে সাজিয়ে আমায় তোমারই বক্তব্য ও পরিকল্পনার নানান কথাই জানালে, ঠিক তেমনি ভাবে এক মাত্র তুমিই পারবে আমায় তৈরী করিয়ে নিয়ে— আমাদের দাম্পত্যিক জীবনেরই অতি সলাজ মহালেতে স্বর্গ রচনা করাতে। সত্যি বলছি। আমি না পারলেও, তুমি কিন্তু পারবে। আর, আর মানে এখনি যে ভাবে তুমি ভালবাসাবাসি আরম্ভ কোরে দিয়েছো নিলাজে-সলাজে—এই মুহূর্তেরই প্রতিটি পল-অণুপল নিয়ে সাজানো নিশীথ-নিঝুমতায়, বুঝলে রত্না, তাই দেখে আর অনুভব কোরে কোরে আমি জানালাম যে, এটাই হোল আমাদের রচনা করা-- দাম্পত্যিক স্বর্গ। বল, তাই না? ওগো, তুমিই ত' হোলে আমার দেবিকা। তাই বলি, আচ্ছা দেবিকা, তুমি কি ঐ দুটি বছর পরে একটি মাত্র দেবশিশুকে সৃষ্টি ক'রেই হবে চরমে ও পরমে—আনন্দিতা খুশীয়ালিনী?"—একটু থেমে প্রিয়ার রঙীন মুখে-চোখে আঙুলে বুলানো আদর মাখাতে মাখাতে বলল পলাশ—"এই, এই দুষ্টু। বলি, দুষ্টুমি কোরে কি শুধু —কেটি দেবশিশুরই মিষ্টি মা হবে? না, তুমি হবে এক থেকে বহুর গড়ার জন্য প্রজায়িতা? দুয়ের? তিনের? চারের? পাঁচের? বল? অত দুষ্টু হাসিতে বিভোর না থেকে জানাও লক্ষ্মীটি।"

শুধু দুষ্টুমির রঙে বিভাসিত থাকা আপন স্বামীর হাসি-স্ফূর্ত অধরেতে নিজের হাতখানা চাপা দিয়ে, আর ওরই সুন্দর সুন্দর চোখ দু'খানার চাহনিটির ওপর ওপর—সুপ্রিয়া রঙে রঙে ঝলকানো অধর লুটিয়ে দিয়ে আদর কোরল। তারই মধ্যে জানালো সুপ্রিয়া—"ওগো, বড় দুষ্টুমি কোরছ কিন্তু। সত্যি এ তোমার ভারী অন্যায়। এই পলাশ, তোমার এই সুপ্রিয়া কী অবুঝ না কি, যে দেবশিশুর গর্বিত মা হওয়ার জন্য চাইবে এক থেকে আরম্ভ কোরে অনেকেরই জন্য— সৃজন করার অভিপ্রায়টি? না, না। তুমি আমায় ভুল বুঝো না। আর আমিও এই ব্যাপারে তোমায় ভুল কিছুটি বুঝাবো না।"

প্রিয়া কথা থামাতেই, প্রিয় আরম্ভ কোরল কথা বলা।—"ঈষ্। ঈষ্। দেখছি গো, মেয়ে বলে মেয়ে বটে তুমি। বাব্ বা। অভিমান কোরে লাভ নেই। তোমার ত' জানি সামান্য অভিমানেতেও তুমি কেঁদে ফেলে, বর্ষার মতো জলের ধারা নামাও। উঃ। সে কথা মনে থাকার পরেও কি সাহস রাখতে পারি কোন কিছু নিয়ে অন্যায় করার? বাব্ বা, তা হোলেই হ'য়েছে আর কি। চোখের জলে শেষাশেষি তুমি আমাকে হার মানাবেই, ঠিক-ঠিক। শোন প্রিয়া। শোন মিষ্টি।

এই, সত্যিই তুমি অভিমান কোরছ দেখছি। ধ্যাৎ, কী যে না তুমি!"—হঠাৎ কথা থামিয়ে দিয়ে পলাশ তার বধূ-রত্নাকে বুকের কঠিনতর বাঁধনে টেনে নিয়ে সমস্ত শরীরে হাত বুলিয়ে আদর কোরতে লাগল। কেন না, এই মুহূর্তে তারই প্রিয়া অতি সামান্য কারণ থেকেই হয়ে উএঠছিল অভিমানের কাঁপন নিয়ে—টানা টানা চোখের মধ্যে—বর্ষার আভাসটি ধরা। আর ঠোঁটে ঠোঁটে ফলে ওঠা কাঁপন নিয়ে এলোমেলো। তাই আদর করাতে করাতে পলাশ মধুর কোরে জানালো— "দ্যুৎ। তুমি এত দুষ্টু কেন? আমার কথায় গুরুত্ব দিলে কেন? সত্যি, এই, তুমি পারলে না হেসে উড়িয়ে দিতে? শোন,সত্যি বলছি। চোখের জল এত সহজে ঝরালে কিন্তু ভাল হবে না বলছি।"

পলাশ কথা থামালো। আর ঐ অবস্থাতেই নিজেকে ঠিক কোরে নিয়ে সুপ্রিয়া বলল প্রিয়তমর গলা দু'হাতে শক্ত কোরে জড়িয়ে রেখে—"শোন পলাশ। আমাদের এই স্বর্গ হোয়ে দাম্পত্যিক প্রজায়নের যৌথ রূপ থেকে যে দেবশিশু সৃজনে আমি তোমায় দিয়ে নিজেকে মা করাবো, সেই প্রথম সৃষ্টিখানা যেন হয় এক দেবকুমারের। সত্যি প্রথম যে আসবে আমারই মধ্যে দিয়ে— তোমারই দেওয়া সহযোগিতা পেয়ে, এই সে যেন সূর্য্যের মতো হয় এক কুমার। জ্বল-জ্বলে বহ্নি ঘেরা এক ছেলে। এক দেবপুত্র। আর, হ্যাঁ পলাশ, শোন লক্ষীটি, শোন..." কিন্তু এক বিরাট লজ্জার ঘেরাটোপে বাঁধা পড়ায়—সুপ্রিয়ার সমস্ত যৌবনময়তা দেহসায়র ধরে কাঁপতে পাঁকতে থামিয়ে দিল ওরই কথার—গতিবেগ আবেগটিকে।

"দ্যুৎ। এই পলাশ। আমি পারছি না আর মুখ ফুটে কিছুটি বলতে। ওগো, তুমি কেন বুঝে নিচ্ছ না প্রিয়ার এর পরের বলতে চাওয়ারই কথাকে। দ্যুৎ। তুমি ভারী দুষ্টু। হ্যাঁ, হ্যাঁ। সত্যি, সত্যি।"—কথা নিয়ে এক পলক থেমে প্রিয়াল স্বামীর কপোলে কপোলে ছুঁইয়ে, কানের কাছে মুখটি নিয়ে চুপিচুপি জানালো মিথুনিকে নিলাজতা ঘেরা কথাটিকে—"ওগো মধুর। ঐ দেবকুমারের সৃষ্টির পরে, ঠিক কেটি বছরের মধ্যেই আমায় কিন্তু আবার, হ্যাঁ, পুনরায় তোমারই পবিত্র দেহের সিসৃক্ষু শোণিতকণার এক কণা ধার দিয়ে আমায় করাতে হবেই প্রজায়িতা। পুষ্পায়িতা। নতুন আরেক প্রাণেতে—সন্তানসম্ভবা। আমার এই দ্বিতীয় সৃষ্টির কারুকাজ ধরে ধরে যে দ্বিতীয় দেবশিশুটি আবির্ভূত হবে, —আমি চাই সে হবে দেবকুমারী। ফুটে ফুটে জ্যোৎস্নার মতো স্নিগ্ধা। হ্যাঁ পলাশ, আমার বিবাহিত যৌবনাকুতির পূর্ণাহুতি সমাপ্ত হবে—এই দ্বিতীয়াতে। এই শেষ সৃষ্টির মধ্যেই। এক কুমার ও আরেক কুমারী—একএছলে ও আরেক মেয়ে—এই দুই

দেবোপম শিশুর মা হোতে পারলে পর—সত্যি আমার থাকবে না আর—যুবতীকা ধরে কণামাত্র অতৃপ্তি। অপ্রাপ্তি। ওগো, সেই সঙ্গে তোমারও কিন্তু। আমার ছেলের আগমনের পর—তারই পিঠোপিঠি কোরে হবে আমারই মেয়ের সম্ভাবনা। ওগো, তুমি হোলে ওদেরই সৃষ্টির মহৎ উৎস। আর, আর আমি হলাম সেই সৃষ্টির পরম্পরারই—সব। প্রথম থেকে শেষ। শুরু থেকে সারা। এই. এই পলাশ। জান, এই পরিকল্পনাই আরো গভীর অনির্বচনীয়তায় দাঁড় করাবে আমাদেরই কল্পনার ও আংশিক পাওয়ার —এই স্বর্গ রচনাকে। ওগো অন্তরতম। বল, তুমি আমায় এর রীতি ধরে ঠিকই করাবে সময় মতো ঋতায়নী স্রষ্ট্রী? বল?"

আনন্দসায়রেরই অশেষ গরিমায় স্নান করার মতোই হোয়ে উঠে স্বামী পলাশ তার এই আদর্শ যুবতীত্বে মহীয়সী থাকা প্রাণপ্রতিমাকে পিঠে-বুকে-গলায়-হাতে-চিবুকে হাতের বুলানো আদরে আদরে আবেশ দেওয়াতে দেওয়াতে জানালো—"আচ্ছা, সবই হবে। সবই করাবো। তোমাতে-আমাতে মিলে-মিশে। কিন্তু এর সপক্ষে আমার একটি কথা আছে। শোন মিষ্টি। আমি তোমার মুখ থেকেই জানতে চাই, যে, আমার দেহের উৎস যে প্রাণ তোমারই অন্তরালে প্রজায়ন করাবে, এবং তারপর যেদিন কুসুমিত করাতে করাতে তাকে যখন পৃথিবীতে সৃষ্টি করাতে পারবে—হ্যাঁ, সেই তোমারই পরিকল্পিত দুই দেবশিশুর দুই প্রকাশ রূপে—ঐ দেবকুমার আর দেবকুমারীকে কী দিতে পারবে মা হ'য়ে— সেই বিরাট ঐশ্বর্য্য আর ঋদ্ধি ও সমৃদ্ধিটি? হ্যাঁ প্রিয়া, শোন তা যদি দিতে পার, আর তা দিয়ে যদি অনাগতকালের পটভূমিতে সেই জগতটিকে সৃষ্টি করাতে পার ওদেরই ভবিষ্যৎ দিয়ে—ঠিক যেখানেতে ঋষি বার্নার্ড শ' কল্পিত জ্ঞানে প্রজ্ঞায়-প্রমায় 'Long lived' মহাপুরুষ হোয়ে ওরা আজকের 'Short lived' ও অল্প জানা সেই সব—জান্তাদের কাছ থেকে—পৃথিবীর শাসনভার নিজেদের হাতেতে নিয়ে আর সেই দেশেতেই করাতে পারবে—ঠিক ঠিকই 'Methusila'র সৃষ্টি? ও তাতেই ফিরে ফিরে যাওয়ার অভিষেকী অভিসার? হ্যাঁ, তবেই জানবে মধুমিতা, যে, তোমার প্রয়াস, তোমারই ঋদ্ধি, তোমার ঐশ্বর্য্য আর তোমারই মহীসয়ী মায়ের রূপটি সত্যিকারের কোরেই তোমাকে কোরেছে স্বর্গেরই—এক দেবিকা। জানি, আমার মধ্যে নেই কণামাত্র দেবত্ব। তবু আমার বিরাট বিশ্বাস আছে এইখানেতে, যে, মা হোতে চেয়ে তুমি যদি দিতে পার মহাপুরুষের আর মহামানবীর জন্ম—তা হোলে এ কথা সুনিশ্চিত, যে, তুমি একজন দেবিকা। অন্য কেউ নও। কি গো আনন্দিতা, আমি যখন তোমার পরিকল্পনা সার্থক

করাতে চাই, তখন আশা করি, তুমি নিজেও সার্থক কোরে তোলাবে আমারই অভিলাষকে। কেমন, ঠিক ত?"

বলতে বলতে কথা থামিয়ে হাসিতে খুশীতে ঝলমলিয়ে উঠে প্রিয়া সুপ্রিয়ার ছবির মতো চোখের ওপরে—পলাশ নিজের সুস্মিতাধর স্থাপন কোরল। একটু আগে বর্ষার রূপ নিতে চাওয়া প্রিয়ার দুটি চোখকে চুম্বণ কোরল পলাশ ধীরে ধীরে। আদরে আদরে।

আবেশের অপার আনন্দসায়রেরই মধ্যে খুশীয়াল রাখাল ঢেউয়ে মাতামাতি করার মতোই, আমেজ ঝরিয়ে প্রিয়া সুপ্রিয়া তারই অন্তরতমকে নিবেদন কোরল—"এই। এই পলাশ। তুমি মধুর। তুমি মহৎ। অন্যে না বললেও, আমি জেনেছি আর বুঝেছি, যে, তুমি আমারই দেবতা। তা হোলে যে, ঐ দেবশিশুদের সৃজন কোরে আমার পক্ষে তোমারই দেবিকা হওয়া সম্ভব। শোন, শোন। আমি কথা দিলাম। তোমারই কথা মতো আমাদের ভবিষ্যতের ঐ দুটি সৃষ্টিকে সমস্ত জগতের জন্যই—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বে করাবো অলঙ্কৃত। নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। ওরা যে আমাদের এই রচিত দাম্পত্যিক স্বর্গেরই দ্যুতিতে তৈরী করা—প্রতিভু হবে। তাই না?"—বলতে বলতে প্রিয়া সুপ্রিয়া ভয়ানক চঞ্চলতায় ঊর্ম্মি ফুটিয়ে নিয়ে—নিজেরই যুবতীত্বের প্রতি যৌবনায়নে ও মিথুনায়নে সার্থকতার মঞ্জিলেতে পৌঁছিয়ে—দেবিকা করাবার একমাত্র অধিকারীএই জীবনদেবতারূপী স্বামী পলাশের চোখে-মুখে-কেশে—বনহরিণীর মতো দ্রুততায় চুমায়নী ঋতুতে সাজাতে লাগলো। আর তারই মধ্যে বধূ-রত্না এই ভাবী দেবিকার খালি মনে পড়ছে নিজেদের এই রচিত দাম্পত্যিক স্বর্গেরই কথায়—প্রাণাধিক পলারেই তাপঝরা বুকের কঠিনতায় বন্দিনী থাকতে থাকতেই—মনীষী মাঁরোয়ার বাক্‌বিভূতিটি—এই স্বর্গ রচনার পরিপ্রেক্ষিতেই—'Ths is a novel'' the husband and wife shold both say, ''which I am going to live, not write, I know that I must take into account the peculiarities of the two characters who are already drawn, but I want to succeed, and I will succeed.''

এই ভাবকুট্টিমতার ধ্যানে মশুগুলা হোয়ে প্রিয়া সুপ্রিয়া তারই জীবনদেবতারূপী প্রিয়াল স্বামীর সুস্মিতাধরতে চুমায়ন টেনে দিতে দিতে জানতে চাইল—"এই। এই। বল, তাই হবে ত'? আমায় দিয়ে তাই করাবে ত' তোমার-আমার যৌথ প্রয়াসী দুটি সৃষ্টির জন্য? মধুর, নিজের মুখে আরেককারটি বল।"

—"আমার দেবিকা। আবার বলছি। তাই করাবো। আমরা যে আমাদেরই বিবাহিত যৌবনায়নে স্বর্গ রচনা এরই মধ্যে কোরে তুলেছি। তাই হোয়ো না

বিন্দুমাত্র শঙ্কা নিয়ে বিহ্বলা। কেমন? ঠিক ত' আনন্দিতা?"—কথা থামালো পলাশ তারই সুতৃপ্ত আর সুদীপ্ত থাকা মনের আকুতিতে।

প্রিয়া সুপ্রিয়া জানালো আবার—"ঠিক-ঠিক। মিষ্টি, আমি খুশী। দুষ্টু, আমি সুখী। তোমারই পাওয়া সহযোগিতায়।"

স্বামী পলাশ তখন তার যুবকোচিত প্রণয়াচারে সুপ্রিয়াকে আবরিত করাতে করাতে বলল—"হ্যাঁ। হ্যাঁ। আমিও সুখী। আমিও খুশী। তোমায় এভাবে পাওয়ায়, এই মর্ত্যের মানুষেরই বিবাহিত যৌবন দিয়ে তৈরী করা স্বর্গটিতে।"

—১৬ই নভেম্বর, ১৯৬০

একান্ত দাম্পত্যিক

আমাব-আদরের জায়া—রুচিস্মিতা, সন্ধ্যা রায়, মধুরিকাসু।

বধূজীবনের বুকভরা মধু নিঙাড়িয়ে সকালের সোনা রঙ রোদে ঝকমক ক'রতে ক'রতে—স্বামী গৌতমের প্রতি কথাকাকলী জানালো মিষ্টি যুবতীকার রিমঝিম ছান্দসিকা—শ্রীমতী সন্ধ্যা।

—"ঈষ্! ঈষ্! আজও যদি গত কালকার মতো দেরি ক'রে রাত দশটা বাজিয়ে ফের, তা হোলে কিন্তু আজ রাতে আমার কাছটিতে আর তোমাকে বিন্দুমাত্র ঘেঁষতে না দিয়ে—জানাবো অভিমানী বৌ-টির অসহযোগ। সত্যি-সত্যি। দেখো, আজ ঠিকই তা কোরবো। হ্যাঁ, কোরবো ব'লেও আজ পর্য্যন্ত তা ক'রতে পারলাম না ব'লে ভেবো না যেন, তোমার এই সন্ধ্যা তা পারে না জানাতে! বা ক'রতে! পারি খুবই। আজ ঠিকই কোরবো। গৌতম, এই?"

শ্রীমতী সন্ধ্যা হোল গ্রাম বাঙলার—এক বৌ। তবে উপস্থিত আর কি।—এই পরিচয় ছাড়িয়ে, ও শহুরে। ও আধুনিকা।—কিন্তু ছোটবেলা থেকেই পল্লী-গাঁয়ের প্রতি থাকা মস্ত এক প্রীতির টানে টানে—সন্ধ্যা তার স্বামী গৌতমকে নিয়ে ছোট্ট একখানা শান্তির আর স্থিতির নীড় রচনা ক'রে নিয়েছে—গ্রাম বাঙলারই এক অতি নিঝুমতায় সাজানো—এই নিভৃতিটির কুলায়। বছর খানেক ধরে এখানে গাচ-গাছালির পাতায় পাতায় তৈরী করা ছায়ার ঘেরাটোপ দেওয়া—শুধু নিরালায় সুনিবিড় এই এক রকমের আধুনিক বাংলোখানাকে দূর থেকে দেখলে পর মনে হয়—প্রাচীন ঐতিহ্যের যেন এক লতাবিতান। এরই মধ্যে সংসার পেতেছে—এই সন্ধ্যা ঘোষ। আর তারই যৌবনের সুখ—ঐ গৌতম ঘোষ। আর আছে ওদেরই দুটি ছন্দ এক হোয়ে সৃষ্টির—প্রায় এক বছরের মেয়ে,—নাম যার—'টুলটুল'।

হ্যাঁ,—শহরেরেই এক আধুনিকার যৌবন-স্বপ্ন গ্রামীন বধূ হোতে চেয়ে—নীড় বেঁধেছে তাই। কিন্তু, হ্যাঁ এত শান্তির নীড়খানায় আজ বেশ অনেকদিন ধরেই—যেন একটা না-বোঝা এমন কিচুর ধূসর মেঘ দিয়ে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে! মেঘের আড়ালে যেন দুলে উঠছে—অস্বস্তির ঝড়।—সন্ধ্যাকে যেন তা ভয় দেখাচ্ছে। ভয় পাইয়ে কাঁপাচ্ছে। বাংলোর বারান্দায়—সিলিঙ্ থেকে ঝুলে থাকা চকচক

মতন মাধবীলতাগুলো যখন মৃদুল হাওয়ায় দুলতে থাকে,—আর বারান্দারই কাঠের থামগুলোতে লতানো জুঁইফুলের ঝাড় থেকে যখন—গত সাঁঝেতে ফোটা সুবাস-ঝরা ফুলগুলো প্রভাতের আলো তীব্র হওয়ায়—একে একে শুকিয়ে উঠে নীচেকার বালু-চিকচিক মাটিতে—পড়ে জমায়ঝরাফুলের জন্য শোকের আসরখানা—তখন গৌতম ঘোষের অফিস যাওয়ার পথেতে সাত-সকালেই তোড়জোড় করার ফাঁকে-ফাঁকে—স্ত্রী সন্ধ্যা ঘোষ না-জানা এক ভয়ের দোলনে অস্থিরা হ'য়ে পড়ে। মাঝে মাঝে গোরোচনা রঙের দেহলতা কেঁপে ওঠে।

হ্যাঁ,—সাত সকালেই অফিসে বেরিয়ে পড়ে সন্ধ্যার স্বামী। আর বেরুনোর মুখে—প্রায় এক বছরের ফুটফুটে মেয়ে টুলটুলকে প্রিয়ার কোল থেকে নিজের কাছেতে নেয়।—রোজকার মতো বেশ সময় ধরে দু' হাতের মুঠোয় রাখা আপন সৃষ্টির অতি ছোট্ট আকারের প্রাণময় স্বতঃস্ফূর্ততাটিকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে হাসিয়ে-নাচিয়ে প্রায় ক্লান্ত ক'রে এনে—শেষে শুইয়ে দেয় ছোট বেবি-কটে। আর তারপর হাতঘড়ির দিকে তাকাতে তাকাতে শোবার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে বসবার ঘরটিতে। আদরভরা গলায় রোজ যে ভাবে প্রিয়াকে কাছে ডাকে, সেভাবে আজও ভোরের রাগ-রাগিণীদের জাগিয়ে দেওয়ার মতো কোরেই ডেকেছিল—
"আমার দেরি হ'য়ে যাচ্ছে সন্ধ্যা, শোন। কাছে এসো একবারটি। এই, এসো। সন্ধ্যা। লক্ষ্মীটি বলছি।"

তারপর রোজকার মতো দাঁড়িয়ে থেকে যেমন অপেক্ষা করে স্ত্রী সন্ধ্যার জন্য—তেমনি আজও সকালে গৌতম কোরল তাই।

তাই সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে কাছে এসে একটু ব্যবধান রেখে আজও সন্ধ্যা বলেছিল ওপরের কথাগুলো।—প্রথমেই সেই মানা জানানোর—'ঈষ্' শব্দখানাকে স্বামীর প্রতি ছুড়ে দিয়ে। জানিয়ে।

অন্য দিনের মতো সন্ধ্যা ঐ কথা শেষ ক'রে—পুরনো ব্যবহারে ও কথালাপে নামিয়েছিল নিজেকে। বলে উঠলো সন্ধ্যা মুখময় ছাপিয়ে তোলা পবিত্র সিঁদুরের মতো রঙীন ঝলস্ ফুটিয়ে—

—"আচ্ছা, আচ্ছা। এ ত' বেশ আবদার! বলি, আমায় কী টুলটুল ঠাওরেছো? এই গৌতম, ওকে যেমনভাবে আদর কোরলে তুমি এইমাত্র, বলি, আমায়ও কী সেই ভাবে আদর আর সোহাগ জানাবে? না-না। অত আদর আমি পারবো না সহ্য কোরতে—এই দিনমানেতে। দ্যুৎ। ভারী দুষ্টুমি হচ্ছে কিন্তু। আরে, এ কি! যাও, ভালো লাগে না, না..."

ততক্ষণে প্রিয়ার কথা চালাচালির সুযোগেতে—গৌতম এগিয়ে এসে

নিজের বুকের মধ্যে ঘন ক'রে কেড়ে নেয় সন্ধ্যাকে। সজোরে চাপ দিয়ে প্রিয়ার দেহরাগে ফুটিয়ে তোলাতে চায়—আবেশের ঊর্মিময়তা। আর তারই মধ্যে দুরন্ত হ'য়ে সন্ধ্যার মুখের সচলতায় আদর ঝরাতে চাওয়ারই দরুন—প্রিয়ার কথা এর পর সত্যি বাধ্য হয়—থেমে যেতে। একটি যুবতী-অধর যখন তারই একান্ত একাত্মের যুবকাধরের সোহাগে বন্দী হয়ে চুমার আলিম্পন ফোটাতে চায়, তখন আর একটুও সুযোগ থাকে না কথা বলার জন্য।—তাই এই মুহূর্তে গৌতম—তার আদর করার সন্ধ্যাকে ঘনভাবে অধরালিঙ্গনে টেনে নেওয়ায়—স্ত্রীর পক্ষে কোন অনুযোগভরা কথায় আর ঝলমলানো সম্ভব হ'ল না। এমন ভাবে সাত-সকালে অফিসে বেরুবার পথেতে—স্ত্রীর পক্ষে কোন অনুযোগভরা কথায় আর ঝলমলানো সম্ভব হ'ল না। এমন ভাবে সাত-সকালে অফিসে বেরুবার পথেতে—স্ত্রী সন্ধ্যাকে করা আদর-সোহাগ দেখলে পর মনে হবে—স্বামী গৌতম যেন অনেক দিনেরই জন্য কাছ-ছাড়া হয়ে কোন দূর দেশের পথেতে—পাড়ি দিচ্ছে। হ্যাঁ, তাই যেন প্রিয়াকে অনেক দিনের জন্য দেখতে পাবে না!—ঠিক তা ভেবেই তৃষিত দেহমনের উৎফুল্লতায় নেচে-নেচে—বরনারী সন্ধ্যাকে আশ মিটিয়ে আবদারী-আদর কোরে তোলে—লাজে-লাজে নিলাজিতা। আর দোদুলা।—কিন্তু গৌতমের ভালো লাগলেও,—এমনটা এই ফর্সা আলোর মধ্যে পেতে সন্ধ্যার একান্ত যুবতী-মনখানার কাছে মোটেই সুন্দর লাগে না। সন্ধ্যা চায়—'আমার গৌতমের এ সব দুষ্টু-দুষ্টু আদরগুলো ঝরুক মুষলধারে সেই নিভৃতির 'সন্ধ্যা'য়। হ্যাঁ, সেই নিরালার নিঝুম-নিঝুম রাতের গহন আঁধারে যে প্রহরগুলো ফুটে-ফুটে ওঠে প্রমত্ত হ'য়ে—হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই ত' হ'ল আমায় আদর করার, আর আমাকে নিলাজ করাবার প্রশস্ত সময়। ধ্যাৎ, গৌতম যে কি না! সময়-অসময়ের ধার মোটেই ধারে না। এমনি ওর ভালোবাসা জানাবার স্বভাবখানা। দ্যুৎ। কী যে না!'

আজও গৌতমের কাছ থেকে সাত-সকালে তেমনি প্রণয়ের ঝড়ে পথ হারিয়ে শিউরে-শিউরে কেঁপে উঠে—সন্ধ্যা তাই আবার ভাবলো। না চাইলেও এই অনির্বচনীয়তার আবেদনটি—গৌতমের করা অধরের আদরকণা ধরে-ধরে স্ত্রী সন্ধ্যার দেহে আবেশ ধরালো। ঠিকই। চোখ দু'খানা আমেজে তাই বন্ধ হ'য়ে যায় তখন প্রিয়ার। তবু মুখ ফুটে অস্ফুটে কথা বেরুবার মতো দুটি ঠোঁটে বিন্দুপরিমাণ ফাঁকটিকে পর্য্যন্ত—দুরন্ত স্বামীরই মুখের দস্যুময়তা আবরিত ক'রে রাখলেও—তারই মধ্যে দ্রুত একটা বিকর্ষণ সত্যি ফুটে ওঠে। সন্ধ্যার চুমায়-চুমায় বিপর্য্যিত—ঠোঁট দু'খানায় জাগা সেই অশ্রুতপূর্ব কথায়।

আজও অন্য দিনের সকালের মতোই গৌতম বেশ কয়েকটি পলক ও-ভাবে আবেশেরই নিঝুম ঘরেতে নিলাজে কাটিয়ে ওঠার পর—দু'হাতের বাঁধনে সন্ধ্যার কাঁধ শক্ত ক'রে ধ'রে জানালো—

—"সন্ধ্যা। আমার মিষ্টি। এই? এবার তুমি সন্ধ্যা, কেমন?" কিন্তু এই মুহূর্তে সন্ধ্যা নিজেকে স্বামীর কবোষ্ণ ছোঁয়ার মাদকতা থেকে জোর ক'রে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা ক'রেই বলল—

—"না। না। বার বার বলি, সকালে আমায় আর এমন ভাবে দুলিয়ে দিও না। কিন্তু তুমি তা শোন না কিছুতেই। বল, সব সময়ে ভালো লাগে? এই, অনেক হ'য়েছে। আর দেরি করে না। ও-দিকে তোমার নির্দিষ্ট ট্রেনখানাকে হয় ত ফেল ক'রে বসবে। না, না। কিছু হ'বে না। কিছুটি এখন পাবে না।আর আমি দেবোও না তা আমার কাছ থেকে পেতে। সত্যি বলছি। হ্যাঁ পাবে। খুবই পাবে তবে এখন আর নয়। আগামীকাল সকালের জন্য ডবল্ ভাবে জমা রেখে দিচ্ছি—আমারই কাছ থেকে পাওয়ার পাল্‌টা আদরটিকে।—অবশ্য মস্ত সর্ত থাকছে। সর্ত থাকলো এই, যে, আজ তাড়াতাড়ি অফিস ছুটির সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ী ফিরতে হবে। হ্যাঁ, কথা দাও সত্যি-সত্যি ফিরবে বলে? ফিরবে টিক-ঠিকই? তাড়াতাড়ি? কেমন? শোন গৌতম, যদি না ফের তা হ'লে আজ রাতেতে, হ্যাঁ,—সত্যি বলছি তা হ'লে আজ সত্যিই একটা কিছু...না, না। থাক। যখনকার যা তখনি দেখা যাবে 'খন। এই গৌতম, বলছি ত' আজ আর পাল্‌টা আদর না হয় নাই পেলে!"

বলতে বলতে থামলো সন্ধ্যা। ঝলমলালো আমেজ মুখর হাসিতে। স্বামীর কপোল বরাবর নিজের মুখের একটি ধার ছোঁয়ালো। আস্তে আস্তে বলল—"এই, তুমি বল যে, আমি কখনো কারুর সঙ্গে ঝগড়া ক'রতে পারি না, এই ত? তা গৌতম, আজ তুমি যদি কথা না রাখতে পার, তাহ'লে তুমি দেখবে এই সন্ধ্যা কেমন ভীষণ ঝগড়াখানাই না ক'রে বসে! হ্যাঁ, হ্যাঁ। সত্যি বলছি।"

"তুমি, মানে সন্ধ্যা তুমি ঝগড়া ক'রতে পারবে কী? ওগো দুষ্টু মেয়ে, মনে হয় তুমি তা পারবে না।"

তাই বলে প্রিয়া সন্ধ্যাকে এই ফুটফুটে রোদ থেকে মধুর ভাবে ঝলকিত সকালটিতে—আরেকবার, মানে বাড়ী ছেড়ে বেরুবার আগে শেষ বারের মতো—নিজের হাতের ছড়ানো বাঁধনটি সঙ্কুচিত করার মধ্যে—গৌতম কাছে আটকালো। ঘনতর করালো। আর তখনি সন্ধ্যার কাকলীকথা ঝরে পড়লো মেয়েলি ভয়কাতরতায়—

—"এই গৌতম, ও কি কোরছো! দ্যুৎ। লাগছে বড়। সত্যি ব্যথা দিচ্ছ। ছাড়ো। তা না হ'লে এখনি হয়ত আমি কেঁদে ফেলবো। সাতসকালে প্রিয়ার চোখে জল দেখে অফিসের পথে পা বাড়াতে কী তোমার ভালো লাগবে? তবে ছেড়ে দেও এইবারটি। ঈষ্, কি যে না তুমি! ছাড়ো, লক্ষ্মী ছেলে। লাগছে সত্যি। এ ত' দুষ্টুমিপনা নয়! এ যে নিখুঁত দস্যিপনা! বাব্বা। চোখের জল ঝরাবার কথা বলতে না বলতেই দেখছি লক্ষ্মী ছেলেটি হ'য়ে উঠেছো। গৌতম, শোন মাথার দিব্যি রইলো, আজ কিন্তু তোমার তাড়াতাড়ি ফিরে আসার কথা থাকছে মনে রেখো। এই, বুঝলে গো?"

বলতে বলতে—সকালের এই আমেজ থেকে মধুরতায় নেচে উঠে সন্ধ্যা তার স্বামীর দস্যুবৃত্তিতে এই একটু আগে পর্য্যন্ত মেতে থাকা অধরের ওপরেতে—আপন অধর নিয়ে ঝুঁকে পড়ে বললো কাটা কাটা কথায়—আর ঝলকানো গলায় সুরেলা ক'রে—

—"দুষ্টু? বলি চোখ বোজো। আর, আর, এই গৌতম, একবার পেলেই খুশী হবে ত'?"

চোখের সুন্দর দৃষ্টিখানা পাতার ফাঁকে ঢাকতে ঢাকতে বলল গৌতম—"ঈষ্। একবারেই কি খুশী হবো! সন্ধ্যা, যদি না হই?"

মেয়েলি ভয়কাতরতায় সাজা মুখের অভিব্যক্তি নাচিয়ে সন্ধ্যা জানালো—"এই ত' মুস্কিলে ফেললে দেখছি! তুমি ত' বয়েসে আমারই সমান। মাত্র সপ্তাহ খঅনেকের মতো বড়।—বলি অন্ততঃ তুমি ত' আমাদেরই টুলটুলের মতো অবুঝ শিশু নও? আর তুমি ত' হলে ওরই বাবা। দ্যুৎ। ও না হয় আমার কাছ থেকে অমন আদরখানা বারংবার চেয়ে-চেয়ে ওরই ছোট মুখখানাকে আগাগোড়া ভরিয়ে নেওয়াতে পারে। কিন্তু ওর বাবা হ'য়ে তাই বলে কী ওরই মায়ের কাছটি থেকে এত বেশী ক'রে এই-সব আদর চাওয়া যায়? ভারী দুষ্টু তুমি। টুলটুল এখন ও-সব বোঝে না তাই আর কি! ও যদি বড় হয়ে জানতে পারে, যে, তুমি তার মায়ের কাছ থেকে—ওরই শুধুমাত্র আবদার করার এক্তিয়ারগত আদরগুলো থেকে—দস্যুর মতো খালি লুট ক'রে-ক'রে কেড়েই নিচ্ছ—কি সময়ে, কি অসময়ে,—তা হ'লে দেখো ও তোমায় কেমন জব্দ করে। ঈষ্। টুলটুল এমন অবুঝ আর ছোটটি বরাবর থাকলেই বড় ভালো হয়, না? থাক, থাক। আমি কিন্তু এখন একবারের বেশী আর দু'বার আদর কোরতে পারবো না। তা আগেই জানাচ্ছি। রাজী না হ'লে আমার করার কিছুটি নেই।"

প্রিয়ার পিঠময় হাতের তাপভরা আদর মাখাতে মাখাতে গৌতম তখন হাসতে হাসতে রঙীন হ'য়ে বলল—

—"বেশ। রাজী আছি। তবে তোমার দেওয়া ঐ একবারটির মতো আদরখানাকে—তুমি লক্ষ্মীটি মুহূর্তেই থামিয়ে দিও না কিন্তু। হ্যাঁ, করাবে তা বিলম্বিত। ছন্দিত। ঠিক-ঠিক তাই আর কি। দেখ সন্ধ্যা, ওদিকে আবার দেরি হ'য়ে যাবে যে! সন্ধ্যা, এই?"

তৃষ্ণাভরা অধরেতে সকালের সোনা রঙ্ নাচিয়ে—আর চোখের কালো কালো মণিতে খুশী হতে চাওয়ার ছবি দুলিয়ে—নিজের জানানো দুষ্টু আবদারখানায়—স্বামী গৌতম সত্যি এক অসহায় যুবকেরই মতো যেন ভেঙ্গে পড়লো।—প্রিয়ারই বুকের সপেশল আরাম দরিয়ায়।

প্রিয়া সন্ধ্যা এইবারটি মান-অভিমানের রেশ থেকে প্রভাতেরই আতপ্ত সোনা রঙ্ রোদেতে ঈষৎ তাতিয়ে ওঠায়—শেষ পর্য্যন্ত আদর দিয়ে স্বামীর প্রতি—সারাদিনমান ধরে কাজ করার জন্য উৎসাহ ভরাট দীপখানাকে চাইলো জ্বালিয়ে দিতে। সাজিয়ে দিতে।—তাই এবার হাতের বালা-চুড়িতে রিনী-থিনী আওয়াজ কোরতে থাকা—দু'খানা হাতেরই প্রসারণেতে রাখা বিস্তৃতিটি সংক্ষিপ্ত করাতে-করাতে—প্রিয়ার প্রেমডোর করালো সঘন। কংক্রীট। যেন হৃদয় দিয়ে হৃদি।—স্ত্রী সন্ধ্যা তার সুন্দরী বুকের মাধবীরাগ ঘেরা আপীনতার যাদুময়তাতে অতি মধুরভাবে পরশ ভরিয়ে আরামঝরার সুখ লাগালো—স্বামী গৌতমেরই কবোষ্ণ বুকখানার অধিত্যকা প্রদশেতে। যুবকের বুকের সুখ নাচলো—খুশীয়ালিনী মধুরিকারই ছবি হ'য়ে ছন্দিত থাকা, সেই বক্ষসাজের দু'ধারার বৃন্তে বৃন্তে মিতাক্ষর হ'তে না পারা—পাহাড়ী পথেরই মতো দু'ধারের উদ্ধত থাকা—পীনোতায়। সকালের সোনা রঙ্ রোদের তাপ-ম্লানিমা ঈষৎ ভাবে যেন তাতল সৈকত ক'রে তুলেছে।—আটপৌরে ছাঁদে পরা সন্ধ্যার ভাঁজ-ভাঙ্গা রেশমী শাড়ীর আঁচলের ভেতর থেকে—ঢেউ খেলানো রূপবতী বুকখানার শৈল্পিক সুষমার ওপরে—সেই তাপ ঝরছে এখনো। হ্যাঁ তারই উদ্ধত বঙ্কিমাতে। এ রূপ দেখিয়ে আর সাজিয়ে প্রিয়া তার স্বামীর যুবকত্বকে শ্রীরাধার মতো সুভাষিত ক'রে বলতে চায়—

"মৃগমদ বলি ঝাঁপিয়া কাঁচলি রাখিব হিয়ার মাঝে;
তোমার বরণ বসনে ঝাঁপিয়া রাখিব লোকের লাজে।।
কিম্বা কেশপাশে কুবলয়-দামে রাখিব যতন করি।
একলা হইয়া মুকুত করিয়া দেখিব নয়ান ভরি।।"

প্রিয়া তার যুবতী দেহময়তার কারাপ্রাচীরেতে—প্রিয়কে যেন আড়াল করাতে-করাতে, আর মধুছন্দার হাসিতে দুরন্ত হ'য়ে ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে—শেষ মুহূর্তে অধরের অনির্বচনীয় আদর ধারাটিকে লুটিয়ে দেওয়ালো—স্বামী গৌতমেরই তৃষায় নাচানাচি করা অধরেতে ছাপা—সাত-সকালের ঐ সোনা রঙ রোদ ঢেকে দিয়ে।

প্রিয়র করা এই বিশেষ ধারার আবদার মেটাবার জন্য—প্রিয়া যে লাজময় আদরটি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেওয়ালো চোখে-মুখে—তারই অভিব্যক্তি খুব ছোট্ট ছোট্ট শব্দ হয়ে-হ'য়ে—বার কয়েকের জন্য ছোট-বড়-মাঝারি লয় ঝরে-ধরে—ফুটলো। ফুটতে ফুটতে প্রিয়ার অধর দিয়ে করা কারুকাজের সিক্ততায় ভিজতে-ভিজতে—সে শব্দ-মুখরতা ম্লান হ'তে-হ'তে মিলিয়ে গেল—গৌতমেরই অধর বরাবর। তারই মিষ্টি খুশীতে নেচে ওঠার—ছন্দে ছন্দে। যতিতে যতিতে।

হ্যাঁ—সকালের চনমনে সোনালী রোদ মাখতে মাখতে—ষ্টেশনের পথেতে পা বাড়াবার আগে রোজকার অভ্যাস মতো—প্রিয়ার অধরাধারের সুরভিতে বন্দিত স্বামী--স্বতঃস্ফুর্ত প্রাণময়তায় মশগুল থেকে বেরিয়ে পড়ে—অসম এক খুশীর মাতনে নাচতে-নাচতে।

তারপর রোজই শেষটায় সন্ধ্যা যেমন ক'রে থাকে—তেমনি ভাবে শাড়ীর আঁচল হাতে নেয়।—স্বামীর অধরের ওপরে ওরই দুষ্টুময়তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে জানানো—প্রিয়ার আপন দুষ্টুপনায় ঝরা চুমার সিক্ততায় ছাপা আলপনার রঙীন রেখাগুলোকে—আঁচলেরই প্রান্ত-ভাগ দিয়ে মুছিয়ে দেয়।

আর তারপর সন্ধ্যা আবার বলে ওঠে কল্‌কলানো স্বরলহরেতে—

—"শোন। শোন। দুষ্টু, বলি মনে রেখেছো আজকের ফেরার ব্যাপারে আমার জানানো ফরমানখানা? না, না। দেরি ক'রলে চলবে না। রোজ কথা রাখ না তুমি! আজ রাখতেই হবে। তা না হ'লে জান ত' গৌতম—"

বলতে বলতে কথা শেষ না ক'রে সন্ধ্যা তার মদিরাভরা চোখেতে এখনো আবছায় ফুটে থাকা—সেই গত সন্ধ্যায় করা কাজল-প্রসাধন ছাপিয়ে—হঠাৎই যেন ছলছলালো।—আর সন্ধ্যার দু'খানা ঠোঁটেতে রাঙানো লাল রঞ্জনীর সাজখানা গত রাতের প্রণয়-দুষ্টুমিতে ধুয়ে-মুছে যাওয়ায়—সেখানকার শুভ্র হাসিটা এখন কেঁপে-কেঁপে উঠলো।

কয়েক পলক মাত্র। তারপরেই নিজেকে সামলে নিয়ে প্রিয়া সন্ধ্যা মধুরিকার মতো বলে উঠলো ছন্দিত গলায়—

—"না, না। ও কিছু না। শোন গৌতম। লক্ষ্মীটি, ফিরে এসো তাড়াতাড়ি।

আচ্ছা, আমার বুঝি অত রাত পর্য্যন্ত একলা থাকতে ভয় করে না? টুলটুল ত' সন্ধ্যা হ'তেই ঘুমিয়ে পড়ে। ভাবো ত' দেখি আর তখন থেকে আমার অবস্থাখানা কেমন নিঃসঙ্গ হ'য়ে পড়ে? এই, আজ তাড়াতাড়ি ফেরা চাই-ই-চাই। ঠিক ত?''

সুন্দর এক মনোলোভা হাসি ছড়িয়ে গৌতম জানালো—বাংলোর জাফরি দিয়ে ঘেরা সিঁড়ি থেকে হলদে পাথরে ছাওয়া ঘুটিঙ বাঁধানো পথখানায়—নেমে দাঁড়াতে দাঁড়াতে—

—''ঈষ্! না এলে তোমার করা রাগ আর অভিমান দেখার মধ্যে কিন্তু বেশ মজা, পাবো। এই, এই? দেখ ত' আবার অভিমান ক'রে সন্ধ্যা তুমি ছোট্ট মেয়েটির মতো যে ঠোঁট ফোলাচ্ছ! বাব্বা। দুষ্টু মেয়ে, তুমি শুধু থেকো মিষ্টি শুধু মধুরিকাটি। মাঝে মাঝে দুষ্টুকা হ'য়ো অবশ্য।—তাই ব'লে চোখের পাতায় ফোটাবে কেন ছলছলানো সজল ভাবখানা? দ্যুৎ। শোন সন্ধ্যা. ঠিক ফিরবো সময় মত ফিরতে খুবই চেষ্টা কোরবো। আর একটা কথা। সন্ধ্যা, শোনো? এই, একটু কাছে এসো।''

বলতে বলতে সিঁড়ির শেযে পর-পর দু'খানা ধাপে উপরে-নীচে ক'রে পা দুটির অবস্থান রেখে—গৌতম হাত বাড়ালো ওপরের দিকে। মধুর হাসির স্ফূর্ত গমক লাগালো স্ত্রীর প্রতি। দু'একটা ধাপ নেমে নীচেকার সিঁড়িতে—সন্ধ্যা সামনা-সামনি প্রায় হ'য়ে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়েই ছান্দস্ কাকলীতে বলল সন্ধ্যা—

—''ঈষ্। আজ কিন্তু অফিসে বেরোবার আগে যেন তোমায় পেয়ে বসেছে—দুষ্টুপনার দুরন্তময়তা। বাব্বা। আর সিঁড়ির ধাপ ভেঙ্গে হ'তে পারবো না তোমার মুখোমুখি। ভয় হচ্ছে। এখনই বোধ হয় আবার দুষ্টুমির পাগলামিতে মেতে—আমায় ছোট্ট টুলটুলের মতোই বুকে টেনে নেবে। তারপর দারুণ ভাবে জড়িয়ে-জড়িয়ে ধরবে ত'? ঈষ্। আর কাছে আসছি না দুষ্টু। ওখান থেকেই বল না কি বলবে। গৌতম, এই তোমার যে সত্যি দেরি হ'য়ে যাচ্ছে?''

প্রিয়ার থেকে অল্প একটু ওপর-নীচের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে থেকেই—গৌতম দু'হাতের আদরকে একটু ওপরের দিকে প্রসারিত ক'রে সন্ধ্যার রুচিস্নিগ্ধ মুখখানা ধরে নিয়ে বলল—''শোন। তাড়াতাড়ি ফিরবো। তবে আজ কিন্তু তোমায় সাজতে হবে আমারই ফরমায়েশী পোশাকে। লাল ব্লাউজে। লাল শাড়ীতে। লাল ওড়নায় শুধু রেশমে। আর রেশম সাজেতে। লাল ভেল্‌ভেটের স্লিপার থাকবে অলক্তকলেপা পায়েতে। কপালের কেন্দ্রস্থ সিকির মতো সিঁদুরের বড় টিপ্‌টির দু'ধার দিয়ে কপোল অবধি নেমে আসবে চন্দনের লবঙ্গ ছাপ। গলায়-হাতে-কবরীতে থাকবে জুঁই ফুলের হার। রজনীগন্ধার বালা। আর মালা। সাজবে তুমি

ফুল-সাজে। প্রতীক্ষা কোরবে। আমি আসবো তাড়াতাড়ি। এসে তোমারই জন্য তৈরী করাবো নিজেকে। তারপর তুমি নিজেকে তখন—নতুন থেকে নতুনতর ক'রে ক'রে—আমার কাছটিতে হবে সমর্পিতা। কেমন? শোন, শোন। মান-অভিমানও যদি পার ত' সে সব তুলবে ফুটিয়ে অমন ভালোবাসার নিভৃতিটি ধরে-ধরে। ঠিক, তাই? এই, এবার চলি। তা না হ'লে নির্ঘাত আজ ফেল কোরবো আমার ক'লকাতা পৌঁছানোর নির্ধারিত ট্রেনখানাকে। এই, হেসে ফেল ঝলমলিয়ে। সন্ধ্যা, গেট পেরিয়ে যেতে-যেতেও যে তোমারই মিষ্টি হাসির রিনী-ঝিনী সুরখানা বাজতে থাকে অনবরত আমারই মন্‌মহলের ছন্দে। দুষ্টু, আসি তা হ'লে।"

কথা শেষ কোরলো। প্রিয়ার আরক্তিম মুখখানাকে হাতের আদরে আর একটু ঘন ভাবে আরাম ছোঁয়াচের উষ্ণতায় ভরালো। তারপরেই প্রিয়ার দিকে পেছন ফিরে হলদে কাঁকর বিছানো পথখানায় নেমে—চলতে লাগলো জুতোর মচ্ মচ্ শব্দতে মাতিয়ে। বারেকের জন্য পেছনে মুখ ফিরিয়ে—স্ত্রী সন্ধ্যার প্রতি ছুড়ে দিল দুষ্টু হাসিরই গমকমালা। প্রিয়াও তেমনি হাসির মাধুরীতে জানাতে লাগলো সানন্দ বিকাশ। চৌকাঠের গায়ে নিজের ছবির মতো শরীরখানাকে হেলিয়ে দিয়ে রেখেছে। আবেশের মাদকতায় যেন প্রিয়া আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না।— এমনি ভাবখানায় ফোটা মূর্তি নিয়ে দেখছে—চলতে চলতে তারই দিকে পেছন ফিরে-ফিরে তাকাতে থাকা—স্বামী গৌতমের সুন্দর মুখটিকে। প্রিয়র সহাস ঘেরা মুখের দুষ্টু ঝরনাটিকে। আর তাই দেখে নিজেও সেই হাসির সাথে সাথে তাল মিলিয়ে মিলিয়ে দেখে চলেছে। সন্ধ্যা মনে মনে বলছে—অস্ফুট ক'রে—"আমার গৌতম। আমার দুষ্টু ছেলে। আজ কিন্তু ফিরে এসো তাড়াতাড়ি। বিকেল গড়িয়ে ঠিক সন্ধ্যা হওয়ার মুখোমুখি। আচ্ছা, সকালে যেমন সাত-তাড়াতাড়ি অফিসের জন্য বেরিয়ে পড়, বলি, ঠিক তেমনি কী ঘরে ফেরার জন্য ফিরতে পার না দেরি না ক'রে? আমি যে একলা থাকি তুমি যতক্ষণ না ফিরে আসছো! সেটা ভুলে যাও কেন? তুমি যাওয়ার পর সেই সকাল থেকে দুপুর পার করিয়ে বিকেল গড়ানোর পর—আস্তে আস্তে ফুটে উঠতে থাকা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কোনো রকমে নিজেকে স্থির রাখি।—নানান কাজের তদারকি করার মধ্যে—মেয়ে টুলটুলকে কোলে-পিঠে রেখে-রেখেই। একলা ওকে রেখে কাজ ক'রতে মন চায় না। যতক্ষণ ঘুমায় ততক্ষণ শুইয়েই রাখি দোলনায়। যখন জেগে থাকে তখন কোল ছাড়া করি না। ভয় কী জান? ভয় এ জন্য, যে, তোমার অনুপস্থিতির মধ্যে মনে জেগে ওঠা একাকীত্বের নিঃসঙ্গতাকে কাটাবার

জন্য—ছোট্ট টুলটুলকে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখি। ওর হাত-পা নেড়ে মুখেতে খৈ ফোটানোর অভ্যাসের সাথে—আমিও যোগ দেই।—ওকে আদর মাখাতে মাখাতে। রোদ পশ্চিমের দিগন্তে—মাটির শেষ সীমানা ছুঁয়ে হেলে না পড়া পর্য্যন্ত—মালি, চাকর, ঝি, দরোয়ান, তোমার শখের করা পোলট্রির ছোট-ছোট ঐ দুটি ছেলের সাথে কাজে আর কথায় সময়টা বেশ কেটে যায়। তারপর সন্ধ্যা ছাড়িয়ে রাত যখন গভীর হ'তে থাকে—তখনই আরম্ভ হয় আমার মধ্যে অস্বস্তিকর বিরক্তিখানা। আমাদের এই বাংলোখানায় অবশ্য পল্লীগাঁয়ের রাত—তার পাখায় বিস্তার করা কালো আঁধার দিয়ে ঘন ভাবে ঢাকতে পারে না ঠিকই। বাংলোর চারধারে অন্ধকার ঐ রাতের মাধুর্য্য ছড়িয়ে দিলেও—ভেতরের ওপর আর নীচের প্রতিটি ঘরেই জ্বলতে থাকে ঝকমকে বিদ্যুতের আলো। সন্ধ্যা হ'তে না হ'তেই দরোয়ান এসে সুইচ্ অন্ ক'রে দেয়—নতুন লাগানো—হোম জেনারেটরটির। ঘরে ঘরে আলো থাকে ঠিকই। তবু যেন কেমন-কেমন লাগে কৈ, ছুটির দিনে তুমি যখন কাছে থাকো তখন ত' আমি বেশ স্বস্তিরই মধ্যে থাকি! আর অন্য দিনগুলোতে—তোমার ফিরতে দেরি হওয়ারই সাথে মিল ধরে যেন আমি ডুবে যাই—বিরক্তিকর অস্বস্তির মধ্যে! না, না। তুমি গৌতম আজ তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।—কেন ভালো লাগে না তা আজ জানাবো। তোমারই ফরমায়েশী সাজখানায় ঝলমল কোরতে কোরতে—তোমারই হাতের আলিঙ্গনে প্রসারিত করা বাঁধনে ধরা দেবার জন্য—বুকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বো। হ্যাঁ, তারপর পরম স্বস্তির সঙ্গে জানাবো, কেন আজকাল রাত গভীর হ'তে থাকলেই আমি কেমন যেন অস্বস্তিতে ঢাকা পড়ে যাই। আর তারপর রোজকার মতো সন্ধ্যা গাঢ় হ'তেই—ঘুমিয়ে পড়ায় টুলটুলকে এই সময়টায় কোল-ছাড়া ক'রে—ওরই ছোট্ট খাটখানায় শুইয়ে দেই। হ্যাঁ গৌতম, ঠিক তখন থেকেই আমার দেহে আর মনে অস্বস্তির সঙ্গে জুড়ে বসে—এক ধরনের ভয়। ভয় পেয়ে আমি তা সহজে কাটিয়ে ওঠাতে পারি না এই পল্লীর অতি নির্জন পরিবেশখানারই কতগুলো বিহ্বলতার মধ্যে থাকায়। তখন জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে পর ভয় লাগে। ভয় পাই। বাংলোর পেচনে তখন ঘুটঘুট্টি অন্ধকার—কোন না জানা রহস্যময়তার জাল হয ত' বুনে-বুনে চলেছে। অনেক দূরের ঐ গোয়ালের আটচালার ভেতরে টিম্‌টিম্ ক'রে জ্বলতে থাকা হ্যারিকেন নিয়ে—মাঝে মাঝে মধু গোয়ালাকে দেখা যায়। আর কিছুটি নয়। আর বাংলোর সামনের জানালায় এসে বাইরের আঁধারের প্রতি আমার ভয় জড়ানো চোখের জ;ষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে দেখতে পাই—বেশ অনেকটা দূরে যেখানে আমাদের বাগান বাড়ীর এই হলদে কাঁকড়ের ফটকখানা

পর্য্যন্ত,—হ্যাঁ, ঠিক তারই বাঁ দিকে একজন নিঃসঙ্গ মানুষের পক্ষে শুধু হাত-পা ছড়িয়ে ওঠা-বসার মধ্যে সংসার পাতাবার মতো ঐ টালির ছোট্ট ঘরখানায় বুড়ো দরোয়ান রামকিষেণকে দেখা যায় শুধু।—কেন না হ্যাজাকের প্রজ্জ্বলিত আলো একই সঙ্গে ওর ঘরখানা এবং ফটকের আশো-পাশে—মায় জেলা বোর্ডের সড়ক পর্য্যন্ত ছটাকখানা রাস্তা ক'রে রাখে—আলোকময়। তবু চারধারে ঘন ভাবে সুবিস্তৃত রাস্তা ক'রে রাখে—আলোকময়। তবু চারধারে ঘনভাবে সুবিস্তৃত আঁধার দেখে-দেখে মনে হয়—আলো যেন আঁধারের বুকেতে আছড়ে পড়ে ভালোবেসে চলেছে। আর চোখে পড়ে—বুড়ো রামকিষেণকে। তার পাকা শনের মতো একরাশ চুলে ভরা মাথাখানা দোলাচ্ছে আসন-পিড়িতে বসার মতো বসে-বসে।—আর সামনেকার ছোট্ট বইদানিতে হেলিয়ে রাখা সেই তুলসীদাসী রামায়ণখানা— ওদেরই মৈথিলী ঢং-এর সুর ধরে-ধরে পড়তে দেখা যায়। অবশ্য এ মুহূর্তটি আমার দেখতে বড় ভালো লাগে। একটু স্বস্তি পাই। জান গৌতম, ও যেন মস্ত এক অনির্লিপ্ততা। এক মস্ত নির্বিকারচিত্ততা। দায় নেই বাঁধন নেই। কোন দাবী-দাওয়া পর্য্যন্ত নেই। দু'বেলা নিজের হাতেই যা হোক ডাল-ভাত কি দু' একটা ভাজাভুজি তৈরী ক'রে খাওয়ার মধ্যে যেন থেকে যায় পরম খুশী! হ্যাঁ-হ্যাঁ, যখন ভয়-ভয় ভাব আমায় জড়িয়ে নিয়ে শুধু ভয় পাওয়াতে চায়—তখন আমি এই জানালাটিতে এসে দাঁড়াই। দাঁড়িয়ে সত্যি স্বস্তি পাই আর তোমার ফিরতে দেরি হওয়ার প্রতিটি মিনিট গুনতে গুনতে আমি অধীর ভাবে দাঁড়াই কিছু সময়।—আবার কিছু সময় একটা বই নিয়ে মনোযোগী হবার জন্য পড়তে বসি—টুলটুলেরই ছোট্ট খাটখানার পাশটিতে। তবু কি জান গৌতম, এখনও তোমায় একটা জিনিস জানানো হয় নি বলেই—তোমার ফিরতে দেরি হ'লেই আমি ভয় পাই। ভয় পেয়ে সময়ে সময়ে—হয ত' অযথাই আঁতকে উঠি। মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে থাকা টুলটুলকে বিছানা থেকে তুলে বুকে জাপটে রেখে কেঁদেও ফেলেছি! না-না। তুমি তাড়াতাড়ি এসো। আজ নিশ্চয় বলবো,—কেন আমায় এ ধরনের ভয় কিছু দিন হ'লো আঁধার গভীর হ'তে না হ'তেই জড়িয়ে ধরছে। আজ, হ্যাঁ, আজ সন্ধ্যার মধুক্ষরা মুহূর্তটিতে তুমি এসে আমায় পাবে আমারই যথার্থ রূপঝরনারই মধ্যে। কলোচ্ছলতায়। গৌতম, আমার আদর আমার মধুর। তুমি এসো কিন্তু কথা মতো। প্রিয়ার দিব্যি রয়েছে তোমার আজ অন্ততঃ দেরি না করার জন্য! জান গৌতম, তোমার এই দুষ্টু প্রিয়াটি তার স্বামীর যৌবনেতে সন্ধ্যার রঙীন মেঘ হ'য়ে সাঁতার কাটার জন্য—রোজই তৈরী রাখে নিজেকে।—হ্যাঁ গৌতম, তোমার এই আদরণীয়া স্ত্রী তোমারই দেহসায়রে অনুরাগ

ভরিয়ে ডুব-সাঁতারে মিলে-মিশে যাওয়ারই জন্য—যাতে কোন কণামাত্র বাধা-বিপত্তির মুখোমুখি না হয়,—হ্যাঁ, ঠিক তারই শঙ্কায় চালিত হ'য়ে-হ'য়ে—আমি আমার বুকখানার যুবতী লজ্জাধারকে কোন আবরণের লজ্জাভারেতে আবরিত রাখি না। শ্বেতশুভ্র কঞ্চুলিকার মঞ্জুলিত ঊর্মিময়তায় পবিত্র চন্দনের বিলেখনে ফোটাই না কোন—মৃগমদ চিত্রপাঁতি। আর আমার গলা থেকে ঝুলিয়ে রাখা সোনার দ্যুতি-ঝলকিত করা কোন হারখানা পরি না, এ জন্য, যে, তা পরলে পর হয় ত' তোমারই বিশেষণে অভিনন্দিত—আমারই মনোলোভা বুকখানার যুবতী-অনিন্দ্যতায় রিমঝিম করা লজ্জাধারেতে অস্বস্তির আবরণ দিয়ে থাকবে—ওরই মুক্তা বসানো লকেটের দোদুল ছোঁয়া লাগাতে-লাগাতে। কেন জান? গৌতম, তোমারই জন্য আমার এই অনয়া আরাধিতার মতো রূপ গ্রহণ করা। এ আঁধার ঘন হ'তে থাকার মুহূর্তে একাকিনী আমার কাছটি থেকে ত' তখন তুমি থেকে যাও যেন— ছোট-ছোট নদী বা কোন পাহাড়েরই দূরত্ব ধরা—ছাড়া-ছাড়িতে। তাই আমার মনেব যুবতী শখ্ চায় প্রোষিতভর্তৃকা শ্রীরাধার মতো—

"চির চন্দন উরে হার না দেলা।
সো অব নদী-গিরি আঁতর ভেলা।
পিয়াক গরবে হাম কাহুক না গণলা।
সো পিয়া বিনা মোহে কে কি না কহলা।।"

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই হ'লো আমার মতো এক আধুনিকারও দেহমনের—মিলিত আকুলতা। ছন্দিত বিলোলতা। তারপর বুঝলে গৌতম, আমার মনে কবি বিদ্যাপতি আশ্বাসের বাতিদানটি জ্বালিয়ে দেন এই নিরিখেতে, যে, তুমি, যত দেরিই কর না,—তবু এখানে ফিরে আসবে ঠিকই। আমার বাড়ীর আঙ্গিনা ছেড়ে,—আমার বুকের প্রণয় ঝরনায় সাঁতার কাটতে না চেয়ে,—ওগো গৌতম, তুমি সাত সকাল থেকে অনেক রাত পর্য্যন্তই যে থেকে যাও—'আন' জায়গায়।—মানে তোমার ক'লকাতার কর্মস্থলে। তাই তোমারই অনুপস্থিতি বিলম্বিত হওয়ারই দরুণ মনে হয়—"আন অনুরাগে পিয়া আন দেশে গেলা।
পিয়া বিনে পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা।।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
ধৈরজ ধরয় চিতে মিলব মুরারি।।"

হ্যাঁ। সত্যি বলছি। ওগো গৌতম, তুমি আজ তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। তোমার কাছে ধরা দেবো আজ একেবারে নতুন সাজেতে। নতুন আস্বাদনে। স্বাধীনা রাধার মতো আজ সন্ধ্যায় প্রিয়ার দেহসাহরে পরাবো—লাল রেশমের আবরণ।

আর নানান ফুলের অলঙ্কার। তুমি গৌতম আমার ঐ বাসকসাজখানাকে শুধু ফুলের বিছানায়—তোমারই সুনন্দিত স্বামিত্বের প্রণয়কলায় করাবে—এলোমেলো। হ্যাঁ, করাবে বিপর্য্যস্ত। না, না। আর আমি কিছুটি ভাবছি না! বলবও না। কিন্তু তুমি এসো। হ্যাঁ, এসো। টিকই তাড়াতাড়ি।"

বাংলোর একতলার দরজায়—যেখানে হলদে কাঁকরের পথেতে নামার জন্য সিঁড়ির কয়েকটি ধাপ দু'ধারে ছড়িয়ে গেছে—তারই ওপরের কাঠের জাফরিতে তৈরী প্রায় ছোট্ট এক 'ওয়াচ্-ঘরে'র মতো দেখতে ছাউনির নীচে সন্ধ্যা দাঁড়িয়ে থেকে—গৌতমের পথ চলার দিকেতেই চোখ রেখে মনে-মনে ভাবলো—এত-সব মধু-কথার রাগ-আলাপন। হলদে কাঁকর ছাওয়াকে ছুঁয়ে থাকা সিঁড়ির শেষ ধাপে সন্ধ্যা নেমে এসে—কাঠের রেলিঙে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। একটা মোড় ঘুরে গৌতম যখন ষ্টেশনের পথখানা ধরলো—তখন সন্ধ্যা আর দেখতে পায় না। রোজই যতক্ষণ না গৌতম জেলা বোর্ডের এই মেঠো পথখানার বাঁক ঘুরে পিচের রাস্তা ধরছে—ততক্ষণ পর্য্যন্ত এক মুহূর্ত চোখের পলক পড়তে দেয় না সন্ধ্যা। তারপর প্রিয়ার মাথার ওপরের জাফরির ছাউনির ফোকরগুলো থেকে ঝরে পড়া সোনা রঙ্ রোদের চক্চক্ করা জাল বুনে তোলা আমেজ পেতে-পেতে—চোখের প্রায় সজলিত দৃষ্টি ভেজা ভেজা হ'য়ে আসে—গৌতম ষ্টেশন রোডে ঢুকে আড়ালে চলে যাওয়ায়। আস্তে আস্তে সন্ধ্যা তখন ভেতরে আসে। ঘরকন্নায় নিজেকে তারপর থেকে মাতিয়ে রাখে।

অন্য দিনের মতো আজ দুপুরে জেগে-জেগে বই পড়া, বা ছবি আঁকা, বা সেলাইয়ের টুকিটাকি কাজ না ক'রে—ঘুমিয়ে পড়েছিল। বেশ অনেকক্ষণই ঘুমিয়েছিল। কী আশ্চর্য্য! পাশেই দোলনার দুলুনিতে ঘুমিয়ে থাকা টুলটুলও আজ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘমিয়েছে! ঘুম ভাঙ্গায় ওর হাত-পা ছুড়ে-ছুড়ে জানানো চীৎকারে—সন্ধ্যা উঠে পড়েছিল ঘুম থেকে। তারপর টুলটুলকে আদর ক'রে দুধ খাইয়ে, সাজিয়ে-গুছিয়ে—অনেকক্ষণ কোলে-কোলে রেখে ঘুরেছিল। ফিরেছিল আধুনিকা সন্ধ্যা মেয়েকে ছোট ছোট আদরে—কোরে তোলাচ্ছিল ব্যতিব্যস্ত মেয়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে গুনগুনিয়ে শোনালো ছড়া।—ঘুরতে-ঘুরতে চলতে-চলতে।—সেই 'আতাগাছে তোতাপাখী ডালিমগাছে মৌ' থেকে আধুনিক ছড়াকার অন্নদাশঙ্কর রায় পর্য্যন্ত। সুকুমার রায়ের পর সন্ধ্যার সব চাইতে প্রিয় ছড়াকার হলেন এই অন্নদাশঙ্কর। কেননা তাঁর রচনা করা ছড়ার মধ্যে আধুনিক সমাজের অনেক কথাই উঁকি-ঝুঁকি দেয় বলেই—সন্ধ্যা এত ভালোবাসে। ও মনে ক'রে—শিশুরা এর মানে না বুঝেও ছড়ার মাধুর্য্য যেমন ক'রবে উপভোগ—

হ্যাঁ, তেমনি বড়রাও মাধুর্য্য পেয়ে উপরি পাওনার মতো পাবে—অন্য এক কথা,—যা ছড়ার আকারে জানানো হ'য়েছে। তাই আজ সন্ধ্যা মেয়েকে বুকে চেপে—ওর ছোট্ট মুখখানায় ফোটা জ্যোৎস্নাময় হাসির ওপর-ওপর হাজারবার চুমা খেতে-খেতে—জানালো মৃদুল গলায় অন্নদাশঙ্করেরই ছড়া। মেয়েকে দোলাতে দোলাতে—সুর ধরে ধরে গুনগুনালো মিষ্টি সন্ধ্যা—"ওঃ টুলটুল। ও দুষ্টু। আমার মা সোনা, জান কি—

'ব্যাঙ্ বললে, ব্যাঙাচ্চি, দাঁড়া তোদের ঠ্যাঙাচ্চি।
তা শুনে কয় ব্যাঙাচ্চি, আমরা কি, সার ভ্যাঙাচ্চি?'

—ঈষ্, টুলটুল, তুমি বুঝলে না, না? তবে শোন আরেকখানা—

'আদুড় বাদুড় চালতা বাদুড় বাদুড় দেখ'সে
ট্রামগাড়ীতে ঝুলছে বাদুড় রাত্রিদিবসে।
বাসগাড়ীতে ঝুলছে বাদুড় টিকিট না কেটে।
রেলগাড়ীতে ঝুলছে বাদুড় প্রাণটি পকেটে।'

—কী, কেমন মজা লাগছে শুনতে, না? বাঃ, বাঃ। আমার খুকুসোনা। আমার দুষ্টু সোনা। আমার টুলটুলরানী। এবার, এবার তা হ'লে প্যারাম্বুলেটারে শুয়ে থেকে ঘুরে এসো কেমন?"

বলতে বলতে সন্ধ্যা তার শত আদরের ছোট্ট মেয়ের দেয়ালা হাসিতে ভরপূর মুখখানাকে—শতেক চুমায় ঢাকতে ঢাকতে—প্যারাম্বুলেটারের গদীর বিছানায় শুইয়ে রেখে রঙীন চাদরখানা পায়ের দিক দিয়ে বুক পর্য্যন্ত টেনে দিল। আর ছোট্ট হাতখানায় কোন রকমে মুঠো করনো শিখিয়ে ধরিয়ে দিল একটা প্লাস্টিকের ঝুমঝুমি। তারপর বেশ কিছু সময়ের জ্য সন্ধ্যা পোলট্রির ছেলে দুটোর জিম্মায় ছেড়ে দিল টুলটুলকে। ওরা রোজকার মতো ওকে গাড়ী ঠেলে-ঠেলে সমস্ত বাগানের পথে ঘোরাবে। এই বেশ কিছু সময়টায় সন্ধ্যা নিজেকে তৈরী করাতে পারে—সাজে-পোশাকে-হাবে-ভাবে। আগতপ্রায় বাসক-সন্ধ্যাটি, গৌতমের সঙ্গে রভসেতে কাটাবার জন্য।

বাংলোর দো'তলার পেছনে—দক্ষিণ খোলা চওড়া বারান্দা। ঐ বারান্দা ঘুরে যাওয়া যায় এক তলাকার প্রশস্ত ছাদে। তার পরেই শ'খানেকের মতো একরের সবজু জমীন। সবটাই ওদের। দক্ষিণের যে প্রান্ত ছুঁয়ে ওদের জমির সীমানা শেষ হয়েছে—ঠিক সেই সীমারেখা ধরে পাহারা দিচ্ছে—দেবদারু গাছের চলমান সারি। মাঝে মাঝে রয়েছে পাইন আর নারিকেল। হাওয়া যখন দক্ষিণ থেকে তাদের উঁচু হয়ে থাকা মাথা ডিঙ্গিয়ে বাংলোর দিকে আসতে-আসতে দমকা

হ'য়ে পড়ে—তখন পাইন ও নারিকেলের ঝালরের মতো পাতায়-পাতায় খেলে যায়—দোলনের ঢেউ। তা দাঁড়িয়ে থেকে সন্ধ্যার দেখতে খুবই ভালো লাগে নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলোতে,—যখন পাশে গৌতম থাকে না। আর টুলটুলও থাকে না। মনটা খালি ভ্রমর-গুঞ্জনে হতে চায় বিবাগী। হাতের চুড়িতে-বালাতে-শাঁখাতে জাগে বেলোয়ারী বাজনা।—পলকে পলকে সন্ধ্যার যুবতীকা তখন নাচের রিদম্ ঘেরা অভিমানে দুলতে থাকে। আর মদালসা চোখের মদিরতা অজানতে কখন জানি পদ্মপাতায় জলের মত টলমল করা কয়েক ফোঁটা—মুক্তা-বিন্দুর অশ্রুতে ভরিয়ে তোলায়। তারপর কখন জানি সন্ধ্যারই অজানায়—বৃষ্টি শেষে নারিকেলের মসৃণ পাতার খাঁজ ধরে ধরে চুইয়ে যাওয়ারই মতো ক'রে—সেই জমাট বাঁধা কয়েকটি মুক্তাশ্রু আনন্দেরই সুখী গমকেতে—মুক্তি খোঁজে দু'ধারার কপোল বেয়ে। সন্ধ্যার মদিরেক্ষণ যুবতীকা তখন অনুরাগবতী সন্ধ্যার জন্য—নতুন সাজে-পোশাকে আবরিতা হওয়ার আগে—সেই বিকেলের গোধূলিতে হ'য়ে পড়ে কেমন যেন—বিশ্রস্ত। বাঁধনহারা। তাই সুযোগ বুঝে দখিনা হাওয়া তখন পাগলামিতে মেতে ওঠে। হাওয়া নিজের দমকা ঝাপটায়—বিরাগিনী হওয়া যৌবন-স্নাত ঐ পেশল-মাধবীরাগে টইটম্বুর বুকখানার লাজ-নিটোলতাকে—বারে বারে চাইছে নিলাজে প্রকট করাতে। সত্যি সন্ধ্যা তেমন মুহূর্তে বুঝেও যেন ইচ্ছা করেই বুঝতে চায় না এ হেন অবস্থায় এটাই, যে,—

"ঝরে যায় উড়ে যায় গো আমার বুকের আঁচলখানি
বাধা মানে না হায় গো তারে রাখতে নারি টানি!"

—ঠিক-ঠিক। তাই হয়ে ওঠে সন্ধ্যার মনের সঙ্গে—দেহেরই মিল ধরা এমন উদাসীনতাটি। সন্ধ্যা আজকেরও গোধূলি-লগ্নের মিষ্টি আলোতে —এই প্রশস্ত বারান্দার খোলামেলা পরিবেশের আমেজটি উপভোগ ক' রতে ক' রতে — আপন অঙ্গসজ্জার বর্ণময়ী প্রসাধনে মেতেছে। আবিষ্টা রেখেছে। বারান্দার সবুজ রঙ্ করা কাঠের জফরি বসানো ওপরের ঢেউ-ঢেউ খেলানো সীলিঙের নীচেতে— নিভৃতির প্রসাধন কক্ষটিকে সন্ধ্যা তৈরী করিয়েছে — তার আদরের গৌতমেরই পরিকল্পনায়। শোবার ঘর থেকে বেরিয়েই — এই বারান্দাটি। বারান্দা আর ঘরের একখানা দেওয়াল ঘেঁষেই এই সাজ করাব, — আর সাজ করার ফাঁকে-ফাঁকে — নিলাজ হওয়ার মতো আব্রু দেওয়া পরিবেশটিকে ঠিক-ঠিকই সন্ধ্যা বজায় রেখেছে। — এই, এইখানটারই খোলামেলা প্রাকৃতিক শোভা—ও মাধুরীর মধ্যে। বাঁশের সরু সরু কঞ্চি চেঁচে-ছুঁলে — রঙীন সুতোর বেঁধে-বেঁধে বোনা জাপানী কারিগরদের সেই নয়ন-সুখকর 'ব্যাম্বো ম্যাট্রেস্' ছাদের শান্ ছুঁইয়ে প্রায় ছ'ফুট পর্য্যন্ত ঝুলিয়েছে

ওপরের কাঠের সীলিং থেকে। শুধু পুব আর পশ্চিম দিকটায়। উত্তরে রয়েছে ঘরের দেওয়াল। আর দরজা। শুধু খোলা রেখেছে দক্ষিণটা পুরোপুরি। কেননা, এখানে থেকে ছাদটা বারান্দার অল্প একটু উঁচু চত্বরেতে ঘেরা কাঠের রেলিঙ্ ছুঁয়ে — সামনে এগিয়ে গেছে প্রায় যাট কী সত্তর ফুট পয্যন্ত। ছাদের শেষে তিন ফুট চওড়া পাঁচিল। কাঠেরই। তবে জাফরির কাজ ফোটানো নয়। তারপর থেকে সেই শ'খানেক একরের ফুল ও সবজির বাগান বহু দূর পর্য্যন্ত এগিয়ে গেছে। তারপরেই ত' কাঁটা তারের ঘন ভাবে বেড়া দেওয়া লোহার খুঁটিগুলোর এ-পারে — ওরই সমান্তরালে সারি বেঁধে ঘুরে গেছে — দেবদারু-পাইন-নারিকেল গাছগুলো। — যেন পাহারায়—মোতায়েন থাকে। তাই সন্ধ্যা ভাবে, আর মাঝে মাঝে গৌতমকে শুধায় কথার উত্তরে —"দ্যুৎ। লজ্জা কেন পাবো। এমন সুরক্ষিত দুর্গের মতো বাগান-বাংলোর প্রাকৃতিক ছবিতে মুখর থাকা — এই পেছনকার পুরোপুরি খোলা দক্ষিণায়ণের পথেতে, বল, কার সাধ্য আছে যে, গোধূলির মায়াঞ্জনে রাজকন্যা হ'তে চাওয়া — আমারই আচমকায় লাজ-হারা করানো দেহখানাকে দেখে ফেলতে পারে? — লুকিয়ে-চুরিয়ে? না, তা কেউ পারে না। হ্যাঁ, পারে শুধু একজন। হ্যাঁ, এমন বিশেষ একজন! যার আমাকে সলাজের চাইতে বরং বেশী মাত্রায় — নিলাজ আর নিরাবরণ সৌন্দর্য্যে দেখে-দেখেও — আশ কিছুতেই যেন মিটতে চায় না! জান গৌতম, সে কে? ঈষ্, জান না, না? তুমি কী তাকে চেন?"

— সে কথায় দুষ্টু-দুষ্টু হাসিতে ঝলমলিয়ে থেকে কিছুটি না বোঝার মতো ক'রেই বলতো গৌতম — "বাঃ মেয়ে। আমি কী ক'রে তাকে চিনবো বল? আমি যে নিজেকেই চিনি না যে! এই, এই? না, না। আর না। একবারটি শুধু।" — তাই বলতো গৌতম। আর তখনি কিন্তু আরেকবারটি সাঙ্গ কোরে নিত — স্ত্রীর প্রতি স্বামী-দুষ্টু-মানেরই নিলাজক কৃতি! তখন হয় ত' ঐ কথাকে পরস্পরের প্রতি চালাচালি করার ফাঁকে — মনে হয় স্ত্রী সন্ধ্যার প্রসাধনে ব্যস্ত থাকারই দরুন খেয়াল থাকতো না মোটেই, যে, — ওর যৌবনের বঙ্কিমায় মঞ্জুষা হ'য়ে ঝকঝক ক'রতে থাকা ভরাট—সুষমাঙ্কিত বুকের লাজরেখার উদ্ধতা — সত্যি কবিতায় ছন্দ-সিম্ফনি নিয়ে — আবরণ-মুক্ত বোতামে ব্লাউজের আড়ালে দেওয়া কারাগার থেকে হ'য়ে পড়েছে — মুক্ত লাজ। তাই সে সময়ে মুহূর্তেকের সুন্দর দুরন্ততায় মেতে —স্বামী গৌতমের দুষ্টুমিতে আনচানানো অধরায়ন সুন্দরতায় ভরিয়ে দিত—প্রিয়ার ঐ হঠাৎ হ'য়ে পড়া মুক্ত-লাজ বরাবর নিলাজিত প্রণয়-সমীক্ষাটি! কিন্তু এর পরেই আর কী, — স্ত্রী সন্ধ্যার মনে আবরিত হতো বিষম সংকট। সন্ধ্যা তখনি সুখ পেয়ে আর খুশীয়ালিনী হ'তে হ'তে — কেঁদে ফেলতো অঝোর ধারায়। কী আশ্চর্য্য!

সন্ধ্যা যুবতী মনেতে অনুসন্ধান করার পর তা বুঝেছে, যে, — স্বামী গৌতমের কাছ থেকে কারণে-অকারণে সময়ে-অসময়ে এমন সব প্রণয়-দুর্দমতারই ঝড়ের কাছে — ঝরে পড়তে সত্যি ভালো লাগে! তবু, —হ্যাঁ তবু, এত'র পরেও কেন জাগে — এ হেন কান্না? সত্যি স্বামীর যুবকত্বে মুখর এই মঞ্জুলিত দুষ্টু আবদারটি সাঙ্গ করাবার জন্য —গৌতমও তার প্রিয়া স্ত্রীকে সুন্দরের অর্চনাতেই এ ভাবে দেহী-লাজরেখার প্রতি — জানায় আদর! করায় অধরায়ন! তবু কেন সুখ পেতে-পেতে আর রভসিতা হ'তে-হ'তে —সন্ধ্যা চোখের বাদুলে ধারায় ভেসে যায় — ঠিক-ঠিক এক ক্রন্দসী মধুছন্দারই মতন? —তাই প্রিয়াকে সজলিত চোখেতে আরও মুক্তোর দানার মতো আকার ছাপিয়ে — ছোট ছোট অশ্রুকণায় অভিমানিনী হ'তে দেখা মাত্র গৌতম জানতে চাইতো—"এই? এ কী? এতে কান্নার কী আছে? সন্ধ্যা, ভালো লাগে না বুঝি? না কী মোটেই পছন্দের নয়? তুমি সত্যি সন্ধ্যা যে কিনা আমার পক্ষে তা বোঝা মুস্কিল। আমারই হঠাৎ আচমকা ক'রে ফেলা—এমন সব আদর করার পরই দেখি — তুমি কেঁদে ফেল! কী যে না তুমি! সন্ধ্যা, এই দুষ্টু?"

প্রিয়র কথা থামতেই—স্ত্রী সন্ধ্যা বলতো গৌতমের কাঁধের ওপরে কান্নায় আরো মধুর হওয়া মুখখানা আড়াল কারার পর — "না, না। তুমি ভুল বুঝছো কেন? আমার ভালো লাগে। তবে কী জান, এই দুর্দম দুষ্টুপনায় চালিত হ'য়ে তোমার করা আদরেরই দুরন্তপনার মধ্যে —আগে থেকে নিজেকে তৈরী না রেখে—হঠাৎই সঁপে দেওয়ার মুহূর্তগুলোতে আমার যুবতী-স্বভাবটি ভারসাম্য রাখতে না পারারই দরুণ—আমি অসম সুখের আবেশে মুগ্ধ হ'তে হ'তে —তারই প্রকাশখানা দেখিয়ে ফেলি—কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। আর কিছু নয়, গৌতম! সত্যি বলছি। আদর জানাবার জন্য, বা আবদার মেটাবার জন্য তুমি যত সহজে মুহূর্তেই তোমার বুকের আশ্রয়ে বন্দী করাতে পার —বুঝলে গৌতম, আমি ত' মেয়ে, — কাজেই অত সাততাড়াতাড়ি নিজেকে মদিরে-বিলোলে —দুষ্টুমতী করাতে পারি না আর কি।"

কথা শেষ কোরেই — বরনারী সন্ধ্যা মুখোমুখি চাহনিতে ভেজা-ভেজা ভাবখানা ছড়িয়ে দিয়ে—মধুস্নিগ্ধারই মতো ঝরাতো—হাসির রঙীন শুচিতা। আর কি আশ্চর্য, তারই মধ্যে কিনা স্বাবাবিক ছন্দের যতি ফুটিয়ে —সন্ধ্যার দু' চোখের কোণা দিয়ে তখনও পড়তো টপ্ টপ্ ক'রে —মুক্তোর ঝকঝকে দানা।

সে সব অতি দাম্পত্যিকে বোঝাবুঝির খেলায় মাতামাতি করার দুর্দমতা ভুলে —দুরন্ত যৌবন নিয়ে সত্যি শান্ত হ'য়ে উঠতো—এই গৌতম। স্ত্রীর ছবির মতো চোখের স্নিগ্ধতায় অশ্রুকণা টলমলাতে দেখলে পর— গৌতমেরও চোখের টানা মণি ছাপিয়ে—জল জমতো। চিকচিক কোরত। সন্ধ্যা এই কান্নায় বেশীদুর পর্য্যন্ত

অকারণেই এগুলে পর— গৌতমও মাঝে-মাঝে কেঁদে ফেলেছে। ওরই মধ্যে একদিন গৌতম বেশ সুন্দর কথা বলেছিল— সেদিন সজলিত হওয়া নিজের দু' চোখের কালো-কালো কুট্টিমে এক রুচিস্নিগ্ধ যুবকের আর্তি সাজিয়ে।—আর একটু আগে নিজেরই অতর্কিত ভাবে জানানো আদরের দুরন্তপনাতে এলোমেলো মুখ-রুচিরায় কান্নার গমক ধরা প্রিয়া সন্ধ্যার স্নিগ্ধ হ'য়ে থাকা—দু'খানা কাজল আঁকা চোখের পাতার কিনারায়—টলমলানো আনন্দাশ্রু রুমাল দিয়ে মুছিয়ে দিতে-দিতে বলেছিল—"ছিঃ, সন্ধ্যা! আর কাঁদে না। দেখেছো ত' যত বড় দুরন্ত স্বভাব নিয়েই না কেন আমি তোমায় আদরে-আবদারে ব্যতিব্যস্ত কোরে তোলাই,— সেই আমিও সত্যি তোমার অকারণের মস্ত এই মেয়েলি রীতিকায় কাঁদতে দেখলে পর—আমিও নিজেকে ঠিক রাকতে পারি না মুহুর্তেরই জন্য। আমিও কান্নার সামিল হ'য়ে উঠি।" তাই বলে সেদিনের কান্নায় আর কান্না-দোদুল মুহুর্তে —স্বাভাবিক ছন্দ-যতি মিলেতে ফিরতে ফিরতে —সন্ধ্যার মুখখানা দু'হাতের দৃঢ় করা অঞ্জলিতে তুলে নিয়ে— কয়েকটি আলতো চুমায় রাঙাবার পর বলেছিল গৌতম হাসি মুকুলিত মুখে— "আচ্ছা সন্ধ্যা, তুমি অস্কার ওয়াইল্ডের লেখা পড়েছো? ভালো কথা, বলতে পার ইংরেজী সাহিত্যে ওঁর বৈশিষ্ট্যটি কী?"

—"হ্যাঁ। পারি বলতে। মোস্ট স্টাইলিস্ট লেখক। ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যে নতুন-নতুন শব্দ তৈরী, আর শব্দের আহরণ ও যথাযথ যোজনার ব্যাপারে উইলিয়ম সেক্সপীয়ার ও জন কীটস্ যেমন মহাকবি ছাড়াও ভাষার কারিকুরিতে মস্ত যাদুকর ছিলেন,—হ্যাঁ বুঝলে গৌতম, তেমনি আধুনিক লেখার মধ্যে চাকচিক্যে ভরা শুধু নতুন-নতুন বহু শব্দ, আর তারই মধুরেতে করা বিন্যাসের রুপকার হিসাবে অস্কার ওয়াইল্ডও বিখ্যাত হ'য়ে আছেন—ভাযার যাদুকর নামেতে। কী, তাই না? শুধু কি তাই? ওয়াইল্ড একাধারে মধুর বাক্যবিন্যাসে ও ততোধিক সুন্দর শব্দের সমারোহে খুবই সহজ ও সরল ভাবদ্যোতনা রেখে গেছেন। সত্যি বলতে গেলে কথার যাদুকর অস্কার ওয়াইল্ডের গল্পে বা উপন্যাসে বা প্রবন্ধে— মায় সাহিত্য-সমালোচনা সম্পর্কিত তাঁর সেই বিখ্যাত গ্রন্থ— " The Intentions ", —হ্যাঁ, যার মধ্যে তিনি 'criticism as an art'-এর ভায্যকর হ'য়ে দেখা দিয়েছিলেন, — বলি গৌতম, সে সব রচনার যে অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্য ও শব্দ-চয়নের অনির্বচনীয়তা রেখে গেছেন—তার হদিস কী আর কোন প্রখ্যাতনাম লেখকের মধ্যে পেয়েছি? না, পাওয়া যায়? স্কুলের জীবনে ক্লাস টেনে উঠে পড়েছিলাম সিলেকশনের অন্তর্ভূত 'The Selfish Giant.' — পড়তে-পড়তে বা শিক্ষকের পড়া শুনতে-শুনতে আমি ত' একদিন ক্লাসসুদ্ধ মেয়েদের মধ্যে বসে বসে থেকে—হঠাৎই কেঁদে

উঠেছিলাম —গল্পের শেষ পরিণতিটি দেখে। আজও মনে পড়লে মন আমার ব্যথাতুর হ'য়ে ওঠে। মনে হয়, যে, মানুষের মধ্যে যখন মঙ্গলময় ভগবান সত্যিই ক্ষণিকের জন্য হ'লেও উদিত হন,—হ্যাঁ তখন তাঁর পক্ষেই এ ধরনের একখানা 'Song Celestial.' - রূপী গল্পের আকারে তা রচনা করা—সম্ভব হয়। পরে কলেজে উঠে যৌবনের প্রথম সোপানেতে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম —ওয়াইল্ডের বহু বিতর্কিত ও সব দেশেতেই আলোচিত — সেই 'দি পোট্রে ট অফ্ ডোরিয়ান গ্রে' বুঝলে গৌতম সে আবার আরেক জগতের সন্ধান পেলাম। হ্যাঁ, ঐ উপন্যাসেরই মধ্যে আলোকপাত করা জটিল প্রণয়াদি সম্পর্কে। যাক্ সে কথা। এই বল, কেন ওয়াইল্ডের কথা জিজ্ঞাসা ক'রলে?'' —বলে দু'হাতের বাঁধন এক হাতে রেখে— সন্ধ্যা অপর হাতখানা তুলে আঁচলের প্রান্ত দিয়ে স্বামী গৌতমের চোখের কালো রঙ্ ছাপিয়ে থাকা —জলের টলমলে রেশ মুছিয়ে দিয়েছিল। আর হেসেছিল তখনি দুষ্টু মধুরিকার মতো।

গৌতম প্রিয়ার ঘন এলোচুলে ভরা মাথার সুগন্ধি আঁধারে অধরের ছোঁয়াকে ধরে রাখার মতো ক'রে বলেছিল—''জান, এই ওয়াইল্ড তোমাদের মতো মধুরিকা স্ত্রী-সুজনাদের সম্পর্কে রেখে গেছেন এক মস্ত প্রশস্তি? আর সে কথাটিকে আজ তোমারই মধুরে-সুন্দর ঐ যুবতী স্বভাবেতে থাকা মুঠো-মুঠো অনির্বচনীয়তার আভাতে ঝলকিত হ'য়ে— না ভেবে পারলাম না। তুমি কত মধুর। কত অনিন্দ্যা। —তাই ওয়াইল্ডের প্রশস্তির ভেতর দিয়ে— তোমারই মহত্বকে বোঝাতে চেয়ে বলবো যে, — 'There is nothing in the world like the devotion of a married woman.' — কি দুষ্টু তাই না? বলি, আমাদের ছেলেদের সম্পর্কেও বোধ হয় এত বড় প্রশস্তি নেই! এ ছাড়াও আর আর যা আছে —তার সবই তোমাদের বিবাহিতাদেরই গুণগাথায় ভরাট। জান ত' সন্ধ্যা দার্শনিক সোপেনহর —যিনি পৃথিবী জুড়ে এক সময় পয়লা নম্বরের নারী-বিদ্বেষী হিসাবে পরিচিত ছিলেন —হ্যাঁ, সেই তেমন তিনিও পর্য্যন্ত একটি জায়গায় হার স্বীকার করেছেন তোমাদেরই অসাধারণ এমন কিছুর ব্যাপারে। তোমাদের, মানে মেয়েদের যৌবনবাসরটি মিথুনলীলায় তাদের প্রিয়তমদের থেকে ধার করা অণু পরিমাণ এক শোণিতকণায় —নতুন প্রাণ সৃজনের জন্য অঙ্কুরিতা হ'য়ে — যে অসম ধৈর্য্য ও সহনশীলতা থেকে সৃষ্টির সম্পুর্ণ রূপখানা ফোটায় —হ্যাঁ, তাই পরম বিস্ময়ের টানাপোড়েন ধাঁধিয়ে যাওয়া সোপেনহর করেছেন—তারই গুণগানটিকে। সন্ধ্যা, এই ধর না কেন, —তুমি যেমনটা ক'রেছো আমারই টুলটুলের 'মা' হ'য়ে। ঈষ্! রাঙা হচ্ছো যে এই

কথায়! দ্যুৎ। শোন, সন্ধ্যা। ধ্যাৎ, কী যে মেয়ে না তুমি! ওঃ, কিছু বলবে বুঝি?''

স্বামীর কাঁধেতে মুখ ন্যস্ত রেখে শুধু বলেছিল তখন —''এই বলত' ওয়াইল্ডের বৌ যিনি ছিলেন —তিনি কী খুব সুন্দরী আর বিদুষী রমণী? স্বামীকে কী খুবই ভালবাসতেন? ওগো, বল না।''

তখনি গৌতম বলেছিল — ''হ্যাঁ। শ্রীমতী ওয়াইল্ড মানে—কনস্টান্স মেরী লয়েড় দেহী-রূপে ছিলেন —পরমাসুন্দরী। আর সেই সঙ্গে গুণবতী। এ পায়াস লেডি। বেশ কয়েক বছরের ভালোবাসাবাসির পর —তিনি বছরের শেষে অস্কারের পরিণীতা হন তাঁরই সমবয়েসিনী সাথী এই কনস্টান্সের সাথে। বিয়ের পরই — পর-পর দু'ছরের মধ্যেই স্ত্রী কনস্টান্স দুটি সন্তানের মা হন। প্রথম সিরিল ও দ্বিতীয় ভিভিয়ান। তাতে নিজেকে তিনি যেমন গর্বিতা মনে ক'রতেন, তেমনি মন-প্রাণ দিয়ে গরিমা ভরিয়ে ভালোবাসতেন অস্কারকে। তিনি ছিলেন যুবতী রত্না। বুঝলে সন্ধ্যা, তারই জন্য—লেখক লুইস্ ব্রড্ ওঁদের জীবনী লিখতে গিয়ে ওয়াইল্ড-প্রিয়া কনস্টান্স সম্পর্কে বলেছেন, " A thoroughly womanly woman is the summing up of her character." আশা করি সন্ধ্যা, এ থেকে তোমার সব জানা হ'লো।''

মাস দু' তিন আগের এ সব কথা মনে পড়ায়— আজ সন্ধ্যা এমন মধুর গোধূলিতে ঘেরা ম্লান আলোর ঠাণ্ডাঠাণ্ডা আমেজে—একটু অন্যমনস্কা হয়ে পড়েছিল। আকাশের সীমাহীন নীল রঙ্ ছাপিয়ে মেঘের খেলা তখন চলেছে—রঙ্ ধূসরিমায়। হংস বলাকা আর চাতক পাখীরা তখন ঘুরছে কোথাও কোথাও দল বেঁধে। —চক্রাকারে। ঘুরতে-ঘুরতে নীচের দিকে নামছে। আবার পরমুহূর্তেই উঠে যাচ্ছে ওপরেতে—ডিগবাজী খেয়ে। দক্ষিণ পথেতে বাগান শেষ হওয়ার সীমানা-সূচক রেখা ধরে-ধরে—চারটি ধার ঘেরাও রাখার মতোই পাইন-দেবদারু নারিকেলের সারির উঁচু-উঁচু মাথা ছুঁয়ে—আকাশের মেঘমালা—বড় ঝড় নামাবার ঈশারাখানা যেন জানাচ্ছে। নারিকেলের আর পাইনের ঝালর দেওয়া পাতার জাফরি মতন রূপখানা হাওয়ায়-হাওয়ায় দুলতে থাকায় —সন্ধ্যার চোখের দৃষ্টি আকর্ষিত রেখেছে। —কেন না সবুজ সবুজ শরীরেতে ছোট্ট লাল ঠোঁটখানায় সুন্দর দেখতে —অনেকগুলো টিয়াপাখী তখন ঘুরছিল আর ফিরছিল —এক গাছ থেকে উড়ে-উড়ে আর বসে-বসে —অন্য গাছটিতে। সবুজ পাতায় ঢেকে যাওয়া টিয়াদের সবুজ শরীরে —অপরূপ মিল ধরে, বারে বারে হারিয়ে যাচ্ছিল —সন্ধ্যার চোখের স্থির রাখা দৃষ্টিপথ থেকে। এ এক আশ্চর্য্য খেলায় পেয়ে বসেছে তাকে। কোন্

টিয়াটি এক জায়গা থেকে উঠে গিয়ে কোথায় আবার বসলো সবুজ পাতারই মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে —তাই খুঁজে বার ক'রতে চারধারে তন্ন তন্ন ক'রে সন্ধ্যা খোঁজ ক'রছে। খুঁজে দেখার মাদকতায় নেচে গেছে ওর মন। —কিন্তু বেশ কিছু সময় ধরেই যে ছাদের দক্ষিণ খোলা এই নির্জন প্রসাধন কক্ষের মধ্যে —গদি দেওয়া ছোট মোড়াখানায় বসে আছে —তা বোধ হয় সন্ধ্যা ভুলতেই বসেছিল প্রায় আটপৌরে ঢঙে পরা তাঁতের শাড়ীর রঙ-বেরঙ্ কাজে বোনা চওড়া আঁচলখানা —এতক্ষণ আলতোভাবে বাম কাঁধের আশ্রয়ে ছিল। ওর এক প্রান্তে বাঁধা ছিল ঘর-গৃহস্থালির জন্য চাবির একটা থোকা। সন্ধ্যা একটি লুকিয়ে পড়া টিয়াকে দেখবার জন্য বাঁয়ে একটু হেলতেই —আঁচলখানা বারান্দার টালির মেঝেতে পড়ে গিয়ে — সেই চাবির থোকায় ঝনৎকার করা শব্দেতে মুখরিত করালো। দখিনা বাতাস অবশ্য অনেক আগে থেকেই ছিল —আলতো হয়ে থাকা আঁচলখানাকে স্থানান্তরিত করাতে। এখন চাবির ভারে আঁচল কাঁধ ছেড়ে বুকের রূপঝরনার লাজরেখা আড়ালে না রেখে —নীচের দিকে পড়তে থাকায় —হাওয়ার ঢলতাকে ঝনঝনানির মধ্যেই ছড়িয়ে দেওয়ালো। লাজে লাল বুকের পাহারায় মোতায়েন থাকা আঁচলখানা ওড়াতে ওড়াতে। সন্ধ্যার খেয়াল হ'লো। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরলো পেছনের দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে রাখা হাল ফ্যাসানোর ড্রেসিঙ্ টেবিলের ফ্রেমে বাঁধা আয়নার দিকে। আয়নাতে যে দেহীরূপ নিলাজ সুষমায় ঝলমলালো—সন্ধ্যারই অন্যমনস্কতার সুযোগ পেয়ে — তা নিলাজ হ'তে পারে! কিন্তু তাই-ই হ'লো—আসল লাজ-যুবতীকা। সন্ধ্যার বিবাগী মনের ঘেরাটোপ সরিয়ে ওরই অজানায় কখন এক সময় আর কি আঁচলের কারাগারে বন্দী থাকা—যৌবন-সবুজতায় প্রগাঢ় দুই ছান্দসী রিদম্—রেশম ব্লাউজের বাঁধনটি খুলে যাওয়াতেই,—আর হাওয়ারই দক্ষিণায়নী ঝাপটার দুরন্তপনায় সামলে না রাখায়—ঐ ব্রাউজের উন্মুক্ততাকে আরো প্রসারিত করিয়েছে।—দু'ধারের রেশমী প্রান্ত তাতে পাশ বরাবর স্থানান্তরিত হ'য়ে দুলতে থাকছে। আর কাঁচলি ছাড়া বুকের সৌন্দর্যসায়র ধরে ত্বক-যৌবনায়নী মাধুর্য্যধারার দুই ঝরনা—রিমঝিম ঝিলিমিলিতে স্বতঃস্ফূর্ততা পেয়ে—আয়নার স্বচ্ছতায় যেন হ'য়ে পড়েছে—আটক। আলিঙ্গিত পীনোদ্ধ। সন্ধ্যা আজ এই গোধূলি রাঙা মুহূর্তে,—আর আকাশের নীল নির্জনতা ছাপিয়ে ঝরতে থাকা মেঘ-ধূসরিমায়,—আর দক্ষিণ থেকে শন্‌শনানো হাওয়ার দাপাদাপির মধ্যে—সত্যি এক ধরনের অতি মেয়েলি লাজে লাল হ'তে হ'তে গুনগুনালো—"ছি ছি লাজে মরি হায়,/তরুণ এ তনু আর গোপন কি রাখা যায়?/সে এসে দেখার আগে বসনেলো ঢাকি কায়; / দেহ সে যে নাহি চায়।"—সন্ধ্যা তাই ভাবলো—"হ্যাঁ, এ যে তরুণীর লাজ! এ যে বিবাহিতা যুবতীর লাজ!—কিন্তু,

সত্যি একটা কিন্তু আছে এই লাজময়তার শূন্যতায়।" স্ত্রী সন্ধ্যা টেবিলের থেকে চিরুণী হাতে নিয়ে মাথার কালো মেঘের মতো ঘন রাশি রাশি অলক প্রসাধন করার জন্য—ডান হাতখানা কেশে ছুঁইয়ে, আর বাঁ হাতেতে তার গোড়া ধরার চেষ্টা ক'রতে ক'রতে ভাবলো মস্ত এক দুষ্টুকার মতো—"দ্যুৎ। সব সময় কী আর লজ্জার ধার ধারলে চলে? মাঝে-মাঝে লজ্জার মাধুরী ঝরা ভারখানাকে—মুঠো মুঠো নিলাজেরই শাণিত ধারখানার মধ্যে দিয়ে কাটাতে—যে কোন মিষ্টি যুবতীর ভালো লাগে খুব।—দুষ্টু মনেরই দুরন্ত অভিলাষে! হ্যাঁ, এই সন্ধ্যারও তা ভালো লাগে। খুব। তা কী হয়েছে? আমার এই রূপ দেখুক না এই খোলা পরিবেশখানা এর গোধূলি লগ্নখানা। তারই মেঘমেদুর আকাশের ঐ ছায়া-ছায়া ধূসরিমাখানা। হ্যাঁ-হ্যাঁ, দেখুক বাগানের শেষ ধারেতে প্রহরীর মতো এক-এক পায়ে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে থাকার—ঐ দেবদারু-পাইন-নারিকেলেরা। ঐ টিয়া পাখীরাও সবুজ ডানা মেলে আকাশে উড়ুক। ঘুরুক এলোপাতাড়িতে।—আর ওদের সেই 'bird's eye view' ফেলুক—আমারই বুকখানার এই প্রভাসখানায়। হ্যাঁ, ওরা সবাই দেখুক আর চিনুক। ভাবুক।—হ্যাঁ, ভাবুক এটাই, যে, আমার বুকের এই রূপঝরনা ওদের পরশ করবার আর পরখ করার নাগালের বাইরেকারই জিনিস! না পরশ পাওয়ায়, না ধরতে পারায়, না অনুভব করায়—প্রকৃতির ওরা সব এমন নিলাজ আকর্ষণ দেখে-দেখে হিংসা ক'রতে শিখুক, বা জানুক—এই পৃথিবীরই একজন বিশিষ্টতমকে। এই বিশিষ্টতম হ'লো সন্ধ্যারই স্বামী সুজনক।—হ্যাঁ, বরনারী সন্ধ্যা প্রিয়া-স্ত্রী হিসাবে জানে অন্তরঙ্গতায় আর একান্ত চাহিদায়, যে,—তার বুকের সৌন্দর্যভারের ঝকঝকানিতে—রিমঝিম করা মাধুর্য্যধারের আপীনতাকে, একমাত্র আবদার থেকে পরশ ক'রতে আর শুধু দুষ্টুমি থেকে আদরের দস্যিপনায়—এরই বৃন্তে বৃন্তে লাজ-পেশলতাকে শুধু নিলাজতায় স্নাত করাবার জন্য মধুরিক দেহ-মনের অধিকারক হ'লো—ওরই শত আদরের, আর শতেক আহ্লাদের মধ্যে রাখা হ্লাদিত স্বামী—ঐ গৌতম।—হ্যাঁ, সারা পৃথিবীর মধ্যে আর অন্য কোন রূপবান বনাম গুণবান যুবক—যতই সুজনক বা মধুরিকও হোক না কেন ভালোবাসা নিয়ে,—তবু বধূ সন্ধ্যার কাছে থেকে পাওয়া এই অনির্বচনীয়তাকে দেখার জন্য, জানবার জন্য, বা পরশ ক'রে আবদার ধরে আদর করাবার অধিকারেতে স্বামী গৌতমই হ'লো—যৌবনের প্রথম ও শেষ ধৃতি। ও—তারই কৃতি।" সে কথা মনে হওয়াতে আজ সন্ধ্যার ইচ্ছা জাগলো—নিজের অজানায় উন্মুক্ত হ'য়ে ওঠা বুকের রূপঝরনা ধ'রে-ধ'রে, আর আয়নার প্রতিফলন দেখে-দেখে—রঙ্ আর সূক্ষ্ম তুলির টানে-টানে এঁকে তুলবে—মৃগমদ চিত্রপাঁতি। আঁকবে শুভ্র ফুলের ছবি। খুব ছোট ক'রে ক'রে। জুঁই-চাঁপা-

রজনীগন্ধা-শাদা গোলাপ—এদেরই পাপড়ি ফোটানো পুরোপুরি ছবি।—গোল আকারে।·ধরে-ধরে। পর-পর।—হ্যাঁ, তারপর আঁকা শেষ ক'রে—সন্ধ্যা আজ সাজ-পোশাক পালটানোর সময়—বুকের রূপঝরনায় ফোটানো মৃগমদ চিত্রপাঁতিকে নিখুঁত রাখার জন্য পরবে না কোন—আঁট-সাঁট বাঁধনের ব্লাউজটি! কেন না শ্বেতশুভ্র ছোট্ট কাঁচলির আঁট ঘটনা মৃগমদ বিলেখনকে মুছে দিতে পারে।—কঠিনতর পীনোতায় বন্দিত রেখে মুছে দেবে। সন্ধ্যা তাই আজ সাঁঝের রূপপ্রসাধনে কাঁচলি ছাড়াই শুধু ধূপছায়া রঙের জরিদার রেশমী ব্রাউজখানায়—কৌশলে আড়াল দেওয়াবে আলতো ভাবে। তা হ'লে শ্বেত আর রক্ত রঙ্ চন্দনেতে বৃত্তাকারে আঁকা ফুলের ছবি—থাকবে নিখুঁত। আবরণের বাঁধনে যাবে না আর—মুছে। আর কুঁচিয়ে পরা লাল টকটকে মুর্শিদাবাদী শাড়ীখানা পরার পর—তার আঁচলটি সামনে দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে—পেছনে টেনে ফেলার আগেতে—বুক বরাবর রাখবে আলতো প্যাঁচে। টান-টান করালে অসুবিধা আছে। কেন না লাজ-বুকের পাহারাদার আঁচলেতে টানের সৃষ্টি থাকলে পর—উপরের তৈরী টানে-টানে ব্লাউজের রেশম—নিশ্চয়ই ভেতরের ঐ মৃগমদ বিলেখনে ফুটে থাকা ছবিকে—মুছে নিশ্চিহ্ন করাতে পারে আর টুলটুলকে সে জন্য কোলে নেবে খুব সাবধানে। এ ত' রোজের ব্যাপার নয় শুধু আজ সন্ধ্যাটির জন্য। না-না।—আর দেরি করা যায় না। কেশ প্রসাধনটি পরিপাটি ক'রে আগেই, গা ধুয়ে নেওয়া ভালো। তারপর লাল মুর্শিদাবাদী রেশমখানা কুঁচিয়ে পরে,—আর ঐ আলমারী থেকে বার করা ধূপছায়া-রঙ্ জরিদার ব্লাউজখানায় বুকের দু'ধারে ঝলমল করা সুষম-শিল্পকে—মোতায়েনী পাহারার লাজ আবরণ দিয়ে—পুনরায় ফিরে, এইখানটাতেই বসে-বসে মনের আমেজ নিঙাড়িয়ে আঁকা যাবে—মৃগমদ বিলেখন। ততক্ষণে আঁধার ঘনালে, জেনারেটরের ত্বরিত গতি নিশ্চয় তড়িৎ-প্রবাহে ছুটে এসে—জ্বালিয়ে দেবে মাথার ওপরকার বেলোয়ারী কাঁচের নক্সা তোলা বাতির ঝাড়টি। হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেই ভালো।"—এত সব ভাবনার মধ্যেই পরিপাটি ক'রে অজন্তা ছাঁদের মস্ত খোঁপাখানা বাঁধা হ'য়ে গেল সুন্দরী সন্ধ্যার সন্ধ্যা ভাবে—"সত্যি এ-দেশীয় মেয়েদের খোঁপাবাঁধার নানান রীতির বহুল রকম চমৎকারিত্ব দেখে-দেখে বুঝি, যে,—এটা মস্ত এক আর্ট। যা আমাদেরই একচেটিয়া।" সন্ধ্যা না ভেবে পারে না তাই,—"হ্যাঁ, এই ত' কিছু আগে রাশি-রাশি এলো চুল যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল ঘাড়ে-পিঠে-বুকে—সত্যি এখন যেন আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপের মতো উধাও হয়েছে সব এলোত্ব সমেতই।—এই অজন্তা প্যাটার্ণের কবরী রচনার মধ্যে। সত্যি ও-দেশের ওরা যে সব সিঙল্, বব্, হর্স-টেল্, পনি-টেল্ বা পিগ্-টেল্ করে অলক-বিন্যাসে—তা কী আগাগোড়া বৈচিত্র্য ছাড়িয়ে—শুধু

একঘেয়েমিতাকে প্রতিপন্ন করায় না?—থাক্ ও কথা। আমাদের কবরী-রচনা করার আর্টেতে আছে যাদু।—তা না হ'লে সময়ে-সময়ে কবরী রচনার পারিপাট্য হেতু—অনেক দেখতে ভালো নয় তেমন মেয়ের আকৃতিখানা সুন্দর বলে মনে হতো না! তাই আকৃতিবিজ্ঞান, মানে 'Science of Physiognomy' আমাদের নানান রীতির কবরী-রচনার মধ্যে নিহিত—এই সব মস্ত বৈশিষ্ট্য ও সুযোগাদিকে স্বীকার ক'রে।"—তাই ভাবতে-ভাবতে মুখের, আর চোখেতে নাচানাচি করা মাধবীরাগের মতো ঝলস্ আয়নার কাঁচেতে ঠিকরে পড়তে দেখে—খিলখিলানো শিশুময়তার ঝলমলানিতে স্ফূর্ত হাসি নিয়ে সন্ধ্যার পোশাকে এলো সারা শরীরে—বুলালো হিলোল রেখা। বুকের আপীন জৌলুসকে মুক্ত রাখা ব্লাউজের দু'পাশ বরাবর সরে থাকা প্রান্ত—টেনে বোতাম-বদ্ধ না ক'রতে চেয়ে—টালির মেঝেতে লুটিয়ে বিশ্রাম ক'রে চলা আঁচলখানা তুলে পিঠের পেছনেতে ঘুরিয়ে দিল। কিন্তু দখিনা হাওয়া তা ঠিক রাখতে দিতে রাজী নয়। এলো ক'রে, আর উড়িয়ে—আবার সামনে দিয়েই নীচে গড়িয়ে ফেলাতে চাইছে। তাই আঁচলের একটা অংশ মুখে চেপে রেখে—ওপরে তোলা দু'হাতের চাপে-চাপে শেষ বারের মতো—রচনা করা কবরীর অবস্থানটিকে খুবই নিখুঁত রাখার জন্য—আনমনা ভাবেই রবীন্দ্র-সুভাষণে গুনগুনালো সন্ধ্যা—লাজে লাল রঙ্ ধরতে ধরতে—

"সজ্জা খুলিতে লজ্জায় মরি অঞ্চল-তল দংশিয়া ধরি,
নির্জ্জনে একা বক্ষ আবরি' আপন কক্ষ-মাঝে।"

—"দ্যুৎ। আজ হঠাৎ আমি এ সব কী ভাবছি? এত নিলাজিতা হ'য়ে পড়েছি? বাব্বা। আর নয়। আজ এমন ভাবে চললে সাজ-পোশাক পালটাতে অযথা দেরি করাবো।"—সন্ধ্যা মনে-মনে তাই অস্ফুটে বলে নিয়ে শোবার ঘরে ঢুকলো। আর দেরি না ক'রে তোয়ালে হাতে ঐ ঘরেরই সংলগ্ন স্নানঘরে চলে এলো। ওর যুবতী-মন উপছিয়ে তখন মৃদুল আওয়াজে—ছোট ছোট গানের কাকলী-কথা উঠছে—গুনগুনিয়ে। ঝলমলিয়ে। আনচানিয়ে।

তারপর কিছু সময়ের বিরতি দিয়ে সন্ধ্যা শোবার ঘরের দরজা খুলে ঐ বারান্দার ড্রেসিং টেবিলটির সামনে—ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আয়নায় নিজেকে দেখতে লাগলো। লাল মুর্শিদাবাদী রেশমের কুঁচিয়ে পরার পরিপাটি ভাবখানা—এই মুহূর্তে সন্ধ্যাকে আরো মোহনীয়া, আরো লোভনীয়া ক'রে তুলেছে। বুকের মাধবীরাগে ঝলসানো শিল্প সম্ভারের যৌবন-উদ্ধতাতে—ধূপছায়া রঙের জরিদার ব্লাউজখানা খুবই ম্যাচ্ করেছে। এ মানানোটা অবশ্য একটু বেশী টাইট ফিটিংসে কেটে তৈরী করার জন্য—এক ধরনেরই মাদকতা নিয়ে আঁট আকারকে ফুটিয়েছে। হ্যাঁ, কথা মতোই সন্ধ্যা

তার এই লোভনীয় সজ্জায়—নিলাজ দুষ্টুপনা ভরিয়ে দিয়েছে। শ্বেতশুভ্র কাঁচলের কঠিন বাঁধনখানায় আবরণ না দিয়ে পরা ধূপছায়া রঙ্ জামার দু'খানা প্রান্তকে—অর্গলমুক্ত রেখেছে। তবে লাল শাড়ীর রেশমী আঁচলে আবরিতা থাকায় মনে হওয়ার জো নেই, যে, ধূপছায়া-রঙ্ জামা এখনো আছে বোতামমুক্ত। কেন না, খুবই আঁটসাঁট গঠনে তৈরী করারই দরুন—ব্লাউজের দুটি খোলা প্রান্ত অবশ্য পাশ বরাবর মোটেই সরে যেতে পারেনি—ওরই আকারগত সংক্ষিপ্ততার ফলে। তাই সন্ধ্যার সুষমে ছন্দিত বুকেতে লজ্জার দোলন ফোটানো দুটি ঝরনাধারার ভারসাম্য—নিটোলতার আপীন প্রকাশ ধরে থাকায় ধূপছায়া রঙ্—লাল আঁচলের নীচেতে বেশী ঝলস ছড়াচ্ছে। আর ঐ পীন ঔদ্ধত্যের ধারে ও ভারে আপন সংক্ষিপ্ততার দরুণ—তা আকারে-আকারে আছে স্থানগত। এ যে অর্গলমুক্ত!—তাই পাহারায় মোতায়েন থেকেও রয়েছে ঢিলেঢালা। এ কথা সন্ধ্যা নিজে জানে। কিন্তু তা দেখেও অন্যে কেউ সত্যি জানতে পারবে না, যে,—এর সংক্ষিপ্ততায় ঘেরা আঁট অবস্থানটি ত' পুরোপুরি ভাবে—শুধু লাজরেখার ধার ঘেঁষে জুড়ে আছে। তা না হ'লে বাঁধনহারার দুষ্টুমিতে—মুহূর্তে জৌলুসখানা আছড়ে পড়তো—রেশম শাড়ীরই টকটকে লাল রঙ্ টিকে পর্য্যন্ত—অস্বীকার করার মতোই।

মায়াবিনী মদিরেক্ষণার সজ্জায় ঝলমনানো—বধূ সন্ধ্যা কাকলী ভরা কথায়—বারান্দার স্নিগ্ধ পরিবেশের নির্জনতা ভাঙ্গতে-ভাঙ্গতে বলল—"না-না। এই সময়টাতেই সেরে রাখি সব। হ্যাঁ, গৌতম ঠিকই তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে বলে আজ কথা দিয়েছে। তবু যদি দেরি ক'রে ফেরে? তবে? তখন? না, আজ বিশ্বাস রেখেছি—ওর ফিরে আসার জন্য দেওয়া কথাতেই। হ্যাঁ, যদি ফিরেই আসে তাড়াতাড়ি, তা হ'লে এর পরে আমার বুকের লজ্জাধারে অভিলাষিত সেই মৃগমদ বিলেখন ফোটাবার আর সময় কী পাবো? মনে হচ্ছে, আমায় অকারণেতে কাঁদিয়ে তোলার দুষ্টুমিতে দুরন্ত—ঐ গৌতম যেন আজ আর দেরি ক'রবে না! হ্যাঁ, আজ যদি দেরি ক'রেও আমার দুষ্টু মিতা ফেরে,—তা ব'লে আর অভিমান নিয়ে অনুযোগ জানাবো না। কাঁদবো না। আজ আমারই অবুঝ থাকা মধুরকে নিবেদনে জানাবো একখানা কথা,—যা এই কিছুদিন ধরে বলি-বলি ক'রেও—জানাতে পারলাম না। এটা জানানো দরকার। আজ সকালে কথা দিয়েছি—এটা জানাবো এই নিরিখেতে যদি আমার গৌতম তাড়াতাড়ি ফেরে। না-না, গৌতম আজ ফিরতে দেরি ক'রলেও—আমি যে ক'রেই হোক্ আজ জানাবো!"

সন্ধ্যা গুনগুনানো স্বর-লহরে নাচানো—প্রিয়া-মনের কথা-কাকলী থামিয়ে ঝুপ ক'রে ব'সে পড়লো গদি আঁটা মোড়াতে।—আয়নার সামনে মুখোমুখি হ'য়ে।

বিকেলের গোধূলির আলো ততক্ষণে ছন্দ মিলিয়ে দিয়েছে—মিটি-মিটি আঁধারেতে মিষ্ট সন্ধ্যারই উঁকিঝুঁকি দেওয়ার মধ্যে। এরই মধ্যে এক সময় জ্বলে উঠেছে মাথার ওপরের বেলোয়ারী বাতিদান। খোলা দখিনা পথে মাতাল হাওয়া ঘন হ'তে থাকা সন্ধ্যার অনুরাগনির্ঝরকে আপন ঝাপটায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিচ্ছে ওদিক পানে পেছন দিয়ে বসা—সন্ধ্যারই আমেজভরা—বর-অঙ্গে। ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা একটা শিহর আছে এই দখিনা বাতাসে। সন্ধ্যার তা বেশ ভালো লাগছে। হাওয়ার সেই শিহরে-শিহরে মাদকতা নিয়ে সন্ধ্যা ব্যস্ত হ'লো তারই বুকের লাজ-রেখার যৌবনতায় ঝলস্ ঝরাতে থাকা—দুধে-আলতায় মিল ধরা ত্বক্-মসৃণতাতে সূক্ষ্ম-তুলির টানে-টানে—শ্বেত আর রক্ত চন্দনেতে বিলেখন-চিত্রপাঁতি আঁকার জন্য।—আর তাই মোলায়েম রেশমী শাড়ীর লাল আঁচলখানা—বুক-পিঠ থেকে তুলে নিয়ে যত্ন ক'রে জড়ো হ'য়ে আনচানালো ব্লাউজের ধূপছায়া রঙ্খানা—আয়নার স্বচ্ছতায়। তারই বাঁধনহারা ফাঁকটুকুন দিয়ে দুধে-আলতায় মেলানো গোরোচনা ত্বক্-ঝলস্ হাসছে দুষ্টুমির প্রকাশ ধরে-ধরে। আঁট গঠনায় তৈরি ঐ জামার ফিটিংস্ খুব বেশী কঠিনভাবে জড়িয়েছে—ওখানকার যৌবন-পেশলতায়ই।—যার দরুণ বরনারী সন্ধ্যার এখনকার মধুরা অনুরাগে রাঙা আবেশটি পরিবেশের নির্জনতায়—নিলাজ হ'তে চেয়েছে। ঐ রূপঝরনা দুটির আপীন ঔদ্ধত্যকে বোতাম-মুক্ত জামারই অতি সংক্ষিপ্ততাটি—দু'ধারের পাশ অবধি একটুও সরে না গিয়ে—দুটি প্রান্তরেখা ওরই ভেতরের লাজরেখাকে আকারে-আকারে—পাহারার সীমিত আড়াল দিয়ে রেখেছে। তারই জন্য—আবেগ আর আবেশের উত্থান-পতন—সেই নিটোলতায় জাগিয়েছে কবিতার ছান্দস্ গতি! রিদ্‌মিক মিটার!—'সফ্‌ট ফল্ য়্যাণ্ড সোয়েল'।—হ্যাঁ, তাই। ঠিক-ঠিক। কি ভেবে সন্ধ্যা বলল—"আরে, আমি তা হ'লে এ মুহূর্তে বড় বেশী লাজহীনা হয়ে পড়ছি. না? তা বেশ ক'রেছি। গৌতম, হ্যাঁ গৌতমকে খুশীয়ালে আজ চমকিত করাবো। বুকের মৃগমদ বিলেখন দেখাবার জন্যে আমি নিজে থেকে আবদার ধরবো,—যাতে ও যেন নিজের দুষ্টু হাতেই আমার বুকের ব্লাউজের বাঁধন সরিয়ে—তা দেখতে-দেখতে—যৌবন-নাচা যুবকত্বকে ধাঁধাতে পারে! না, আর দেরি নয়। এইবারটি শেষ করা যাক্ এমনি এক দুষ্টু আর দুরন্ত হওয়া—একান্ত মেয়েলিপনা।"—তাই ভেবে সোনার কাঁকন আর চুড়ির ঝনক-ঝনক রিনী-ঝিনীর আওয়াজসুদ্ধ বাঁ হাতটি একটু ওপরে তুলে—লাজ-পাহারারই আবরণের—ধূপছায়া-রঙ্ ধরে এক ধারের প্রান্ত অল্প পাশে সরিয়ে—ডান হাতের তুলিকাটি ঘষে নিতে লাগলো চন্দনদানি থেকে। একটু শুধু অন্যমনস্কা হয়ে পড়েছিল। প্রায় এমন পরিবেশটির কথা সন্ধ্যা ভুলতে বসেছিল। কিন্তু—

—"আরে, তুমি কখন এলে? অথচ একটুও জানতে পারলাম না! এখানে যে এসে চৌকাঠটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছো,—কৈ তারও বিন্দুমাত্র আভাষ পেলাম না! দ্যুৎ। গৌতম, কী যে না তুমি।"—বলতে বলতে মোড়া ছেড়ে উঠে পড়লো দ্রুত। হাত থেকে তুলিকা পড়ে গেল টালির মেঝেতে। কোলে রাখা লাল ঝলস্ ছড়ানো আঁচলখানাও মেঝেতে পড়ে গিয়ে—ছত্রাকারে ছড়িয়েছে। আর আপনা থেকে ছন্দ-চিরন্তনীর প্রভাবে সন্ধ্যার মধুরেতে-মধুর মদালসা দৃষ্টির কাজল-ঘেরা-চাহনি—যন্ত্রচালিতের মতো নীচেতে লুটিয়ে পড়া লাজ-প্রতীক—ঐ লাল আঁচলেরই লাল দ্যুতির মধ্যে নেমে গিয়ে যেন আটকালো। কাঁপা-কাঁপা লাল অধরাধার দিয়ে কাটা-কাটা ভাবে—সন্ধ্যা লাজময়তা জানালো—"ঈষ্। ঈষ্। কী যে না তুমি? ভারী দুষ্টু। দ্যুৎ। এমনভাবে মাঝে-মাঝে তুমি না...." কথা আর শেষ করালো না সন্ধ্যা। একটা নিখুঁত লজ্জারই স্থির ভাবরূপতা হ'য়ে—নিশ্চলে আর কাঁপনে চুপ হয়েই পড়লো প্রিয়া।—শুধু নিলাজ দেহী-সজ্জায়। লাল লজ্জায়। আর ছন্দ-চিরন্তনীতে।

—"এই? এই মেয়ে, বলি অত 'ঈষ্' আর 'দ্যুৎ' আর 'কী যে না' বার-বার জানাচ্ছ কেন? ওগো দুষ্টুকা, বলি অপরাধ কী আমার এত তাড়াতাড়ি আজ ঠিকই কথা মতো এসে পড়েছি বলে? আমি কী তোমার কাছে অচেনা? না, না। যে ভাবেতে বিলোলিতা হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়েছো, হ্যাঁ, একটু থাকো না ও ভাবেই। হ্যাঁ, ঠিক হওয়ার আর চেষ্টা ক'রো না গো কিছু সময়ের জন্য। না, না।—সন্ধ্যা, থাকো তুমি এমনি বেঠিক ছন্দে আর যতিতে এলো। আমি, হ্যাঁ, তোমার আদরের গৌতম—দুষ্টুমি ভুলে অতি লক্ষ্মীটির মতো এমন মুহূর্তটিতে—বেঠিকে এলোমেলো তোমায় জানাতে চাই—মহাকবি জন কীটসের কথাতেই—'No—yet still stedfast, still unchangeable, / Pillowed opon my fair love's ripening breast, / To feel for ever its soft fall and swell, / Awake forever in a sweet unrest,...." হ্যাঁ সন্ধ্যা, আমারও এখনকার মনের সুভাষণখানাও হ'লো তাই। এই, এই দুষ্টু? তুমি স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়েই থাকো। নড়বে না। সরবে না। আমিই কাছে আসছি। আমার দুষ্টুকা।"—বলতে-বলতে হাসির মধুর স্ফূর্ততায়—খুশীয়াল ভাবেতে প্রিয়ার প্রায় নিলাজে কুসুমিত বুকখানাকে ছুঁয়ে দাঁড়াবার মতোই—গৌতম এক লহমায় কাছে এলো। দু'হাত সুবিস্তারিত করালো।—বুকের বাঁধনে প্রিয়াকে বন্দিনী করাতে। এক কি দুটি পলক কাটলো। তার পরেই ঝড়ের বেগে ঝাঁপিয়ে পড়লো বধূরত্না সন্ধ্যা—তারই আদর করার ও দেওয়ার—গৌতমেরই পরম নিশ্চিত ও নির্ভয়ে ঘেরা—আলিঙ্গনেতে। পরম খুশীর আবেশময়তাতে।

তারপর ?—হ্যাঁ, তারপর ঝড়—সন্ধ্যার এই সমর্পিত ভঙ্গিমায়—তুফান হ'তে চেষ্টা কোরল। প্রাকৃতিক সন্ধ্যার অনুরাগ আগে থেকেই ভেতরে-ভেতরে কিন্তু—তার যুবতীকা ভরিয়ে ছন্দ-অভিমানখানা ফুটিয়ে রেখেছিল। এখন সুযোগ পেয়ে তা হঠাৎ নির্ঝরে ঝরা—বাদল হ'লো।

কিন্তু সব মান-অভিমান, আর লাজ-নিলাজের কথা ভুলে—এই মুহূর্তে সন্ধ্যা অভিমানের কান্নায় বাদলার রূপ ঝরিয়ে—আষ্টেপৃষ্ঠে গৌতমকে বুকের মধ্যে ঘন করালো।—নিজেরই একধারের কপোল দিয়ে স্বামীর কপোলে, গলায়, কাঁধে, দুষ্টু হাসিতে নাচতে থাকা ঠোঁটে—ঘষতে-ঘষতে বলল কাটা-কাটা আর কাঁপা ভাবেতে—

—"গৌতম, আমার গা ধরে কথা দাও এই শপথ নিয়ে, যে, আর তুমি কখনো ফিরে আসতে দেরি ক'রবে না। রাত ক'রবে না। যত তাড়াতাড়ি পার ফিরে আসবে আমার, হ্যাঁ, আমারই জন্য। জান, আমাকে কিছুদিন ধরে রাত হওয়ার সাথে-সাথে এক ধরনের ভয় পেয়ে বসছে। তুমি কাছে না থাকলে আমি যেন একটু বেশী ভয়কাতরা হ'য়ে পড়ি। কেমন জান, ঠিক সেই পুরানো ভয়খানাই পেয়ে বসছে আমাকে। গৌতম, বিশ্বাস কর, সেই টুলটুলের জন্মের আগেতে কয়েক মাস ধরে যেমন রাত হ'লেই ভয় পেতাম, হ্যাঁ, ঠিক তেমনি ধারার ভয় আজকাল আবার আমার মধ্যে—জুড়ে বসেছে। ওগো, তুমি এমন সময়ে যদি কাছে থাকো, তা' হলে কিন্তু আমি ভয় পাবো না। সত্যি বলছি।"—এক লহমায় কাটা-কাটা আর কাঁপা স্বরে এত কথা বলে, থামলো সন্ধ্যা। আর চোখের জলে তখন স্বামী গৌতমের কপোল, গলা, কাঁধ, আর শার্টের কলার থেকে কাঁধেরই পুট্ পর্য্যন্ত—ভিজিয়ে তুলেছে। তারই মধ্যে মুখ আর চোখ ঘষায়—ছোপ ধরে গেছে লাল ওষ্ঠরঞ্জনীর আর কালো কাজলের। আর সন্ধ্যার সিঁথিতে ঘন ও লম্বা ক'রে আঁক টানা—সিঁদুরের লাল পবিত্রতা আলগা থাকায় ওরই গুড়ো—ঝরে লেগে গেছে গৌতমের কপালের কাছে। কানের লতিতে।

—"আচ্ছা সন্ধ্যা, এমন ভাবে ভয় পাচ্ছ কেন? আর আমার আসতে দেরি হ'লে ওদিকে রাত যত বাড়তে থাকে—ততই তুমি বা কেন মুষড়ে পড়—ভয়েতে? বলবে না কেন, এই? বল, আমার আদর?"—কথার ফাঁকেতে জোর ক'রে গৌতম অধর দিয়ে প্রিয়ার চোখেতে থৈ থৈ করা জলের প্রবল বান পথরুদ্ধ করার চেষ্টা করালো। কতকটা পর্য্যন্ত বাঁধ গড়ে তুলে জলের তোড় এগিয়ে আসাকে বাধা দেওয়ালো এ ভাবে।—ঠিক স্বামীরই মুখের অবস্থানে প্রিয়ার মুখটি অবস্থান পাওয়ায়—অতি কাঁপা-কাঁপা ঠোঁট দুটি নিয়ে সন্ধ্যা তা ঘন ভাবে রাখলো—

গৌতমেরই কাজলের ছোপ ধরা অধরেতে। যুগপতে দু'জনই চুমায় চুমায়—দু'জনকে আদর কোঁরল। পালটাপালটি ভাবে।

তৃপ্তা হ'য়ে, আর দৃপ্তা থেকে—সজলিত দিঠি দিয়ে একেবারে মুখোমুখি অবস্থানে থাকা স্বামীর খুশীয়াল মুখখানা দেখতে-দেখতে—সন্ধ্যা জানালো—"ভয়ের কারণটা জানালে পর তুমি খুশী হ'তে পারবে ত'? আমাকে ভুল বুঝতে না ত'? সত্যি বলছো? সত্যি? তবে শোন।"—হঠাৎ কথা থামিয়ে সন্ধ্যা আদুরে গলায় বলল—"বলছি। গৌতম? এই, আমায় একটু বেশ দুরন্ত হ'য়ে আদরে এলো করাবে না ঐ না জানা কথাটি শোনার আগে? এই, আদর কর।"

—"ঈষ্। আগে আদর খায় না আর! তোমার কথা ত' শুনি। তারপর যত খুশী আদর চাও সবই পাবে। সন্ধ্যা, এখন শুধু এই।" বলে গৌতম ছোট একখানা আলতো চুমা ওর কপোলে ছোঁয়ালো।

গৌতমের কাঁধেতে মুখরুচিরা লুকিয়ে অধরের সিক্ত আদরে শার্টের পুট্‌খানা প্রায় ভিজিয়ে তোলার মতো ক'রে জানালো সন্ধ্যা—"এই গৌতম? জান, টুলটুলের জন্য ভাই নয় ত' বোন—এদের কেউ একজন আসছে শীগগির। আসছে মানে, এসে গেছে। টুলটুল ছাড়াও যে আরো একজনের বাবা আর কিছুদিন পরেই তুমি হ'তে চলেছো,—তা কৈ গৌতম, তুমি কী বুঝতে পার নি? আচ্ছা, আচ্ছা গৌতম, এত তাড়াতাড়ি আমায় আবার সন্তানসম্ভবা করালে কেন? আমার টুলটুলের কথাটা একবার ভাবলে না? ও কিছু বুঝবে না ঠিকই, এমন কি ওর কিছু অসুবিধাও যে হবে না—সে আমি জানি। তবু এই ছোট্ট শিশুকে আমার কাছ থেকে কোলছাড়া করিয়ে ছাড়বে—ঐ নতুন শিশু। না-না। এমনটা এত তাড়াতাড়ি হোক্ তা কিন্তু হলফ্ করেই তোমার সন্ধ্যা বলতে পারে, যে,—ও চায় নি কিন্তু! তবু, হ্যাঁ তবু, নতুন আরেকজনের জন্য প্রজায়ন করায়—আমি অচিরে যে দ্বিতীয়বার 'মা' হ'তে চলেছি,—বুঝলে গৌতম, তার জন্য কিন্তু আমি খুবই গর্বের সাথে—নিজেকে সুখী মনে ক'রছি—প্রতিটি পলকে-পলকে। আর আমার তুমি, মানে আমাতেই সম্ভাবিত দ্বিতীয় সন্তানের স্রষ্টার কারুকাজখানাকে—তোমারই অজানায় অনুরণিত মিথুনিক লীলা-বাসরেতে যে সম্পূর্ণতায় অঙ্কুরিত করাতে পেরেছো,—বলি, সে কথা জেনে তুমিও নিশ্চয়ই খু-উ-ব খুশীয়াল হ'য়ে উঠেছো? কী গো দুষ্টু ছেলে, তাই না? এই, কথা বল। এই সম্ভাবিত দ্বিতীয় সৃষ্টির কবি-স্রষ্টা এত তাড়াতাড়ি হ'য়ে পড়েছো জেনে কোন ছেলেমানুষি অভিমানে ভেঙ্গে পড়ো না কিন্তু! কী, রাগ ক'রছো বুঝি ভয়ানক? তোমারই সন্ধ্যা নাম্নী দুষ্টুটির ওপরে, না? এই, কী যে না তুমি! চুপ ক'রে আছো কেন? কথা বল। তা না হ'লে এই আনন্দ-সংবাদটি তোমাকে

শোনানোর পর এত সুখ আমায় আনচানিয়ে তুলছে, যে,—তা সহ্য ক'রতে না পেরে—আমি এখনি বোধ হয় কেঁদে ফেলবো—অঝোরধারায়। ঈষ্, আমায় দ্বিতীয় প্রাণেতে অঙ্কুরিতা করিয়ে অমন মান-অভিমান ক'রে কী বেশীক্ষণ পর্য্যন্ত পারবে, অবুঝ থাকতে? এই? আমায়, হ্যাঁ, তোমার সন্ধ্যাকে খু-উ-ব বিলোলিতায় আদর কর? বলছি কর। তবে ত' বুঝবো, যে, তুমি রাগ কর নি।''

বলতে-বলতে যা বলা, করলোও তাই সন্ধ্যা। গৌতমের কাঁধে মুখ রেখে অঝোর-ধারার ছলছলানো কলোচ্ছলতায় কান্নার মৃদুল শব্দে ভবালো—-এই শান্ত নিঝুমতাতে। সে কী কান্না!—সন্ধ্যার মতো মধুরিকা স্ত্রীরা বোধ হয়—-তাদের সন্তান-সম্ভাবনার বার্তাখানা ওদেরই না জেনে থাকা, বা বুঝতে না চাওয়া স্বামী-সুজনকদের জানাতে পারার পরই—ভেঙ্গে পড়ে—এমনতর অভিমানে রাঙানো আনন্দাশ্রুর ভারেতে আর ধারেতে।—নতুন প্রাণের সৃষ্টি—এ যে মহাকবির মহাকাব্য রচনা করারই মতো! তাই না?

প্রিয়ার মুখ থেকে আচমকা ঘোষিত হওয়া প্রতিটি কথাকে শুনলো—তারই স্বামী। শুনতে-শুনতে আর অনুভবে আশ্লিষ্ট হ'তে-হ'তে—স্বামী গৌতম অপার বিস্ময়ে ঘেরা আনন্দের ধারায় উদ্বেল ভাবে—স্ত্রী সন্ধ্যাকে পুরোপুরি বুঝতে পারলো। আপন যুবক দেহ-মনের অন্বয়—ঐ ভাবে দ্বিতীয় পর্য্যায়েতে আনকোরা এক প্রাণকণার সৃজন সম্ভব করাতে পেরেছে—প্রিয়া সন্ধ্যারই নিসর্গ-সন্ধ্যার মতো অপার রহস্যময় শারীরিবিতানেতে।—সে কথা এইমাত্র প্রিয়ারই অভিমানে কাঁপা লাল-লাল অধরাধার ছাড়িয়ে—কাটা-কাটা ভাবে জানাতে পারায়—গৌতম মুহূর্তকের জন্য বাক্‌শূন্য না হ'য়ে পারলো না। সত্যি, কী মধুর, কী উদার হোতে পারে তারই সন্ধ্যা!—তা না হ'লে পর এত তাড়াতাড়ি—পুনরায় সন্ধ্যা আরেক প্রাণস্বত্বায় পুষ্পায়িতা হ'য়ে—ওরই প্রথম সৃষ্টির কবিতা—ঐ ছোট্ট টুলটুলকে এই অচিরে আগতর জন্য—কোলছাড়া হতে হবে বলে—অযথা ভয় পেতো না। না, না। গৌতম চোখের দৃষ্টিতে সজলিত হ'য়ে পড়ে ভাবলো—''কী বিরাট আনন্দ পাওয়ায় সন্ধ্যা আজ ছোট্ট টুলটুলের জন্য ওরই মায়ের বুকেতে পাতা আশ্রয়খানাকে—আগতপ্রায় নতুন প্রাণখানা শিশু-কবিতায় ফুটে উঠে যদি আশ্রয়হীন করায়,—সে কথাখানাও সন্ধ্যা ভেবে ফেলেছে। হ্যাঁ, তারই মিষ্টিকা এই সন্ধ্যা! আর কিনা, সেই টুলটুলের কী হ'বে তা ভাবার পর—নতুনকে সানন্দে শিল্পীর রসনির্য্যাসে স্পন্দিত রেখে-রেখে—আজ এই একটু আগে আমার সন্ধ্যা এ কেমন প্রশ্ন কোরে বসেছে ওরই উতলা মন থেকে, যে,—এই তাড়াতাড়ি সৃষ্টির ছন্দে স্পন্দিত নতুন প্রাণকণার পুনরাবির্ভাব কী আমাকে তুষ্ট কোরল না? আমি কী রাগ ক'রলাম? না-না। সন্ধ্যা,

এ কথা আর মুখে এনো না তুমি। জান ত' তোমার মধ্যে দ্বিতীয় সৃষ্টির এই উৎসবখানা যত তাড়াতাড়িই—শুভায় ভবতু বলে আমার থেকে করিয়েই থাকুক না কেন এরই অঙ্কুরণ—জান সন্ধ্যা, এ ব্যাপারে অসহায় যুবকত্বে অবুঝ আমি—আমারই প্রতিটি শিরা-উপশিরায় ছন্দিত হয়ে বাজতে থাকা আনন্দনির্ঝর নিয়ে বাক্‌শূন্য হ'য়ে পড়ছি। সন্ধ্যা, আমার সুখ! তোমায় আমি আজ তোমারই মুখ থেকে এমন কথা জানার পর দেখছি, যে, খালি 'My heart leaps up'. অহরহ ভাবে তাই মনে জাগছে—

"The Child is father of the Man;
And I could wish my days to be
Bound each to each by natural piety."

—শুধু ওকথা ভেবে-ভেবে অনুরাগের মাধবীরাগে ছোঁয়া পেয়ে—দোদুল মনে আর সজল চোখের ইশারায় ঝরা জলরেখার দাগ—দু'ধারের কপোল দিয়ে নেমে-নেমে যাওয়ার মধ্যে—স্বামী গৌতম কথা বলল—

"না-না। সন্ধ্যা, তুমি যে এ ব্যাপারে আমায় ভুল বুঝবে না কখনো—তা আমি ভালো ক'রেই জানি। আচ্ছা, তুমি নিজেও কেঁদেছো এ কথায়? কেন? আমি জেনে রাগ ক'রেছি কিনা, তাই? শোন, এ রকম প্রশ্ন আর কখনো ক'রো না। আমার দুষ্টু! বুঝলে? আমি সত্যি রেগেছি কিনা—তা মুখ তুলে আর কান্না থামিয়ে ভালো ক'রে চোখ খুলে দেখ, তা হ'লেই বুঝবে! এই সন্ধ্যা, আমার মিষ্টিকা, তাকাও বলছি চোখ খুলে। তা না হ'লে কী ক'রে ঠিকটা বুঝবে।"

গৌতমের ধীরে-স্থিরে জানানো এখনকার এই কথাগুলোর মধ্যে সজল ভাবখানার প্রকাশ পাওয়া মাত্রই—প্রিয়া সন্ধ্যা বিদ্যুৎচালিত ভাবে এক লহমায় তার কান্নায়-হাসিতে একাকার থাকা—মুখখানা তুলে ধরলো মুখোমুখি অবস্থানে। তাকিয়েই চমকালো বিলোলিত থাকা কান্নার মধ্যেই। সন্ধ্যার চোখে হাজার মুক্তাবিন্দুতে জমা জল—টলমল ভাবে কাঁপছে। আর ঝরছে। বেয়ে পড়ছে ছড়ানো ধারায়। আনন্দাশ্রুতে ভেজা লাল-লাল ঠোঁট দু'খানা অভিমানের গমকে ফুলে-ফুলে উঠছে—ছোট্ট এক মেয়ের মতো,—যে মেয়ে হারিয়ে ফেলেছে তারই মুখের দেয়ালা হাসিটি। কান্নার ছন্দে বিলোলিতা হ'য়েও, মুহূর্তের দেখা থেকে সন্ধ্যা বুঝলো—গৌতমের দু'দিকের কপোল দিয়ে একখানা করে সরু-সরু ধারায় নেমে আসার—জলরেখা। তখনি নিজের ডান হাতখানা তুলে তর্জনী দিয়ে টেনে-টেনে সন্ধ্যা মুছিয়ে দিতে লাগলো—প্রিয়তমর সুন্দর মুখময় কান্নার স্বাক্ষরে ফোটা—সিক্ত রেখাকে। তারই মধ্যে নিজেরও কান্না ভেজা গলায় সন্ধ্যা বলল।

—"ছিঃ। একটু দুষ্টুমি ক'রে আমার প্রশ্ন করায় তুমিও দেখছি ছেলেমানুষিপনায় কম যাও না! দ্যুৎ। সত্যি, কী যে না তুমি! বাব্ বা, ভাগ্যিস টুলটুল এখানে নেই, তা না হ'লে ও-ও তোমার চোখে জল দেখলে অবুঝ মনেতেই হেসে-হেসে, লাল হ'তো। শোন, আর একজন নতুন জন্ম নিয়ে আসছে বলে অত ভয় বা ভাবনার কী আছে? আমি ভেবেছিলাম পাছে যদি টুলটুলের কিছু অসুবিধা হয়, এই আর কি! উপায় অবশ্য আমি খুঁজে বার ক'রেছি। আপাতত দ্বিতীয়ের জন্ম না হওয়া পর্য্যন্ত, মানে এখন যদি আমার এই সন্তান-সম্ভাবনার সময়টা দু'মাসের হয়, তা হ'লে শেষের দিকে ওর জন্মানোর মাস তিনেক আগেই—ক'লকাতার তোমার মা'-বাবার কাছে ফিরে যাবো। আর থাকবোও ওখানেই। তা হ'লে আর আমাদের টুলটুলের অসুবিধা কিছুই হবে না। সংসারের প্রথম পৌত্রী হিসাবে ও ত' ওর ঠাকু'মা আর দাদুর থেকে কাছছাড়াটি কখনো হ'বে না। তাই আমি আমার নতুনকে নিয়ে পড়বো না কোন অসুবিধায়। সব চেয়ে বড় কথা—পুত্রবধূর প্রতি দেওয়া আদরেতে-সোহাগেতে—আমাদের মায়ের নজরে-নজরে যে তখন থাকতে পারবো। শোন গৌতম, এখন থেকে যে মাস পাঁচেক এখানে থাকবো তার মধ্যে আর কোন দিনও তুমি অফিস ফেরত, বল, আর দেরি ক'রবে না? কথা দাও আমায়।"

প্রিয়া সন্ধ্যার কান্নায় ভেজা আর প্রসাধনে এলো মুখখানায়—নিজের কপোল ঘষতে-ঘষতে বলল গৌতম—"হ্যাঁ, সন্ধ্যা। তাই হবে। তোমার সিঁথির সিঁদুর ছুঁয়ে কথা দিচ্ছি। এরপর আগামীকাল থেকে আর কোন দিন ফিরতে হবে না দেরী। ঠিক-ঠিক।"

আবার মুখোমুখি অবস্থানে মুখ রেখে—চার চোখেতে দু'জনারই ভেজা-ভেজা চাহনি বন্দী রেখে—সন্ধ্যা অনুরাগ-নির্ঝরে বহুত মিনতি করারই মতো জানালো—লাল-লাল ঠোঁটে মধুছন্দার কাকলী-স্বভাব নাচিয়ে রেখে। রাঙানো জৌ লুস ভরিয়ে। সন্ধ্যা বলল—

—"এই? শোন মিষ্টি। এ ছাড়াও তোমার প্রতি এই সন্ধ্যার জানাবার আরও আরজি আছে। দুষ্টুমি পরে ক'রো। শোন। আমাদের দু'জনার বয়েসখানা এখন আঠাশেরই প্রখর যৌবনসায়রের পারাপারে রয়েছে। স্বামী হিসাবে তুমি ঠিকই স্ত্রীর ওপরে নিজের শ্রেষ্ঠত্বটি বজায় রেখেছো—মাত্র সাত দিন,—মানে পুরো একটি সপ্তাহের অগ্রজত্বে—আমারই বয়েসখানা থেকে। দেখ গৌতম, তোমার এই সন্ধ্যা শুধু তোমার প্রিয়া, বা শুধু স্ত্রী, বা শুধু 'বেটার হাফ'ও নয়! ও হ'লো তোমারই মস্ত বন্ধু। তাই বলছি যে, আমাদের সাতাশ বছর বয়সের মাঝামাঝি—আমরা প্রথম মা-বাবার পরিচিতিটি পেলাম—টুলটুলের জন্মতে। তুমি ত' জান,—টুলটুলের

জন্য আমাদের দু'জনকারই ছিল কী বিরাট আর ব্যাপক আকাঙ্খা। কী দাম্পত্যিক অধ্যবসায়। কত যত্ন। কত শঙ্কা।—কিন্তু গৌতম, ওর জন্মের পরই সাত তাড়াতাড়ি—নতুন আরেকজনের জন্ম-সম্ভাবনাটি একটি পুরো বছর ঘুরতে না ঘুরতেই দেখা দিল! তবে কি জান, জন্য আমরা কেউই নিজেদেরকে ভুল বুঝতে পারি না। একদিকে কিন্তু আমাদের এই সৃষ্টি-সমীক্ষাটি বেশ রোমাণ্টিকই হ'লো। আমাদের আঠাশ বছর পুরো হওয়ার সাথে-সাথেই—টুলটুলের পিঠোপিঠি ওর জন্ম হচ্ছে।—কিন্তু গৌতম, তারপরেই কিন্তু প্রতিজ্ঞার চরম দলিলে আমাদের স্বাক্ষর দিতে হবে এই নিরিখে, যে, আগতপ্রায় নতুনের জন্ম-অভিষেকটি সম্পন্ন হওয়ার পর,—হ্যাঁ, আর—মানে আর যেন না হয়,—মানে, মানে এই আর কি,—ঈষ্। তুমি সত্যি কি যে না! মুখ ফুটে বলতে পারছি না দেখছো ত'। তা তুমি বুঝে নিচ্ছ না কেন নিজে? হ্যাঁ, মানে আর কি—এ ব্যাপারেতে একেবারে টানবো ইতিরেখা। কেমন?"—বলতে বলতে সন্ধ্যা চোখের মুষলধারেতে ঝরা বিপর্য্যয়ে হওয়া মোহনীয় মুখশ্রীখানা একেবারে স্বামী গৌতমের অতি শান্তশ্রীতে ঢাকা—মুখেরই সাথে ঘন করালো। কপালে কপাল। ভুরুতে ভুরু। চোখে চোখ। আর অধরে অধরখানার অবস্থানটিই যা শুধু আলতো ছোঁয়াতে রাখলো। তারই মধ্যে সন্ধ্যার ডান চোখখানার ভেজা কাজল-চাহনিটি আধক-আধ-দিঠিতে ঠিকরে পড়েছে—গৌতমেরই পেছনের খোলা দরজা দিয়ে ঘরের ভেতরেতে। সামনেকার দেওয়ালে জ্বলতে থাকা ল্যাম্প-ষ্ট্যাণ্ডের নীচেতে—বড় ফ্রেমে আছে ভগিনী নিবেদিতার ছবিখানা। ছবির নীচে বড় টাইপে ছাপা রয়েছে নিবেদিতারই এক দামী কবিতা। ভালোবাসা সম্পর্কে ছন্দিত করা—প্রবাদ বিশেষ! আরো বড় টাইপের মোটা 'phase'-এ জ্বল-জ্বল ক'রছে নামখানা। 'A Litany of Love.'—সন্ধ্যার সজলিত চোখের 'আধক-আধ-দিঠি' একটু ফাঁক পেয়ে—নিজেদের নিশ্চল আর নির্জন আলিঙ্গন বাঁধনেতে আবেশ পেতে-পেতে—ও দিতে-দিতে, গুন-গুন ক'রে পড়তে লাগলো—অধরের কাঁপন-ছোঁয়া গৌতমের অধরেতে আলতো ভাবে বসিয়ে—রেখে কাঁপন তুলে-তুলে—

"Love all transcendent,
Tenderness unspeakable,
Purity most awful,
Freedom absolute,
Light that lightest every man,
Sweetest of the sweet, and
Most terrible of the terrible."

সত্যি তা চোখের সজলিত 'আধক-আধ-দিঠি' বিস্তারিত ক'রে পড়তে পড়তে—সন্ধ্যা অজানিত পুলকানন্দে হেসে উঠলো, ঝলমলিয়ে। রিমঝিম প্রাণোচ্ছলতায়। হাসির স্ফূর্ত দোলনে সন্ধ্যার ঠোঁট এ ধরনের মুখোমুখি অবস্থানে থাকায়—অধরেরই নম্র আঘাত হানলো স্বামীর অধরেতে। হ্যাঁ, যে গৌতমের দুরন্ত অধর সময় কি অসময়ের কোন ধার না ধারার মধ্যেই—প্রণয়ের দস্যিপনায় মাতামাতি ক'রে বসে, ওরই যুবকত্বের একান্ত নিয়মমাফিক—আজ সত্যি এমন মধুরিক অবস্থানের মধ্যে পেয়েও কিন্তু হোতে চাইছে না দুর্বার। অনিবার। সন্ধ্যা তা দেখে-দেখে—দারুণ খুশিয়ালিনী হ'য়ে পড়লো। চাইলো খুশীর ছোঁয়ায় গৌতমকে সুখের অন্বয় ধরে—আরো খুশীয়াল করাতে।

সন্ধ্যা বলল—"বল, কেমন আদর চাও? গৌতম, এইবারটি ছেলেমানুষিপনা ভেঙ্গে ফেল। কিছু বল?"—বলতে-বলতে সারা শরীরে মাদক হিলোলতা ঝরিয়ে প্রায় লাফাতে লাফাতে—গৌতমের অধরে চুমায়নী ঋতুসাজ আঁকতে থাকার মধ্যেই বললো—"বাব্‌বা। তোমায় ত' জানি কী ছেলে! একবার মাত্র চুমায় আদর ক'রলেই কী হোল! সত্যি, সত্যি। কিছুতেই যে, একেবারে তুমি খুশী হও না। হ্যাঁ, তুমি যে দুষ্টু তখন বল, 'না, একেবারে হবে না। চাই—Twice more. Thrice more. আরো। আরো।' হ্যাঁ, তাই গো দুষ্টু। তোমায় ত' আমি জানি। আর গৌতম তোমায় ত' আমি চিনি আমারই দেহের' প্রতিটি অণুতে-পরমাণুতে। আর সে ভাবেই ত' আমি তোমায় ভালোবাসি। তুমিও যে আমায় 'বাসো তেমনি। প্রণয়-স্বাক্ষর ফোটাতে যে তুমি তোমার এই সন্ধ্যার দেহমনেতে ঝড় আর তুফান ডেকে আনাও। তা কী, আমারও সুন্দর লাগে না? মধুর লাগে না?"—বলতে বলতে মধুরিম করা হর্ষোৎফুল্লতায় নাচের মুদ্রা ফুটিয়ে—শ্রীমতী সন্ধ্যা তার ফুলের মতন নরম লাল অধরেরই দুষ্টু প্রণয়কাজখানায়—গৌতমের অতি শান্ত অধরেতে মৃদু-মৃদু আঘাত হেনে—অশ্রু টলমলানো দু'চোখের মদালসা চাহনি ঝলমলিয়ে বলল—"কী গো গৌতম, আমার করা এই আদরকণা চাইছো বুঝি—আরেকবারটি, না? কী, once more? খুশী হ'বে ত', না পুনরায় দুষ্টু ছেলের মতো আবদার ধরবে! নেও, নেও। আর কিছুটি বলতে হবে না তোমায়। কী, এই once more হ'লো ত'? এবার গৌতম? হ্যাঁ, আমার আদর—এই যে twice more-ও হ'লো। উঃ, আর পারি না। কী যে দস্যি না তুমি! আমার সব আদর লুট ক'রে তবে ছাড়বে দেখছি। ঈষ্। ঈষ্। এই যে, এই ত' thrice more-ও হ'য়ে গেল। না-না। আর হবে না। আর এর বেশী চাইলে পর আমি কিন্তু সত্যি তোমার দস্যিপনার কবল থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য—কান্নারই বাদলা ধারায়, ভয়ানক ভাবে ভাসবো।"

আদর লুট করার একান্ত দাম্পত্যিক ঋতুমহলেতে করা শুধু নিলাজক আবদার অনুযায়ী—স্বামী গৌতম জানতে চাইলো—

—"বাঃ। এ ত' বেশ কথা! তুমিও ত—'আর হবে না, আর হবে না' হ্যাঁ 'আর পাবে না, আর পাবে না' বলে-বলেও আদরখানা জানাচ্ছই বা কেন? আর পরমুহূর্তে তার জন্য শ্রাবণের বাদলায় এলো হ'তে চাইছো কেন? ঈষ্। আমি দস্যিপনা করি, না? আর তুমি? এই সন্ধ্যা, জানই ত' তুমি ভালো ক'রে, যে,—তুমিই আসলে আমার দুরন্তপনা ধরে-ধরে পরম দুষ্টুমান হবার মতো ইন্ধনখানাকে —প্রযোজনা ক'রে থাকো। দেহেতে। প্রাণেতে। আর মনের প্রতিটি অণু পর্য্যন্ত আবদার করার ঢেউ তুলে-তুলে। কী, ভুল বললাম? এই, চোখে চোখ রাখো। কথা বল। তা না হ'লে বুঝতেই ত' পারছো—এই সময়টায় টুলটুল কাছে না থাকার দরুণ এমন সুবিধাতে..."

সন্ধ্যা তার চুড়ি-বালাতে ঝনক-ঝনক তানসুদ্ধ হাতখানা দিয়ে এক ঝটকাতে চাপা দিয়ে ধরলো—গৌতমেরই অধরের কথা-নির্ঝরে। বাঁধ বাঁধার মতো। বলল—"না। আর পারি না বাপু এ ভাবে তোমারই আবদারগুলোর সাথে প্রতিনিয়ত যুঝতে! ধ্যাৎ, কী যে কোরছো না তুমি! না, না। অনেক হ'য়েছে।—ঈষ্! তোমার জারিজুরির কাছে একটি মেয়ের জোর আর কতক্ষণ 'না' জানাতে পারে? গৌতম, দ্যুৎ, কী কোরছো! লাগছে যে! দোহাই তোমার। হার মানছি। ছাড়ো না এইবারটি। সারা রাতের তিনখানা যাম ত' এখনো পড়ে রয়েছে। এই, তখন না হয় আবার আবদারেতে ঝড় হ'য়ো। কেমন?"

প্রিয়ার কপোলেতে আপন অধরের আবদারটি লুটিয়ে রেখে—ডান হাতেতে গৌতম আদরণীয় পরশ ভরিয়ে—সন্ধ্যার মাথায়, গলায়, ঘাড়ের দু' পাশে, পিঠেতে, আর সুনিবিড় যৌবনরহস্যে ভাব ও আবেগের উত্থান-পতনে ছন্দময় বুকখানার পাশাপাশি ভালোবাসার শিহরণ ফুটিয়ে বলল—"দেখ সন্ধ্যা, এমন নিরালায, এমন স্নিগ্ধ পরিবেশে আমি দুরন্ত হই। আর দুর্বার হই ঠিকই। হই তোমারই জন্য সন্ধ্যা তোমায় আদর করারই জন্য। সন্ধ্যা, কিছু বলবে না?"

হঠাৎই কথার পিঠেতে কথা বসাতে গিয়ে তার শত আবদার নিয়ে উৎফুল্ল থাকা গৌতমেরই কাঁধেতে মাথা রেখে সন্ধ্যা বলল—"হ্যাঁ, তাই। তোমার সন্ধ্যা মনে-প্রাণে তাই বিশ্বাস ক'রে। আর কিছুটি যে নয়, ত' তোমারও ভালো ভাবেই জানা আছে। তুমি তোমার ভালোবাসা জানাতে নেমে যত বেশী দুষ্টুপনায় আমায় এলো করাও না কেন—সেটাকেই আমার বেশী পছন্দ। তবু আজ এতদিনে টুলটুলের মা হয়েও—পুনরায় আবার যখন এমন সময়টায় প্রজায়নের নতুন-সৃষ্টিতে সম্ভাবিতা

হ'য়েছি—জানবে, এখনও আমি তাই চাই। তাই চাইবো। হ্যাঁ, চিরকালই তাই চেয়ে-চিন্তে চলবো।''

সন্ধ্যা কথা নিয়ে থামতেই—আগেও অনেকবারই ক'রে থাকা উত্তর-জানা প্রশ্নখানা জানতে চাইলো গৌতম—''তবে বাধা দেও কেন? এ রহস্য বার-বার উদঘাটন করেও—এর কোন স্থির লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারি না যে, সন্ধ্যা! তুমি ত' আজ আমারই যৌবনধ্যানের মূর্তিখানাতে নিজেকে হ্লাদিতায় সঁপে দিয়ে-দিয়ে—আমার ও তোমার সৃষ্টি-সুখেরই পালাবদলেতে—সত্যি প্রজায়িতায় সাজবদল ক'রায়—আত্মজাকে পৃথিবীতে এনেছো।—আর এনে 'মা'-তে নামধেয়া হ'য়েছো! তবু সন্ধ্যা, মাঝেমাঝে এই দাম্পত্যিক বাসরেতে সুখী থেকে—বুঝেও বুঝতে পারি না কেন—আমারই এই তোমাকে!''

সন্ধ্যা মদিরা ভরা হাসিতে ঝলমলিয়ে উঠে বলল—''ঈষ্! তুমি একেবারে ছোট্ট শিশু বুঝি! তবে. বুঝেও খালি 'বুঝি না' বল কেন? ওগো গৌতম, তুমি জেনে রাখো, যে, তোমার সন্ধ্যা এর পরেও অনেক বছর ধরে—এমন ভাবেতেই নিজেকে হাসাবে। কাঁদাবে। রাঙাবে। আদরে-আবদারে করাবে এলোমেলো। অলাজুকা। কিন্তু, কী জান? এরপরও—তুমি নিজে থেকে সত্যি কিছু চাইলেই আমার মুখে তখনই শুনবে সম্মতি-বাচক—সেই 'না। না' করার প্রতিরোধখানা।''

গৌতম তার রঙের মাধুরীতে আনচানানো চোখের বিস্ময়-গাঢ় ভাব ছাড়িয়ে উঠে জানালো—''আচ্ছা সন্ধ্যা, সে না হয় বুঝলাম। আর ভুলও না হয় বুঝবো না। কিন্তু বলি, তুমি যেদিন বার্দ্ধক্যের ভারে দিশেহারা হবে,—সত্যি সেদিন কী আর আগের মতো যৌবনায়নী দুষ্টুমিগুলো না ক'রতে পারার দরুণ হবে না—ক্রন্দসী? একই বয়েসী যে আমরা দু'জন! জান সন্ধ্যা, এ-দেশের প্রবীণাদের ধারণা হ'লো, যে,—মেয়েরা নাকি কুড়ি পেরুলেই বুড়ি হ'য়ে যায়! অন্ততঃ ছেলেদের চাইতে ত' ঠিকই। শোন সন্ধ্যা, আর কিছুদিন পরেই ত' আমারই মতো তোমারও আঠাশ বছর পূর্ণ হ'তে চলেছে। আমার থেকে এক সপ্তাহের ছোটটি তুমি হ'লেও—তাতে কিছু সুবিধা হ'বে না এ জন্য, যে,—কবেই ত' তুমি কুড়ি পেরিয়ে এসে—তথাকথিত প্রবাদানুযায়ী বুড়িয়ে যাচ্ছ না কি? জান ত' সন্ধ্যা, একই বয়সের তীরভূমি ছুঁয়ে থাকায়—মেয়ে বলে আমার আগেই ত' তুমি, হ্যাঁ, আমার এই দুষ্টু বনাম মিষ্টি সন্ধ্যা নামের অতি লাজুকা যুবতী কী...''

প্রিয়তমর মুখেতে হাত চাপা দিয়ে কথাটি আর শেষ করাতে না দিয়ে—একটি ভয়কাতর চাহনি ছড়িয়ে গৌতমের চোখেতে চোখ রেখে জানালো সন্ধ্যা তখনি—''না। না। অমন কথা তুমি মুখে এনো না কখনো। আমি কখনো বুড়ি হতে পারবো

না। বুড়িয়ে গেলে বল কে তখন তোমাকে আদরে আর আবদারে পাহারা দিয়ে রাখবে? না'না। তোমার সন্ধ্যা যে একদিন বার্দ্ধক্যের ভারে টাল খেয়ে পড়তে পারে,—ও কথা ভাবতে গেলে আমার সত্যি কান্না এসে যাচ্ছে। ওগো গৌতম, তুমি, হ্যাঁ, আরো অনেক বছর পর্য্যন্ত এইভাবেই ভালবাসবে শুধু। দেখবে তা' হলে তোমার সন্ধ্যার যৌবন থাকবে অটুট। অন্ততঃ মনের দিক থেকে ত' নিশ্চয়ই। একথা ভাবতে পারি না যে।" বলতে বলতে বাদুলে বাতাসে আছড়ে পড়ার মতো দু'চোখে বাদলের ধারা নামালো সন্ধ্যা।—কিন্তু তারই মধ্যে—ভবিষ্যতের অমন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে—স্বামী গৌতমকে যুবতী প্রিয়ার চুমায় চুমায় সাজাতে লাগলো সন্ধ্যা। তারই অন্তরতম আরাধ্যকে। হৃদয়ক দেবতাকে। একান্ত দাম্পতিক্যকতায় বধূরত্না সন্ধ্যা যে দেবিকা হয়েই থাকতে চায় চিরন্তনীতে। তারই বরপুরুষের কাছটিতে।

সন্ধ্যারাগ, যুবতী ধরম ও একটি সাহিত্যিক অবসর

প্রায় এক দশক ধরে লেখার জন্য উৎসাহ দিয়ে আসা— সেই বিশিষ্টা মধঞরিকাকে

সেদিন এক সোনা ঝরা সন্ধ্যায়—গঙ্গার দেখা-না-যাওয়া অপর দিকখানা দিয়ে বাদুলের হাওয়া ছুটে ছুটে আসছিল। বেশ শিরশিরানি জাগানো মাতলামি নিয়ে এ-পাড়ে এসে আছড়ে পড়ে পড়ে আদর জানাচ্ছিল—অতি অন্তরঙগতার লজ্জা-ভাঙ্গা রূপখানাতে—প্রায় জড়ানো মুদ্রা ফুটিয়ে বসে থাকা—ঐ ওদের দু'জনাকে। হ্যাঁ, আর ওদেরই বসে থাকা জায়গাখানার চারধারটিকে।

ওরা দু'জনা হ'ল যৌবনের দুটি ধারার—দুই শরিক। অবশ্য এই শরিকানার বৈশিষ্ট্য সাজানো আছে—ভালোবাসা নামী অতি এবং অনির্বচনীয়তায় দামী—বমানবিতকতারই মধুরেতে মিতাক্ষরা যৌবনায়নে।

ওরা হ'ল রূপা মুখোপাধ্যায়। আর সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়। একজন হ'ল যৌবনের ঝড়। আরেকজন সেই ঝড়ের মায়াবী নাচনে তালে তালে পা ফেলে ফেলে নিজেকে বর্ষার পূবালী হাওয়া কোরে,—ইন্ধন যুগিয়ে যৌবনের সার্থক অভিষেক সম্পন্ন করাতে পেরেছে—ভালোবাসার তুফানযাত্রায়। 'কীপিং ফিট ইন্ এ সাইক্লোনিক এ্যাড্‌ভেঞ্চার অফ লাভ্'। একজন যে ঝড়— সে হ'ল সৌমিত্র। আর সেই ঝড়েরর মাতলামিতে যে তার দেহ-মেনর আর্তি ভাসিয়ে ছন্দ তৈরী করাতে পেরেছিল শেষ পর্যন্ত পরিণয় নিয়ে—'ফ্রম্ দি অ্যাফেয়ার অফ্ লাভ্ টু দি কিংদম অফ্ ম্যারেজ'— সেই ছান্দসিকাই হ'ল ঝড়ের গতি পেয়ে তুফান হোয়ে পড়া—ঐ রূপা মুখোপাধ্যায়।

আজ বাদুলে বাতাস শিহর ভরানো ঝটপটানি নিয়ে—ডায়মণ্ড হারবার স্ট্র্যাণ্ডখানার চারধার পর্য্যন্ত হামলাহামলিতে মেতেছে। এই কিছু মাত্র আগে—সন্ধ্যার সোনা ঝরা রহস্যময়তাকেও যেন এই হাওয়ারই মাতাল গতিবেগ—এই মাটির পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মাইলের ওপরেতে থাকা—আকাশেতেও তুলেছে দুলিয়ে—কাঁপন ধরা আঁধারেরই দোলনায়।

এখানকার অপর পাড়খানাকে দেখা-না-যাওয়া এই প্রশস্ত গঙ্গার বাঁধানো পাড়েরই ফেন্সিং থেকে—ফুট খানেক তফাতের একখানা কংক্রীটের বেঞ্চি তে বসেছে ওরা। বসেছে অবশ্য নির্জনতা বাঁচিয়ে। নিরালার আড়াল নিয়ে। মাঝে

মাঝে বাস ও গাড়ীর ছুটে চলার বেতাল করা শব্দ-লহর ওরই চলাচলের ফাঁকটুকুন' ধরে ক্ষণেকের জন্য—এই সুন্দর স্ট্র্যান্ডখানার নিরালাকে যান্ত্রিক সরবতায় বুজিয়ে দিয়ে যায়।—এই আর কি!

তবু—পাশের প্রশস্ত রাস্তার দাম্ভিক যন্ত্র-দানবদের আসা-যাওয়ার শব্দ-মখুরতাকে—সত্যি—সত্যি অবহেলা দেখিয়েই যেন—রূপা ও সৌমিত্র বসে আছে সামনেরই গঙ্গার উদার রূপ মাখানো সুবিস্তৃতির দিকে চয়ে। ওদেরই চোখের সামনে—অনেকটা দূরের গঙ্গায় একখানা বিদেশী জাহাজ নোঙ্গর করা রয়েছে। ঐ জাহাজখানায় আলোর মালার মতো হোয়ে জ্বলতে থাকা বাতিগুলো যেন ওদের মনে—সুদূরের পিয়াস ধরিয়ে দিয়েছে। আলোগুলো কখনো জ্বলছে মিটিমিটি ভাবে। আবার কখনো বা দপ্‌দপ্ করা শিখায়।

—"আচ্ছা সৌমিত্র। কী, আমার কথাটা শুনলে না? অত কি ভাবছো?"

সৌমিত্রর দেহের যৌবন-তাপ নিয়ে উপছানো আশ্রয়ের একটি পাশ ধরে—রূপা মুখোপাধ্যায় তার রূপের অনিবার হওয়া ঢল্‌ঢলানো দেহীতরঙ্গিমাকে জড়িয়ে রেখে—ওপরের ঐ কথা জানালো। জানাতে গিয়ে অধরের মুক্তা-হাসির কিনারায় লাল-প্রসাধনকে করালো—আরো রঙীন। দু'খানা পেলব ঘেরা হাতের আরাম দিয়ে ধরে রেখেছে শক্ত করা মুঠোয়— সৌমিত্রর ডান হাতখানা। কখনো নিজের কোলের ওপরে রাখছে। আবার কখনো ওপরে সরিয়ে নিয়ে—রূপা দুষ্টুমি করারই জন্য যেন নিজের আপীন মাধুর্য্যেতে ভরাট বুকখানারই লজ্জায় কঠিন থাকা এক ছন্দ পেশলেতে—প্রিয়র ঐ হাতের উষ্ণতাকে ছোঁয়াতে ছোঁয়াতেই—পুনরায় দুস্টুমি কোরেই আবার সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে—রূপা তার গালেতে এনে লাগিয়ে রাখছো। রূপা প্রিয়া! রূপা যুবতী! রূপা বাগদত্তা! তবু—এই রূপা নিজের দুষ্টুমি কোরে দেখতে চাইত—তারই প্রিয় যুবকটির যৌবনের অন্বেষণ নিয়ে এই বিয়ের আগেকার ভালোবাসা বাসার ফাঁকে ফাঁকে—সত্যি লাজহর দুষ্টুপনায় সৌমিত্র মেতে ওঠে কিনা—তাই জানতে। তাই বুঝতে। —সত্যি-সত্যি—এখনই সেই বিয়ের আগের বা পরের কোন ব্যাপার নিয়ে রূপার মাথা ব্যথা করার কোন কারণ নেই।—ভালোবাসায় অবগাহন কোরে থাকা নিজের যুবকেরই সুজনক যৌবনের ইতিহাস নিয়ে কোন যুবতী যখন তার রূপের মধ্যে বান ডাকা দেহী সায়র থেকে—এক বিশেষ যুবকেরই প্রাণের মিষ্টি মিতায়, বা দুষ্টু বধূতে অভিষিক্ত হয়—ঠিক তখনকার প্রথম পরিচিতির প্রথম সেকেণ্ডটি থেকেই ঐ বিশিষ্টতমার মন ডিঙ্গিয়ে শেষ পর্য্যন্ত প্রণয় বা পরিণয়েরই ছাড়পত্র পেয়ে যাওয়ায়— সেই বিশেষ যুবকটির যৌবনের মদিরাস্নাত চোখের

রূপান্বেষণ—ভালোবাসারই দাবীতে—জানতে চায়, বুঝতে চায়, দেখতে চায় বাধাহীনতায়, মায় স্পর্শ কোরতে চায় অকপটতায়—তারই মঞ্জুলিকার শুচিতায়, আর স্নিগ্ধতায় ঢল্ কাঁপানো দেহী টইটম্বুরতায় সঘন থাকা যৌবন-রেখাঙ্কনগুলোকে। সৌমিত্রর সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হোতে চেয়ে—ওরই প্রিয়া এই রূপা মুখোপাধ্যায়—ওর যুবকত্বের এই চিরন্তনতা নিয়ে উপনীতা হোয়েছে এমন এক সত্যে। —তাই আজও এই সন্ধ্যার সোনা ঝরা আলো-আঁধারির মায়াপরিবেশে বসে বসে—ঠিক নিজের হওয়া ধারণার থেকে অনেকবারই প্রিয়র ডান হাতখানাতে—আপন বুকের দু'ধারার যৌবন সালঙ্কৃত উদ্ধত লজ্জাধারার—পেশলিত ধারের ছোঁয়া জানাতে চেয়েও—পারে নি তা আপন প্রিয়কে অকপটে থেকেও—পুরোপুরি ভাবে পরশখানা পাওয়াতে। কি দেওয়াতে। ইচ্ছে ওর হয় ঠিক-ঠিকই। কেন না, সেটা হোল রূপাদের মতো মধুরিকাদেরই যৌবন-বাসরের—এক মস্ত কানুন। ফুল উইথ্ ইয়্যুথস্ আন্নোন প্রাইভেসি।—আব হোতে দিতে চেয়েও—পুনরায় বাধা দান ক'রে তা হোতে না দেওয়াটাই ত' হ'ল—ওদেরই যুবতী রত্নত্বের মস্ত এক মাধুর্য্য। নামধেয় সৌন্দর্য্য। নামধেয় এক চিরকালীন ছান্দসী লাজ-বিধুরতা!

—"এই। ভারী দুষ্টুমি হোচ্ছে কিন্তু!"—বলতে বলতে রূপা তার সুষমার ছন্দে ছন্দে ঢেউ খেলানো বুকের ছোঁয়া বাঁচিয়ে—সৌমিত্রর তাপ-ভরা হাতের লাজহর করা দুষ্টুময়তাকে—হঠাৎ আলোর এক ঝলকানি ছোটানো হাসিতে ভাঙ্গ তে ভাঙ্গতে পথরোধ করালো—আপন মুঠোতে ধরা অবস্থানটিকে —স্থানান্তরিত কোরে। হাসির গমক ভরা ছর্‌ররায় নাচা নিজের মুখের ওপরে প্রিয়র হাতখানা টেনে এনে—আপন অধরের স্ফূর্তির-স্ফূর্ততাটি ঢাকলো রূপা তারই আধারে।

আর তখনি রূপা বলল—"ঈষ্। চাইলেই পাবে না। সত্যি আমাদের সম্পর্কে তোমাদের দুষ্টুপনার ইন্ধন বহুদিন আগেই দিয়ে গেছেন—সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র। বলি, জান না তা? কেন ঐ ঋষি-স্রষ্টার 'আনন্দমঠে' পড় নি, যেখানে আম্রকুঞ্জের ছায়া-সুনিবিড় বিতানেতে—জীবানন্দ ও শান্তির দাম্পত্যিক মিলন-বাসরখানা চুমাচুমির যৌবন-সুধায় মাতোয়ারা থাকাকালীন—স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের মানস যুবতী-স্ত্রীর প্রতি রেখে গেছে—প্রশস্তি। এ্যাড্‌মিরেশন্। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের যুবতীত্বের প্রিয়া রূপখানার যাদুময়তা সম্পর্কে লিখেছেন,—রমণীর বুক বড় নরম জিনিস।—কিন্তু সৌমিত্র, আমি যদি বলি, মহান শিল্পীর এই ভাষ্য আমাদের শুধু মন-মহলেরই নয়, মায় দেহ মঞ্জিলের বিশেষ কোন রূপাধার সম্পর্কে তোমাদের করাতে চেয়েছে ওয়াকিবহাল,—তা হ'লে মনে হয় ভুল কিছু

হবে না। এর ব্যাখ্যা যত বড় সাইকোলজিক্যাল,—হ্যাঁ, ঠিক তত বড়ই হোল এর শারীরী বিভূষণ-গত ফিজিক্যাল্ কণ্টূর (contour)! তাই না?"

শুনতে শুনতে প্রিয়ার কাঁধের ওপর দিয়ে সুবিস্তারে ছড়ানো নিজের বাম হাতের লতা-বাঁধনে আরো অন্তরঙ্গতায় জড়িয়ে—মিষ্টি-মিষ্টি হাসিতে ঝড় হওয়ার মতো কোরে সৌমিত্র জানালো—

—"বাঃ, মেয়ে! এ জন্যই ঋষির উক্তি হোল, স্ত্রী-চরিত্র দেবা ন জানন্তি! আমার হাতের করা দুষ্টু অভিলাষ পাছে যদি কেড়ে নেয় তোমারই লজ্জাধার, তাই নিয়ে প্রতিরোধ কোরেও ত' তুমি তোমার মুখের বাক্-চাতুরীতে আরো বিশদ করালে না কি—নিজেরই পাওয়া লাজটাকে? বাব্ বা! লক্ষ্মী থাকবো কি ক'রে বল? তোমাদের এই দেহ-মন ভরিয়ে উপছে থাকা রহসময়তাকে খালি পত্র-পত্রালীর নানান রঙ-বেরঙেরই বাহার দিয়ে-দিয়ে সাজানোর মধ্যে—অন্তরাল রাখার জন্যই ত' যুবকের দুষ্টু-দুষ্টু অভিলাষ তপঃভঙ্গে জেগে ওঠে! বল মেয়ে, তারপরেও তোমায় কাছটিতে পেয়ে—থাকবো শুধু লক্ষ্মী ছেলেটিরই মতো—অতি শান্তটি? তা যে সম্ভব নয়! এই রূপা, অমন ক'রে হাসছো কেন খিল্‌খিলিয়ে?"

—"কি মুস্কিল! হাসি পেলে বুঝি হাসবো না? না কি গোমড়া মুখখানা কোরে থাকবো? হ্যাঁ। হ্যাঁ। আমরা স্বাভাবিক লজ্জার জন্যই অতি স্বাভাবিকতায় নিজেদেররই দেহবল্লরীকে পাতা আর পাতার মধ্যে আড়াল ক'রে রাকি বলেই, যে, তোমাদের তা দেখতে হবে অনাবারণতায়—আর আভরণহীনতায়— সেটা কি তোমাদের মস্ত দুষ্টুমিপনা নয়? আমাদের সাহিত্য ত' আজ না হোলেও, তার ক্ল্যাসিকাল সমস্ত সৃষ্টির মধ্যেই তোমাদের যুবক-দুষ্টুমিগুলোকে, বল, কালির আঁচড়ে-আঁচড়ে পাতার পর পাতা পর্য্যন্ত তুলে ধরে নি বুঝি? জয়দেব, বিদ্যাপতি, রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র থেকে আরম্ভ কোরে কালিদাস পর্য্যন্ত—সবাই ত' তোমাদের চোখের রূপানুসন্ধান মেটাবার জন্য, বল, আমাদের রূপতনুকাগুলোর রূপসুষমারই ঘোমটা—লাজ-সরিয়ে সরিয়ে দেখান নি? ইউএরাপের কথায় কিন্তু আমার কেমন যেন পরম বিস্ময় জাগে। শোন মিতা। শোন গো সৌমিত্র। আমি ভাবি আমাদের এই দেশটা না হয় পথ চলতে চলতে হাজার হাজার—হয় সত্য, নয় মিথ্যা নীতিজ্ঞানের যূপকাঠেতে ফেলে করাতে চায় কখনো সত্যানুসন্ধান! আবার কখনো বা পুরোপুরি পথভ্রষ্ট! তাই হাজার নীতির কড়াক্কড় কানুন ছাড়িয়ে তোমাদের যুবক দেহমনের এমন সব দুষ্টুমিগুলোর পেছনে—ঠিক-ঠিকই মস্ত কারণ থেকে যায়।—কিন্তু ইউরোপের ওঁরা? ওদের সমাজে ত' সবই খোলাখুলি ব্যাপার। আমাদের নীতির শাসনে যা

শোভন নয়, ওদের দেশ জুড়ে ত' তাই হোল—সুন্দর শিষ্টাচার। কোথাও বা তা পড়ে যায়—রিলিজিয়াস্ রিচ্যুয়ালে। তবে এই ওদেরই সম্পর্কে মনে বিস্ময়ের ঘনঘটা জেগে ওঠে। কেন জান? এ জন্য, যে, ওদের শিল্প-মনীষায় যুগন্ধর আজকের পুরুষ সাহিত্যিকেরা তাঁদের রচনার কথায়ানে চড়ে প্রণয়-কথা তৈয়ার করার ফাঁকে—একটু সুযোগ পেলেই এঁকে বসেন—সুনিপুণ চিত্রশিল্পী পল্ গঁগ্যা বা ভেনগগ-দেরই মতো কোরে। যাঁদের লিপিকুশলতায় যুবক প্রণয়ীদের চোখের সমনে—ওদের যৌবনের তৃষা নাচিয়ে—একে একে সুবিস্তারে বর্ণনা দিয়ে যান—ওঁদের দেশেরই যুবতী প্রিয়াদের সঘন দেহী-যৌবন-ঘেরা, বাঁকে বাঁকে পরিশোভিত লাজ-রেখাগুলোর পুরোপুরি কোরে দেখানো—এ্যানাটমিক্যাল্ আউট-লাইনস্! আচ্ছা সৌমিত্র, তোমাদের ছেলেদের যৌবনের সবুজ রঙ্ ভরা দৃষ্টির কাছে—এই সব বর্ণনা খুবই ভালো লাগে? কি, ঠিকই ত'? হ্যাঁ, তাই বলে আমাদের যে খারাপ লাগে তা কিন্তু আমি বলতে চাই না। মেয়ে বলে এক রকম আমাদেরই মেয়েলি অস্বস্তি অনুভব করি ঠিক-ঠিকই। শিল্প যখন, সাহিত্য যখন, ছায়াছবি যখন, তখন তার মধ্যে স্রষ্টার দর্শন থাকে। তা না থেকে পারে না। কাজেই তেমন শিল্প কলার মধ্যে খারাপ থাকতে পারে না। অস্কার ওয়াইল্ডের কথা ত' তুমিই আমাকে পড়িয়েছিলে। ভিনদেশী সাহিত্যের ঐ মোস্ট স্টাইলিষ্ট্ লেখকের কথাই ধ্রুবসত্য। রচনার মধ্যে খারাপ কিছু থাকতে পারে না—যদি সত্যি ইচ্ছাকৃত ভাবে খারাপ কোরে না লেখা, বা আঁকা হোয়ে থাকে। প্রশ্ন হোল whether it is badly written or written in a good manner.' আর তার নিক্তি ধরে ওজন কোরে বলা যায়— কোন ভাব, কোন বক্তব্য, কোন চির ব্যঞ্জনা ফোটাবার মধ্যে—সুন্দর আর সুস্থ কোরে রচনার ধর্মই হোল,—'Nothing is obscene. Only thinking makes it so.'

এক লহমায় এত সব কথার বুদ্ধি দীপ্ত আলাপচারণখানা এগিয়ে নিয়ে যেতে যেতে থামলো রূপা। বিদিশার মুঠো মুঠো অন্ধকারে ফুলে-ফেঁপে থাকা নিজের ঘন কেশদামে করা—অজন্তা-রীতির ছবির মতো খোঁপাটি সৌমিত্রর বাম ধারের কপোল ঘেঁষে লাগিয়ে, মাথা একটু কাৎ করায়—প্রিয় তার ত্বক্ ভরিয়ে অনুভব কোরল—একটা ঠাণ্ডা শিরশিরানি। আর ঘ্রাণকোরল কেশবতীর দুপুরের কেশ-প্রসাধনেতে লাগানো—ফুলেল আরকের সুবাস। স্নান করা সত্বেও তা ভুরভুর ক'রছে। এই অবস্থায় প্রিয়ার গলায় আর মাথায় হাতের আদর জানাতে জানাতে বলল সৌমিত্র—

—"বাঃ। আমি দেখছি যে আর কত রকম ভাবেই না জানি আমায় ধাঁধাবে! উ! কী দুষ্টুটাই না হোয়েছো। ডায়মণ্ড হারবারে বেড়াতে এসে— গঙ্গার পাড়ে বসে বসে এ কি পাগলামিতে তোমায় পেয়ে বোসেছে? এই, একটু ভালোবাসা জানাও তাই নিয়ে তোমাদের কখনো শেষ না হোতে চাওয়ারই কথা শোনাও। তা না—আমায় নিজের ছাত্র ঠাউরে যেন সাহিত্যের পাঠ নেওয়াচ্ছ! বাব্ বা!"

—"দ্যুৎ। ও কথা কেন বলছো? আচ্ছা সৌমিত্র বলি তোমাদের ভালাবাসার মধুমিতাদের কি প্রণয়ালাপে ধরা—শুধু ছয়লাপ নিয়ে গুঞ্জরণ করা ছাড়া—আর কিছুটি করার, বা বলার নেই? শুধুই কি সাঁঝের নিরালায় একটা নির্জন কোণ আশ্রয় কোরে জানাবো, আর জানাতে জানাতে ক'রবো মান-অভিমান-রাগানুরাগ? দ্যুৎ। সব সময় ভালো লাগে না এ সমস্ত। জান ত' আমি অন্য রীতিতে গড়া। তুমিও ত' তাই। তবে শুনতে অনিচ্ছা দেখাচ্ছ কেন—আমি এতক্ষণ যা বলে গেলাম তাই নিয়ে?"

বলতে বলতে ওদেরই একচেটিয়া অনুভূতির অভিমান নিয়ে অতি অকারণেই যেন এই স্বর্ণালী সাঁঝের বেলাতে—প্রিয়া রূপা মুখোপাধ্যায় তার কাজল আঁকা টানা টানা দু'খানা চোখের মদিরতায় ছল্‌ছলালো। লাল অধরের চুনীর ঝকমকানিকে কাঁপালো। রূপবতী বুকখানায় মাধবীরাগ ভরা পেশলিত ঝরনায় আবেগের দোদুল লীলাময়তা ফোটালো। ঠিক এই মুহূর্তে নিজের হাতে মুঠো ক'রে রাখা ডান হাতখানাকে রূপা তার বুকের পর ঘন ভাবে ধরে রাখায়—প্রিয়ার এই লাজ-ঘেরা সুষমাধারে জাগা দোলার পরশ অনুভব কোরল—প্রিয় সৌমিত্রর যৌবনায়নে ফোটা—প্রিয়ারই দেহী-যৌবনের জন্য অন্তর্ভেদী—সবুজ দৃষ্টিখানা।

মুখের দুষ্টু দুষ্টু হাসিতে ভেঙ্গে পড়ে তখনি সৌমিত্র তার রূপাকে আরো অন্তরঙ্গতার বাঁধনে কঠিন ক'রে নিজের সাথে জড়ালো—বাম হাতেরই লতাজালের ঘেরাটোপে। রূপার মসৃণতায় আর পরাগে চক্‌চক্ করা ডান ধারের কপোলেতে নিজের মুখেরই একটি ধার ছুঁইয়ে আদর কারার মধ্যে জানালো—

—"বেশ। বেশ। আমি কিছুটি না বলতেই এত অভিমান? তা হোলে বিয়ের পর রাতদিনের অতগুলো টানা প্রহর ধরে ধরে না জানি কত ধারার কত অভিমান দিয়ে—আমায় করাবে নাজেহাল! হতচকিত! বাব্ বা। আচ্ছা মেয়ে তুমি! আচ্ছা-আচ্ছা, তোমার কথা কিন্তু এখনো শেষ করো নি। তা এইবার ভালো ক'রে বলে শেষ কর। আচ্ছা, তুমি ত' জানই ভালো ক'রে, যে, তোমার ও সব কথার আলাপচারণে আমি কত খুশী হই? তবে? এই, শেষ কর তোমারই বলতে চাওয়া কথাকে।"

কথা শেষে সৌমিত্রর মুখ ছাপিয়ে জাগা হাসির ছররায় মুকতা ঝরলো।—আর তখনি সেই ঝরা মুক্তাদলের শুভ্রতায় ঠিক্‌রে যাওয়ায়—প্রিয়ার অধরেরই অভিমানের বাঁকাচোরা ছন্দময়তা মিলিয়ে গিয়ে— সেই চুনীর লাল ঝকমকানি উজ্জ্বলতা পেল। রূপার মুখের কথার লহরদল তখনি নাচলো—

—"না-না। সৌমিত্র, ও কিছু নয়। আমার চোখ এমনি কোরেছিল ছলছল। ভয় নেই, তোমার মতো এক সুন্দর ছেলের মধুর আবদারের মধ্যে ভাসতে ভাসতে আমি কিন্তু অভিমান ক'রতে চেয়েও—পারি না কণামাত্র অভিমানিনী হ'তে! সত্যি-সত্যি। আচ্ছা সৌমিত্র, বাদ দিয়েও দেও এ সব মান-অভিমানের কথা, ও তারই জন্য করা প্রশোত্তরাদি। কেমন?"

তাই বলে নিয়ে এইবারটি বেশ মধুর করা আদর পেতে পেতে ও দিতে দিতে—রূপা তারই প্রিয় সুজনকের দুষ্টু আহ্বানেতে পলক মাত্র নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিল। তারপরেই রূপা বলতে লাগলো আগের প্রসঙ্গের রেশখানা ধরেই—কল্‌-কাকলির সুর সাজিয়ে—

—"জান সৌমিত্র, আমার হাতে এই যে মলাট দেওয়া বইটা দেখছো, এটা হ'ল লরেন্সের একখানা ছোট-গল্পের সংকলন। নাম 'Love Among the Haystacks'. হ্যাঁ, তোমার ত' বইখানা অনেকদিন আগেই পড়া হোয়ে গেছে। তোমার ভালো লেগেছিল বলে আমায়ও পড়তে বলেছিলে। গত কাল বাড়ী ফেরার পথে বইখানার 'অ্যাভনে'র এই সংস্করণটি—কিনে অনেক রাত পর্য্যন্ত পড়ে প্রায় শেষ কোরে এনেছি। গল্পগুলোর প্রতিটিই আমার ভালো লেগেছে। তবে কি জান—এই ডেভিড হারবার্ট লরেন্স সত্যি ঐ ইউরোপীয় রীতির পথ ধরে আমাদের, মানে মেয়েদের যৌবন বিভূষিত দেহের বর্ণনা কি ভাবে তাদের দেশের যুবকদের চোখ ধাঁধানোতেও অপলকে দেখে দেখে চলা থেকে হয় না নিবৃত্ত—তা নিয়ে কয়েকটি গল্পে এর ছবিবহুল পুরোপুরি বর্ণনা —কথার ঠাস বুনোনেতে সাজিয়েছেন। আমার মতে শিল্পের রসলোক তাইতে কণামাত্র বিচ্যুত হয়নি। ফুটেছে picturesque হ'য়ে। অলঙ্করণ হয়েছে উঁচু দরের। তবু, আমি এদেশের আলাদা ধাঁচের মানসিকতায় গড়া একজন যুবতী হ'য়ে ভালো লাগাতে পেরেও কিন্তু—মনে থেকে যাচ্ছে একটা প্রশ্ন—হ্যাঁ, যে প্রশ্নটির প্রসঙ্গেই উঠেছে এত সব কথা। দেখ, এতে ক'রে কি ছেলেদের মনের এ ধরনের দৃষ্টির নিমেষ ভরা বর্ণনা দিয়ে—ছেলেদেরই এই ভাবে আমাদের কাছে বেহায়া ও নিলাজ কোরে তোলা হচ্ছে না? বল সৌমিত, কৈ ও দেশের মেয়ে লেখিকারা যখন লেখেন তখন এতটা এ ভাবে এগোন না ত'। এক—গ্রেস্‌ মেটালিয়াসের কথা

বাদ দিয়েই বলছি অবশ্য। আর কারুর কি এমন মস্ত নজির আছে বলে দেখেছো?"

হঠাৎ রূপার মুখের কথা থামিয়ে দিয়ে সৌমিত্র বলল—" কেন থাকবে না ও দেশেরই আর কোন লেখিকার মধ্যে! তুমি ত' পার্ল বাকের 'Come, My Beloved' পড় নি,তা না হ'লে বুঝতে মিসেস্ বাক্‌ও ঐ উপন্যাসটির মধ্যে এমন ছবিবহুল বর্ণনা রেখেছেন। বিশেষ ক'রে শেষ চ্যাপ্টারেতে পার্ল বাকের সৃষ্ট-চরিত্র—আমাদের বাঙালী নায়ক, ডাঃ যতীন দাশ ও তারই ওদেশীয় প্রেমিকা মিস্ লিভির সাথে—যে প্রণয়লোকের কাহিনী বুনেছেন, সেই তারই বিরাট বক্তব্যখানা ধরে—প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিল ধরাতে ধরাতেও—বিচ্ছেদ টানার মধ্যে—পুরুষ লেখকের মতো erotic বর্ণনার কথালিপিকা করেছেন। একটা কথা ভাব খালি এই নিয়ে, যে, আচ্ছা রূপা, দেখ এই পার্ল বাক্ যিনি পৃথিবীর সোসাইটি অফ দি এলিট্‌স্‌দের (elites) একজন, হ্যাঁ সেই প্রখ্যাতনামা মহিলাও কিন্তু তাঁর সমাজ চেতনায় আমার মতে —আন্তর্জাতিক হ'তে পারেন নি। কেন জান? উনি যতই উদার হন না কেন, তবু বিদেশীদের সেই বর্ণ বৈষম্য-মূলক—অন্ধ প্রীতির মায়াডোর ছাড়িয়ে—উর্দ্ধে মোটেই উঠতে পারেন নি। উঠতে পারেন নি তার কারণ বইটির মধ্যেই রয়েছে। বাঙালী ছেলের সঙ্গে বিদেশিনীর প্রেম যতই মধুর হোকনা কেন,—লেখিকা তাঁর প্রতীচ্যকে এ দেশের সঙ্গে মিলন হওয়ার মুহূর্তটিতেই যেন—গলা টিপে হত্যা করেছেন। তাই বাইবেলের নাম-ধারী ও উপনিষদের বাণী বিভূষিত 'Come, My Beloved' উপন্যাসে শেষ পর্য্যন্ত নিজেদের বর্ণ-বৈষম্যের প্রীতি অটুট রাখার জন্য—বিচ্ছেদ ধরে যবনিকা পড়ে যায়—যতীন ও লিভির প্রণয়লোকে। গ্রন্থটি ভালো সত্যি। কিন্তু নয়—সম্পূর্ণ humane. মানবিক। রূপা, তুমি বইটি পড়লে পর সব কিছুই বুঝবে। আমি ওঁর 'Good Earth' পর্য্যায়ের ত্রি-লজিটির কথা বাদ দিচ্ছি। কেন না, আমার মতে ওই বইয়ের ত্রি-ধারা অনেকাংশে যেন সাহিত্যিক মানদণ্ড ছড়িয়ে হোয়ে উঠেছিল সেদিন—প্রাচারধর্মী। কিন্তু ওঁরই সুন্দর ও মধুর সৃষ্টির 'ইষ্ট উইণ্ড ঃ ওয়েষ্ট উইণ্ড' বা 'এ্যাংগ্রি ওয়াইফ' বা 'কম্যাণ্ড দি মর্নিং'-এর মতো অবশ্য নিখুঁত রচনা হোয়েও—হে 'কাম্ মাই বিলাভেড' মহৎ সৃষ্টি হোতে হোতেও—সত্যি এই বিদগ্ধা মার্কিনীর পক্ষপাতিত্বে ঘটা—বাঙালী নায়ক যতীনের মধ্যে প্রাচ্যকে অবেহেলা করার জন্য—নায়িকা লিভির দেহীবিজ্ঞানের জটিলতা নিয়ে চোখঠারা ব্যাখ্যায় যে ভাবে চরম আঘাত হেনে—মিলনের শেষ অণুটিকে পর্য্যন্ত হার মানানো হোল, বুঝলে রূপা, তখনই তার জন্য মহৎ সৃষ্টির গৌরব আর যেন পেল না। তাই...."

কিন্তু সৌমিত্রের কথা বাধা পেল। তখন মাঝ গঙ্গায় নোঙ্গর করা বিদেশী জাহাজখানায় ঘন ঘন এ্যালার্ম বাজানোয়। আর তারই রূপারও মুখের কথা আগ বাড়িয়ে ঝল্‌মলিয়ে ওঠায়

—সত্যি এমনভাবে প্রাচ্যের এক ভারতীয়ের প্রেম নিয়ে যে পরিণতি দেখিয়েছেন বাক্‌—যদি তাই হয়, তা হোলে বলবো—এই মাত্র সেদিন যে তাঁরই কাহিনী থেকে এক ছায়াছবির চিত্রনাট্যবিন্যাস করাতে ঐ 'Yellow Rose'-এর জন্য বাক্‌ তিববতে এসেছিলেন, —আর ফেরার পথেতে এই শহর কলকাতাখানা মাত্র এক নিমেষের জন্য গ্র্যাণ্ডের মতো অতি আধুনিক সরাইখানারই বাতায়ন থেকে দেখার মতো ক'রেই যেন অতর্কিত প্রস্থান নিয়েছিলেন,—যদি বলি যতই চীন-প্রেমী হোক না কেন বাকের মানবতাবোধ, তবু এ কথা সত্যি যে, এ দেশকে তিনি যেন এক চোখের কৃপণ চাহনিতেই দেখে গেছেন। তার বেশী নয়। জান সৌমিত্র, সেদিন ছিল এক ছুটির রবিবার। আমার মনে আছে ঠিক সেদিনটর সন্ধ্যায় পি. ই. এন. ক্লাবের সভ্যদের মজলিস নিয়ে সান্ধ্যভোজের ব্যবস্থায়—আমাদের বহু নামকরা সাহিত্যিকই এসেছিলেন। এই সভায় পার্ল বাক্‌কে আনার জন্য গ্রাণ্ডের স্পেশাল স্যুইটে গিয়ে—বেশ আন্তরিক ভরা আবেদনে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। জান সৌমিত্র, দুঃখ এখানে, যে, আমাদের সরকার যতই বিশ্ব সৌভ্রাত্রের পাগলামিতে মাতুকই না কেন, শ্রীমতী পার্ল বাক্‌ অন্ততঃ এ ব্যাপারে কোন ভ্রাতৃত্ব-প্রীতির নিদর্শন রেখে যেতে পারলেন না সময়েরই অভাব ধরা অতি স্বাভাবিক এক অকাট্য অনুযোগ দাঁড় করিয়ে তিনি আসেন নি ঠিকই, তবে কি জান, আমাদের প্রিয় লেখকদের সুন্দর এক জমায়েতে না এসে—এ ভাবে তিনি আমাদের অন্তর থেকে সরে গেলেন না কি? আমি বলি কি—অনেক লেখকই দেখা যায় মানবদরদী কথাসাহিত্যের দলিল-দস্তাবেজ রচনা করেও—মাঝে মাঝে এমন এক আমন্ত্রণ গ্রহণ না কোরে—খুব যেন আত্মপ্রসাদ পান। পান বটে, তবে সেই সঙ্গে কি মানবতার ভুবন থেকে ক্ষণেকের জন্য হোলেও—হন না পথভ্রষ্ট! ব্রতভ্রষ্ট? হ্যাঁ। হ্যাঁ সৌমিত্র, তুমি জানবে আমার কথাই ঠিক। আমি বলতে চাই, ঠিক এই কারণেই আমাদের ভারতীয়দের হৃদয় দরবার থেকে —বহুযোজন দূরে যেন শ্রীমতী বাক্‌কে সরিয়ে দিয়েছেন—গল্প গাঁথামহলের যাদুকর—ঐ উইলিয়ম সমারসেট মম্‌। বল্‌, এ কথা তুমি কাটতে পারবে কি? না, পারবে না। মহামানব রমণ মহর্ষির ঐ মহীশূরের আশ্রমে থেকে এ দেশীয় ধ্যান-ধ্যারণার উপনিষদীয় দীক্ষায়—মনীষী সমারসেট মম্‌ যে ক্ষুরস্য ধারার অভিনিবেশ গ্রহণ করেছিলেন, বলি সৌমিত্র তা কি আলোচ্য ঐ লেখিকার

আছে? জান ত' সৌমিত্র, লেখকের কোন জাত থাকে না। কোন নিজের দেশ থাকে না। সে হ'ল সব জাতের। সব দেশের। মায় নিরবধিকালের জন্য হয় তাঁদের জন্ম-স্বাক্ষর। দেখ, তাই চরম সত্যি বলে সমারসেট মমের নায়ক ল্যারি—Razor's Edge-এ কথা প্রসঙ্গে আমাদের অতি কাছের মানুষ—ভগবান রামকৃষ্ণের কথামৃতের অমৃতময় বাণী পর্য্যন্ত উচ্চারণ করেছে।— সেই ল্যারীরই একটা কথা খুব দামী লাগায়—আমি পুরোপুরি মুখস্থ রেখেছি। শোন সৌমিত্র, ল্যারী বলছে—It is a mistake to think that those holy men of India lead useless lives. They are a shining light in the darkness. They represent an ideal that is a refreshment to their fellows ; the common run may never attain it, but they respect it and affects their lives for good. When a man becomes pure and perfect the influence of his character spreads so that they who seek truth—are naturally drawn to him."

সে কথা শুনতে শুনতে সৌমিত্র তার প্রিয়ার কপোলেতে অধরের আলতো করা আদর ছড়িয়ে দিয়ে বলল কথা শেষ হ'তেই—

—"তোমার মেয়েলি স্মৃতি সত্যি প্রশংসার মতো দাবী রাখে। সত্যি অদ্ভুত তোমার মনে ক'রে রাখার শক্তি! শোন মিতা, সাহিত্যের নায়ক হিসাবে ল্যারী হ'ল আমার এক প্রিয় চরিত্র। আর ওরই স্রষ্টা মম—ও তাঁর এপিক নভেলেরই—ফিলিপ ভাষ্য সমেত তা হ'ল আমারই মন মহলের প্রিয় প্রসঙ্গ। আর এই প্রসঙ্গে তুমি আমার কথা ধরে অন্য কথায় নেমে যা শোনালে ও বোঝালে,— সে সবের প্রতি আমার আছে মস্ত সায়। পুরোপুরি আমিও তা মানি। শিল্পী মম্ যে ভাবে এই 'রেজর্স্ এজ্' রচনা ক'রতে পেরেছিলেন, হ্যাঁ, ঠিক তাই আমার মনে হয়েছিল পার্ল বাক্‌ও বোধ হয় এমনি এক জগত তৈরী করতে প্রয়াস নিছিলেন 'Come, my Beloved'-এ—যখন দেখি সে গ্রন্থের আরম্ভেই ইংরেজী তর্জমায় দেওয়া আছে। বিখ্যাত উপনিষদের 'তমসো মা জ্যোতির্গময় অসদ মা সদ্গময়'র মধুময় সেই পুণ্যশ্লোকটি! ভেবেছিলাম। তাই—এই যদি হয় এর শুভ-সূচনা, তা হ'লে শেষেতে নিশ্চয়ই থাকবে প্রভাসিত হওয়া মহৎ এক দর্শন—যা আন্তর্জাতিকতারই সুরে থাকবে—গাঁথা! কিন্তু পেলাম না তা। তবে এখানে আর একটা কিন্তু আছে। আমি যদি ভারতীয় বাঙালী না হতাম—তা হ'লে এটা ঠিকই, যে, এতটা এ নিয়ে ভাবতাম না। শোন, এই বইটি প্রসঙ্গে যে কথা তোমায় বলতে চেয়েছিলাম—তা বইটি কাছে না থাকলেও তোমায় স্মৃতি মন্থন ক'রে কয়েকটি লাইন জানাতে পারি এখনই

লাইনগুলোয় মধুর ক'রেই এঁকেছেন। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে তাই লাইনগুলো গেঁথে আছে মনের চৌহদ্দিতে। শোন তবে, নায়িকা লিভি যখন জানতে পারল বাঙালী যতীন দাশ নামী প্রেমিক-ডাক্তারের গলায় বিয়ের বরমালা পড়াতে পারবে না—তখন সে চাইলো এমন এক বিরাট কিছুকে—যার সৃষ্টির ভেতর দিয়ে আবার মিলন ঘটাবার জন্য ফিরে আসতে পারবে—আপনারই দেশ হিসাবে ভালোবেসে ফেলা—এই ভারতেরই মাটিতে।—হ্যাঁ, এক বাঙালীর স্ত্রী হিসাবে! তারই সন্তানের জননী হিসাবে! তাই বিচ্ছেদ যখন ঠিক অপ্রতিরোধনীয় হ'ল—ঠিক তখনি শ্রীমতী লিভির প্রাচ্য-প্রীতি ওদেশের সাথে এদেশেরই সম্পর্কটিকে 'কংক্রীট' করে গড়ার জন্য—ডাঃ যতীনেরই যুবকত্বের পুরুযোচিত কামনার কাছে—শ্রীরাধার মতোই নজেকে বহুত মিনতিতে সঁপে দিতে পারলো।—তারই কুমারী যৌবনের তপ্ত রুধিরেতে—যাতে অঙ্কুরিত হতে পারে—এক হিন্দু বাঙালীরই দেহী-স্বত্বা।—হ্যাঁ, তারই সন্তানের মধ্যে দিয়ে। এই তারই জন্য নারীর সিসৃক্ষু যুবতীকায় কৌমার্য্য-হরণ—নিজেরই অভিলাষে 'যতীন দাশ' নামী পিয়তমকে দিয়ে—শেষ পর্য্যন্ত সমাধা করাতে দেখলাম, 'In the dark Livy was walking with swift and reckless steps. heedless of the snakes and the night insects, the folds of her sari gathered in her hand and over her head the scarf which hid her bent profile'. হ্যাঁ, এই শঙ্কায় ভরা পদক্ষেপে—পোশাকে ভারতীয়ানী হওয়া লিভির শাড়ী পরা অবস্থার মধ্যে—এমন এক যৌবনের মাতাল ঝড় হওয়ার পেছনে এ পর্যন্ত মানবিক চাওয়ার আর্তিই রয়েছে প্রজ্জ্বলিত—আর তারপর দেখলাম—প্রিয়ার এই অভিলাষিত মিথুনিক ঝড়েরই তাণ্ডবেতে মাতাল হয়ে নিজেকে সঁপে দিতে—প্রথমটায় অবশ্য ডাঃ যতীন দাশ রাজী হতে চায় নি। শেষে অনিন্দ্যা প্রিয়া এক অসম মহত্ব যে ভাবে প্রিয়তমকে লাজহরণ অধিকারেতে অধিকারী করালো—প্রিয়ারই তাপিত দেহের পবিত্র কৌমার্য্যকে অস্বীকার ক'রে—এই বাঙালীরই এক নতুন প্রাণকণাকে রোপণ করার জন্য—ঠিক তখন সত্যি-সত্যি এই যুবতীর মহীয়সী ভাবেতে চাওয়ারই আরাধনার কাছে—বাঙালী নায়ক স্বীকৃতি জানিয়েছিল। তাই দেখি রাতরে আঁধারের আর নিশুতি লগ্নে, হ্যাঁ, 'Yet his easily roused blood quickend and grew warm. She was sitting closee to him, her slender thigh pressed against his leg, bare under the cotton dhoti. She was silent, a graceful drooping shape beside him, andhe reached for her hand and took it between his and stroked it gently in long soft movement, palm

against his palm, his fingers stroking between hers. She drooped toward him, and he put his arm about her waist. Love could be denied, yes, but sometimes it was uncontrollable. Here in the night, with everything forbidden them, love itself was uncontrollable. Nobody had seen her come, and none need see her go'.আর তারপর দেখলাম রূপা, এমন এক মাদকবিহ্বল নিলাজময়তা উপচে উপচে ওঠায়— শেষ অবধি সত্যি-সত্যি শ্রীমতী লিভির মহৎ অভিলাষ অনুযায়ী সুখী করাবার জন্যই ত' —He rose and hooked the door and then he went into the other room and put out hte lamp and in the darkeness he come back to her and sat down.'বসে পড়ে নিরালার নিভৃতিকে মিথুনের সাতরঙ্ ধরে সাজাবার জন্য আঁধারের মধ্যে প্রণয়ের দীপবর্তিকা জ্বালিয়ে প্রিয় যতীনকে দেখা গেল, Stroking her hands he ..roked up her arms and about her neck, down her cheeks and into her little ears. Then still in the same desperate silence, he opened the tiny buttons of her short sleeved vest and stroked her bare skin, her shoulders, her back, and then at last her breasts. When his hand smoothed the rounded curve of her breasts, she gave a great sigh.'তারপর নিজেরই করা যৌবনিকা দুষ্টুময়তায় বিহ্বল থাকা মন নিয়ে যতীন মধুরেতে জানতে চাইল, "What now Livy"—প্রিয়তমর এ হেন প্রশ্নের উত্তরে.....she trembled, she put her arms about his neck and leaned her head upon his shoulder, and did not speak a word. He took her silence for reply and he lifted her in his strong dark arms and carried her into the house.' যাওয়ার পথেতে শুধু একবারটি আর কি যৌবনবিহ্বলতার প্রণয়াচারে মাতাল থাকা যতীন halted at the threshold of his sleeping room.' তখন ওর প্রিয়ার আবেশ ধরা অবস্থা 'was murmuring against his breast. What do you say, Livy?" তখন আবেশেতে চোখ বোজা অবস্থায় প্রিয়া বলল "I said I want it to happen—what even will happen, I want it"—যতীন তারপরে বলেছিল, But we must keep it secret' লিভি তাই বলেছিল I want it আর তখন তাই দেখলাম, This noce, he was thinking, he was promising himself, only the once and it was out likely that anyone need know. It was very seldom that anything happened the first time, a virgin carries her own protection, and some risk love

must take, only the once, and then, of course, they must part.' আর তারপরেই দেখলাম মস্ত এক অনুভূতির কথাটিকে, যে, He had not it from the first, he had never had any hope, none at all. But hopeless love was the worst, the most terrible, the most enduring, and this would be the end.'—আর বুঝলে গো রূপা—তাই আমারও ঠিক তোমারই মতো খারাপ লেগেছিল, যখন পরে জানতে পারলাম পার্ল বাকেরই লেখা থেকে, যে, তারপর স্বদেশে ফিরে গিয়ে লিভি জানলো—তার এই অভিলাষ পূর্ণ হ'ল না! যে মিলনে ওর মনে হয়েছিল—ও সত্যি তা হলে যতীনের সন্তানের মা হয়ে—তবে একদিন সত্যি সত্যি নিজের স্বদেশ থেকে এই ভারতেরই বুকে—ফিরে আসতে পারবে।—প্রেমিক যতীনকে মিথুনাচারের নির্জন প্রহরেতে—দেহময়ে সঁপে দিয়ে পরম শুদ্ধশীলতায় লিভি তার কুমারীর লাজ উন্মোচনে একখানা জীবন্ত শোণিত বিন্দু ধার করেছিল সত্যি-সত্যি।—লেখিকা বাক্ শেষ পর্য্যন্ত পরিকল্পিত কথাযানেতে ঠুকে দিলেন—প্রকৃতির পরিহাস। প্রমাণিত হল—এই দুই ভিন দেশীর মিথুনচয়ন পুরোপুরি সার্থক হল না—প্রমাণিত হল যতীনের দেহ থেকে ধার করা সেই বিন্দু শোণিত—লিভির দেহের আলাদা শোণিতে মিলে মিশে সত্যি করাতে পারে নি germination. সুনন্দিতা লিভির যৌবনিক সৃষ্টিক্ষমতায়— বোধ হয় প্রকৃতি বিধিত কিছু অভাব ছিল।—হয় ত তা হ'তে পারে। শোন, শোন রূপা, সে যাই হোক, 'Come, my Beloved' আমাদের ভারতীয় মনে মস্ত ব্যথা দিলেও,—পুরোপুরি গ্রন্থটির শিল্পবিন্যাসে যে উঁচু মানের হয়েছে— সে কথা একশ বার স্বীকার করবো। বাইবেলের কথাতে আগাগোড়া ঝঙ্কৃত হয়েছে। এখনও—যতীন-লিভির এমন করুণ পরিণতির পরেও মনে পড়ছে 'Song of Solomon.' তাতে আছে—'Come, my beloved, let us go forth into the field ; let us lodge in the villages.'

সৌমিত্র কথা থামালো। রূপা জানালো ওর সায়। আর তারপরেই ঝলমলালো রূপার কথা-কাকলী।

— শোন সৌমিত্র, এইবারটি আমায় আগের কথাতেই ফিরে যেতে দেও। কথা উঠেছিল ইউরোপের সব দেশ সমূহের আর আমেরিকার পুরুষ লেখকের রচনা করা কথা ও কাহিনী পরম্পরায়। আমার বক্তব্য পার্ল বাক্ কেন, গ্রেস মেটালিয়াস্ বা মিস্ ডফিন দ্যু ম্যারিয়ার, বা মিস্ (?) সাইমন দ্য বভোয়া, বা ফ্রাঁসোয়া সাঁগা—এমন ভাবেতে তাঁদেরই সৃষ্ট যুবতী নায়িকাদের যৌবন সাজানো তনুশ্রীকে পত্রপত্রালীর আবরণ সরিয়ে—যুবকদের চোখ ধাঁধানোর ব্যবস্থা করার

পরেও—খুব বেশী ভাবনার সুযোগ নেই, এ জন্য, যে, ওঁরা নারী। ওঁরা লেখিকা। সুতরাং মেয়ে লেখিকা হ'য়ে যখন এ ব্যাপারে লিপিবিন্যাস করে যান, তখন মনে হয় পক্ষপাতিত্ব ধরে এটাই, যে,—ওরা ত' মেয়ে! কাজেই মেয়ে হয়ে আমদেরও আর অস্বস্তিকর লাগে না তা পড়ার সময়। দেখ সৌমিত্র, এটা মনের ব্যাপার। বিশেষ ভাবে মেয়েদেরই আর কি! তাই বলি সাহিত্যের সৌন্দর্য্য এমন সব বর্ণনাকুশলতায় ভরা সৃষ্টির শিল্পগত রূপপরম্পরায় কণামাত্র ব্যাহত না হোলেও—লেখকদের এ সব রচনার রসাস্বাদন করার কোন কোন মুহূর্তে, হ্যাঁ, সত্যি বলছি, মেয়ে হওয়ায় আমি অন্তত মেয়েলি ধারার ঐ বিশেষ অস্বস্তিতে ঢাকা পড়ে যাই। ও কথায় ছবি হয়ে ফোটা যে কোন যুবতীর দেহ সায়রের অমন নির্ভেজল আর নিখুঁত বর্ণনার রেখাঙ্কন পড়তে পড়তে, জান সৌমিত্র, আমি নজেই চঞ্চ ল হ'য়ে পড়ি —আমারই নিজের এই আবরণে ও আভরণের নানান সাজে-গোজে লুকিয়ে রাখারই মতো—এই ছোট আকারের দেহখানা নিয়ে বুঝলে? আর তখনি ভাবনায় দোল দিয়ে ওঠে কে জান? এই সেমিত্র, সে হ্যেল তুমি সত্যি। বলছি। ঈষ্। অত দুষ্টুহাসি হাসছো কেন? এই? শোন দুষ্টু ছেলে, আমি তখন ভাবি আমারই দেহ-মনের সাথে মিল ধরাতে প্রয়াসী—এই সৌমিত্র নামধারী পরম দুষ্টু ছেলেটির—যৌবনের আহ্বান কী দু'চোখের লজ্জারাগ ছাড়িয়ে—বিয়ের আগেকার এই বাগদান করা জীবনেতে হ'য়ে চায় না, বা হ'য়ে পড়ে না কি—অসম নিলাজ? লজ্জাহরে ব্যাকুল থাকা এক দুষ্টুমান? কি গো সৌমিত্র, কথার ছোট্ট একটা উত্তর অন্তত জানাও? ঈষ্। হাসি যেন বাঁধ ভেঙ্গে তোমার লালচে অধরের দু-কূল ধরে ছোটাবে দুষ্টুমির বন্যা! বল, বল, কথা বল।"

কথা থামাতে থামাতে হঠাৎ যেন রূপার ভেতরের যৌবনাকুতি—তুফানের মধ্যে ভেঙ্গে পড়তে চাইলো—সৌমিত্রকে ঝড় করাবার জন্য।— সৌমিত্ররই অধরেতে ঝড় ফুটিয়ে হাসির রঙীন ছটা লাগানো ঢেউয়ে ঢেউয়ে—তুফানেরই ঝাপটায় চাইলো আড়াল করাতে।

তখন মাথার ওপর দিয়ে সোনা ঝরা সন্ধ্যার মায়ারাগ—গঙ্গার বিরাট প্রস্থে ঘেরা বুকখানার ওপর দিয়ে ছুটে আসা—পুবালী হাওয়ার মধ্যে দোল খাচ্ছে। শুধু সন্ধযারাগ নয়। ও যেন সন্ধ্যার কুলা। আর অনুরাগের ঝরনা।

তাই তাকিয়ে দেখতে দেখতে রূপা ছোট্ট ক'রে আবদার কোরল—"এই।"

—"আরে, বলি রূপা, শুধু মুখ ফুটে এই বললেই বুঝি তোমাদের মেয়েদের পক্ষে বলা, বা জানানো হয়ে যায়—অনেক কিছুই? না? কি মেয়ে, তাই ত? দ্যুৎ। খালি বলবে—এই আর এই! ওতেই বুঝি সব মানে বোঝানো হয়ে গেল, না?"

সৌমিত্র কথা থামালো। থামিয়ে যৌবনোচিত আর্তিতে দুষ্টু হতে চেস্টা করলো। আর তখনই হয়েও পড়লো বেশ দুষ্টুমান। হাসিতে। কথাতে। ব্যবহারে। আর আবদারেতে।

—"এই? বুঝলে রূপা, তোমারই দেখাদেখি আমিও বললাম 'এই'। শোন, এবার ভাষা একটু বিস্তৃত কর। ব্যঞ্জনা ফোটাও। না হয় মৌনতায় আনাও সচলতার আলাপন। কিসে? ভাবেভাবে? কথায় কথায়? না, দুষ্টুমিরই যতি ধরে—আমার আর তোমারই যুগল অ—"

হ্যাঁ, ঐ শেষ না করা কথাখানার প্রথম আদ্যাক্ষর অ-কে উচ্চারণ করার সাথে সাথেই যেন তৈরী থাকা রূপা মুখোপাধ্যায় তার হাত চাপা দিয়ে থামিয়ে দেওয়ালো—প্রিয়র মুখের ঝলমলে কথামালা। তারপর রূপা হাসলো। রঙীন হ'ল। আর হল সোনালী সন্ধ্যার মতো —এক রিমঝিম ছন্দ। মায়ারাগ ভরা রূপা পুরোপুরি ঝলমলালো ছন্দ মধুরিকাতে। যতি মাধবীকাতে। কবির নতুনা রাধাতে

রূপা ভালোবাসার সুর ধরে তুফান হ'তে হ'তে— সৌমিত্রকে তারই রেশেতে ভরিয়ে প্রমত্ত ঝড় করাতে করাতে হঠাৎই—আপন মুখখানায় ফোটা লাল লাল পলাশ-হাসিতে ছাওয়া রীতিকাকে—সত্যি ঝৎ করে ছুঁইয়ে দিল—মধুর যুবকেরই অধরাধারে।

কিছু পলকের জন্য—এই নির্জন প্রায় স্ট্রাণ্ডের নিরালা কোণটিকে সত্যি সত্যি লজ্জা পাওয়ালো—সন্ধ্যার রিমঝিম তান ধরা আকাশের, আর ছলাত, ছল্ করা গঙ্গার প্রবাহিনী—গানের লয় সমেত। পুবালী হাওয়ার ঝটপটানি অবশ্য এ সব দেখেও যেন দেখলো না—এমনি এক উদাসীনতায় ছুটে যাচ্ছে। কিছু পরেই দূরে ভেসে ওঠা কোন গাড়ীর এগিয়ে আসারই জানানোটা—তখনি রূপাকে সামলে দিল। প্রিয় থেকে রূপা তখনি নিলাজ ছেড়ে সলাজের ঘেরাটোপে ফিরে এলো আর সঙ্গে সঙ্গে তাই রূপা হল লাজবতী।

লজ্জায় ফিরে এসে আবেশ ধরা গলায় জানতে চাইলো—

—"আচ্ছা সৌমিত্র, এবার একবারটি বল ত তোমারই বুকের ছড়ানো এই বাঁধনেতে সঁপে দিয়ে রাখা—এই আমি মেয়েটির যৌবন সাজানো দেহখানার যথাযথ রূপরেখাগুলোকে দেখতে আর জানতে, আর ছোঁয়াচ ভরিয়ে অনুভব কোরতে কি এখনই, মানে আমাদের এই বিয়ের উৎসবটি শুভভাবে উদ্‌যাপিত না হওয়ার আগেতেই—হ্যাঁ, হ্যাঁ, লক্ষ্মীটি সত্যি ক'রে বলবে না—এখনকার মুহূর্তগুলোতে তোমার যুবকত্ব কি তা চায় না? এই, বল সৌমিত্র। তোমাতে-আমাতে ত' কোন লুকোচুরি নেই। তবে বলতে বাধা কিসের বল?"

অসম দাবী— কাব্য-বিবেকের পশরায় এঁকে সাজিয়েছেন পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিতা. শ্রীরাধার-—এই মানস-মুখর দেহময়তাকে। কেন সৌমিত্র, মেয়ে বলে আর লাজবতী এক যুবতী বলে কি এ সব কথা মুখ ফুটে বলতে পারি না আমরা? ঠিকই পারি। তাই এর একটি নিদর্শন তোমায় দিতে চাই। কবি গোবিন্দদাস ছিলেন ও যুগের কবি হিসাবে ভাষা ও ছন্দের যাদুকর। তাঁর একটি কবিতার দুটি চরণ থেকে শোনালে পর বুঝবে, যে, শ্রীরাধার করা অমন দুষ্টুমির লাজহরা রূপখানাই হ'ল—যুবতী প্রিয়াদের মানসগত এক মধুরতম বৈশিষ্ট্য। কবির বর্ণনায় শ্রীরাধাকে দেখছি—

ফুলের গেরুয়া ধরয়ে লুফিয়া
সঘনে দেখায় পাশ।
উঁচু কুঁচযুগে বসন ঘুচে—
মুচকি মুচকি হাস।'

—বলি, এই সৌমিত্র, তোমার লজ্জা করছে নিশ্চয়, না? দ্যুৎ আবৃত্তি করলাম আমি, মানে যুবতীত্বে এক লাজবতী! আর শুনলে তুমি, মানে দুষ্টুমিতে সুযোগ পেলেই নিলাজক হতে চাওয়া—একজন যুবক! কি গো, তাই না? কিন্তু জান ত'—রচয়িতা অবশ্য নারী নন। স্রষ্টা এখানে পুরুষ।—বাব্বা, তোমরা মানে ছেলেরা যৌবনের নিখুঁত দোসর হয়ে কি সাংঘাতিক রকমেতেই না সৃজনশীলতার উৎসস্থল হ'য়ে দেখা দেও! ভাবতেও বড় বিস্ময় লাগে। দ্যুৎ। বড় নিলাজক তোমাদের যৌবন কালের ঐ আবদারের চাহিদা! সত্যি বলছি, দ্যুৎ। তোমরা আমাদের ঐ তোমাদেরই সৃষ্টি কাজের বিরাট ভাগখানা চাপিয়ে দেওয়াও—শেষ করারই জন্য। সম্পূর্ণতে রূপবৃতি ফোটাবার জন্য। একবারে ক্ষ্যান্ত হলে সত্যি ভালো। কিন্তু যখন ছোট-বড় সময়ের ব্যবধানে—বারে বারে আমাদেরই যৌবনের lone splendour গুলোর মধ্যে দিয়ে তৈরী করাতে চাও— তোমাদেরই সৃজনশীলতার নামধেয় ফার্টিলিটিটিকে—দেহী প্রিয়াদেরই Virgin Soil Upturned করে করে—হ্যাঁ, তখন এই তোমাদের যুবকত্বের দুর্দমতায় ঝড় হয়ে থাকা দুরন্ত অভিসারগুলো দেখে দেখে—আমাদের খালি মনে হয়— তোমাদের এই যৌবনকালটা তোমাদের মস্ত কবি করায়। স্রষ্টা করায়। হ্যাঁ,—করায় এক বা ততোধিক কুমারসম্ভবের কবি। মায় আর কি—বহুপ্রসূ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সৌমিত্র, এ কাজ করার মধ্যে দিয়ে তুমি আরেক ধারার স্রষ্টা হিসাবে কি হোতে পার না—মিখাইল শলোকখ্! হয় ত তাঁর থেকেও বড় স্রষ্টা! কেন না শলোকখ্ ত একটা সৃষ্টির নামরকরণ করেছেন এইভাবে। হ্যাঁ, আর

তোমাদের সৃষ্টি-সুখের উল্লাস আমাদেরই ভার্জিন সয়েলকে প্রথমবার আপটার্নড্ ক'রেও—আরো বার কয়েক ধরে করাতে পারো না কি সে ধারারই মতো—আপটার্নড্? জান, জান সৌমিত্র, আজ তোমার বুকের তাপঝরা সমুদ্রেরই আরামের মধ্যে নিজেকে সঁপে দিয়ে অসম এক পাগলামিতে উঠেছি মেতে। হ্যাঁ, তাই প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে কথালাপ নিয়ে করে বেড়াচ্ছি—ছয়লাপ। এই, এই, বলি এ প্রসঙ্গে শলোকফের নাম জড়ালাম বলে বুঝি তোমার ভালো লাগলো না, না? কিন্তু কি জান, আজ এই সন্ধ্যারাগ ভরা আকাশের নীচে বসে থেকে—যেমন তোমাকে আমার অনেক কথাই জানালাম— তেমনি আজ শলোকখের কথা যখন আচমকায় তুলে ফেলেছি, তখন ঐ মহান কথাশিল্পীর ব্যাপারে একটা ভালো না লাগা অতি ব্যক্তিক কথা বলতে চাই। তোমার যেমন হ্যাঁ, আমারও তেমনি অতি প্রিয় রুশী লেখক হ'লেন— বোরিস্ পাস্তেরনাক। কাউন্ট টলস্টয়, ডস্টয়েভস্কি, গোর্কি, ডেকভ্ ও তুর্গেনেভের সঙ্গে আমি পাস্তেরনাককে রাখি এক সারিতে। অপর সারিতে অন্য রুশ লেখকদের মধ্যে কুপরিন, এনেরবুর্গ ও নবোকভের নাম করতে পারি। শোন সৌমিত্র, তুমিও ত' জান, যে:-বিদেশের সাহায্যে 'ডাঃ জিভাগো' প্রকাশের পর—তা নোবেল প্রাইজে বন্দিত হওয়ায়—বোরিস্ পাস্তেরনাক রাশিয়ার কাছে হিংসার ব্যাপার হয়ে ওঠেন। দেখ, আগেই একবার এইমাত্র বললাম না, যে, —কোন মহৎ লেকখকের দেশ বা জাত বলে —সত্যি নিজের কিছুই থাকে না। তিনি হন পৃথিবীশুদ্ধ সব দেশের। সব জাতির। অবশ্য হাল আমলের চীন ও পাকিস্থানের কথা বাদ দিচ্ছি। ওদের দু'দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি রাজনীতির ডামাডোলের নীচে যেন চাপা পড়ে গেছে। যাক্, ঐ ডাঃ জিভাগের পৃথিবী জুড়ে জয়-জয়ন্তীদেখে সত্যি মুস্কিলে পড়েছিলেন—শলোকখ্। কেন না, তুমি ত জান, যে শলোকখ্ একদিকে হলেন বর্তমান রাশিয়ার সব চাইতে বড় লেখক। ও সেই সঙ্গে হাতে যথেষ্ট সরকারী ক্ষমতা রাখার মতো—অধিকারী ব্যক্তিত্ব। অপরদিকে আজকের রুশী সাহিত্যের প্রায় বন্ধ্যা হওয়ার মতো সাহিত্যের ওপর—নানান ফর্মূলা ঘেরা সাহিত্য রচনার সরকারী বিধিনিষেধটি দেশময় প্রচারের ও পরিচালনার স্বত্বাধিকারীর পদে— শেষ পর্য্যন্ত রাশিয়া তিন দশক আগের 'And Quiet Flows the Dawn'-এর যুগন্ধর লেখকরূপী—এই মিখাইল শলোকখ্কেই বসান। আর আজও তিনি সেই আসনে বসে থেকে সরকারী কানুন বহির্ভূত সাহিত্য সৃষ্টির জন্য—শাস্তিবিধানের একচ্ছত্র কর্তা হোয়ে আছেন। জান সৌমিত্র, তোমারই মতো আমিও ব্যথা পাই এ ব্যাপারেতে—যখন দেখি creative originality র অধিকারী মহান

লেখকেরা—তাঁদেরই দেশের বাহাদুর সরকারের ততোধিক বাহাদুরী চাল চালা রাজনীতির—বাহক ও ধারক হন। অন্ধ প্রচারক হন। আমার আরো খারাপ লাগে এ জন্য, যে,—যে রাশিয়া দেশখানার তৎকালীন হালচাল অধ্যয়ন করে, ও আপন প্রতিভায় কাউন্ট টলস্টয়কে এবং মহা-মনীষী লেনিনকে পর্য্যন্ত মুগ্ধ করার অধিকারী— সেই স্বামী বিবেকানন্দ সোভিয়েত ইতিহাসের কালের চাকা পুরোপুরি ঘুরে যাওয়ার অনেক আগেতেই, যখন বলেছিলেন, যে Communism in the world, first will approach to Russia.—আর এই দেশখানায় পৌঁছুতে পেরে বিশ্বকবি মনে করেছিলেন, যে, এখানে আসায় তাঁর জীবন সত্যি সার্থক হ'ল। আমি তাই ভাবব সৌমিত্র, যে, সে দেশের সাহিত্যের ওপরে আজ কেন আরোপ ক'রে রাখা হয়েছে এহেন আইনের কড়াকড়ি! এর উত্তর চাই না এজন্য, যে, আমাদের এই বাঙালা দেশেতেই রাজনীতির মস্ত চালে বিভক্ত হয়ে পড়া—পশ্চিম খণ্ডেরই আধুনিক অনেক প্রখ্যাতনাম লেখকও ত সরকারের যাদুদণ্ডের ছোঁয়াচে কি হন নি—আপন আপন শৈল্পিক মানস গঠনার ব্যাপারে—দিশেহারা? পথহারা? তাই সৌমিত্র, তোমার রূপা আর খুঁজে বের করতে চায় না এ নিয়ে কোন বেশী কিছু উত্তর।—এ ব্যাপারে বলতে চাওয়ার শেষটুকুন হ'ল এই, যে, পাস্তেরনাক ডাঃ জিভাগো নিয়ে পৃথিবীখ্যাত হয়ে পড়ায়—শলোকখ্ তাঁর নিজের মহনা শিল্পীর ভূমিকাখানা ভুলে গিয়ে যেন—স্বখেদে বৃশ্চিক দংশনটি খেয়েছিলেন। মনে হয় এরই জন্য তিনি যেন খুব বেশী আক্ষেপ করে বলেছিলেন, —ভাগ্যিস আমার হাত ফস্‌কে ডাঃ জিভাগো রাশিয়ার বাইরে চলে গিয়েছিল! নয় ত' আমরা এই বইটিকে এদেশেও—কখনোই প্রকাশ করার ছাড়পত্র দিতাম না। আর যদিও বা দিতাম তা হলে বইটি প্রকাশ করার আগে—আমূল সংশোধন করিয়ে নিতাম। আর, তাতেও যদি আমার মনঃপুত না হোত তা হলে বারে বারে নির্দ্দেশ দিয়ে পছন্দ মতো ভাবে—কাট-ছাঁট করিয়ে নিতামই অবশ্য। দেখ সৌমিত্র, যাঁর মহৎ সৃষ্টি হিসাবে 'এ্যাণ্ড কোয়ায়েট ফ্লোস দি ডন'-এর সর্বত্র এক মস্ত উদারতার আর আন্তরিকতার ছড়াছড়ি রয়েছে—সেই শিল্পী শলোকখ্ যেন সাহিত্যিকোচিত উদারতা আর আন্তরিকতার—অভাব দেখিয়েছেন—পাস্তেরনাকের প্রতি। হ্যাঁ, পাস্তেরনাককে জানানো সব দেশের জ্ঞানী-গুণীমহলের অভিনন্দনাদিকে তুচ্ছ ও অবহেলা করেছেন—বল মিতা, তাই নয় কি? ঈষ্! আর তোমায় এত সব প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে ছুটে ছুটে চলার বার্তা জানিয়ে, এ ভাবে কেড়ে নেবো না এই মধুমাখা মুহূর্তেরই— সন্ধ্যারাগ নয়ে রিমঝিমানো ভালোবাসার আহ্বান। শোন,অন্য

মেয়েরা তাদের মনের খুশীয়াল ছেলেদের এমন নিরালার লুকানো কোণটিতে পেয়ে যখন শুধু nonsense talks নিয়ে ঝাল-মিষ্টি-নোনতায় টক-টকিয়ে ওঠে,—তখন ভাবি এই প্রেমরাগ ভরা শুধু কিছু সালতামামি ছাড়া কি আর কিছুটি বলার নেই?—লক্ষ্মীটি, তুমি ত জান এখানটাতেই ওদের সাথে আমার যুবতী স্বভাবের মিলখানা খুঁজে পাবে না। আমি হলাম আমি। যেহেতু তুমিও এসব শুনতে আর বলতে ভালোবাসো। শোন সৌমিত্র, তোমার আমার এই ভালোবাসা আজ শুভ বাগদানের মধ্যে হয়েছে দত্ত, হ্যাঁ, অপেক্ষায় তা আছে বিবাহের সপ্তপদ পরিক্রমায় নামার জন্য। বুঝলে আমাদের সেই জীবনের দু'ধারায়— যৌবনকে আবীর রঙেতে ফোটাতে ফোটাতে আমরা এক হাওয়ার মধ্যে মূল্য দিতে চেষ্টা কোরবো—জগতের সব কিছুকেই। হ্যাঁ, তাই ত' হবে আমাদের ভালোবাসার বিস্তৃতি। প্রশস্তি। দেখ সমাজগত, জীবনগত নানান প্রশ্নের বেড়াজালে তোমায় নিয়ে বাঁধা পড়েও—ভুলে যাবো না ভালোবাসার দীপশলাকা দিয়ে খুঁজে ফেরা সুখ নামী মহা দামী জিনিসটিকে।—হাঁ, যে সুখ সত্যিই দাম্পত্যযৌবনের পূর্ণতা এনে দেয়। ঘটায় বোঝাবুঝির মধ্যে পূর্ণ মিলন। হ্যাঁ, শুধু তোমারই সে দিনের সেই blessed বিবাহিত যৌবনের দরজায়—সুখ পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য বলবো আমারই যুবতী দেহ-মনের লাজবিধুর নয়— তেমনি কথাখানা। যদিও বলবো কবি-সম্রাটের বিখ্যাত কবিতাতেই—

'লও লও বেঁধে লও কেড়ে লও মোরে—
লও লজ্জা, লও বস্ত্র, লও আবরণ।
এ তরুণ তনুখানি লও চুরি করে—
আঁখি হতে লও ঘুম, ঘুমের স্বপন।

লাজ মুক্ত বাসমুক্ত দুটি নগ্ন প্রাণে
তোমাতে আমাতে হই অসীম সুন্দর।
এ কী দুরাশার স্বপ্ন হায় গো ঈশ্বর,
তোমা ছাড়া এ মিলন আছে কোনখানে।

—বুঝলে সৌমিত্র, সেদিন পৃথিবীর কোন বাধা, কোন বিপত্তি, কোন অভিশাপই—আমাদেরকে প্রণয়ের সবুজ জাজিম পাতা পথেতে আর বাধা দিয়ে করে রাখতে পারবে না—প্রতীক্ষিত। হতচকিত। পথহারা। যদি কখনো প্রতীক্ষা করতেই হয় তা হোলে সে প্রতীক্ষা হবে—এই মর্ত্যেরই বুকেতে পেতে চাওয়া স্বর্গের জন্য। স্বর্গীয় অনির্বচনীয়তার জন্য। আর তারই মধ্যে প্রত্যেকটি মহূর্তের

প্রীতক্ষা বাসর—চুমাচুমিতে সাজাবার জন্য কবিসম্রাটেরই ব্যালাড গাঁথা থেকে জানাবো। সৌমিত্র, তুমি আমায় নিয়ে যে অপরূপতায় ভালোবাসা সাজিয়ে তুলেছো, হ্যঁা, তারই বন্দনায় ঐ কাব্যসুরভি যেন জানাচ্ছে—

'দুইটি তরঙ্গ উঠি প্রেমের নিয়মে
ভাঙিয়া মিলিয়া যায় দুইটি অধরে।
ব্যাকুল বাসনা দুটি চাহে পরস্পরে
দেহের সীমায় আসি দু'জনের দেখা।
প্রেম লিখিতেছে গান কোমল আখরে
অধরেতে থরে থরে চুম্বনের লেখা।
দুখানি অধর হতে কুসুম-চয়ন,
মালিকা গাঁথিবে বুঝি ফিরে গিয়ে ঘরে।
দুটি অধরের এই মধুর মিলন
দুইটি হাসির রাঙা বাসর-শয়ন।

—কি গো, সৌমিত্র তাই ঠিক না? তবে আর একটা কথা আছে। এই নিয়ে ভালোবাসার আলপনায় আমাকে এলোমেলো এক লজ্জার মিতাক্ষরা ছন্দ করাতে করাতে— শেষ পর্য্যন্ত তুমি নিশ্চয় হবে না ক্লান্ত? হবে না কবিতার শেষ যতি? পূর্ণ ছেদ? তুমি নিশ্চয়ই আমার বুকের আসনখানায় বাঁধা পড়ে—নিজেকে কোন রকম বন্দী মনে করে শুধিয়োনা তাই লক্ষ্মীটি—

'দাও খুলে দাও, সখী, ওই বাহুপাশ—
চুম্বনমদিরা আর করায়ো না পান।
কুসুমের কারাগারে রুদ্ধ এ বাতাস
ছেড়ে দাও ছেড় দাও বদ্ধ এ পরান।
*   *   *   *   *
আমারে ঢেকেছে তব মুক্ত কেশপাশ,
তোমার মাঝারে আমি নাহি দেখি ত্রাণ
আকুল আঙ্গুলিগুলি করি কোলাকুলি
গাঁথিছে সর্বাঙ্গে মোর পরশের ফাঁদ।।'

—এই সৌমিত্র, আমি বেশ লাজহীনা হয়ে উঠছি—না?'

প্রিয়ার জানানো আবদার মতোই সৌমিত্র রূপার অধরের লাল পলাশময়তার দু'খানা তীর ছাপিয়ে এঁকে—দিল সঘন করা এক সিক্তশীতল ছোঁয়া। পলক' সরতে না সরতেই রূপাও পালটা জানালো নিজের করা আদর—লাল রঙ্ থেকে

রেঙে যাওয়া সৌমিত্রর দুষ্টু ঠোঁট দু'খানাতে। সোনালী সন্ধ্যায় ঝকমক করা প্রেমরাগে ঘেরা কাজল চোখের দিঠি ভরিয়ে দেখতে দেখতে—রূপা মুখোপাধ্যায় গুনগুনালো অন্নদাশঙ্কর রায়ের নতুনা রাধার ব্যালাডে—

"আমরা দু'জন রসিক সুজন　　সকল রসই ভালোবাসি।
এতই বৃহৎ নয় গো জগৎ　　গড়বে আড়াল দোঁহার মাঝে
সুদূর অদূর সমান মধুর　　বিয়ের বাঁশি নিত্য বাজে।
চোখের দেখা ভাগ্যে লেখা　　নেই বলে কি রইব একা?
আমরা দু'জন রসিক সুজন　　লিখব রসের লিকা যে।"

তারপরেই প্রিয়ার কাজল আঁকা চোখের মদিরেক্ষণ থাকা দৃষিটর ওপরেতে আদরের সিক্ততায় ভিজিয়ে দিতে দিতে—প্রিয়ারই হৃদয় আসনে ভরাট বর্ষার মতো—দু'ধারার বন্যার মতো যৌবনে উতাল উদ্ধতার মধ্যে নিজের বুকখানার তাপঝরাটিকে কঠিন বাঁধনেতে পথরুদ্ধ করিয়ে— সৌমিত্রও ঝলমলালো—কবিসম্রাটেরই সুর ঝঙ্কারের ছন্দময়তায় ঘেরা কথায়—ওগো রূপা। ওগো বাগদত্তা। আমারই দুষ্টু। হ্যাঁ শুধু তোমারই এই যুবতী রহস্যময়তায় ঝিলিমিলি খেলানো বুকখানার ওপরের যৌবন-উদ্ধত দুটি ছন্দে ছন্দে নাচানাচি করা—এই হৃদয় আসনটিতে যেন আমাকে অটুট করে বেঁধে রাখারই জন্য হ্যাঁ, তোমার ঐ—

কোমল দুখানি বাহু শরমে লতায়ে
বিকশিত স্তন দুটি আগুলিয়া রয়,
তারি মাঝখানে কি রে রয়েছে লুকায়ে
অতিশয় সযতন গোপন হৃদয়।
সেই নিরালায়, সেই কোমল আসনে,
দুইখানি স্নেহস্ফুট স্তনের ছায়ায়।
*　　*　　*
উদাস নিশ্বাসবায়ু বসন্তসন্ধ্যায়,
গোপনে চাঁদিনী রাতে দুটি অশ্রুকণা।
তারি মাঝে আমারে রাখিবে কি যতনে
হৃদয়ের সুমধুর স্বপন-শয়নে।।'

—কি গো রূপা, শোন, তোমার মুখের কথাটি না জানলেও আমি অনায়সে বলতে পারি—আমার মধুমিতা আমাকে রাখবে এমনি ভাবে তার হৃদয়েবই আসনে—পৃথিবীর সব রকম অসুন্দরতা আর মন্দ থেকে আড়াল করে করে। কি

বল, তাই না? আর ও ভাবে রেখে রেখে তুমিই ত' আমার যুবক দেহেতে হ্লাদিনীর শক্তিখানা যোগাবে—যা থেকে আমি বাইরের পৃথিবীর সব অসুন্দরকে করাতে পারবো—সুন্দর। আর সব মন্দকে—ভালো। আসল কথা তোমার প্রেরণায় আমি হোতে পারবো—সংগ্রামী। কেমন? তা রূপা, আমার দুষ্টুকা। তুমি অনায়াসে তা পারবে নিশ্চয়ই? তুমি যে যুবতী। এ শক্তি নারী হিসাবে যুবতীর মধ্যে থাকে অতি সুনিশ্চয়ে।" —কথা শেষ কোরে সৌমিত্র প্রিয়ার হাসি মুখেতে ঝলমল করা লাল চুনীর দিকে তাকালো—শুধু অপলকে। তাকিয়ে থেকে হ'লো খুশীয়াল। সেই সঙ্গে সঙ্গে আবেশিত। আর সুখী।

রূপা তখনি কথায় হোল বিভোরা। বলল আদর ঝরাতে ঝরাতে—হ্যাঁ। নিশ্চয়ই তা কোরবো। আর তা করাবোও। কিন্তু তা করতে করতে আমি যদি "কখনো ক্লান্তিতে হয়ে পড়ি নিদ্রিতা—তা হলে তুমি আমার যেই নিদ্রিতার চিত্র দেখে দেখে জানবে—আমার মৌনতা বিশ্বকবির প্রমূর্ত ভাবখানাই জানাচ্ছে—তোমার সংগ্রামী যৌবনের প্রতি প্রিয়া যুবতীরই প্রণয়ার্তি ভরা বন্দনায়—

এলাইয়া ছড়াইয়া গুচ্ছ কেশভার
বাহুতে মাথাটি রেখে রমণী ঘুমায়।
চারিদিকে পৃথিবীতে চিরজাগরণ
কে ওরে পাড়ালে ঘুম তারি মাঝখানে।
*   *   *
চিরদিন কাননের নীরব মর্মর,
লজ্জা চিরদিন আছে দাঁড়ায়ে সমুখে—
যেমনি ভাঙিবে ঘুম মরমে মরিয়া
বুকের বসনখানি তুলে দিবে বুকে।'

—সত্যি বলছি সৌমিত্র, যদি তোমাকে ভালোবাসার শক্তি-সঞ্চারণে সংগ্রামী কবাতে করাতে—আমি ঘুমের দেশেতে মহূর্তেকের জন্যও হয়ে পড়ি,—এক এলোমেলো ছবির মতো মৌন ব্যঞ্জনা,—তা হলে? সৌমিত্র তারপর থেকে এটা তোমারই কর্তব্য হবে আমায় পাহারা দেওয়ার মধ্যে দিয়ে— দেবে না হারিয়ে যেতে। অন্য কোন ভাব বা ভাবনার মায়াকারগারে প্রণয়ের লীলাময় সেই মিথুনবাসরেতে তুমি যখন আনন্দের শেষ স্বত্বায় পৌঁছে—রূপকথার রাজার ছেলেরই মতো পড়বে ঘুমিয়ে—তখন আমি জেগে থাকবো তোমারই সান্ত্রী হয়ে। —আর আমার ঘুম না এলেও—শেষ পর্য্যন্ত তোমারই তাপঝরা দেহময়তার লাজ কেড়ে নেওয়া আশ্রয়ে থাকতে থাকতে— তোমারই দুষ্টুপনার

দুরন্ত নদীতে সাঁতরে সাঁতরে—হয় ত' তারপর নিশ্চয়ই এক সময়—পড়বো ঘুমিয়ে। তখন, সৌমিত্র তুমি ঘুম থেকে না জেগেও আমায় পাহারা দিয়ে রেখো কিন্তু—তোমারই দেহের আদর করা সেই ঘন বেষ্টনীতে। কেমন? বিবাহের পর, সেদিন হয়ত—অনেক প্রলোভন অনেক সমস্যা আমাদের দাম্পত্য-যৌবনে বাধার সৃষ্টি করাতে পারে—ভয় দেখিয়ে। লোভ দেখিয়ে। আর্তি স্বার্থপরতা নিয়ে। হ্যাঁ, তখন জানবে সৌমিত্র, এই রূপাই হবে তোমার যথার্থ সাথী। প্রহরী। জান ত যে কোন যুবক— যে শক্তির ব্যবহারে ঘর ছেড়ে বাইরের পৃথিবীর হাজার সমস্যার সাথে যুঝে আসে প্রতিনিয়ত,—হ্যাঁ, যুবকদের এই শক্তি সঞ্চয়ের উৎস হ'য়ে থাকে—তাদেরই সুনন্দিতা যুবতীরা।--তুমি জানবে আমি সেদিন থাকবো এমনি ভাবে তোমারই জন্য সতর্ক।"

সত্যি বোধ হয় যুবতীস্বভাবের মধ্যে লীন থাকা এই শক্তির পূর্ব পরিচিতি দিতে চেয়ে--আজ এই ভালোবাসার নিভৃতিটির মধ্যে রূপা মুখোপাধ্যায়ের যুবতীকা যেন শেষ না হতে চাওয়া কথামালার কল্‌কাকলীতে নাচাতে নাচাতে চললো—নিজেরই জীবনের সাথে বিবাহের জন্য বাগদত্ত—একই বয়েসী এই সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে। হ্যাঁ, কথায় আর ব্যবহারে ওদের দু'জনার কেউই যে কমতি যায় না, তার কারণ—মিষ্টি রূপা তারই দুষ্টু এই সৌমিত্রের চাইতে বয়েসেতে—মাত্র দু'টি রাত ও দুটি দিনের মানে—আটচল্লিশটি প্রহরের ছোট।— সে কারণেই—রূপা লাজভরা কথায় লাজ অনুভব করার পরমুহূর্তেই—তা জানাতে পারে অকপটতায় আপন প্রিয়কে।

আর তাই কথা থামিয়ে রঙীন হাসি ছড়াতে ছড়াতে—নিজের অধরখানা সৌমিত্রর দুষ্টু-দুষ্টু অভিলাষেতে ছোপানো অধরের চুল মাত্র ব্যবধানে এনে রাখলো। আর তারপরেই সোনালী সাঁঝের মতো ঝলমলিয়ে বলল রূপা—
"এই?"

—"ভারী চালাকি না?—বুঝেছি। বুঝেছি তোমার দুষ্টুমিকে।"—বলতে বলতে সৌমিত্র স্ট্র্যাণ্ডের নিভৃতটিতে মুখর হয়ে রূপার ঠোঁট ভরিয়ে—এক আরাধিতা যুবতীর ছোট-খাটো দেহী লজ্জাময়তাকে কয়েকটি ছোঁয়ায় কেড়ে নিল নিজেরই জন্য।

এবার ঠিক হ'য়ে—আর চুমায় চুমায় প্রিয়ার অধরেতে আঁকা খুশীয়াল ছন্দ ধরে—সৌমিত্র কথা বলল—

—"জান রূপা, তোমাদের মেয়েদের দেহ উপছিয়ে উজান দিয়ে চলা যৌবনের ঘনঘটা— যে সমস্ত বাঁকে বাঁকে প্রকট লজ্জা-রেখায় সুষমায়িত ঝরনা

ফোটায়,—বুঝলে মিষ্টি, সে সবরেই প্রকাশ ত' হয়ে থাকে—আমাদেরই মতো ছেলেদের যৌবনকে খুশী করাতে। সুখী করাতে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। শুধু যুবকের দুচোখ ভরিয়ে দেখার মধ্যেই এসে যায় এ হেন সুখ। এই খুশী। এ নিয়ে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। তোমাদের রূপবতী যুবতীকায় ঘেরা যৌবন প্রখরতায় থাকে—মুঠো মুঠো রহস্য।—আর অনির্বচনীয়তা। এই রহস্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত শুধু চোখের দেখাতে যুবকের মন-মহলে করাতে পারেনা পাঠোদ্ধার—ততক্ষণ ওর যুবকত্ব থাকে ধাঁধার মধ্যে। না-জানা আর না-বোঝা মঞ্জুলার যুবতী দেহময়তা—তখন যুবকের ভুবনে হয়ে দাঁড়ায় গোলকধাঁধা। Labyrinth. আর এমন ধাঁধা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সে যুবক আন্তরিক ভাবে তখন চায়—ওরই চেনা যুবতীটির দেহমঞ্জিলের রহস্য-ময়তাকে জানতে। শুধু জানা নয়। ও চায় উন্মোচনে দেহী-দেবিকা হওয়া যুবতীকাখানা দেখতে। দেখে দেখে মুহূর্তকের সুজনতায় চালিত হয়ে ঐ যুবক তখন আপন লাজবতীর অতি পবিত্র দেহীবঙ্কিমাকে—নিজের হাতের কাঁপন ভরা শীতলতায় পরশ করার মধ্যে—পেতে যায় যৌবনেরই আরাধিতা প্রিয়ার একান্ত কাছ থেকে পাওয়া মস্ত এক অননুভবনীয়তায় রণিত, ও শিরায় শিরায় ঝঙ্কৃত স্বাক্ষরটি। জান রূপা, এই আপাত ছোট-খাটো অথচ যুবকের ভুবনে মস্ত বড় অনুভূতির পশরাটি সাজিয়ে তোলার অভিলাষখানা—তাকে বড় বেশী দুষ্টু ক'রে তোলায় সময়ের কোন এক নিভৃতে। আবার সময়ান্তরে করায় দুরন্ত ঝড়। জান রূপা, তাই ভাবি তোমাদের রূপ-ঝরনা ফোটানো যুবতীকা সম্পর্কে। আমাদের মতো যুবকদের চোখের আর্তিতে যে উর্মি আহ্বান জাগে, সে সম্পর্কে জর্জ বানার্ড শ' যথার্থ বক্তব্য রেখে গেছেন। শ'—অতি সুন্দর ক'রে গুছিয়ে তাঁর নিজস্ব স্টাইলের বুদ্ধি-দীপ্ততায় বলেছেন, যে, 'It is one of the mysterious ways of Allah to make women troublesome when he makes them beautiful' সত্যি রূপা, তোমাদের এই অসম রূপ-সুষমায় যুবকদের মনের চোখ ঝলসে দেওয়ার জন্য যদি কোন অভিযোগ করার থাকে, তা হলে—বার্নার্ড শ'র এই বুদ্ধিদীপ্ততায় ঝকঝক করা কথা ছাড়া—আর কিছুটি জানানোর নেই। আর তোমাদের সম্পর্কে আমাদের এই লাজহর অভিলাষে মাতার আগে নিজেদের মদির করা দু'খানা চোখের যুবকত্বে নাচা দুষ্ট-দুষ্টু চাহনি বিস্তার রেখে— তোমাদেরই দেহী রূপ-ঝরনার অতলান্ত লাজ-রেখার পরিপাটি শিল্পসম্ভারকে দেখে ফেলি, বা দেখে থাকি,—বুঝলে রূপা, তুমি জানবে সে ব্যাপারে কোন অশালীনতার ছাপ থাকতে পারে না। কণামাত্র নয় এটা অশোভন। মনীষী-প্রবর—র‍্যালফ্ ওয়াল্ডো

ইমারসনের কথা তাই মনে পড়লো। ঐ মনীষীর কোন কবিতার দু'খানা লাইনে আছে—

If eyes were made for seeing,
Then Beauty is its own excuse for being.'

ও কথা শুনতে শুনতে—ইমারসনের কথা শেষ হতেই রূপা তার হাত চাপা দিয়ে সৌমিত্রর মুখ বন্ধ কোরল। ঝকমক করা হাসির নাচন অধরেতে দুলিয়ে নিয়ে রূপা জানালো আবেশিত গলায়—

—"এই সৌমিত্র, তোমার কাছ থেকে শোনা শ' আর ইমারসন এ দু'জনার কথা হল সত্যি খাঁটি সূক্তি-সমুচ্চয়। এই দুষ্টু, এই কথার মধ্যে দিয়ে তুমি নিজেও ধরা দিলে দেখছি। বাব্বা। তুমি যা দুষ্টু ছেলে! ভয় হয় তাই কখন না জানি তুমি এক নিভৃতের আড়ালে আমাকে বন্দিনী করে সত্যি আবদার করবে দেখবার জন্য—আমারই দেহময়তা থেকে হ্যাঁ, তোমারই করা যুবকত্বসম্পর্কিত ব্যাখ্যানুযায়ী—আমি যুবতীটির সাজ-প্রসাধনে লুকিয়ে রাখা লাজময়তাকে! ঈষ্! একবার চেয়েই দেখনা, পরে তা দেখতে পার কি না পার? সাবধান থেকো কিন্তু! আরও সব দুষ্টু বুদ্ধি এখনই মাথায় এঁটো না কিন্তু। লক্ষ্মীটি, এখন থেকে এ সব দুস্টুমিপনার সফলতা অর্জনটি—জমা থাকুক, কি বল?—অন্তত যতদিন না আমি জড়িত পদে, কম্প্রবক্ষে শুভ বিবাহের মধ্যে তোমায় না পাচ্ছি। আর বিবাহের পর আমাদের লাজ-বিছানার দাম্পত্যবাসরে— তোমারই দুরন্ত যৌবনের মধ্যে স'পে দিতে চাওয়া লাজাঞ্জলির মুহূর্তে—হ্যাঁ সৌমিত্র, তুমি তখন তা পেতে যা চাইবে, পাবে তা ঠিক তখনি।"

প্রিয়ার গালে আঙুল জড়ো করে আদর ভরা মৃদু আঘাত দিয়ে সৌমিত্র বলল—বাঃ মেয়ে, বলি এত আধুনিকা হয়েও এ ব্যাপারে তুমি দেখছি বেশ কন্‌সারভেটিভ্! মডেস্টিকে খুব ভালোবাসো দেখছি। কিন্তু তবু যদি জোর করি এই দাবিতে, যে, অচিরে ত আমাদের বিবাহ সমাধা হতে চলেছে, হ্যাঁ, তুমি নিজেই ত' বলেছো সেদিন আমাকে তোমার দেহময়তার মায়াকারাগারে প্রবেশ করার অধিকার দেবে—আমরই স্বামীত্বের অধিকারকে অভিষিক্ত করাতে। আমি বাগদত্তের দাবিতে তাই যদি চাই— সে ধারার অভিষেকে আময় বিবাহের আগেই গ্রহণ করাও, বলি, তা কি অশোভন হবে? তা কি তোমারই মতো যুক্তিবাদিনী আধুনিকতারও অপছন্দের কারণ?"

—"হ্যাঁ-হ্যাঁ, সৌমিত্র। তবে কি যান— তোমার মতো কে মস্ত আদর্শবাদী ছেলেটিও যখন তার যৌবনের মঞ্জিলে দাঁড়িয়ে, এমনি এক দাবি করে ফেলতে

পারে,—আর সত্যি এমনি দোলা জাগানো ভাবনায় যখন এতটা আকুলতা, আর প্রশ্নের পিঠেতে প্রশ্ন নিয়ে দেখা দিচ্ছ—তখন আমারই ভালোবাসার এই তোমার মতো মধুরের করা এই অভিলাষটিকে কি করে মুখ ফুটে বলি—অশোভন? আর তা আমারই অপছন্দ যে, তা কি করে বলি,—বল?"

ক্রমশঃ সন্ধ্যার স্বর্ণাভা ছড়ানো আলো রাতর ঘনায়মান প্রথম যামের দিকে পাড়ি দিচ্ছে। স্ট্র্যাণ্ডের পাশের রাস্তায় লোক চলাচল বিরল হচ্ছে। আর কেউ হেঁটে গেলেও—রাস্তা থেকে চওড়া ফুটপাথ এবং তার শেষ প্রান্তে ফেন্সিং-এর ধারটি ঘেঁষে কংক্রীটের বেঞ্চে —অতি নিলাজক ঘনিষ্ঠতায় নিজেদের সঁপে দিয়ে ছোট-খাটো দু'একটা লাজহীন দুষ্টুমি করে বললেও—তা দেখে ফেলার কোন সুযোগ হচ্ছে না, যতক্ষণ না এদিক পানে ছুটে আসার সময় কোন গাড়ীর দপ্ দপ্ করে জ্বালাতে থাকা— হেড লাইটের আলো পথখানাকে আলোময় করে দেখাতে পারে।

হ্যাঁ— তেমনি এক নির্ভয়তা ভরা এই সন্ধ্যার নিভৃতিতে রূপা তার প্রিয়তমর এমন সব কথায় সত্যি মুহূর্তকের জন্য বিচলিত না হয়ে— দারুণভাবে নিজের আলিঙ্গন আরো কঠিন করাতে করাতে সৌমিত্রর রাঙা হয়ে ওঠা অধরেতে—এক বিলম্বিত লয়ের সিক্ত অপলনায় আদর করালো— বেশ কয়েকটি পলক ধরে তারপর প্রিয়তমর থেকে নিজের অধর আলাদা করে নিয়ে ছোট এক জিজ্ঞাসার অভঙ্গুরতা তুলে— সৌমিত্রর দুস্টুমিতে অভিলাষিত কথার প্রসঙ্গেই জানালো—

—"এই সৌমিত্র, বলি কি জান, আমাতে-তোমাতে এই বিবাহ পূর্ব এক আধদিনের জন্য করা প্রণয়াভিসারেতে যে সব মধুর করা, আর সুন্দর করা— আদর ও আবদার নিয়ে দুষ্টুমি করেছি, বা এইমাত্রও করলাম,—বা আরো অনেকবারই হয়ত করবো—হ্যাঁ, এ সবের ব্যাপারে আমি বলতে চাই, যে—শুধু চুমাচুমির যৌবনিক দুষ্টুপনায় যা তুমি আমায় দেওয়ালে, আর আমি তোমায় পাওয়ালাম,—হ্যাঁ, তাই লক্ষ্মীটি, আমার একান্ত মিনতি থাকছে তোমার প্রতি এই নিয়ে, যে, এর চেয়ে বেশী কিছু গভীর সম্পর্ক করার জন্য—আমি চাই না আমাদের আদর করার দুরন্ত স্বভাবটি এগিয়ে যাক্। তোমার কাছেতে বিবাহবাসর পর্য্যন্ত যতক্ষণ না আমাদের জন্য তৈরী করা লাজবিছানায় মিথুনের অধিকারটি পাচ্ছি,—ততক্ষণ আমাকে থাকতে দেও একেবারে নতুন। কি গো, তুমি ঠিকই তো থাকতে দেবে, কেমন? হ্যাঁ মধুর, আমায় আনকোরা সুন্দর করেই রাখো নতুনের মধ্যে। এখনই জানতে চেয়ো না ভুল কোরে—তোমারই প্রিয়ার অজানা

দেহময়তাকে। অচেনা যৌবনময়তাকে। তাই অহেতুকী হয়ো না লাজবিধুর। ওগো সুন্দর, এই ঝলকানো ইচ্ছাতে চালিত হয়ে হঠাৎ আপন মধুমিতার সুরার মতো মাদকতা লাগানো ছবি হওয়া অবয়বখানাকে—লজ্জার বাঁধন ধরা পত্রপত্রালীর আবরণ সত্যি উন্মোচন করাতে চয়ে তোমার যুবকত্বকে কাঁপিয়ে তুলো না। তোমার রূপা, হ্যাঁ তোমারই এই প্রিয়া— তেমাার তাপঝরা যৌবনাকারের কাছ থেকে এমনটাই পাওয়ার জন্য প্রত্যাশা করে। তাই জানালাম এই বহুত মিনতিটি। ওগো সুন্দর, ওগো প্রিয়ারই আর্তিতে পূজিত মাধব, তুমি ত জান এই রূপার দেহময়তা আর মন্ময়তা—অচিরে তোমারই যৌবনের কাছে তিলতুলসী অর্ঘ্যের মধ্যে হবে—পুরোপুরি একাকার। তখন, হ্যাঁ, তখন সব কিছু পেয়ে আর জেনে যদি—সব কিছু জানার আর পাওয়ারই দরুণ তোমার মনে এই রূপা নাম্নী আমি যদি পুরনো হয়ে যাই, তা হলে তখন তুমি কি সেই পুরানো হয়ে পড়া আমায় নিয়ে—পারবে এমন করে আগেকার মতো দুরন্ত হয়ে, আর দুর্বারতা নিয়ে—আমারই যুবতীকায় লুকানো বৈচিত্র্যকে খুঁজে খুঁজে পাওয়ার,—আর চাওয়ার ভালোবাসায় মাতামাতি ক'রতে?"

কথা থামাচ্ছিল রূপা নিজেই। কিন্তু থামার রেশ শেষ হতে না হতেই—সৌমিত্রর অধরের দস্যুতা দুর্বার হয়ে বেশ গভীর ভাবে লুটিয়ে পড়ে আদর মাখাতে লাগলো—প্রিয়ার এমন ধারার প্রশ্ন নিয়ে—ভাবী ভয়ের কথায় নামতে দেখে। আদর করার দস্যুতা যেন এ মুহূর্তে বড় দুরন্ত হয়ে উঠেছে সৌমিত্রর মধ্যে।

—"এই, এই? ধ্যাৎ, ও কি হচ্ছে। এই, লাগছে বড়। কি যে না তুমি! ছাড়ো। ভালো লাগছে না। এইবারটি থামো সৌমিত্র। লাগছে সত্যি।"

ভালো ক'রে অবশ্য কথা বলতে পারলো না রূপা। কেন না ওর লাল লাল অধরখানার ঝকমক করা চুনীর হাসিময়তাকে—প্রায় ঢেকে রাখছিল--প্রণয়েতে দুর্বার সৌমিত্রর মুখেরই দুরন্ত আদরের ঝড়।

তারই মধ্যে আপন যুবতীকার কানুন ধরে এই অবস্থার খোলা পরিবেশের নিশ্চিন্ত নিভৃতির মধ্যে—এমন ভাবে প্রিয়াকে নিলাজ-দুষ্টু হোয়ে চলতে দেখায়— শেষ পর্য্যন্ত রূপা—চুমার অসম সুখ-নির্ঝরে খুশীয়ালিনী হয়ে ওঠার পরিচিতি স্বরূপ—উঠলো ঝরঝর করা কান্নার মধ্যে—বেপমানা হয়ে। আর তখনি প্রিয়তমর অধরালিঙ্গনের তন্ময় দস্যুময়তা শান্ত হতেই মুহূর্তের মধ্যে প্রিয়া রূপা আরেকবার যুবতীকার রহস্যময়তা দেখালো—তখনি কান্নার ঝরঝরানি থামিয়ে—একেবারে স্বাভাবিকা হয়ে উঠল। হাত দিয়ে তখনি মুছে নিল রূপা

তার দু'চোখের কিনারায় আঁকা কাজলেররেখা ধরে—চিকচিক করার—বিন্দু বিন্দু জলকণা। তারপরেই নিজে স্থির হ'ল। আবার অস্থিরও হল। প্রিয়রও হয়ে ওঠা শান্তময়তার প্রতি তাকিয়ে তাকিয়ে—হতে চাইলো বিদ্যুতের মত চমকময়। থির বিজুরিক। নিজের গোরোচনা শরীরময় ফুটিয়ে তুললো থির ও অথির—দু'ধারারই মিল ধরা—বিজুরি। তারপর প্রিয়র কাঁধেতে আগের মতো ক'রেই তৃপ্ততার দীপ্তি ভরা মাথা আরাম থেকে ন্যস্ত রেখে—রূপা কাটা কাটা ভাবে বলতে লাগলো—কাকলী ঘেরা কথাগুলো।

—"এই, অনেক কিছুই ত' করা হ'ল। বলাহ'ল। আর অনেক প্রসঙ্গের কথারই ত করা হল অবতারণা। তা বলি কি এইবারটি আমায় আমারই অবতারণা করা সেই ডি. এইচ. লরেন্সের প্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে— শেষ না হওয়াটাকে তোমায় জানিয়ে শেষ করতে দেও লক্ষ্মীটি, কেমন? কি, দেবে না?"

প্রিয়ার কপোলেতে আবেশ থেকে নিজের মুখের একটি পাশ ঘষতে ঘষতে বললো সৌমিত্র—এই, আমি কি না করেছি? তুমিই ত কথায় কথায় অন্য কথা নিয়েই—বার বার অন্য ধারে মোড় ঘুরে গেছো। এবার যাতে আর মোড় ঘুরতে না হয়—তারই ব্যবস্থা করে কথায় ওঠো ঝলমলিয়ে। ছন্দেতে। যতিতে। এই,বল, এবার কি বলতে চাও।"

প্রিয় দয়িতের কাঁধ থেকে তুলে—মুখোমুখি হয়ে সুন্দরী এক মনোলোভার চাহনিতে সৌমিত্রর সুন্দর মুখখানার মধুর ভাবটিকে করালো যেন আবরিত। আকর্ষিত। তারপর কয়েকটি পলক পার হয়ে এসে রূপা রিমঝিমিয়ে বলল—

—"আচ্ছা সৌমিত্র, লরেন্স যে তাঁর সাহিত্যিক সৃষ্টিকলার বহু বহু জায়গায় প্রণয়ের লিপিকা আঁকতে বসে—অতি খোলাখুলি হলেও ভাষায় শৈল্পিকতায় সাজানো—ভাবের মিথুনবিলাসে অবগাহন করা যুবক-যুবতীদের —যে কম্যুনিয়ন অফ দি হোলি সেক্সে'র বর্ণনা দিয়েছেন,—এবং তা দিতে বসে সময় সময় যে ভাবে তাঁর আঁকা শ্রীমতীদের—ফুল রোবেড্ অবস্থা থেকে—ধীরে ধীরে—যুবকের চোখে রূপতৃষ্ণা ধাঁধাবার জন্য করিয়ে গেছেন পুরোপুরি—ডিস্রোবেড্—তা খুবই আর্টিষ্টিক ভাষা ও ভালোবাসারই ঔদ্ধত্য ঘেরা বিহেভিয়ারিজমে out and out natural করে বর্ণিত করা হ'লেও—আমার মনে প্রশ্ন দেখা দেয় একটি কারণে, যে লরেন্স তাঁর বিবাহিত জীবনে সত্যি এতটা আভিজাত্যময় ঔদ্ধত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কি? না হলেও এটুকু জানি যে, তিনি ছিলেন খুবই বৈচিত্র্যপ্রেমী! কিন্তু ওর স্ত্রী—শ্রীমতী ফ্রাইডা লরেন্স—তিনি কি স্ত্রী হয়ে এ সব বর্ণনায় ফোটা সাহিত্যিক নির্যাসটিকে সত্যি পুরোপুরি গ্রহণ

করতে পেরেছিলেন? তাই স্ত্রী শ্রীমতী ফ্রাইডাকে লেখা—ডেভিডের চিঠিপত্র থেকে জানতে পারলাম, যে, স্ত্রী হিসাবে তিনি এ সব ব্যাপারে স্বামীকে নানানভাবে পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা দিতেন। আর তাই একজন স্ত্রী-শ্রীমতীর পূর্ণ সাহচর্য্য লরেন্সের জীবনে ছিল বলেই—তিনি এমন সব erotic বর্ণনার সাহিত্যিক ব্যঞ্জনা দিতে পেরেছেন। আমার ত তাই বিশ্বাস দেখ, এই যে আমার কোলে রাখা লরেন্সের Love Among the Haystachks এর একটি গল্প থেকে আমি পড়ে শোনাতে চাই অংশ বিশেষ। তোমার পড়া থাকলেও আশা করি লাইন বাই লাইন মনে নেই নিশ্চয়। বইটিতে একদা বা Once নামে যে গল্পটি আছে, আমার মতে তা শিল্পীর লেখা একটি নিখুঁত সৃষ্টির। গল্পটিতে ও দেশের সামাজিকতার ঘেরা প্রেম-প্রণয় সম্পর্কে সত্যাসত্য জানার সেই লরেন্সীয় শিল্পদর্শন এই গল্পের মধ্যেও আপন বৈশিষ্ট্য রেখেছে। তুমি ত জান—অনীতা (Anita) নাম্নী ঐ রূপবতী উঁচু সমাজের কে পদস্থ সেনানীর বিবহিতা স্ত্রী হিসাবে—নানান এ্যারিস্টোক্রেসীর টানাপোড়ায় বৈভবের মধ্যে থেকেও—মধুর ভালোবাসার কণামাত্র স্বাদ পায়নি। কিছুই পায় নি তার যুবতী দেহ-মন। ঐ অনীতার ভীষণ দর্শন ও সেই সঙ্গে দূর্ধর্ষ স্বভাবের স্বামী—চেয়েছিল শুধু দেহের খিদে মেটাতে। আর কিছুটি নয়। জান ত'—জানা নেই, শোনা নেই এমন একটি বদ-মেজাজীর পুরুষোকারের সাথে একটি নারীর বিবাহ হঠাৎ হলেই যে, ফল্গু নদীর মত দু-কূল ছাপিয়ে ভালোবাসার বন্যা ভেসে যাবে—তার ত কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। তুমি ত সৌমিত্র ভালো করেই জান যে, আমাদের নীতি দিয়ে গড়া বিবাহিতা জীবনের যৌবনগুলোও ত সব ক্ষেত্রে হয় না সফল—প্রণয়ের মধ্যে পারস্পরিক না বোঝাবুঝির আদানে।প্রদানে। বাইরের লোকের চোখেতে—বহু বহু দম্পতি—সুখী সেজে থাকার অভিনয় দিয়ে তৃপ্তি লাগায় সত্যি। কিন্তু নিজেদের মধ্যে শতকরা পঁচানববই জনই নানান কারণে খুঁজে পায় না—সুখের চাবিকাঠিটি। যা পায়, আর পেয়ে বর্তে যায় সত্যিকারের ভালবাসা পেলাম মনে করে—তা কিন্তু সত্যি বিন্দু পরিমাণ ভালোবাসাও নয়! তা হল শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত—স্থূল সেক্সের ছড়াছড়ি। বিয়ে করে ভালোবাসা গড়ার আর সুযোগ না দিয়ে—অচিরে ভালোবাসাকে তা নির্মূল করায়। অতি পারঙ্গমের মতো সেই—সেক্স কম্যুনিয়নকে—যেন-তেন-প্রকারণে পছন্দ করার পর—এটাকেই ত দেখেছি—তারা ভালোবাসা মনে করে থাকে। জান ত এনজন্যই বলতে পারি, বিয়ে করলাম—অথচ ভালোবাসা কি তা জানতে চাই না— তেমন দম্পতিদের মধ্যে, যুবতী স্ত্রীরাই ত বেশী ফাঁকিতে পড়ে যায়। আর যিনি স্বামী—তিনিও তখন

দেবত্ব থেকে ভ্রষ্ট হয়ে—প্রিয়া স্ত্রীর দেহ-মনের ঐ মস্ত ফারাকটিকে বোঝাবার জন্য—সত্যি আইনানুযায়ী সৃষ্টি সুখের উল্লাসে, নাচতে নাচতে যেন মেতে ওঠে— সেক্সেরই খেলাতে। তাই ভাবি সৌমিত্র, মানুষের রঙীন সাজঘরখানা বিবাহের রামধনু ফুটিয়ে দাম্পাত্য বাসরের মন্ত্রোচ্চারণায় পেতে চাওয়া mutual understanding- কেগ্রহণ না করায় অসুখী হোলেও ওরা সমাজের আয়নায় তার প্রতিফলনটি দেখলে পর,—আমাদের কানুন বাঁধা সমাজ—তাতে অখুশী হয় না দেখেছি। তা নিয়ে ভাবাভাবি ত' দূরের কথা। কিন্তু, ওদেশের সমাজব্যস্থা এমন কিছু নিয়ে ন্যায় অন্যাহয়র বিচারেতে মাততে—খুবই ভালোবাসে। শিল্পী-সাহিত্যিক সমাজতাত্বিকেরা—তা নিয়ে লেখালেখিতে নেমেও পড়েন। তাই বলবো—ভিক্টোরীয়ান নীতিবাগীশদের ছুঁইছুঁই করা সমাজখানা হটে যাওয়ার সময়েতে—এই লরেন্স প্রমুখ কথাকারেরা তারই শিল্পায়ন করে গেছেন। হ্যাঁ সৌমিত্র, আমি বিশ্বাস করি—শুধু ভালোবাসা যেমন বিবাহের বাঁধন না পেলে হয় না সার্থক,—হ্যাঁ, তেমনি বিবাহও সার্থক না হয়ে স্বর্গ রচনার পালা থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে—ভালোবাসার অপ্রাপ্তিতে। এই Once গল্পের মধ্যে বিবাহিতা অনীতার চরিত্রটি সেই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিল। আর তা হয়েও নিজের যুবতী-ধর্মটিকে অসুখী রাখার মধ্যে শুধু কাঁদাতে না চেয়ে—এই বিরাট পৃথিবীরই অনাবিলতায় নেমে পড়ে খুঁজতে চেয়েছিল—এক সুন্দরদেহী যুবকের—তেমনি সুন্দর থাকা মনেরই দুরন্তপনায় ঘেরা ভালোবাসায়—মুক্তিস্নান করার জন্য। অনেক পরে অনীতা খুঁজে পেয়েছিল তেমনি একখানা ভালোবাসার—যৌবন-দুর্দম সাজঘর।—তারই স্কুলজীবনের পরিচিত মহলেরই সেদিন থেকে চেনা ও জানা—এক সমবয়েসী যুবকেরই—তাপঘেরা প্রণয়লোকেতে। এই? এই দুষ্টু? সৌমিত্র, তোমার ঐ ছোট্ট পকেট টর্চখানা একটু জ্বেলে রাখো না। ওরই ম্লান আলোতে আমি একটু পড়ে তোমায় শোনাতে চাই। জ্বালাও, কিছু সময়ের জন্য। ঈষ্। তুমি বড় লক্ষ্মী ছেলে। এই, ঠিকভাবে ধরে রাখো। নড়িয়ো না কিন্তু । আমি পড়ছি। সেই স্কুলজীবনের ছেলেটি— যে আজ ওরই মতো ভরা যৌবনের দীপ্ত এক যুবক— সেই তাকেই যখন শ্রীমতী অনীতা শেষ পর্য্যন্ত বরণ করলো প্রেমের জীয়নকাঠি পাবো মনে করে— সেই উত্তম পুরুষের জবানীতে লিখে চলা Once-এর নায়ক বলছে, শোন, 'When at last she accepted me as a lover, told me about it ....' The night I was married," she said, 'I lay counting the flowers on the wallpaper, how many on a string ; he bored me so" ... He was of good family, and of great

repute in the Army, being a worker, He had the tenacity of a bulldog, and rode like a centaur, These things look well from a distance but, to live with, they weary one beyond endurance. So Anita says....She had her first child just before she was twenty ; two years after-wards, another. Then no more. Her husband was somethng of a brute. He neglected her, though not outrageously, treated her as if she were a fine animal."

এই পর্য্যন্ত পড়ে—একটু বিরতি নিয়ে সুনন্দিতা যুবতী তার প্রিয়র অধরে—একটু অধরেরই করা আদর ঢেলে দিয়ে জানালো—

—"জান সৌমিত্র, ওদেশে কেন,—এই দেশেতেও আজ নানান জটিল অবস্থার সম্মুখীন হওয়া মানবিক প্রেমও হয়ে উঠেছে—তাই। আমি জানি, আমার অনেক বন্ধুরা তাদের অর্থবান, গুণবান মায় সুপ্রতিষ্ঠিত স্বামী নামধারী পুরুষদের কাছ থেকে পেয়েছে ভালোবাসার নামগন্ধহীন—এক ধরনেরই অতি আধুনিকতার মতোই—মুখোশ পড়া দেহবিলাস। অনলি দি হাজব্যাণ্ডস্ ডিজায়ার অফ্ ফুলফিলমেণ্ট ফর হিজ সেক্সুয়াল আর্জেস্! এ ছাড়া—নাথিং মোর। সময়ে সময়ে তারা নাকি এই জৈবিক খিদে নিয়ে হয়ে ওঠে—হিউম্যান বীস্ট। বন্ধুদেরই বিবাহিত জীবনের সূত্রপাতে—আমার কাছে অনেকেরই করা খোলাখুলি স্বীকারোক্তি থেকে এটাও বুঝেছি যে, অনেক স্বামী তার পুরুষোকারকে পাশবিকতার মাতলামিতে ফেলে—আপন আপন স্ত্রীকে প্রিয়া না ভেবে, আজও মনে করে থাকে ওদেরই যৌনসুখ মেটাবার জন্য এই স্ত্রীরা যেন—লরেন্সের সেই fine animal! দেখ সৌমিত্র, আমি আমার দেশেরই এক সুন্দর ও সুস্থ সমাজের কথায় বলতে পারি,—এই আধুনিক অনেক দম্পতিদেরই প্রণয়শূন্য জীবনযাপনের মধ্যে করা মাত্রাতিরিক্ত যৌনবিলাস—আপন আপন স্ত্রীর সবুজ যৌবনগুলোকে—যেমন প্রথমেই দেহময়তার দরজায় টেনে নিয়ে—ঐ দেহময়তারই শুধু নিছকতায় ধাঁধিয়ে রাখতে চায়— সেটা সমাজের দিক থেকে—কী নারীর মধুময় যৌবনকালের অনিন্দ্য ধারার প্রিয়ার ধর্মকে—ঠকায় না?—হ্যাঁ, তার চাইতে বড় ও নিষ্ঠুর ভাবে ঠকানো হয়ে থাকে না কি—ঐ ভাবে পুরুষ-স্বামীর আপন স্ত্রী যুবতীময়তার মঞ্জিলে কামনার এলোমেলো স্বভাবে ঘটানো যৌনময়তা নিয়ে—যখন দিব্যি চলতে চলতে হঠাৎই হোঁচৎ খেয়ে পড়ায়, মস্ত এক সমস্যার মতো— আর বিরাট এক শঙ্কার মতো মনে করে বসে স্বামীরই ইরোটিক মানসিকতা—এ কি ঝামেলা! চেয়েছিলাম ত' টাটকা যুবতী দেহখানা থেকে pleasure trip! আর কি না তারই কোন ফাঁক ধরে সঞ্চার ঘটে

গেছে স্ত্রীর মধ্যে—সন্তানের সম্ভাবনাটি! দ্যুৎ, এ ঠকা যেন পথ ভোলা এক—land slip। আধুনিকতায় শিক্ষিত ও কর্মক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত, মায় চেনামহলেতে থাকা শিষ্ট ও মার্জিত স্বভাবের ঐ স্বামী নামী একটি মস্ত অধিকার—হ্যাঁ, সত্যি তার সেই অধিকার যখন তারই এক লাজবতীর রূপঝরা মঞ্জিলকে আড়াল করা থেকে—উন্মোচনে টেনে করাতে চায়—শুধু এক নিছক দেহ-বিলাস,—তখন ঐ স্বামীর অধিকারখানা অপদেবতায় রূপান্তরিত হয়ে, করে বসে—পাশব আর অমার্জিত। জানতে পারে—তার স্ত্রী তারই না-চাওয়া কোন এক সন্তানের প্রীণ ফুটিয়ে হয়ে পড়েছে—ভাবী জননী! আমি বলি— যে সন্তানের জন্মের নিশানা পেয়ে তারই জনক আঁতকে ওঠে শঙ্কায়—আর স্বামীর পাশবিক বিলাসকে আপন দেহের ওপর ছেড়ে দেওয়ায়—হঠাৎই স্ত্রী যখন অশান্তি-অস্বস্তি-অসুখে থাকতে থাকতেই—সত্যি একদিন তারই মধ্যে সন্তানের প্রাণ হয়ে ওঠে অঙ্কুরিত,—হ্যাঁ, তার পরের কথাটা কি তা বলতে পার সৌমিত্র? আমি পারি বলতে।—তাই বলছি, তেমন অনাকাঙ্খিত সন্তান—তারই মা-বাবার সমাজ অনুমোদিত বিবাহের মধ্যে দিয়ে এলেও—তারই জন্মের প্রাক্-ভূমিতে যেন থেকে যায় ফাঁকি! আন্তরিকতার পুরোপুরি অভাব। ওর জন্ম যেন ঘটে যায়—থ্রু এ মিয়ার এ্যাকসিডেণ্ট, কজড্ বাই ম্যানস্ বডিলি এন্‌জয়মেন্ট ওভার হিজ ওয়াইফ্! বল, তাই নয় কি! আমার যুবতী মনে ব্যথা জাগে এই ব্যাপারে। আর দেখ, ও-ভাবে দেওয়া ওদেরই জন্মের ইতিহাস মানবিতাকে কি কলুষিত করাচ্ছে না? বল, এভাবে যদি বহু সন্তানের জন্মের ইতিহাস এগিয়েই চলতে থাকে—তাদেরই বিবাহিত মা-বাবার অধিকার থেকে, সৌমিত্র, তা হলে সত্যি অচিরে কোনদিন this type of human procreation will degrade and denounce our welfare of society and of humanity too! না-না, —ও সব কথা ভাবতে চাই না সৌমিত্র। ভাবলে বড় ভয় লাগে। আর আমারই মতো আজও বিবাহিতা নয় এমনই এক বাগদত্তার মুখে এসব কথা অন্যের ধারণায়—পছন্দসই নাও হ'তে পারে। আমাদেরই মেয়েদের মধ্যে ত' এ নিয়ে রকমফের আছে। ভাবলে তুমি বিস্মিত হবে। বন্ধুদের মধ্যে বিবাহিতা কেউ কেউ এমনও আছে,— যে তার স্বামীর কাছ থেকে কণামাত্র স্নিগ্ধ ও শুদ্ধশীল ভালোবাসা না পেয়েও—মনে খেদ রাখেনি এই নিয়ে। কারণ জিজ্ঞাসাকরলে অনায়াসে কনফেস্ করেছে এই বলে, যে, মনের তৃষ্ণা মেটার যখন কোনই পথ খুঁজে পেলাম না স্বামীর দুর্দম কামনার কাছে,—তখন ত শ্রেয়-প্রেয়র দ্বন্দ্ব ভুলে—এই দেহের একপেশে চাহিদা মেটানোর ব্যাপারে—অনিচ্ছা সত্ত্বেও—তাকে ইচ্ছারই

ব্যাপার করাতে হয়েছে! সত্যি ভাবি, এই যদি হয় আমাদের আজকের অনেক বধূদের জন্য—তথাকথিত শিক্ষিত মায় প্রতিষ্ঠিত সমাজেরই—প্রায় ওপর-ওপর দিয়ে ক'রে রাখা সাজানো গোছানো মানসিক ভ্রান্তি ও দুর্বলচিত্ততা,—তা হলে তাদেরই আইনানুমোদিত বিবাহ থেকে হঠাৎ না-চাওয়ার মধ্যে দিয়ে কোন না কোন সেক্স কম্যুনিয়ন সাঙ্গ করার ছিদ্রপথ ধরে— যে প্রাণকণা সৃষ্টির আলো স্পর্শ করারই জন্য হয় অঙ্কুরিত তারই প্রজায়িতার দেহে—হ্যাঁ, তা নিয়ে আমি যদি স্যার জেমস্ জীন্সের আধা-সত্য কথার সেই 'এ্যাডেজ'খানা মনে করাই—তা হ'লে কী ভুল কোরবো? না, ঠিকই কোরবো। "Life is a product by an accident" স্যার জেমস্ তাঁর প্রবন্ধবিশেষের প্রথমেই যা লিখেছেন—তা অবশ্য মা-বাবার আকাঙ্ক্ষিত ও সুন্দর ক'রে পরিকল্পিত সন্তানের জন্য প্রজায়ন করার ব্যাপারে মোটেই প্রযোজ্য নয়। তাই ইংরাজী—এপিক 'Savitri' ও মহাগ্রন্থ 'Life Divine'-এর ঋষি অরবিন্দ ঘোষ স্বাভাবিক বলেই বিদেশী মনীষীর ঐ বিশেষ বক্তব্যখানা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই গম্ভীরভাবে পাল্টা প্রশ্নের উত্থাপন করে বলে গেছেন, 'How far Sir James has come to understand that life is a product by an accident?"—একটু থেমে কি যেন ভেবে নিয়ে রূপা তারই রেশ ধরে বলতে লাগলো—

"তুমিও ত' জান সৌমিত্র, যে কলেজের প্রথম দিককার ইংরেজী সিলেবাসেতে থাকা স্যার জেম্সের 'দি ডাইং সান' পড়ে আমি তা মান্‌তে পারিনি—পুরোপুরি। কিন্তু বয়েস বাড়ার সাথে সাথে অনেক কিছুর না-জানা আর না-বোঝা ব্যাপারেতে চোখ খুলে যাওয়ায়—আজ সত্যি-সত্যি এই 'এ্যাডেজ'টিকে কৃত্রিম বিলাসেতে মাতা বর্তমান সমাজদর্পণেরই মধ্যে প্রতিফলিত দেখছি। আধুনিক অনেক বিবাহিত দম্পতিরই—Marriage by negotiation-ই হোক, বা marriage from love affair-ই হোক না কেন—বিবাহের পরে যে আসল ধারা—মোস্ট সিনসিয়ার ভালোবাসার কণামাত্র আদান-প্রদান না করার মধ্যেই—না চেয়েও হঠাৎই সৃষ্টি ক'রে ফেলা ওদের সন্তানকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার মহত্ব দিয়েও, বলতে পারি, যে,—তাদের এ হেন ধারার লুকোচুরির মধ্যে দিয়ে জন্মানোর ইতহাসটা হাজার মানবিক হয়েও কী নয়— A product by accident? হ্যাঁ, আর এই নিরিখটি থেকেই আমি মনে করি—স্যার জেমসের বক্তব্যটি শুধু এই অদ্ভুত মানসিক বে-ধারার অসুস্থতায় ঘেরা দম্পতিদের—হঠাৎ করে ফেলা সেই act of procreation-র ব্যাপারে—যথার্থই পুরোপরি রকমে প্রযোজ্য। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার মতে তা শতাংশে সত্য। জান

সৌমিত্র,—আজকের এমন অনেক অল্প বয়েসী দম্পতিদেরই অনিচ্ছায়, আর প্রণয়শূন্যতা থেকে হঠাৎই জন্ম দিয়ে ফেলা সন্তানাদির ব্যাপারে স্যার জেমস্ জীনস্ যেন ঠিকই লিখেছেন, 'Into such a universe we have stumbled, if not exactly by mistake, at least as the result of what may properly be described as an accident'.হ্যাঁ, এমন সব প্রজায়নকেই ত'—দুর্ঘটনা বলে!"

বলতে বলতে থামলো—বরকন্যা রূপা মুখোপাধ্যায়। কিন্তু যেই প্রিয় যুবকের লাল রঙেতে ঈষৎ ভাবে ছেপে যাওয়া অধরের ফাঁকেতে কথা উঁকি দিল,—তখনি দুষ্টুকার লাল অধরখানা দুষ্টুমি মাখিয়ে প্রিয়কে বলতে দিল না—কোন কথাটি!—প্রিয়র অধরে নিজের অধর দিয়ে বাধা দেওয়ার দুষ্টুমিতে।

—"না-না, সৌমিত্র, আজ অমার মন-প্রাণ উপছিয়ে বহু কথা উজাড় হয়ে এসেছে। আমায় বলে শেষ করতে দেও লক্ষ্মীটি। শোন, ওদেশের একজন ইন্‌টেলেক্‌চ্যুয়াল কথাশিল্পী ও আর একজন সমাজবাদী মনঃসমীক্ষকের দু'খানা প্রসিদ্ধ বইয়েতে আঁকা আছে অতি সুন্দর ক'রে—এই অদ্ভুত মানসিকতা থেকে বিবাহিত দম্পতিদেরই কথা।— যেখানে স্বামী-স্ত্রী দুষজনাই শিক্ষায় রুচিতে অর্থে উঁচু সমাজের হয়েও—আপন স্ত্রী-সুজনাদের প্রতি মিথুনের লোভী লগ্নগুলোতে—ভালোবাসাশূন্য অবস্থায় স্বামীদের যৌবনাকৃতি নিজের নিজের মস্ত অধিকারেরই—আইন পাশেতে কেড়ে রাখার মধ্যে-- যে ভাবে পশুর মতো 'beastly' ব্যবহার স্বেচ্ছায় করে থাকে, সত্যি তা পড়তে গেলে শিউরে উঠতে হয়। হ্যাঁ, তাই অমার মনে গাঁথা বর্ণনা ভরা কথার ভয়ঙ্করতা তোমায় জানাচ্ছি স্মৃতির স্মরণের মধ্যে দিয়ে। নোবেল লরিয়েট ফ্রাঁসোয়া মরিয়াকের 'A Kiss For The Leper' ত' অনেকদিনই হ'ল পড়েছো। তার নায়ক ম'সিয়ে জ্যাঁ পেলুয়ের ও তারই যুবতী-স্ত্রী নোয়েমির—দাম্পত্য-জীবনের জটিল করে তোলার, তাইতে ভ্রান্ত হওয়ার, আর যুবক-স্বামীর বারে বারে যৌনতারই ভল পথেতে যাওয়ার—ও তারই স্বামী-স্বত্বের শুধু 'ইরোটিক' আসক্তির কাছে এক লাজভীরুমঞ্জুলার দেহমন ধরে উপছিয়ে পড়া মস্ত এক ভয় পাওয়ার কথায়—মরিয়াক লিখেছেন—The autumn rain whispered on the roof, the shutter banged, a farm waggon rumbled into the distance. Noemie, kneeling beside the dreaded bed, repeated in a low voice the words of her evening prayer : O God, here on my knees, I thank thee that thou hast given me a heart capable of knowing and of loving thee....' Inthe darkness Jean Peloueyre

could feel the adored body shrink away from him. He put as much space between them as possibly could. Now and again Noemie, stretching a hand to touch the face which now, because she could not see it seemed less odious, would find it warm and moist with tears. At such times, with remorse and pity, she would strain the unhappy creature to her, as in the Roman amphitheatre, a Christian virgin might, with closed eyes and teeth fast clenched, have leapt forward to throw herself before the waiting beast.' আর এর পরেই দেখেছি—কি ভয়ঙ্কর এই দাম্পত্য সম্পর্কেরই দেহময়-সম্ভোগ-কথা! সত্যি দেহ ছাড়িয়ে পাওয়া সুন্দর ধারার কোন কোন সংযোগ তাদের ঘিরে দাঁড়াতে পারেনি। কারণ একজন স্বামিত্বের অধিকারে ছিল—প্রবলেতে অসংযমী। আর তারই অন্যজনা সলাজে থেকে ভয় পেয়ে হতে চায় না—নিলাজ লহরদল ধরে ধরে তা হবারই জন্য। তবু লাজভীরু নোয়েমিকে শেষে হতে হয় তাই। বল ত কী আশ্চর্য্য আমাদের মতো মেয়েদের জীবনবাসর, না? যা আমরা ঘৃণা করি প্রথম থেকে,—আর শেষ অবধি কিনা উপায় খুঁজে না পেয়ে—তারই মধ্যে নিজেদের সঁপে দেই!—ঘৃণা-ভয়-শঙ্কা-নিয়েই!—আর একজন যে সমাজবিজ্ঞানীর কথা বললাম,তার নাম ডাঃ আলেকজাণ্ডার ম্যাগুন। ওঁর 'Love and marriage' বইটিতে তিনি আধুনিক সমাজের ভালোবাসা ও সেই সাথে বিবাহের নানান প্রসঙ্গ নিয়ে—ব্যাপক এক সাহিত্যিক রস-সঞ্জাত আলোচনা করেছেন। ভাষা অপূর্ব। বক্তব্য অপুর্ব। তদুপরি লেখকের উপলব্ধি ও বিশ্লেষণাদি অপূর্ব। ডাঃ ম্যাগুন তাঁর বইটির এক জায়গায়—বিবাহিত যৌবনে মিথুনবাসরটিকে সাজাবার জন্য অধিকার পাওয়া এক দম্পতিরই কথা প্রসঙ্গে—আপন স্ত্রীর সুন্দর স্বভাব ও মধুর দেহের প্রতি—তারই স্বামীর অতি মার্জিত রুচিও, কী ভাবে মিথুন-কারুকলায় অন্ধ হয়ে—অদ্ভুত আর অমানবিক আচরণ জানাতে পেরেছে—তারই অতিবাস্তবের কথা জানিয়েছেন—পত্রলেকিকা এক যুবতীরই নিজস্ব জবানবন্দীতে। ডাঃ ম্যাগুন পত্রটি উদ্ধৃতির আগে পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, যে, মেয়েটির বিবাহ হয়েছে। আর বিয়ে করেছে মেয়েটি—তারই মতো পড়াশুনায় ব্রিলিয়াণ্ট ক্যারিয়ারেরই একটি সমবয়েসী যুবককে,—যে মেয়েটির চাইতে শিক্ষার মানদণ্ডে—আরো অনেকদূরই এগিয়ে গিয়েছিল। সেই সাথে ছেলেটির উঁচু বংশ, রূপ-যৌবন-অর্থ সবই আছে। তবু ডাঃ ম্যাগুন মেয়েটির বিবাহিত যৌবনের ব্যথাতুর কথায়—ভাবিত হয়েই জানিয়েছেন ঐ বিশেষ জবানবন্দীটিকে। আপন স্বামীর ভুল করা মিথুনাচারের নানান অস্বস্তিতে

ধাঁধিয়ে 'পড়া মেয়েটির যৌবনাকুতি বলছে—'He does not seem to be able to exite me any more. He tries to act like a cavemen, and I do not like it. I do not think he realizes that he is so rough. I asked him to be more gentle, but he still pulls my hair by leaning his arm on it when he kisses me, and is likely to crush my stomach with is unsupported weight, or even to brandish an elbow in my face. Sometimes he crumples me against the mattress in what resembles a clutch far more than an embrace, and scores my cheek with his unshaven stubble.'—আমাদের মেয়ে সমাজের পক্ষ থেকে—সেদিন ডাঃ ম্যাগুনকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম আমাদেরই মধ্যেকার অনেকের জীবনে ঘটা অসামঞ্জস্য ভরা বিবাহগত যৌবন-যন্ত্রণাগুলোর অতলান্ত রূপ নিয়ে সূক্ষ্মধারার বিশ্লেষণ করার মধ্যেই—নানান সমাধানের পথটিকে পর্য্যন্ত দেখিয়ে দেওয়ায়। দেখ সৌমিত্র, সেই ব্যাপারে অনোরে দ্য বালজাকের মতো যুগন্ধর কথাশিল্পীর পর্য্যন্ত সমাজতাত্বিকের ভূমিকায় নেমে রচনা করা সেই বিখ্যাত 'Marriage' বইটিতে জোরালো ভাবেই এ হেন অবুঝ আর নিষ্ঠুর হয়ে ওঠা স্বামীদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন সত্যি ঠিক-ঠিকই—'A man must never permit himself the pleasure with his wife which he has not the skill to make her desire.'—তাই বলি সৌমিত্র, বিবাহ ক'রলেই যে স্বামী-স্ত্রী সব স্বত্বেরই অধিকারী হ'লো—এটা ভাবা ভুল কিন্তু। আসল কথা দু'জনকেই হতে হবে এ ব্যাপারে—উপযুক্ত। যথার্থই পুরুষকে হতে হবে বেশী করে।— কেন না সেই ত যৌবনায়নী প্রণয়কলায় হল—তারই স্ত্রী-সুজনাটির সব সুখ। সব খুশীর উৎস।"

প্রিয়ার এক্ লহমায় আষাঢ়ী ঢল্ ধর নামানো কথার বৃষ্টিতে খুশীর স্বাদ নিতে নিতে—সৌমিত্র এই মুহূর্তে আপন রভসিতার বুকের ঔদ্ধত্যে ঘেরা প্রদেশেতে যুবকের দুষ্টুমি মাখাতে চাওয়া মাত্র—রূপা থেমে গেল কথার মূর্চ্ছনা হারিয়ে। ঝলমলালো খিলখিলানো হাসি-ময়তায়।—আর তার মধ্যে দিয়ে ঝরালো সন্ধ্যারই স্নিগ্ধশীল রুচিরা ঘেরা—অনুরাগ বৃষ্টি। ঝকমকিয়ে। ঝিকিমিকিতে। ঝিলিমিলিতে।

—"না-না। রূপা, আমার মধুমিতা। ভয় নেই। কোরব না দুষ্টুমি। শোন, তোমার কথা মতো বিবাহিত ঐ সব যুবকদের করা এই নিষ্ঠুর মিথুনাবৃত্তি নিয়ে অনোরে বালজাক্ যে আরো রসিয়ে বক্রোক্তি করে গেছেন, বলি, সেটাও জান কি? ও জান না। তবে শোন। তিনি খুব সুন্দর দু'খানা উপমা দিয়েছেন—দাম্পত্য

জীবনের লাজভরুভি মেয়েদের দেহকে বলেছেন—বেহালা। ভায়োলিন। আর সেই ভায়োলিনরূপী স্ত্রী-দেহী বাদ্যযন্ত্রখানাকে নিয়ে—অপটু হাতের করা নিষ্ঠুরতায় বেসুরো বাজাতে থাকা স্বামীদের বলা হয়েছে, যেন এক একটি—ওরাং ওটাং। পুরো বক্রোক্তিটিতে বালজাক্ লিখেছেন, 'Many young husbnds are so ignorant of woman that they make him think of orang-outanges trying to play the violin' কি গো রূপা, খুব আনন্দ যেন উপছিয়ে পড়ছে তোমার মধ্যে, তাই না? যেহেতু বালজাক্ ভুল পথেতে চলা—ঐ বিশেষ ধরনের অদ্ভুত স্বভাব যুবক-স্বামীদের ওরাংওটাং বলেছেন। তাই না?"

বলতে বলতে সৌমিত্র নিজেও বাঁধ-ভাঙ্গা হাসির ঝলমলানি নিয়ে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরলো বুকের অধিত্যকায়—ওরই মতো হাসিতে ঝড় হওয়া রূপাকে। প্রিয়ার মাথায়, কেশেতে হাত বুলালো আদর করে। তার পরেই বলল—কৈ, তোমার লরেন্স প্রসঙ্গ ত এখনো হল না শেষ? কি শেষ ক'রবে, না বাদ দেবে ও প্রসঙ্গটি? বল, দুষ্টু মেয়ে? ভয় হয় প্রসঙ্গ তুলে একটু চলেই আবার ঠিকই ফিরে যাবে—অপর প্রসঙ্গে। কী, তাই না?—বলে প্রিয়ার ঘাড়ের নিচে এলো হয়ে থাকা ছোট ছোট কয়েকটি চুলের রিঙ্ সরিয়ে—সুড়সুড়ি কেটে গেল।

—"এই, এই, লাগছে। থামো। ঈষ্, বলি কেন বাদ দেবো আমার বলতে চাওয়া প্রসঙ্গখানাকে? একটু ভাল করে পড়ে শোনাতে দেও আমায় লরেন্সের লেখারই এইখানটি, যেখানে ধরা পড়ে তোমাদের ছেলেদের যৌবনকালের চোখের দুষ্টু-দুষ্টু দর্শনটি।—যা আমাদের লাজময় দেহ থেকে লুকানো অর্বিচনীয়তা দেখতে খুবই পছন্দ ক'রে—নিলাজের আভরণহীনতায়। বাব্বা। আমার এই তুমিও কী তা দেখার জন্য—হও না এলোমেলো?— চোখেরই যৌবনিক রূপতিয়াসেতে কাঁপন ফুটিয়ে? হ্যাঁ, হও নিশ্চয়। হ্যাঁ, তোমাদের এই হওয়াটাই ত' হল স্বাভাবিক। চিরন্তন সত্য। এই শোন, Once গল্পে লরেন্স এইটি নিয়েই ছবি আঁকছেন। প্রথম থেকে পেতে চাওয়া নায়কের কাছেতে—শেষে যখন নায়িকা শ্রীমতী অনীতা এসে দাঁড়ালো—'with full acceptance'—ঠিক তখনই ছোট-বেলাকার অনেক দেখারনায়িকা ঐ অনীতা—আস্তে আস্তে যুবকেরই স্বাভাবিক দৃষ্টি-সমীক্ষার মধ্যে ফুটে উঠতে লাগলো। —যা নায়কের জবানীতে লরেন্স তাঁর ভাষার পরিপাট্যে সাজালেন শেষাশেষি। —এই সৌমিত্র, টর্চটা ভালো করে পাতার ওপরে ধরে রেখো। শোন। আমি পড়ছি—'I lay wondering if I too were going into Anita's pocket, along with her purse and her perfume and the little sweets she

loved. It would almost have been delicious to do so. A kind of voluptuousness urged me to let her have me, to let her put me in her pocket. It ould be so nice. But I loved her : it would not be fair to her. I wanted to do more than give her pleasure.'— হ্যাঁ, শোন সৌমিত্র, এই ভাব-ভাবনার টানায় দোলা খেতে থাকা নায়ক প্রায় হতচকিত হয়ে উঠলো—যখন দেখলো পরম আকস্মিকতারই ভেতরে, যে— 'Suddenly the door opened on my musing and Anita came into bedroom. Startled, I laughed in my very soul, and I adored her. She was so naturaal! She was dressed in a transparent lacy chemise, that was slipping over her shoulder, high boots, upon one of which her string coloured stocking had fallen. And she wore an enormous hat, black, lined with white, and covered with a tremendous creamy-brown feather, that streamed like a flood of brownish foam, swaying lightly. It was an immense hat on top of her shamelessness, and the great, soft feather seemed to spell over, fall with a sudden gush, as she put back her head.'এই সৌমিত্র, টর্চের আলোটা ঠিক ভাবে ধর। কেঁপে যেন না যায়। শোন। তারপর প্রিয়ার দেহী ঝলসের ঝাপটা লাগা চোখের ঘন বিস্ময় নিয়ে নায়ক দেখতে দেখতে বলছে, 'She looked at me. then went straight to the mirror....''How do you like my hat?' she said.'—তারপর নায়ক জানাচ্ছে, 'She stood before the panel of lookingglass, conscious only of her hat, whose great feather-strands swung in a tide. Her bare shoulder glistened, and through the fine web of her chemise I could see all her body in warm silhouette, with golden reflections under the breasts and arms. The light ran in silver up her lifted arms, and the gold shadow stirred as she arranged her hat.'

—আচ্ছা সৌমিত্র, লরেন্সের এই নায়ক তার নিজের জবানীতে বলে চলা এই কাহিনীতে— যে ভাবে নিজের মনের প্রকাশখানা ফোটালো—তা কি তোমাদেরই মনের গোপন বিলাসে অভিলাষিত দুষ্টুময়তাকে করায় না— সাহিত্য-স্বাক্ষর? কী, তা না? হ্যাঁ, তাই সত্যি। তবে কি জান, আমরা মেয়েরা এমন এক বিশেষ ধারায় তৈরী সাহিত্যের মধ্যে—আমাদেরই দেহ-সুষমার প্রতিটি অঙ্গ ধরে ধরে করা বর্ণনার ঘনঘটায় মুহূর্তকের জন্য হয়ে পড়ি — লাজবিধুরা। যতই আধুনিকা হই না কেন,— এ থেকে লজ্জার অস্বস্তিতে

আবরিতা না হয়ে পারি না। সত্যি বলছি। দেখ সৌমিত্র, প্রথমে বেশ বিরক্তই হ'য়ে উঠতাম লেখকদের এমন বর্ণনায়। নানান আলপনা ভরা আমাদেরই রূপ সাপেক্ষ কথায়। কিন্তু এখন ভাবি, যে, লেখক যখন পুরুষ , যখন তার শিল্প-দৃষ্টিতে নারী হ'য়ে ওঠে কবিতার মতো সুরেলা ও ছান্দসিকা—তখন নিজের মনে পাওয়া লাজময় অস্বস্তিটিকে কাটিয়ে তুলে বুঝিয়েছি—সাহিত্যের ধর্মে এটাই হল লেখকদের পক্ষে অতি স্বাভাবিক। বল সৌমিত্র, তাই ত'? আর এর পরে সত্যি—আর থাকতে পারে না যে কোন অনুযোগ—তাও আমি বুঝেছি। এই, এই?"

বলতে বলতে মৌনতার ছন্দ ধরে-ধরে জানানো ছোট মতন এক দুষ্টু আবদার কোরল রূপা—নিজের কথা থামিয়ে—

আর তখনি সেই পেতে চাওয়া দুষ্টুময়তা প্রিয়াকে পাইয়ে দিয়—কথায় মশগুল হ'ল সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

—" দেখ রূপা, তোমার মনে আর একটা প্রশ্ন জেগেছিল এই নিয়ে যে,—লরেন্সের স্ত্রী শ্রীমতী ফ্রাইডা কি করে এ সব পছন্দ করতেন! এবার বুঝতে পারছো ত, যে, পুরুষেরই যৌবনকালের দৃষ্টিতে যুবতী যেমন বর্ণময়ী হয়, তেমনি সাহিত্যিক সৃষ্টিতেও তাই হয়। বর্ণে-বর্ণে ও ছন্দেতে তাঁর সৃষ্টি যুবতী হয়ে ওঠে দেহে আর মনে সব অর্গল মুক্ত থাকা—চিরন্তনী। আর তাই রূপা—আমরা লেখকেরা যখন পুরুষ হ'য়ে যৌবনের দুয়ারে দাঁড়িয়ে সাহিত্য রচনায় প্রয়াসী হই—তখন জান ত' যুবতীকে খোলা চোখে যে ভাবে দেখে থাকি—ঠিক সে দেখাটারই কথা ফোটাতে ফোটাতে এমন একটা পর্য্যায়ের ব্যঞ্জনা দিতে চেস্টা করি,—যা রূপা, শুধু বাস্তবেরই নিছক দেখা নয়। যে দেখার অন্বয় সাহিত্যের অয়নে অরূপরতনের আস্বাদন রেখে যায়। তা কেমন জান? তোমার ত রবীন্দ্রনাথের নিদ্রিতা কবিতাখানা মুখস্থ আছে। তাতে নিদ্রিতা প্রিয়ার বেশবাসে যে বিবসনা প্রায় ছবিখানা ফুটেছে, জান কী—তা দেহী রূপ থেকে--রূপাতীতেরও আস্বাদন পৌঁছিয়ে দেয়—রূপতিয়াসীর জন্য দিঠি ভরিয়ে। সত্যি-সত্যি। তাই রূপা, তখন আমরা নিদ্রিতার দেহীরূপ ঝরনাখানার ছন্দলহরে ডুবতে ডুবতে পড়ি—

'কমল ফুল বিমল শেজখানি, নিলীন তাহে কোমল তনুলতা।
মুখের পানে চাহিনু অনিমেষে, বাজিল বুকে সুখের মতো ব্যথা।
মেঘের মতো গুচ্ছ কেশরাসিশ শিথান ঢাকি পড়েছে ভারে ভারে;
একটি বাহু বক্ষ'পরে পড়ি, একটি বাহু লুটায় একধারে।

আঁচলখানি পড়েছে খসি পাশে, কাঁচলখানি পড়িবে বুঝি টুটি।
পত্রপুটে রয়েছে যেন ঢাকা অনাঘ্রাত পূজার ফুল দুটি।
দেখিনু তারে উপমা নাহি জানি—ঘুমের দেশে স্বপন একখানি,
পালঙ্কেতে মগন রাজবালা আপন ভরা লাবণ্যে নিরালা।'

—এই, বল রূপা, এ কী শুধু সাজানো রূপের ডালি? না রূপাতীতের রূপক? জীবনের চেয়ে—আর দেহের আকুলতার চেয়ে বড় নয় কী?"

সৌমিত্র একটু থামলো। ঝকমকানো হাসিতে তেমনি ভাবে ঝলমলালো। তারই গমক ধরে প্রিয়ার ছবির মতো দেহময়তায় আদর জানাতে জানাতে বললো—

—"এই, ও ত' গেল বর্তমানে আমরা যা দেখেছি, যা বুঝেছি, বা যা ভাবছি—ওরই আবহমানকালের অনুভূতিগ্রাহ্য সাহিত্যের বিষয়। কিন্তু এমনি এক পৃথিবী—যা মানুষকে নিয়ে, মানুষেরই সমাজ নিয়ে ন্যায়-অন্যায় বোধের যুদ্ধে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অবস্থ্অয় যে এসে দাঁড়াতে পারে অচির ভবিষ্যতে,—হ্যাঁ রূপা, তেমনি এক চিন্তনীয় বিষয়ের গুরু-গম্ভীর সাহিত্য-রচনায় রূপ দেওয়া উপন্যাস থেকেও—এটা বাদ যায় না। বরং থাকে—নারীরই যুবতী দেহময় থেকে নির্ঝরিত সেই চিরকালীন রহস্যময়তার কথা। তুমি ত' জান, প্রাচীন ভারতীয় মনীষায় মুগ্ধ—মনীষী কথাশিল্পী বনাম দার্শনিক অলডাস হাকসলি তাঁর Brave New World-এ পর্য্যন্ত—এই নারীরই যুবতীময়তার বক্তব্য ধরে ধরে মশগুল ছিলেন—নিজেরই শিল্পচেতনাতে। মহাকবি শেক্সপীয়রের টেম্পেস্টে মিরাণ্ডার মুখে প্রভাসিত সেই বাণী—O wonder!

How many goodly creatures are there here!
How beautious mankind is! O brave new world,
That has such people in't!"

—হ্যাঁ রূপা, শোন, নিজের সৃষ্টি ঐ প্রকৃতির অনাবিলতায় পালিতা যুবতী মিরাণ্ডার মুখ দিয়ে শেকস্পীয়র যে মহৎ দার্শনিকতাটিকে নিরবধিকালের মানবতারই প্রশস্তিস্বরূপ রেখে গেছেন—সত্যি তার থেকেই অতি আধুনিক মনীষার মধ্যে তৃপ্তি হওয়ায়—অলডাস হাকসলি—তাঁর এই ভাবী সমাজ ও ভাবী মানুষের হাব-ভাব রীতি-নীতি রাজনীতি সাপেক্ষ উপন্যাসের নামকরণখানা তাই করেছেন Brave New World—রূপা, আজকের আমাদেরই এই জানা ও চেনা পৃথিবীখানার অচির ভবিষ্যতে কোন নতুন রূপেতে পালটে যেতে পারে,—হ্যাঁ, তাই নিয়ে লেখা 1984 নামী উপন্যাসখানাও ত পড়েছো। তুমি ত দেখেছো

আমাদের ভারতেরই মাটিতে 'born and brought up' ঐ লেখক—জর্জ অরওয়েল—যিনি তাঁর 'Animal Farm' উপন্যাসটিতে কি সূক্ষ্ম বুদ্ধিদীপ্ততায় বর্তমান সোভিয়েট দেশটির প্রোলিটারিয়েট শাসন ব্যবস্থার জটিলতা দেখাতে গিয়ে সুন্দর প্রহসন করে এঁকেছেন—হ্যাঁ, সেই অরওয়েলই 1984 এতে 'anti-sex movement' ও তৎ-সংক্রান্ত বিষয়াদির সাহিত্যিক রূপদানে কতটুকু শৈল্পিক সাফল্য অর্জন করেছিলেন,— সেটা কিন্তু তেমন ভাববার বিষয় নয় এ জন্য, যে, ভাবীকালের সে সামাজিক ছবি হয় ত ঠিকই অমন বর্ণনার drastic change—এতে রূপান্তরিত হবে। অবধারিত হবে। অবধারিত রকমে—তারই লিপি-কুশলাতা এই 1984 এর মস্ত বৈশিষ্ট্য।—এ প্রসঙ্গ এ জন্য উঠলো, যে, অরওয়েল বাস্তব থেকে পরিক্রমায় নেমে অতি বাস্তবিক ভবিষ্যতেরই যে কথা বুনোন করে গেছেন— সেই তারই অসম সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গীর দুনিয়াদারি ছাড়িয়ে—এই দার্শনিক বনাম কথাকার অলডাস হাক্সলি তাঁর Brave New World'-এ আরো দিগন্ত প্রসারিত করা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যায়—একখানা দর্শনেতে ঘেরা উপন্যাসই তৈরী করেছেন। তাঁর দার্শনিকতায় প্রতিভাসিত এর নায়ক হ'ল The Savage! এটা নায়কের যেমন পোশাকী নাম নয়— তেমনি হ'ল নায়কের মুখোশ আবরিত আসল চরিত্রায়ণ! Characteristic! নানান নীতির, নানান অপরাধের, নাননা বিজ্ঞানের অমানবিক সম্প্রসারণশীলতার টালবাহনা ধরা—অস্থির সমাজ-মানসের মধ্যে—তথৈবচ savagery-র প্রতিষ্ঠায় নায়ক The Savage ও—তারই প্রেমচারণার দুনিয়া ঘিরে নায়িকা শ্রীমতী লেনীনার সাথে মিলেছে। বা মিশেছে।—হ্যাঁ রূপা, তারই বর্ণনা আঁকতে গিয়ে দার্শনিক হাক্সলি পর্য্যন্ত— সেই অস্বাভাবিক সমাজ মানসেতেও—প্রণয় ছবির স্বাভাবিক অনুরণন ফুটিয়েছেন। নায়ক The Savage ও যে যৌবনেরই অমর মাদকতায় মাততে পারে,—আর নায়িকা শ্রীমতী লেনীনাও যে নায়কের সব কিছু জেনে শুনেও ক্ষমা-সুন্দর Brave New World -এর পথে—ভালোবাসা নিয়ে এক মধুরিকার ব্যবহারে—সত্যি চিরন্তনী লাজহীনার যুবতী ধর্মখানা ফোটাতে পারে মধুছন্দার রূপ-সুষমায়—হ্যাঁ, তারই সুন্দর ও মধুরে প্রণয়-বিহ্বল থাকা বর্ণনাটি অপূর্ব লিপিকুশলতায় এঁকে রেখেছেন—এরই দার্শনিক কথাশিল্পী। শোন রূপা, Brave New World-এর অনেক জায়গা আমার মুখস্থ আছে। স্মৃতি থেকে বার করে এনে তোমাকে শোনাচ্ছি। প্রেম ও অপ্রেমের দ্বন্দ্বে জর্জরিতা লেনীনার একটি প্রশ্নের উত্তরে 'The Savage' বলছে, It's like that in Shakespeare too. "If thou dost break her virgin knot before

all sanctimonious ceremonies may with full the holy rite..." আর তা শুনে ভীতিবিহ্বলা লেনীনা বলছে, 'For Ford's sake, John, talk sense, I can't understand a word you say. First it's vaccum cleaners ; then it's knots. You're driving me crazy'—বলতে বলতে 'She jumped up and, as though afraid that he might run away from her physically, as well as with his mind, caught him by the wrist. Answer me this question : do you really like me, ro don't you?'—তখন দেখা গেল, 'There was a moment's silence ; then, in a very low voice, I love you more than anthing in the world' he said......Then why on earth didn't you say so? she cried, and so intense was her exasperation that she drove her sharp nails into the skin of his wrist. Instead of drivelling away about knots and vacuum cleaners and lions, and making me miserable for weeks and weeks'....She released his hand and flung it angrily away from her,....If I didn't like you so much', she said, 'I'd be furious with you'—তারপর, বুঝলে রূপা, এই রাগানুরাগের পর মুহূর্তেই দেখা গেল— লেনীনা আদরণীয়া হাওয়ায়, 'And suddenly her arms were round his neck, he felt her lips soft against his own. So deliciously soft, so warm and electric that invevitably he found himself thinking of the embraces in Three Weeks in a Helicopter. Ooh! ooh! the stereoscopic blonde and aah! the more than real blackamoor. Horror, horror, horror....he tried to disengage himself ; but Lenina tightened her embrace'ঠিক-ঠিক, বুঝলে রূপা, তুমিও যেমন সময় বিশেষে মান-অভিমান করেও আমায় আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা বুকের বাঁধনখানায় আরো ঘন করাতে চাও— তেমনি করে করে লেনীনাও সকরুণতায় বললো শান্ত গলায়—'Why didnt you say so? তার উত্তরে তখনি দি স্যাভেজ জানালো The murkiest den, the most opportune place (the voice of conscience thundered poetically), the stongest suggestion our worser genius can, shall never melt mine honour into lust, Never, never! he resolved.—তারই প্রতি পালটা কথা ছুড়ে দিল লেনীনা, You silly boy! ... 'I wanted you so much. And if you wanted me too, why didnt you....? তারপর প্রিয়ার কথায় বার দুয়েক নাম ধরেও কিন্তু বিস্ময়ঘেরা আহ্বান জানাতে—একবারও কথা পুরো করাতে পারলো না ঐ দি স্যাভেজ!—তখন লেনীনাকে দেখা গেল, যে,—She put her

hand to her neck and gave a long vertical pull ; her white sailor's blouse was ripped to the hiem ; suspicion condensed into a too, too solid certainty.' তাই দেখে দেখে 'স্যাভেজ' জানতে চাইলো সাগ্রহে Lenina, what are you doing ? তবু কোন উত্তর পাওয়া গেল না প্রিয়ার কাছটি থেকে। তখন ভাসছে শুধু মৌনতারই ছড়াছড়ি। দেখা গেল— Zip, Zip.! Her naswer was wordless, She stepped out of her bell-bottomed trousers. Her zippicamiknicks were a pale shell pink, The Arch Community-Songster's golden T dangled at her breast— লেনীনার বুকের যুবতী রহস্যময়তা সম্পূর্ণ স্ফূর্ততায় প্রকাশ পেতে শোনা গেল, For those milk paps that through the window bars bore at men's eyes....' The singing, thundering, magical words made her seem doubly dangerous, doubly alluring. Soft, soft, but how piercing! boring, and drilling into reason, tunneling through resolution. The strongest oaths are straw to the fire i' the blood. Be more abstemious, or else... তারপর বুঝলে রূপা, লেনীনা যুবতীকায় রহস্যময়ী হল। তখন একটা ছোট শব্দ ছড়িয়ে দেওয়ায় দেখা গেল— রূপবতী বুকের যৌবন ঘনতায় বিবসনা লেনীনাকে। যেন ভালোবাসার এক ঝড় হয়ে উঠছে তারই যুবতীকায় নাচা আবেগানুভূতিগুলো সমেত। —তাই শোনা গেল Zip! The runded pinkness fell apart like a neatly divided apple. A wriggle of the arms, a lifting first of the right foot, then the left : The Zippicamiknicks were lying lifeless and as though deflated on the floor'. — লেনীনা বিবসনা হয়ে পুরুষকে ধাঁধাতে চাইলো। আর এমন মায়ারাগ ঝকমকানো রূপসায়র করা— দেহী নিলাজতায় মুঠো মুঠো যৌবন-রঙ্ ছড়নোর পরেও লেনীনাকে দেখা গেল Still wearing her shoes and shocks, and her rakishlyy tilted round white cap, she advanced towards him, 'Darling, Darling! If only you'd said so before!' She held out her arms'.

—রূপা, যুবতী তার মধুছন্দা রূপ ঠিকই নিলাজ করালো রহস্যময়তায়। — কিন্তু, হ্যাঁ—কিন্তু তখনই যেন দারুণ ভাবে ধাঁধিয়ে উঠলো নায়ক—দি স্যাভেজ। প্রিয়ার এই মণি-মাণিক্যেতে ঝকঝক করা দেহের বিবসনা প্রায় রূপঝরনাতে চোখের দৃস্টিতে হোঁচৎ খাওয়ায়! তাই দি স্যাভেজ তখন.....Instead of also saying Darling! and holding out his arms, the Savage retreated in terror, flapping his hands at her as though he were trying to scare

away some intruding and dangerous animal. Four backward steps, and he was brought to bay against the wall! প্রিয়ার ঐ রূপ দেখে, ঐ মাধুর্য্য দেখে ধাঁধালো স্যাভেজ—তখন প্রিয়া তার মদালসা দেহময়তার আর্তিতে যৌবনময়তা নাচাতে নাচাতে—প্রিয়কে ছন্দ-যতিতে বেঁধে মিল ধরাবারই জন্য—আবেশ থেকে জানালো—'Sweet!' said Lenina, and laying her hands on his shoulders, pressed herself against him, 'Put your arms round me', she commanded, 'Hug me till you drug me, honey' She too had poetry at her command, knew words that sang and were spells and beat drums. Kiss me, she closed her eyes, she let her voice sink to a sleepy murmur, kiss me till I's in a coma. Hug me, honey, snuggly' হ্যাঁ, লেনীনা চাইছে প্রিয় তাকে প্রণয়ের দস্যুতায় লুট করুক। —বুঝলে রূপা, এর পর আর কিছুটা আছে। তবে, ঠিক-ঠিক লাইন বাই লাইন মনে নেই। তবে, এটুকু জান যে, ঐ ভবিষ্যতের গর্ভে থাকা যে সমাজের কথা দর্শন ক'রে আঁকা হয়েছে এখানে—তাতে দেখা গেল শেষ পর্য্যন্ত 'দি স্যাভেজ' তার প্রিয়া যুবতীর বিবসনা অবস্থাটিকে অন্যায় ভাবে প্রত্যাখ্যান কোরলো—শ্রীমতীরই বর-অঙ্গেতে আঘাত হেনে। 'জন' সেই মুহূর্তে এত সাংঘাতিক হ'য়ে উঠেছিল, যে, লেনীনাকে খুন করার অভিপ্রায়খানা—জানাতেও দ্বিধা ক'রে নি। নায়কের, সত্যি-সত্যি সেই মুহূর্তে 'স্যাভেজ' হ'য়ে ওঠা থেকে—নায়িকা অন্যত্র নিজেকে দ্রুত সরিয়ে নিয়ে করেছিল—আত্মরক্ষা। জান রূপা, ভাবীকালের ঐ সমাজের দর্পণে এটাই ফুটতে চেয়েছে, যে—প্রিয়া যতই তার দুর্ধর্ষ প্রিয়তমকে 'Hug me till you drug me, honey; / Kiss me till I'm in a coma :' বলে-বলে সুরঝঙ্কারে—নিজের বিবসনা দেহী-ঝরনাখানাকে সমর্পণ করাক না কেন মধুরে-সুন্দরে—তার আবেদন কোন মস্ত আকর্ষণ হয়ে লাগবে না—ঐ, ঐ জন নামী আসল পরিচয়ের 'দি স্যাভেজ'দের! দেখ, এমন ঘটনাটির আগের মুহূর্তে কিন্তু অন্যত্র এই 'জন' ওরফে 'দি স্যাভেজ'কে দেখেছি আবার অন্য ধাতুতে গড়া। সেখানে দেখেছি সে তার এই লেনীনাকে কবিতার মধ্যে দিয়ে,—আর যুবকত্বের মাদকতায় নিলাজ ব্যবহারেতে টেনে নিয়ে স্বীকৃতি দেখাচ্ছে। তাই মনে পড়ে—"With closed eyes, his face shining with rapture, John was softly declaiming to vacancy :

O, she doth teach the torches to burn brightl
I't seems she hangs upon the cheek of night
Like rich jewel in an Ethiop's ear ;
Beauty too rich for use, for earth too dear.....'

রূপা, আর তার পরেই দেখছি জন রূপী 'দি স্যাভেজে'র করা ব্যবহারটি—প্রিয়া লেনীনার প্রতি। তাই দেখলাম, 'The golden T lay shining on Lenina's bossom. Sportively, the Arch-Community-Songster caught hold of it, sportively he pulled, pulled. 'I think', said Lenina suddenly, breaking a long silence, 'I'd better to take copule of grammes of *soma.*'—জান রূপা, এই এত সব ভাব-পরম্পরা থেকে এটাও বোঝা যায়, যে, ভবিষ্যতের ঐ সমাজে থাকবে না কোন স্থির ভাব। যা থাকবে তার নাম দেওয়া যায়—অস্থিরতা। অসহিষ্ণুতা। সর্বোপরি—'আমি যা ইচ্ছা তাই-ই ক'রতে পারি'—এমনি সব non-chalant ও 'কুছ পরোয়া' নেই—স্বভাবেরই ছড়াছড়ি। কাজেই তার মধ্যেও প্রণয়াকুলতার রীতি নীতি ছাড়া পাবে না—দারুণ অস্থিরতারই নাগপাশ থেকে!—এই 'Brave New World' রচনা ক'রে দার্শনিক হাক্সলি অনাগত ভবিষ্যতের যে ছবি এঁকেছেন অপরূপ জ্ঞান-প্রমিতিবোধ ও যুক্তি-গ্রাহ্যতার মিশাল দিয়ে—তা সম্পূর্ণভাবে গ্রন্থের কাহিনী ছাড়িয়ে দর্শন হ'য়ে উঠেছে। বল মেয়ে, সেটা কী কেউ অস্বীকার ক'রতে পারবে? বইটির রচনা-ভঙ্গীটি খুবই সিরিয়াস্ টাইপের। তাতে আমি অনেক কিছুই বুঝি নি। তবে যেটুকু বুঝেছি—তা থেকে একটা নতুন দর্শনেরই আস্বাদন পেয়েছি,—যে দর্শন সব শেষে নানান সমস্যায় জর্জরিত হ'তে-হ'তে—হয়ত' ঠিকই পথ পেয়ে যাবে।—পশ্চিম থেকে সরে সরে এসে—এই পূবের দিগাঙ্গনেই-এ হ'বে পূর্বাচলের যাত্রা। পূব মানে আমাদেরই এই এশিয়ার একটি দিক। মানে ভারতবর্ষ নয় কী? বলি, যে দেশের ঋষির ঋদ্ধিতে সাজানো মনীষায় স্বয়ং অলডাস্ হাক্সলি পর্য্যন্ত মুগ্ধ ছিলেন?—শোন রূপা, তোমারই কথায় উঠেছে এই প্রসঙ্গ। যদিও এ থেকে আমার দেখাবার উদ্দেশ্য ছিল, যে , মনীষী হাক্সলির এই অসম মননশীলতায় দর্শনগ্রাহ্য করা 'Brave New World'-এ পর্য্যন্ত—যতই অস্বাভাবিক পরিবেশ নিয়ে প্রণয়ের কথা উঠুক না কেন,—তার মধ্যে নারীর চিরন্তন হৃদয়ের আকুলতাটি—তারই ভালো লাগা যুবকের চোখের সামনেতে নিলাজে-সলাজে-বিবসনায়—প্রকট করানোটাই ছিল অতিমাত্রায়—স্বাভাবিক। মোষ্ট ন্যাচারাল।—দার্শনিক-লেখক যতই বুদ্ধি-দীপ্ততার ঝলস্ ভরিয়ে আমাদের মুগ্ধ করানই না কেন, অন্ততঃ এই প্রণয়-নিলাজ মুহূর্তটিকে রেখে গেছেন—চির নতুন হৃদয়েরই—শৈল্পিক কারুকাজে। তাতে কিন্তু কারুর দ্বিমত নেই। বলি, রূপা, তোমারই যুবতী মনের অভিলাষিত এক প্রশ্নের উত্তর ধরে যখন হাক্সলির এই উপন্যাসের এত কথাই তুললাম,—তখন বলি, বইটির শেষে দেওয়া—শেষ

দার্শনিক সুভাষণখানা শুনবে না? শোন, আমাদের পূবের দেশ—এই ভারতের পক্ষে তা'বহন ক'রেছে মস্ত এক অভিনন্দন। সত্যি এত জ্ঞান, এত বিজ্ঞান, এত সাধনা, এত সমস্যার নানান জটিলতায় থাকতে-থাকতে, আর সেই সাথে প্রযুক্ত বিজ্ঞানের শেষ ধাপেতে উঠে—তারই বিরাট ও ব্যাপক জটিলতায় মানবতা পথ হারাতে হারাতে—যখন হ'য়ে পড়বে পুরোপুরি ভাবেই দিশেহারা, আদর্শভ্রষ্ট, মায় পথভ্রষ্ট,—হ্যাঁ রূপা, দেখবে ঠিক তখনি ও-দেশেতে সে দিনের অনাগত ঐ ওরা পাশ্চাত্য দর্শনের পথরুদ্ধতায়, ও একরকমের নিশ্চলতা দাঁড় করানোতে—সত্যি-সত্যি শেষ দর্শনের আশ্রয় নিয়ে যাত্রা ক'রবে অন্যত্র। পশ্চিম থেকে নানান গোলকধাঁধায় ঘুরতে ঘুরতে—শেষ অবধি এই পূর্বাচলের পথে দেখতে পাবে সত্যের অরুণোদয়। ভারতবেত্তা হাক্সলি সে কথা ভোলেননি। তাই দেখি দার্শনিক-কথাশিল্পী তাঁর ক্ল্যাসিক রীতির উপন্যাসটিতে—সত্যি-সত্যি সব সমস্যারই ধ্বংসপথে চলার শেষ সংহারের মুহূর্তটিতে—যেন ভাবীকালের নায়ক সেই জন নামী 'দি স্যাভেজ্'কে—'Brave New World' এতে পৌঁছবার পথ নির্দেশনা দিয়েছেন। দেখ, লিখছেন,—"Slowly, very slowly, like two unhurried compass needles, the feet turned towards the right; north, north-east, east, south-east, sourth, south-south-west; then paused, and, after a few seconds, turned as unhurriedly back towards the left. South-south-west, south, south-east, east.......". নায়কের ও তারই সমাজের এই যে নতুন পদক্ষেপ—তা এই পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্বপথে 'Brave New World'-এর সন্ধানে চালিত হ'য়ে—হেথা নয়,অন্য কোথা, সেই অন্য কোনখানের ঘূর্ণাবর্তে কিছুকালের পরিধি নিয় পরিক্রমার মধ্যে—বার বার পূর্বাঞ্চলের কাছটিতে উপনীত হ'য়েও—ফিরে ফিরে সরে গেছে অন্যত্র। অন্য দিগাঙ্গনে।—হ্যাঁ, শেষে পরম আকস্মিক-তারই আহ্বানে যেন—বেদের, উপনিষদের, পুরাণের, স্মৃতি-ন্যায়-মীমাংসার পূণ্যশ্লোকে ঘেরা—এই প্রাচ্য,—এই পূর্বাচলের পথেতেই এলো। থামলো। থেমে ধাঁধালো যেন। আর যেন ঘটালো শুভদৃষ্টি। লেখক শেষ শব্দ 'East' লিখে—আর দাঁড়ি টানেন নি। শুধু রেখে গেছেন ইতিতে—ডট্-ডট্-ডট্! তর্জমায় দাঁড়ায় বিন্দু-বিন্দু-বিন্দু! এ কী আমাদের দর্শনগ্রাহ্য সেই বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর বিরাট-উদার স্বাদ গ্রহণ করা! বোধ হয় তাই? হাক্সলি নিজেও ত' এ দেশের থেকে পেয়েছিলেন তারই আস্বাদন তারই অমৃতময় বাণী-সমুচ্চয়। জান রূপা, এ ব্যাপারে যে যাই বলুক না কেন, আমি স্থির, আর নিশ্চিত, যে, ভাবীকালের 'স্যাভেজ' নামধেয় মানব তার মাহাত্ম্যটি পাশ্চাত্যের জটিল ধারার বিজ্ঞান-সচেতনতার সংহারময় রূপের কাছে পুরোপুরি

হারিয়েও—এই প্রাচ্যের ধ্যানমগ্ন দেশটিতে সুখের সন্ধান ক'রলে পর নিশ্চয়ই পাবে 'Brave New World'-এর-নিহিত-নির্য্যাস। আর ক'রবেও তা। কেন না, তুমি ত' রূপা এটাও জান যে, প্রাচ্যই পৃথিবীকে শোনাতে পেরেছে এমন সব 'দেববাণী'। 'Gospel'—যা মানুষেরই ঋষিকল্পতা হেমাঙ্কিতা পুণ্যশ্লোকে অনুভব ক'রে-ক'রে—তৈরী করার ছন্দ-যতি-মিল ধরে ধরে মন্ত্রোচ্চারণায় জানিয়েছে—

'ইয়ং পৃথিবী সর্বেষাং ভূতানাং মধু।
অস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্বানি ভূতানি মধু।।'

—হ্যাঁ। হ্যাঁ রূপা। বুঝলে সত্যিই ত' 'এই বিরাট বসুমতীখানা তার প্রতিটি প্রাণের কাছে—মধু-স্বরূপ। আর হ্যাঁ, তেমনি প্রতিটি প্রাণই হ'লো নির্বিশেষে ঐ বসুমতীরও—মধুস্বত্বা।' যদি তাই হয় রূপা, তা হ'লেও এ কথা স্বীকার্য্য, যে, ভবিষ্যতে পৃথিবী জুড়ে আধুনিকতা যত প্রখরতায়, আর সংহারময়তাতেই গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াক না কেন—তা মানুষ ও মানবতাকে 'Brave New World' থেকে পারে না, আর পারবেও না—অন্য কোথাও নির্বাসনে পাঠাতে। কী, তাই না?"

প্রিয়তমের কপোলেতে নিজের কপোলের একটিধার যোগাযোগে রেখে রূপার যৌবনাকুলতা নাচলো কথা বলতে। আর ফুটলো তখনি মিষ্টি কথার কাটা কাটা বুনোন—লাল ঠোঁটের কিনারায় কাঁপন তুলে।

—"আচ্ছা, তুমি একটু আগে অনুযোগ ক'রে বলেছিলে, যে, আমি এক কথা আরম্ভ ক'রে চলে-চলে যাই অন্য-অন্য কথায়! আর তুমি? এই দুষ্টু। প্রসঙ্গ থেকে এমন এক প্রসঙ্গের আলাপনে এতক্ষণ ধরে নিজেকে মাতিয়ে রাখলে ত বেশ? এই? এই, শোন। 'Brae New World' নিয়ে তুমি যে এত সুন্দর এক ধারণায় পৌঁছতে পেরেছো, তা জেনে আমার মন সত্যি খুশীতে উপছে উঠেছে আনন্দে নেচেছে। দেখ, আমি অনেক আগেই আমার করা একান্ত মেয়েলি মনের প্রশ্ন-খানার উত্তরটি তোমার-আমার কথার এ-পিঠ ও-পিঠের বক্তব্য থেকে বুঝে নিতে পেরেছি সুন্দর ক'রে। আর মধুরেতে। ও নিয়ে আমার মনে আর কোন প্রশ্ন নেই। শোন, আমাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছে দেখা যায়, যারা গল্প-উপন্যাসে দর্শনের কথা থাকলে পর বলে, গল্পের —রসগত বিপর্য্যয় ঘটে আমি কিন্তু তা মনি না। সব কিছুই যদি আটপৌরে হয়, তা হ'লে বল কোথা থেকে আর কী ভাবে মিটবে আমাদের মনের উদারতা? তারই বিস্তৃতি? তারই ভাববার জন্যে ক্ষমতার? সৌমিত্র, তোমার মতো আমি বিশ্বাস করি, বই থেকে যা কিছুই আমরা পড়ি না কেন, অন্ততঃ তার মধ্যে দিয়ে যেন আমাদের ভাবনার

শক্তিটিকে ধীরে-ধীরে ক'রে তোলাতে পারি—সক্রিয়। পড়লাম। ও ভুলে গেলাম। কোন কিছুটি ভাবাভাবির ধার ধারলাম না! এ ত' আমার মতে মোটেই স্বাভাবিক নয়। শোন সৌমিত্র?"

বলতে বলতে দু'হাতের ঘন করা বাঁধনে রূপা তার প্রিয়র গলায় যেন পরিয়ে দিয়ে রেখেছে আদরের মাল্যবাঁধন। দু'চোখে উপছানো সন্ধ্যারাগ থেকে ঝলসানো চাহনিতে দেখতে দেখতে—তারই প্রিয়র অনেক আগে করা একখানা আবদারের রেশ টেনে রূপা বললো—

—"এই সৌমিত্র, আজকের এই শুভ সন্ধ্যায়, তুমি আমার কাছে অনুযোগ করেছিলে এই নিয়ে, যে,—বিবাহের জন্য আমরা যখন বাগদানেতে পরস্পরের প্রতি বাঁধা আছি, হ্যাঁ, তখন তোমার দু'চোখের যুবকোচিত আর্তিতে নাচা অনুসন্ধানী যৌবনময়তার সামনে—কেন বিবাহের আগেতে আমি বিবাহের পরেকার মতো স্বাভাবিকা হোতে চাইছি না! তাই ত? আমার কেন এই অনিচ্ছা? শোন সৌমিত্র, বলি, বি জুডিশাস! দেখ, তুমি আমায় বিয়ের আগেই ত' অনেকটা পর্য্যন্ত পেয়ে গেছো। আমি পেতে দিয়েছি তা এই মধুরেরই সুন্দর ভুবনে এই কথাটি ভেবে, যে তুমি, হ্যাঁ তুমিই হ'লে আমার বাগদত্ত। আমি তোমারই—বাগদত্তা। সৌমিত্র, আমি বলি কি, এরই মধ্যে তোমার অতি দুষ্টু-দুষ্টু যৌবনিক দুরন্তপনাগুলো ত' আমার অধরের ওপর দিয়ে—কৌমার্য্যের লজ্জারাগখানাকে বারেবারে কেড়ে নিয়েছে তোমারই মধুর থাকা—দস্যিপনায়। শুধু কি তাই সৌমিত্র? আমার দুষ্টুমান, তুমি ত' তারই মাঝে-মাঝ—সাংঘাতিক ভাবে ডাকাতি ক'রে ক'রে—প্রিয়ার বুকের লজ্জাধারেরই লাজভারখানকে অতি নিলাজতায় কী নিজের হাতের তপ্তঝরনাতে আবরিত করা ও নি? ওগো সৌমিত্র, যতদিন না আমিতোমায় আমারই সিঁথিতে লাল আঁকখানার পবিত্র পরিচিতিখানা ফুটিয়ে—যুবতীত্বে দেবিকা হওয়ার পর তোমায় দেবতাতে অভিষিক্ত করাতে পারছি,—হ্যাঁ, সেই কিছুদিন শুধু আমায় নিয়ে জানাজানিতে ক্ষ্যান্ত থেকো।—এ পর্য্যন্ত করা দস্যিপনা নিয়ে।—দুষ্টু, শোন। এর বেশী আর চেয়ো না। আমায় নতুন থাকতে দেও। আমার লুকানো রহস্যময়তায় আমাকে অজানিতাই কোরে রাখ। এখনি যদি সব জানতে, আর সব চেনাতে আমায় পুরনো করাও—বলি, তবে নতুন যে থাকবে না বিবাহের 'nuptial bed'-খানার জন্য! জান, জুলস্ রেমঁর এক নায়িকা, নাম যার লুসিয়ানা, হ্যাঁ, যেমন ক'রে সে তার দয়িত পিঁয়েরকে যা বলেছিল, তাই মনে ক'রে তোমায় জানাচ্ছি। সৌমিত্র... 'you must understand. In the past, when sometimes I happend to think of marriage, I knew

of course there was a physical side. But it seemed to me more a sort of accompaniment to the rest, not a simple detail of course, but an aspect, among others, of the new condition. And I go on assuring myself that that is the rational way of seeing it. But it is no longer what I feel. Now, when I think of it, when I repeat such words as 'marriage', 'married', or 'husband'...I tell you...." সত্যিসত্যি তবে কি জান সৌমিত্র, ঐ লুসিয়ানার মতো আমি মোটেই ঐ কথা সমাপ্ত করার জন্য বলবো না...'it terrifies me a little.'—ভালোবাসা থেকে বিবাহ সম্পন্ন হচ্ছে—বলি, তাতে আবার ভয় পাবো কেন? আর ভয় আছে বলেই বা ভাববো কেন? ভালোবাসা কোন দিনও এ ভয় থেকে জন্মাতে পারে না যেমন,—তেমনি ভালোবাসা একবার গড়ে উঠলে পর তার মধ্যে কণামাত্র ভয় বা ভীতিবিহ্বলতার অবস্থিতি সম্ভব নয়।"—একটু থেমে রূপা হাসিতে নাচতে নাচতে বলল—"জান, রেমঁর নায়িকা লুসিয়ানার মতো প্রথম দিককার সব কথাগুলো বলার পর—বিবাহিত জীবনের সম্পর্কে জাগানো চিন্তার রণন ধরে বলতে পারি, 'It puzzles me a little.'—এই আর কি। ও জীবনটা যে ভাবে যৌবনের লীলাবাসর সাজাতে চাইবে পরবর্তীকালের মিথুন কথায়, হ্যাঁ সৌমিত্র তুমি বল না, তা কী এই আজকের জীবনের কাছে অভিনবত্বে ঘেরা এক মস্ত বিস্ময়ের সাজঘর বলে মনে হয় না?—আমার তা মাঝে মাঝে হয় কিন্তু। আর তার জন্যই বুঝলে লক্ষ্মীটি— তোমার চাওয়া-পাওয়ার অতি যৌবনিক দস্যিপনার দুরন্ত ঝড় থেকে অন্ততঃ সেদিনের জন্য নিজেকে রাখতে চাইছি—নতুন। কেন জান সৌমিত্র? শোন, এই দুষ্টু, হ্যাঁ, বিবাহের জন্য যে পবিত্র বিছানায় সেদিন আমি তোমারই কাছে নিজেকে মিলিয়ে-মিশিয়ে দিতে দিতে—নিজেরই দেহমনের কোথাও রাখবো না কণামাত্র লজ্জার রেশ,—ওগো মধুর, ঠিক তখনই জানবে আমি আমার সব নতুনত্ব তোমার মধ্যে সঁপে দেওয়ার পর—হয় ত' আরো লাজহীনা হোয়ে—রেমঁর নায়িকা—ঐ লুসিয়ানার মতোই নিজেকে 'I try to re-live our contact, and seek it in those moments when it was its most perfect. As when we talked most tenderly? But then the words mattered to us. When we looked at each other in silence? But soon our lips drew closer and then joined.' হ্যাঁ, সেই মাদকবিহ্বল মুহূর্তটিতে—নিলাজক তুমি এমন কঠিন বাঁধনের নিগড়েতে আমায় জড়াবে, যে, সত্যি তোমার এই অতি অলাজুকার প্রতি.......'that embrace sufficed but for an instant. Then I must think of the nuptial bed, of the closest intermingling, when not even a morsel

of linen can be tolerated, when even a scrap of ribbon attenuates the embrace. Breath intermingles. Brow rests on btow. And an exchange takes place o such a nature that for a time a whole region of two bodies, profoundly, glowingly, belongs indifferently to both. What more can one desire? What is lacking? Brow against brow. Yes, the two heads seem to be seeking each other also, desiring each other too. They support each other. And the soul, are they not marvellously uplifted? Yes, they profit too. But I ask myself if thereafter they do everything they can?'— এই পরের ধার করা কথাতে জানিয়ে দিলাম তোমার প্রতি—আমারই যুবতী ধরমে লালিত রাখা কথাটি! শুধু শুধু মুহূর্তকের যুবকোচিত বয়েসের ভ্রান্তিতে নেমে—কেন এখনি আমার সব রহস্য, আর রোমাঞ্চ ভেঙ্গে-ভেঙ্গে জানার মধ্যে দিয়ে, চেনার মধ্যে দিয়ে অনর্থকই করাবে—পুরনো? যদিও মহাকবির বিশ্বজনীন কথায় আছে—'নতুন করিয়া লহ আর বার চির পুরাতন মোরে,....নতুন বিবাহে বাঁধিবে আমায় নবীন জীবন ডোরে।'—হ্যাঁ সৌমিত্র, ভুলে যেও না যে, এ বাণী তাদেরই জন্য রচিত হয়েছে যারা বিবাহের বাঁধনে থেকেও—ভুল পথে চলে আসায়, পুনরায় ক্ষমাসুন্দর আর্তিতে যাতে আগের বৈচিত্র্য ফিরে পায়—তারই জন্য নতুন বিবাহের বাসরখানা তৈরি করার আছে মস্ত প্রয়োজন। হ্যাঁ-হ্যাঁ। আমি বলি এটাই, যে, সংসারের হাজার খুঁটিনাটির মধ্যে মুহূর্তের জন্য দম্পতিদের সাহচর্য্য—পরস্পরের কাছে হ'য়ে দাঁড়াতে পারে—একঘেয়েমিতার। আর পুরনো হওয়ারই জন্য—বৈচিত্র্যহীনতার প্রভাবগত! সংসারে বাঁচতে গেলে এমনটাও হ'তে পারে—খুবই স্বাভাবিকে। তখন তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার পথ হ'লো নতুনের মধ্যে—নতুনেরই আর্তি ভরিয়ে বিচিত্রায় মধুবাসর যাপন করানো। তা হ'লে সৌমিত্র, লক্ষ্মীটি আমার, মন দিয়ে বিবাহপরবর্তী এমন কিছু ব্যাপারটির অপ্রতিরোধনীয়তাকে একবারটি অন্ততঃ ভাবার চেষ্টা কর। তা' হ'লেই বুঝতে পারবে এটিকে, যে, বিবাহ করার পরেও যখন যুবকের কাছে তার যুবতীর প্রকাশ হাবে-ভাবে—সংসারেরই কাঁটাজালেতে বিক্ষত হওয়ায় সৃষ্টি করাতে পারে একঘেয়েমিতার অস্বস্তিটি,—হ্যাঁ, তখন কী এটা ভাবলে অন্ততঃ আমাদের পক্ষে ভালো নয়, যে, এখনই নিজেদের আপন আপন মন ছাড়িয়ে,—দেহময়তায় ভরিয়ে—গোপন রহস্যময়তারই দোসর হওয়াটা থেকে বিবাহের আগে সাততাড়াতাড়ি যদি এনে দেয় পুরনো হ'য়ে পড়ারই--সেই অস্বস্তিকর একঘেয়েমিতাকে? বলি, দুষ্টু ছেলে, একবারটি অন্ততঃ ভেবে দেখো—এই

ব্যাপারটিকে? না, না। আর কোন কথাটি নয়। তুমিও তাই থাকো। আমারই জন্য নতুন। হ্যাঁ, স্বভাবে নতুন। কিভাবে নতুন। প্রকাশে নতুন। মায় যুবকত্বের এক আনকোরা শরিক। হ্যাঁ। মধুর, তাই তোমার ঐ শরিকানা নতুন থাকবে হাজার বৈচিত্র্যে। ঠিক সেদিনকারই লাজবাসরটির জন্য।—সেদিন তুমি তোমারই জন্য চিরনতুন হোয়ে প্রতীক্ষিতা এই আমারই দেহমঞ্জিলেতে—নতুনের যৌবনানুসন্ধানখানা সম্পূর্ণ করাতে পারবে—লাজে আর নিলাজে। মিতা, কি গো, তাই ত?"

একটু থামলো সুনন্দিতা প্রিয়া। অধরে কথার রেশ ফুরালো সত্যি।—কিন্তু তার লাল আঙ্গিনা ভরানো যুবতীর দুষ্টুপনা প্রিয় সৌমিত্রর মুখে-চোখে—আছড়ে পড়তে চাইলো দুরন্ত হ'য়ে। দুর্বার হ'য়ে। লাল মাধুর্য্যে।

কিন্তু রূপাকেও ধাঁধিয়ে দিল সৌমিত্রর প্রণয়বিহ্বলতাটি। প্রিয়াকে চুমায়নে টেনে নেবার জন্য—ও-ই হ'লো আগে ঝড়। কেন না প্রিয় যদি আগে ঝড় না হয়—তা' হ'লে কিসের তাণ্ডবে রূপার ভেতরের দুরন্তময়তা হবে—তুফানীর মতো? ঝড় শেষ হ'লো। আর তারপর তুফানেরও দস্যিপনা ক্ষ্যান্ত হ'লো। তখন সৌমিত্র বললো—প্রিয়ার কপোলে-চোখে-গলায় আদর করারই ছাপগুলোকে—রুমাল দিয়ে ভালো ক'রে মুছে দেওয়ারই অভিলাযে মেতে উঠে—

—"দেখ, রূপা? জানি, তুমি এ ব্যাপারে আমায় কখনো ভুল বুঝবে না। এই কথায়-কথায় তোমায় কিছু বলেছিলাম আর কি! এ ব্যাপারে শুধু এটুকু জানবে, যে, তোমার বিন্দুমাত্র বৈচিত্র্যের অভাব আমি কখনোই দেব না ঘটতে। তুমি নতুন থাকো অচিরেতে ঘটতে চলা—আমাদেরই বিবাহ-উৎসবখানার জন্য। জান, আমি চাই আমাদের এই দু'-ধারার যৌবন—অজানায় আর অচেনাতেই থাকুক—ভার্জিন। পবিত্র। এটাই আমার ভালোবাসার দর্শন। জান ত' রূপা, আমরা দু'জনাই যে বিবাহ-বাঁধনের জন্য—আমাদেরই মা-বাবাদের—কাছে বাগদানের ব্যাপার হ'য়ে আছি। হ্যাঁ মিষ্টিকা, সেই ঘটতে চলা শুভমিলনের বিবাহ সম্পর্কে—আমার মন—লর্ড বার্ট্রাণ্ড রাসেলের কথাখানাকেই ধ্রুব সত্য বলে মানে। তাই মহাপণ্ডিত ও আজকের দ্বন্দ্বে-দ্বন্দ্বে বিক্ষুব্ধ এই পৃথিবীরই এক রকম শেষ মহামানব—ঐ লর্ড রাসেলের কথাতেই বলতে চাই, যে, যুবক-যুবতীদের রামধনুর সাত রঙে ছাওয়া দাম্পত্য জীবনেতে—নির্ঝরের প্রবাহে সুখ তখনি প্রবাহিত হয়—যখন দম্পতিদের সবুজ আঙ্গিনার ভালোবাসার মধ্যে আসে ....'must be a feeling of complete equality on both sides; there must be no interference with mutual freedom; there must

be the most complete physical and mental intimacy; and there must be a certain similarity in regard to standards of values.' এই, শুনলে? হ্যাঁ রূপা, তাই দৃঢ় প্রত্যয় থেকে বলতে চাই লর্ড রাসেলের বিবাহ-সম্পর্কিত নিবন্ধখানার শেষ বচন থেকে, যে, 'I believe marriage to be the best and most important relation that can exist between two human beings. If it has not often been realized hitherto, that is chiefly because husbands and wives have regarded themselves as each other's policemen. If marriage is to achieve its possibilities, husbands and wives must learn to understand that whatever the law may say, in their private lives—they must be free.' — কী রূপা, এই কথার ভেতর দিয়ে এ যুগের শেষ জীবিত মহামানব তাঁর বিদেশের চৌহদ্দি ডিঙ্গিয়ে আপন দার্শনিক শ্রেষ্ঠত্বের পরিচিতি সমেত সংসারের 'বিবাহ' সম্পর্কে যে বক্তব্য রেখেছেন—তা নিশ্চয় ভুলে যাওয়ার কথা নয়?"

রূপা তখন আবেশ ভরিয়ে নিজের মাথাখানা প্রিয়র কাঁধেতে নামিয়ে রেখেছে। আর আপন বাগদত্তের মুখে-গলায়-হাতে নিজের আঙ্গুলে ভরা নরম আদর মাখাতে মাখাতে কথায় ঝলমলালো—"এই? সৌমিত্র, শুধু কী ও কথা তোমারই প্রিয় বক্তব্য? জানবে আমারও। দার্শনিক বল, ঋষি বল, মস্ত এক গাণিতিক বল, philanthropist বল, বিরাট সমাজসংস্কারক বনাম মানবতা রক্ষার সৈনিক, ও আণবশক্তিসমূহের দাবানল বন্ধ করার জন্য এক 'octogenarian' বিপ্লবী থেকে মায় যুগন্ধর গল্পলেখকই বল না কেন—সর্বোপরি পরিচিতির বার্ট্রাণ্ড রাসেল হ'লেন সেই বিগত যুগের শেষ মহামানব—যিনি আমাদের মধ্যে আজও রয়েছেন। তাঁর বহু দামী দামী রচনার মধ্যে 'Marriage And Morals' নামী বড় বইখানা—হ্যাঁ, যার থেকে তুমি তোমার বক্তব্য উদ্ধৃত ক'রে জানালে, তার ব্যাপারে আমি ভাবি—এ-দেশের আমাদেরই বয়েসীরা লর্ড রাসেলের আর কোন বই পড়ুক আর নাই পড়ুক—অন্ততঃ একবারটি যেন এই বইটিকে পড়ার মাধ্যমে ভালোবাসার চেষ্টা করে। তুমি ত' জান সৌমিত্র, সমাজের নানান ছোট ও বড় ব্যাপার নিয়ে কোনটা ন্যায় আর কোনটা অন্যায়, কোনটা প্রযোজ্য আর কোনটা প্রযোজ্য নয়—এমনি ধারায় চলতে চলতে লর্ড রাসেলের অননুকরণীয় মনীষা যে ভাবে 'ভালোবাসা' ও 'বিবাহ' সম্পর্কে বিশ্লেষণ তৈরী করেছে—তারই পরিপ্রেক্ষিতে ঐ 'Marriage And Morals' গ্রন্থটি—আগাগোড়া আমায়ও ভাবিয়েছে। ভালোবাসতে শিখিয়েছে। আর অনেক বিষয়েতে নিজের ধারণা তা পড়ার মধ্যে দিয়ে তৈরী করাতেও পেরেছি। শোন সৌমিত্র, বিবাহের'পর যে ভালোবাসা

মিথুনের জন্য অতি স্বাভাবিক ছন্দেই দুরন্ত আর দুর্বার হ'তে চায়, তা কিন্তু জোরালো রকমেরই কারণ থেকে আসায়—অমনটা হ'য়ে থাকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। দেখ, মিথুনেতে হওয়া দুরন্ত আর দুর্বার প্যাশনকে কিন্তু নিন্দা করাটা হ'ল—অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গী। লর্ড রাসেলও সে কথা বলেছেন। আর তোমার মতো আমিও তা স্বীকার করি। তোমার লর্ড রাসেলের এ সম্পর্কে করা অভিমতটি পড়া থাকলেও—হুবহু তা মনে আছে কিনা জানি না। যদি না থাকে, তা হ'লে লক্ষ্মীটি আমায় একবারটি স্মরণ ক'রতে দেও। হ্যাঁ মনে পড়ছে। মহামানব লর্ড রাসেল লিখছেন, যে, 'Passionate mutual love while it lasts puts an end to this feeling; it breaks down the hard walls of ego, producing a new being composed of two in one. Nature did not construct human beings to stand alone, since they cannot fulfil her biological purpose except with the help of another; and civilized people cannot fully satisfy their sexual instinct without love.' এই সৌমিত্র, জান কেন তা ভালোবাসা ছাড়া সার্থক হ'তে পারে না?—তারই বলিষ্ঠ কারণ দেখাতে গিয়ে লর্ড রাসেল বলেছেন অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে, 'The instinct is not completely satisfied unless a man's whole beings, mental quite as much as physical, enters into the relation. Those who have never known the deep intimacy and the intense companionship of happy mutual love have missed the best thing that life has to give; unconsciously, if not consciously, they feel this, and the resulting disappointment inclines them towards envy, oppression and cruelty. To give due place to passionate love should be therefore a matter which concerns the sociologist, since, if they miss this experience, men and women cannot attain their full stature, and cannot feel towards the rest of the world that kind of generous warmth without which their social activities are pretty sure to be harmful.'—হ্যাঁ সৌমিত্র, মানুষের জগতে তাদেরই বিবাহিত জীবনের সম্পর্কে করা লর্ড রাসেলের এ সব বক্তব্য মণি-মুক্তরাই মতো খাঁটি। নিখুঁত। রাসেলের এই সব ব্যাখ্যার অনেক আগেই ত'—স্বামী বিবেকানন্দ এমন সব কথাও বলে গেছেন। বিবেকানন্দ কঠোর ভাবেই বিশ্বাস ক'রতেন, যে, মানুষ তার যৌবনের উৎসমুখে যে ভাবে ভালোবাসার পূর্ণতা আনতে চায়—বিবাহেরই সাত-পাঁচ কানুনের আঙ্গিনাটিতে, হ্যাঁ, তার থেকে উৎসারিত সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে স্নাত

ভালোবাসাই হ'ল—পৃথিবীর সবরকম ভালোবাসার—ওপরেরই জিনিস। জানো ত' সৌমিত্র, বিবেকানন্দ এ ধরনেরই ব্যাপক কথালাপে—নারী জাতির পরমা-প্রকৃতি-রূপা ভগিনী নিবেদিতাকে তা জানিয়ে গেছেন। এই মহীয়সী সমাজ-সেবিকা বনাম প্রখর রাজনীতিজ্ঞা ও বিপ্লবিনী—ভগিনী নিবেদিতা তাঁর 'Notes on Some Wanderings' নামী বইটিতে অতি মনোজ্ঞ ভাষায়—পুরুষ ও রমণীর বিবাহ সাপেক্ষ ভালোবাসা —পুণ্যশ্লোক ধরে-ধরে যে যৌবন-দৃপ্ততার দীপ্তময় ভুবনখানা তৈরী করায় দম্পতিদের 'মধুরা রতি'—যাকে বিবেকানন্দ মনে ক'রতেন সব ভালবাসার চাইতে শ্রেষ্ঠতম।—হ্যাঁ, তারই লিপিবিন্যাস সাজিয়েছেন। শোন সৌমিত্র, যৌবনের যে বিরাট সফলতা অনিবার্য্যতায় নিহিত থাকে—দুটি দু'ধারার যৌবন নিয়ে বিবাহিত রীতিকারই নিঃস্বার্থ ও পুণ্যতোয়া ভালোবাসায়—হ্যাঁ, তারই পক্ষে জানানো বিবেকানন্দের অকাট্য যুক্তি নিয়ে নিবেদিতা লিখে গেছেন,—'Again his subject was marriage, as the type of the soul's relation to God–"This is why", he (Vivekananda) exclaimed, "though the love of a mother is in some ways greater, yet the whole world takes the love of man and woman as the type. *No other has such tremendous idealising power.* The beloved actully becomes what he is imagined to be. This love transforms its object.' আচ্ছা সৌমিত্র, যাঁরা শুধু আমাদের দেশ কেন, যাঁরা সারা পৃথিবীর জ্ঞানী-গুণী মায় জনসাধারণের অতি কাছে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার প্রমূর্ত বিভাস হ'য়ে আচেন আজও—সেই স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা পর্য্যন্ত যে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব রকম ভালোবাসার চাইতে—পুরুষ সকাশে রমণীর বিবাহিত জীবনেরই নন্দিত ভালবাসাবাসিকে —শ্রেষ্ঠতম বলে বিশ্লেষিত করাতে পেরেছেন,—সত্যি তা পড়তে পড়তে আর ভাবতে ভাবতে—আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছি বারে বারে। জান ত' সৌমিত্র, দুই যখন দ্বি-ত্ব ছেড়ে একের মধ্যে লীন হ'তে চায়, বা সঙ্গত হ'তে চায়, বা সঙ্গতে থেকে জাগা অপ্রতিরোধনীয় সম্ভোগেরই দোসর হ'তে চায়—তখন এ সবেরই মূল লক্ষ্য হ'লো—'মিলন'। ছন্দে ঘেরা। যতিতে বাঁধা। মীড় আসে। গমক ঝরায়। আর ঝলকায়। আর তারপর জাগে মূর্ছনা। আর এই শেষটিই হ'লো—মিল। সুছাঁদ। গ্রন্থি। সুন্দর ক'রে শুধু বলবো—মিলন। Union. জান মধুর, 'মিলন' কথাখানা আমার মতে পৃথিবীর অন্য কোন ভাষার তর্জ্জমায় এত মিষ্টি ক'রে বাজবে না কানেতে। এ 'মিলন' ভাবের হোক, কি ভাবসম্মিলনের হোক, কি ভক্তির বা শ্রদ্ধার হোক, সে সবই কিন্তু আমার মতে যৌবনকালের মধুছন্দা

বাসরে অভিষেক করানো যুবক ও যুবতীর বিবাহিত আঙ্গিনায় সুসম্পন্ন করার—সেই তাদের এহেন 'মিলন' সম্পর্কে মহীয়সী নিবেদিতা বলেছেন তাঁর 'Meditations of Triumphant Union'-এ এটাই, যে, 'And union is not an act. It is a quality, inherent in the natures that have been attuned.' জানবে সৌমিত্র, এই মহীয়সীর কথাখানাই প্রযোজ্য—নর-নারীর যৌবন-বাসরের বিবাহিত সংযোজনায়। তারই মিথুনিক মিলনে। আমি অচিরে তোমার সাথে বিবাহিতা হ'য়ে—আমারই যুবতীকা থেকে মিথুনের রিমঝিম ছন্দখানা 'মিলনে' বাঁধাবার জন্য—তোমারই যৌবনময় কারুকলাকে কোরবে না ককনই—প্রতিহত। অস্বীকৃত। না, না।—আমার দেহে-মনে লাজময়তা যতই আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়েই থাকুক না কেন—তোমার সাথেতে লীলাবাসর ফোটানো 'মিলনে' আমি নিজেকে ঐকান্তিকতারই আন্তর তাগিদে—সঁপে দেবো। আর তুমি আমাদেরই বিবাহিত-যৌবনাকুতির—প্রণয়-ঝড়ে অটল ও অনড় থেকে সম্পন্ন করাবে নিবেদিতা-ভাষ্যের সেই প্রকৃতিগত ও দত্ত 'inheritence'—যা আমাদেরই মধ্যে সবুজের আঙ্গিনা জুড়ে 'have been attuned.'—এই মিল কখনো বিচ্ছিন্ন হওয়ার নয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঠিক তাই। এ পুরোপুরি থেকে যায়—সুরলহরযুক্ত। নয় গো বেসুরো। নয়—tuneless. তা ছন্দে তৈরী। তা সুরে গাঁথা। শোন সৌমিত্র শোন আদর। এই সুরেরই রেশ ধরে—বিখ্যাত বই 'Seven Faces of Love'-এর মনীষী লেখক আঁদ্রে মাঁরোয়াও কিন্তু এমনই ধরনের এক বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণ্ রেখেছেন। 'বিবাহ' সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ, নিবেদিতা বা লর্ড রাসেলের মতো মাঁরোয়া নিজেও তাই লিখেছেন। তা শোন সৌমিত্র। মনে পড়ছে বিবাহিতদের ভুবন যাতে তাদের সমাজের মঙ্গল প্রতিষ্ঠায় শক্তি সঞ্চারণ করাতে পারে—তাই তিনি জোরের সঙ্গেই যেন বলেছেন, যে, 'It the art of loving is that transforming a fugitive desire into a lasting emotion, we must consider the case of a man experiencing this desire to whom the law says : "Stop! You cannot yield to your natural instincts unless you sign a contract legally binding you to the woman you desire and to the children who may be born of your union with her.'—কী গো সৌমিত্র, ছেলে হ'য়ে তুমিই বল না এমন কট্টর যুক্তিখানাকে অন্য কোনও ভাবে কাটতে পারবে? না, না।—পারবে না। তাই বলি সৌমিত্র, তুমিও আমায় আমাদের বিবাহের পর দাম্পত্য-যৌবনের ঋদ্ধি ধরে-ধরে—তোমার এই 'দুষ্টুকা' স্ত্রীর প্রতি সমর্পিত রাখবে—তোমারই বুকেতে নিজেকে লুটিয়ে রেখে মুখের চুমায়-চুমায় বিপর্য্যস্ত ওষ্ঠরঞ্জনীতে—অধরের মধ্যে

জাগা কাঁপা কাঁপা হাসির ভেতর গুনগুনাবো—অলডাস্ হাক্সলির নায়িকা সেই শ্রীমতী লেনীনার মতো। কাটা-কাটা ভাবে মূর্ছনা ফুটিয়ে বলবো বুকের বাঁধনে মাতা আশ্লেষ আরো নিগূঢ় করাতে করাতে—"ওগো আদর, ওগো দুষ্টু। তুমি, হ্যাঁ, আমার মিষ্টি তুমি এখন শুধু—

'Hug me till you drug me, honey;
Kiss me till I'm in acoma :
Hug me, honey, snuggly bunny;
Love's as good as *Soma.'*

হ্যাঁ, হ্যাঁ। অবাক হ'য়ো না। জান সৌমিত্র, এই 'soma'-র মানে তুমি যা ধরেছো তাই ঠিক। এ হলো প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ও সংস্কৃতির সেই জ্ঞানী মহাপুরুষ, সাধক, তপস্বী ও তপস্বিনীদের জীবনে—যৌবনকে অটুট রাখার ও কর্মযোগে শতধায় শক্তি যোগাবার—সেই 'সোমরস'। দেবরাজ ইন্দ্রের পারিজাত কানন ও রাজসভায়ও ছিল এর সদ্‌ব্যবহার। এর মাদকতা চলৎশক্তির চরম উদ্দীপনা ও স্বতঃস্ফূর্ততাকেই এনে দিতো—সেদিনকার সুরসভায়। জান ত' সুরলোকবাসীদের জন্য ছিল এই সোমরস। তাপসমার্গের সাধনা ও সিদ্ধির ঋদ্ধিময়তা অর্জনে—এই 'সোমরস' ছিল ধর্মীয় উপাচারেরই শাস্ত্রীয় অঙ্গ। মনীষী হাক্সলি তাঁর নায়িকার মুখ দিয়ে কবিতার সুরলহর সাজিয়ে—এই 'সোমরসে'র ভাষ্য দিয়েছেন। জান ত' উনি ভারতবেত্তা ছিলেন। কাজেই তাঁর জ্ঞানের জগতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিটি বিষযই ছিল নজরবন্দী। হ্যাঁ, হ্যাঁ।—তাই বলি কি সৌমিত্র—তাই বলি কি সৌমিত্র তুমিও তাপস হ'য়ে অচিরের ঐ বিবাহ-বাসরেতে আমারই প্রণয়ে-প্রণয়ে ক'রে তোলাবে—সেই 'সোমরসে'র মাদক প্রাণোচ্ছলতায় আবরিতা। কেমন?—এই? আদর কর। শুধু ছোট একটুখানি দুষ্টুমিতে। কণামাত্র দুরন্তপনায়।"

কথা থামিয়ে দুষ্টুকার মতো ঝলমলালো রূপা। লাল লাল ঠোঁট দু'খানায় মুক্তার মতো ঝকঝকানি ফোটালো।—আর তখনি দেরি না ক'রে সৌমিত্রর যুবকাধর ছোট্ট একটুখানি দুষ্টুমিতে আদর জানিয়েই—কথায় মুখর হলো—"নিশ্চয়। নিশ্চয়ই। রূপা, আমার রাগমাধবীকা। তুমি এই বয়েতখানা জান ত'—যাতে আছে—

'সাকী বেয়ার বাদহ্ কে আমদ জমান-ইগুল।
তা বশু-কুনীম তৌবাহ্ দিগর্ দর্ মিয়ান-ই-গুল।।'

এই রূপা, শোন। এর মানেটা হলো—'প্রিয়া। এখন পুষ্প ফোটার দিন এসেছে। তাই তুমি প্রাণ-সরাব আন। আর তাই আমি সমস্ত বিবাগী ভাব এই

বসন্তে ছেড়ে দিলাম।'—কেমন, তোমার লেনীনার কথার পিঠেতে বেশ সুন্দর ক'রেই বসালাম না এই বয়েতটিকে?"

স্ট্র্যাণ্ডের চারধারে রাত ঘন হয়ে উঠছে। মাদকতা ছড়াচ্ছে। মোহনীয় হচ্ছে। বিলোলিত করাচ্ছে। অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা জাহাজখানার সার্চ লাইটটিকে দেখা গেল—অপর পারের দেখতে না পাওয়া তীরের ধারে-পাশে—বার কয়েক ফোকাস্ ফেলতে। আর পাশের রাস্তাটি অসম নির্জনতার আঁধার রঙ্ মেখে লম্বা হ'য়ে যেন ঝিমুচ্ছে। সেই সাতসকাল থেকে আরম্ভ ক'রে—তার পিচের মসৃণ আস্তরণে ঢাকা বুকের ওপর দিয়ে-দিয়ে—অগণিত যান-বাহন চলাচল করায়—এখন যেন খুবই ক্লান্ত হ'য়ে জিরিয়ে নিচ্ছে। এই একটু সময় যা ফাঁক থাকে। তারপর অন্ধকার রাত থাকতে-থাকতেই ত' ক'লকাতার জন্য আনাজ-পত্রে লাফাতে লাফাতে, দুলতে-দুলতে। চলবে হাজার পরিবহণ তাই এখন অবসর পেয়ে মসৃণ পথটি যেন বিশ্রাম ক'রছে।

রূপা প্রিয়তমর বুকের কবোঞ্চতায সুখী থাকতে-থাকতে বলল—"এই? মাঝ গঙ্গার আঁধারের দিকে তাকিয়ে থেকে কী কিছু দেখছো? না ভাবছো? বলি, না কী আমার ওপরে নতুন ক'রে অন্য কিছু দুষ্টুমি করারই কথাটি ভাবছো? সৌমিত্র, এই?"

'ঈষ্। কী যে না তুমি! আমারই বুকের সঙ্গে আদরণীয়া হ'য়ে জড়িয়ে থেকেও তুমি খালি 'এই' আর 'এই' বলে ডাকছো কেন? ঈষ্। আর আদর চায় না রূপা। এই রূপা, কিছুটি বলবে?"

আঁধারের আলো অধিক কক্ষপথেতে ঘুরতে ঘুরতে সৌমিত্রর ডান হাতের আঙ্গুলগুলো একটা ঠাণ্ডা ছোঁয়া দিয়ে—প্রিয়ার ঠোঁটের, আর গালের আর চোখের নম্রতার মধ্যে বুলিয়ে দিল—আদর। শুধু আদর।

রূপা তার বাঁ হাতখানাকে প্রিয়র ও ভাবে আদর ক'রতে থাকা হাতটারওপরে আলতো ক'রে রেখে জানালো—

"এই? শোন সৌমিত্র। জান, তোমারই জীবনের সঙ্গে পরিণীতা হ'তে বাগদত্তা থেকে-থেকে আজকাল আমার খালি মনে পড়ে স্বামী বিবেকানন্দের প্রণয়-সম্পর্কিত আরেকটি সুবচনী সূক্তিকে। জানো সৌমিত্র, উপনিষদের সূত্রধরে স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন...."None, oh beloved, loves the husband for the husband's sake but for the Self that is in the husband; none, oh beloved, ever loves the wife for the wife's sake, but for the Self that is in the wife. None ever loves anything else, except for the Self." Even this selfishness, which is so much

condemned, is but a manifestation of the same love. Stand aside from this play, do not mix in it, but see this wonderful panorama, this grand drama, played scene after scene, and hear this wonderful harmony; all are the manifestations of of the same love. Even in selfishness, that Self will multiply, grow and grow. That one self, the one man, will become two selves when he gets married, several when he gets children, will become a whole village, a whole city, and yet grow and grow until he feels the whole world as his Self."—বল, বল সৌমিত্র, এর মধ্যে আর তারই প্রিয়া-স্ত্রীর মধ্যে ঠিক এমনি ভাবে ভালোবাসার সার্থকতা কী এসে যায় না?—এক আর একাকী হিসাবে সত্যি যৌবনকালের নিঃসঙ্গতা কাটিয়ে উঠে—আমরা তখন বিবাহের ভুবনেতে আর আলাদা আলাদা দুখানা স্বত্বা না থেকে—যুবক স্বামী ও যুবতী স্ত্রী—যৌবনায়নে লাজাঞ্জলি দিতে-দিতে মিথুনায়নে এক ও অদ্বিতীয় রূপ নেই।—পুনরায় সৃষ্টিতে হই স্রষ্টা ও স্রষ্ট্রী। বলি সৌমিত্র, তখন কী আমরা একটা বড় পৃথিবীর কাছাকাছি পৌঁছে যাই না—প্রণয়ে-প্রণয়ে? দুই হ'য়ে সৃষ্টির জন্য যৌবনাকুতিতে সব স্বত্বারই একাকার করায়—লাজমুখর অয়নে চলতে চলতে যে সৃষ্টি পরম্পরা ফোটানো হয় অশেষ নিলাজক-আহ্লাদে আর আবদারেতে,—হ্যাঁ, তাই ত' হোল বিবাহিত ভালোবাসাবাসির—চরম সার্থকতা। হ্যাঁ, হ্যাঁ।—তাই দুই আর দুই না থেকে—এক হোয়ে-হোয়ে আবার সৃষ্টি-সুখের-উল্লাসেতে ক'রে বসে—অপরাপর নতুন নতুন প্রাণকণার জন্য সাধনা।—মধুরে ও সুন্দরেতে হ্লাদিত সৃজনেরই অন্বয়ে ও অয়নেতে। এই? সৌমিত্র, বলি তুমি কী অন্য কিছু বলতে চাও?" বলতে বলতে প্রিয়তমর মুখের আদল ভরিয়ে নরম-নরম আঙ্গুলের পরশ মাখাতে মাখাতে—শুচিস্মিতা রূপা আঁধারের পর্দায় আড়াল ক'রে রাখারই মতো—সুন্দর দেখতে টানা টানা চার চোখের মধ্যে পাতালো—চাহনির অন্তর্ভেদী মিতালি।

প্রিয়ার শুচিস্মিত মুখখানার ওপরে ঝুঁকে পড়ে কপোলেতে মুখ লাগিয়ে—ছোট্ট দু'একটা সিক্ত ছোঁয়াচ টেনে টেনে বলল সৌমিত্র—"আমিও অন্তরে অন্তরে এ সব মানি। অনুভব করার চেষ্টা করেছি। আচ্ছা রূপা, তুমি বিবেকানন্দের লেখা থেকে 'adage' ধরনের যে গভীর কথা শোনালে, বলি, তার পরের আর কিছুটি কী পারছো মনে করাতে? ঠিক আছে। আমার কাছ থেকে শোন তা' হলে। শোন মধুমিতা। বিবেকানন্দ শেষটায় ঐ আগের মতো উপনিষদীয় শ্লোকেরই নির্য্যাস নিঙাড়িয়ে বলেছেন, 'Thus sang the royal Hebrew sage, and thus sang they of

India also : "Oh beloved, one kiss of Thy lips! Kissed by Thee, one's thirst for Thee increaseth for ever. All sorrows cease and one forgets the past, present and future, and only thinks of Thee alone." That is teh madness of the lover, when all desires have vanished. "Who cares for salvation ? Who cares to be saved ? Who cares to be perfect even ? Who cares for freedom ?"—জান ত' রূপা, ভালোবাসা যখন মানবিক চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে দিয়ে—এমন ভাবে সুন্দর হ'য়ে আর উদারতায় মাধুর্য্য ছড়িয়ে এগুতে পারে,—হ্যাঁ, ঠিক তখনই ভালোবাসার চরম সফলতা অর্জিত হয়। আমি বলি কী, বিবাহের পর ঐ দাম্পত্য জীবনখানাকে—তোমায় আমায় মিলিয়ে—মিতাক্ষরা ছন্দের গীতি-কবিতাতে ভরা যৌবনের সবুজ রঙ্ দিয়ে দিয়ে লেখা যে কাব্যখানা রচনায় মাতবো—হ্যাঁ মিতা, বুঝলে, তখন রোজ সকালেতে সাততাড়াতাড়ি ঘুম ছেড়ে উঠে—রোজকার ক'রে সাজানো বাসরঘরখানা থেকে বাইরের বৈটকখানায় ঢুকতে গিয়ে যেন—আমাদের দু জনারই চোখে পড়ে—বিবেকানন্দের ঐ বাণীখানাকে। ওগো রূপা, তুমি তোমার সুন্দর হাতের লেখায় গোটা-গোটা ক'রে—প্রণয়ের রঙে রঙীন লাল কালি দিয়ে কার্টিজ পেপারে তোমার ও আমার মুখ থেকে এইমাত্র জানানো বাণীটিকে এক ক'রে লিখে দেবে। আমি তা কাঁচ দিয়ে বাঁধিয়ে ড্রইংরুমেতে ঝুলিয়ে দেবো। রোজ সকালে ঘুম ভাঙ্গার পর প্রফুল্ল মনেতে আমরা ঘর ছেড়ে বেরুতে বেরুতে তা লক্ষ্য করবো। মনে মনে পাঠ করবো মন্ত্রোচ্চারণারই মতো। আমরা ছাড়া, ঐ ড্রইংরুমেতে আর যারা ঢুকবে, বসবে,—তারাও যেন মনের কৌতূহল মিটিয়ে অন্ততঃ একবারটি পড়ে। আর পড়ার পর যেন একটু ভাবে। আচ্ছা রূপা, আমার এই প্ল্যানখানা কী তোমারও পছন্দসই? বল।"

প্রিয়া তার বুকের পেশলতায় ছন্দিত মুঠো মুঠো আরামকণার ছোঁয়া দিয়ে—প্রিয় সুজনকে বেঁধে রাখতে রাখতে বলল—"এই সৌমিত্র। তোমার খুব পছন্দ এই পরিকল্পনাটিকে, না? কিন্তু শোন, তা হলে আমারও আছে ঠিক এমনি এক পরিকল্পনা। তুমি ত' সকালের কথা বললে। কৈ, রাতের কথাটি ত' বললে না? রাতে যৌবনের বিবাহিত বাসরটিকে ঝলমলাতে—তোমারই মধুর আহ্বানে আকুলিতা হ'তে-হ'তে যখন আমার দেহী অবস্থাটি হবে বিদ্যাপতির শ্রীরাধার মতোই 'তনু পসেবে পসাহনি ভাসলি পুলক তৈসন জাগু/চুনি চুনি ভএ কাঁচুঅ ফাটলি বাহু-বলয়া ভাগু।' বলি, তখন কি ধূপে অগুরুতে ভুরভুর করা ঘরখানার কোন দেওয়ালেতে ঝোলানো থাকবে না এমন কোন মহান বাণী বা 'হোলি ম্যাক্সিম'?—ওগো মধুর যা দেখে আর পড়ে-পড়ে তোমারই জন্য আমি হতে পারবো মুহূর্তেই সমর্পিতা। আরাধিতারই মতো। তা থেকে ভরাতে পারবো

প্রণয়-সঞ্জীবনীর মাদক-নির্ঝর শতেক আহ্লাদে। হাজার আবদারেতে। হ্যাঁ, যেমন তুমিও অই হ'য়ে পারবে—আর চাইবে তা করাতে আমারই জন্য। কী গো সৌমিত্র, বল? তেমন কিছু কী তোমার জানা আছে?" থামলো রূপা। দু'হাতে প্রিয়র মুখের দু'ধার ধরে অঞ্জলি-বদ্ধ করালো আদর জানাতে। সেই অবস্থারই আমেজ নিয়ে সৌমিত্র বলল—"ঈষ্। আমার কিচু জানা না থাকলে বুঝি—তোমার নেই জানাবার মতো কোন সুন্দর এক সূক্তি?"—বলে নিজেও প্রিয়ার মধ্যে উচ্ছলিত থাকা হাসির সায়রেতে ডুব দিল। সাঁতার কেটে বিলোলিত হতে চাইলো—হিল্লোল ফুটিয়ে। নাচিয়ে রাঙিয়ে।

কাকলী ঝরা কথায় ঝকমকালো বরনারী রূপা। বলল—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার জানা আছে। অনেকদিন আগেই মনে মনে ঠিক করে রেখেছি। Maxim-খানা হলো খ্যাতনাম সমাজ-বিজ্ঞানী ডাঃ এফ. আলেকজ্যাণ্ডার ম্যাগুনের। হ্যাঁ সৌমিত্র, শুনবে? শোন। দম্পতিদেরই সাত রঙে সাজানো বাসরঘরের মধুরিক মিলনেতে—যৌবনের দু'ধারা এক হয়ে যে ঝুলন খেলায় কবিতার মতো সুরেলা সিমফনি ফোটায়—নানান রূপ ও বিচিত্রার পরম্পরায়—তারই কথায়নে নেমে ডাঃ ম্যাগুনের দৃপ্ত মনীষা জানাচ্ছে সুদীপ্ততায়,—"Now as we put our arms around each other, in sincere and affectionate token of our deep and abiding love, we would lay aside all disturbing thoughts, all misunderstandings, all unworthiness. If things have gone awry let neither of us left no accusing finger nor become entangled in the rationalizations of self defence. Who is to blame is not important; only how shall we set the situation right. And so, serving and being served, loving and being loved, blessing and being blessed, we shall make a happy, peaceful home, where hearts shall never drop their leaves, but where we and our children shall learn to face life joyfully, fearlessly, triumphantly, so near as God shall give us grace. Goodnight, beloved,'—বুঝলে সৌমিত্র, বিবেকানন্দের ঐ বাণীখানাকে যেমন প্রণয়েরই প্রতীক ধরা লাল কালিতে আঁকবো—হ্যাঁ, তেমনিভাবে জাঃ ম্যাগুনের এই মঞ্জুষায় সুন্দর কথাগুলোকে যৌবনেরই প্রতীক সবুজ রঙ্ দিয়ে লিখবো। আর এ লেখা বাঁধানো অবস্থায় ঝুলবে আমাদেরই শোবার ঘরটিতে। হ্যাঁ, সে সব মধুর জীবনের জন্য আঁকা কথাগুলোকে—রাতের বাসরে দাম্পত্যিক ঋতু ফোটাবার প্রাক্-মুহূর্তে—তুমি পড়বে। আমিও তা পড়বো। পড়ে পড়ে ওর নির্য্যাস বারে বারে নতুন ক'রে গ্রহণ করবো। কী আদর, রাজী ত'? এই, একটু আদর কর আমারই আবেশিত যুবতীকায়।"

রূপা থামলো। রঙীন হোল মন নিয়ে।—তাই দেখতে পেয়ে সৌমিত্র আদরকরাতে করাতে খুশীযাল থেকে গুনগুনিয়ে উঠলো—

"বসন্তে আজি বিশ্বখাতায় হিসাব নাইকো পুষ্পপাতায়,
জগত যেন ঝোঁকের মাথায় সকল কথাই বাড়িয়ে বলে।"

তারপর হঠাৎ কি মনে হওয়ায়—রূপা এই ঘনিষ্ঠ আবেশ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো বেশ চঞ্চল হ'য়ে। সৌমিত্রর গলায দু'হাতের নরম বাঁধন ছড়িয়ে দিয়ে বলল— "এই, অনেক কথা হ'লো। সেই সঙ্গে রাতও ত' এগিয়ে চলেছে। সৌমিত্র চল, এবার ফিরতে হবে না?"

এই নিঝুম পরিবেশেরই প্রায় খোলামেলা নিভৃতির মধ্যে—মুহূর্তখানা অনির্বচনীয় আমেজে তখন ক'রে রেখেছে আবৃত। গঙ্গার শিহর দেওয়ানো হাওয়া—রূপার অলকে আছড়ে পড়ে এলো করাচ্ছে। এক হাত দিয়ে তাই অলকের গোছানো ভাবটিকে রাখছে যথাযথ।

—"না-না। আর একটু ব'সো। আমরা গাড়ীতে এসেছি। ফিরেও যাবো তাতেই। বাসে এলে কথা ছিল। হয় ত' এতক্ষণে শেষ বাসখানা ক'লকাতার দিকে রওনা হ'য়ে গেছে। শোন রূপা।"—কথা থামিয়েই আলতো টানেতে টেনে নিল প্রিযাকে অন্তরঙ্গতায়। রূপা টাল রাখতে না পারায়—ঝুপ ক'রে আছড়ে পড়লো প্রিয়রই কবোষ্ণ দেহময়তার মধ্যে। আর তখনি যুবক সুজনকের মধুর আলিঙ্গন ঘন হ'তে হ'তে প্রিয়ার দেহী-ঝরনার মুঠো মুঠো লাজময়তায় আবেশ ফোটালো। আদর জানালো। কিন্তু,—কিন্তু প্রণয় নিয়ে দুরন্ত বিহ্বলতায় জানাজানির, এবং লাজহর হ'য়ে চুমাচুমির বেশী নির্ঝরেতে ক্রমশঃ ডুবতে থাকাটা—বোধ হয় যে কোন যুবতীকায় ঝলমলানো অনুরাগবতী সন্ধ্যার মতো মধুরিকার—আর ভালো লাগে না শেষ মুহূর্তে!—তাই রূপা এইবারটি কেমন যেন এক রকমে থাকতে চাইলো অনির্লিপ্তা। নিশ্চলা। শুধু অটুট রাখতে চাইলো—লাজময়তাকে। তাই ত' এই মুহূর্তে—এতক্ষণের একটি সাহিত্যিক অবসর ধরে কত-কত সুন্দর কথার বুনোন সারার পর—কৈ এখন ত' রূপা আর তার অধরের কাঁপনতায়—অতি সহজে নিতে চাইছে না তারই বাগদত্তের যুবকাধরে নাচা দুরন্ত আদরধারার সিক্ত ছোঁয়াখানা!—তবে? সৌমিত্র তাই শান্ত হ'য়ে, স্নিগ্ধ হ'য়ে প্রিয়ার গলায়, কাঁধে, পিঠে, বুকের পাশেতে ঝরা আপীনতায় টইটম্বুর যৌবনরেখা পর্য্যন্ত—আদর ভরা হাতের পরশ ভরিয়ে সান্ত্বনার আর স্বস্তির রেখা টানতে টানতে ভাবলো—"না-না। রূপাই ঠিক। ওর এই লাজময় অস্তিত্বটিই হ'লো সত্যিকারের যুবতী-স্বত্ব। আর যৌবনের যত্ন। মায় রত্নত্ব। হ্যাঁ, তাই বুঝি মিষ্টি যুবতীদের মস্ত মূলধনরূপী লাজ-

সর্বস্বতা বা,'modesty' নিয়ে লেখক স্যার রিচার্ড কার্ল ঠিকই বলেছেন তাঁর 'Women—An Analytical Study' নামী দামী বইখানাতে, যে,—'Feminine modesty is neither a recoiling from life nor a toying with emotions. It is, rid of unwarranted connotations, a dignified acceptance of differences, in which, though self-preservation has a share, there is neither fear nor fraud. Its external manifestations alter, as almost everythign alters, but it is rooted in femininity and therefore imperishable'. এটাই ত' আসল যুবতীত্ব। না-না, শুধু তাই নয়। এর পরেও স্যার রিচার্ড কার্ল বলছেন, যে, 'Men by nature have a strain both of the sentimentalist and of the tyrant. They call for modesty in women, but it must be the modesty *they* admire.' কেন না, এই কারণে যে,—'Women's modesty is not a manmade thing, it is a thing evolved by women because of men. Consequently it is not to be comprehended by male generalizations.'—আমার বাগদত্তা, হ্যাঁ আমার এই রূপা আজ এই মুহূর্তে যা জানাচ্ছে তার নিশ্চল প্রভাসখানা ফুটিয়ে,—হ্যাঁ, তাই ত' হচ্ছে যে কোন মধুরা ও সেই সাথে মঞ্জুলা যুবতীরই মনের কথা। দেহের কথা। সত্যি-সত্যি।"

ভাবতে ভাবতে সৌমিত্র তার প্রিয়ার লাল-লাল ঠোঁট দু'খানার হাসি-হাসি ছান্দস্-গমক ধরে—আপন হাতের তপ্ত ছোঁয়ায় বুলানো আদর মাখাতে মাখাতে বলল সান্ধ্য-নির্জনতাটি ডিঙ্গিয়ে—"আমার দুষ্টুকা। এই? চল, উঠছি এখনি। মধুছন্দা, তা একটা কথা বলবে না? বল।"

তাই বলে থামলো সৌমিত্র। ওদের দু'জনার এ মুহূর্তের আলিঙ্গনখানা এমন অবস্থানে রয়েছে—যার দরুণ সৌমিত্রর বুকের একটি ধারের ছোঁয়া প্রিয়ার বুকখানার ফুল্ল-কুসুমিত পর্য্যাপ্ত স্তবকভারের আনম্র নিটোলতা ধরে—পলকে-পলকে কেড়ে নিচ্ছে—যৌবনিক আবেশতা।—মধুরিক লাজময়তাকে। তারই মধ্যে আমেজে-আবেশে সহাস বিলোলিতা রূপা কাটা কাটা ভাবে বলে উঠলো—আলেকজাণ্ডার পোপের সেই 'মরাল য়্যাপিস্‌লস্' থেকে—"না-না। মিষ্টি, অত কিছু ভাবছো কেন? হ্যাঁ, বুঝলে না গো এই এমনি আর কি! জান ত' আদর, যে,—

'And yet, believe me, good as well as ill,
Woman's at heart a contradiction still'.

—তাই কিন্তু, হ্যাঁ তাই সত্যি।" বলে লাল মাধুর্য্যে নাচানাচি করা অধরাধারে—হাসির স্ফূর্ততা নিয়ে ভেঙ্গে পড়লো।

"না-না, রূপা। ও কথা আমি মানি না। সত্যি-সত্যি। আমি যে তোমায় চিনি। জানি। বুঝেছি। আর দেখেছি। মিষ্টি লাজেতেও। আবার দুষ্টু নিলাজময়তাতেও। ওগো বাগদত্তা, তুমি ত' 'Arcadia' পড়েছো। দেখনি তাতে ইতিহাসের বীর সেনাপতি সেই স্যার ফিলিপ সিডনী—যিনি তাঁর সাহিত্য-সাধনার পীঠেতে লেখার মধ্যে দিয়ে যখন বলছেন, যে 'No is no negative in a woman's mouth,'—কী গো মধুরিকা, দুষ্টুমি ক'রে কী এ কথাটিকেও কাটতে পারবে?—কখনো শুধু কথারই আর্টিষ্টিক মায়াজাল বুনে বুনে?"

কথায় কাকলী ঝরিয়ে বলল রূপা—"ঈষ্। তাই বুঝি? আমরা যে বড় লাজুকা। লজ্জাই যে আমাদের বিরাট ধর্ম। তাই আর কি আমাদের মতো যুবতী মেয়েরা 'are educated to be coy, and would be in any case.' জান ত' সৌমিত্র, বিখ্যাত 'Don Juan' এতে পর্য্যন্ত ওর ততোধিক বিখ্যাত স্রষ্টা—লর্ড বায়রন আমাদের সম্পর্কেই যে লিখেছেন—

'A little whole she strove, and much repented,
And whispering, "I will ne'er consent"—consented

হ্যাঁ সৌমিত্র, হ্যাঁ। আদর, এটাই হলো আমাদের আসল বৈশিষ্ট্য। আসল যুবতী-ধরম। 'না' বলতে বলতেও যে 'হ্যাঁ' বলে ফেলি তার কারণ—ততক্ষণে হাবে-ভাবে-প্রকাশে-স্বভাবে যে জানা হ'য়ে যায় তোমাদেরকে। সত্যি-সত্যি। এই, ওঠার আগে শেষ আদর জানাবে না? নেবে না?"—মদালসা হাসিতে আরো মদিরা হলো শ্রীমতী রূপা।

"বাব্বা। কথায় কী আর তোমার সাথে পারা যায়? তুমি যে কথার নানান শিল্পকলায় অভ্যস্তা।" তাই সৌমিত্র উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে আলিঙ্গনাবদ্ধ রূপাকেও দাঁড় করালো—বুকের ঘন বাঁধন অটুট রেখেই। তারপর দু'জনাই শুধু রভস হাসিতে নাচতে নাচতে—ঠোঁটে ঠোঁট সংযোজিত করালো। এই আর কি! এর বেশীও নয়। কমও নয়। হ্যাঁ, এতক্ষণে একটি সাহিত্যিক অবসর সরে গিয়ে—শুধু যুবতী-ধরমেতে নজরবন্দী হলো—এমনি মধুর ও সুন্দর সন্ধ্যারাগ।

অনেক রিমঝিম সন্ধ্যার একটিতে

সন্ধ্যার আর এক নাম হোল—অদুরাগবতী।

সেই পলাশের রঙেতে লাজ মাখা সন্ধ্যা মঞ্জুলেতে চঞ্চল পরিক্রমা সারা করাতে রোজই আসে—বিকেল গড়িয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। পৃথিবীর দিনমানের ক্লান্তি-শ্রন্তিকে মধুরিম করিয়ে তোলার ঐ সন্ধ্যা—তার তারায় জরির মতো, চুমকির মতো সাজানো আসমানী আঁচলেতে আবরিত করে।—আবার চলেও যায় সে সময় মতো। তার এই আসা-যাওয়ার আবহমান ছন্দ-মুখর পথেতে কেউ বাধা দেয় না। অনুরাগবতীর রাগানুরাগের রূপকাঠির ছোঁয়াতে প্রাণ মাত্রেই তখন হয়ে ওঠে অনুরাগে রঞ্জিত। হ্লাদিত। সন্ধ্যার রোজকার পরিক্রমা যেমন মিষ্টি পরশ ছড়ায় মাটির আঙ্গিনায়—তেমনি তা যাওয়ার বেলায় নির্জনে ফুটিয়ে রেখে যায় পরমা তৃপ্তির আবেশেতে বিহ্বল—এক ঋতুময় আমেজকে। রিমঝিম করা সন্ধ্যাশ্রীর লাজ-ঝরা পলাশময়তা থেকে—ঝিলিমিলি করা মধুবাতায় ঋতায়ত রাগ-মহাদেশের প্রতিটি প্রাণ-কণা হ'য়ে থাকে—সুন্দর। রূপবিভোরে মধুরিক। তালে তালে—ছান্দসিক।

ঠিক তেমন করেই আজকের শুক্লপক্ষের ছান্দসী তানে রিম-ঝিমানো—মধুবাতা সন্ধ্যা এসে পৌঁছেছে। প্রজ্জ্বলিত সোনালী দীপখানা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছে এক পলাশগাছের আঙ্গিনায়—আঁচলে ঢেকে। প্রেমিকের জন্য প্রিয়ার ডাগর ডাগর কাজল চোখের তৃষ্ণা থেকে—তাকিয়ে দেখারই এক মস্ত আনন্দ হ'য়ে রেঙে উঠেছে—লালে লাল পলাশের শুকসন্ধ্যার আলোকাভিসার। সোনায়-রূপোয় জরিদার আসমানী আঁচল মুঠো মুঠো লাজ-কণা ছড়িয়ে আর ঝরিয়ে রেখেছে।

আর তারই নীচেতে মখমলের মতো নরম ও সবুজেতে ঘন ঘাসের জাজিমেতে বসে আছে—বরবর্ণিনী রাধা মুখোপাধ্যায়। শুচিতা ভরা চব্বিশটা বসন্ত বছরেরই যৌবন-আনম্রা এক পদ্মিনী-কন্যা—এই রাধা। এই সুচরিতা বরনারী। অতগুলো টানা বছরের ঝলমল করা বসন্তের রূপসায়র থেকে স্নান সেরে ওঠা—এই রাধা মুখোপাধ্যায়ের দেহী-মঞ্জুলতার কানায় কানায় ভরাট থাকা প্রগল্‌ভিত যৌবনখানা

পরিপূর্ণ ভাবের ব্যঞ্জনায় রাঙিয়ে উঠেছে—আজকেরই এই শুকসন্ধ্যার স্নিগ্ধতায়। তারই রূপাভায়। তারই লাজুকতায়। আর এরই মধুরাগের ছোঁয়াচে তার যুবতী-স্বভাব তৃপ্তির রেশ ধরে, কল-কাকলির মুখরতায় উপ্‌ছে উপ্‌ছে পড়েছে।

এ সব ছাড়িয়ে কিন্তু আরো বেশী ক'রে নয়নসুখকর হয়ে উঠেছে—বরবর্ণিনী রাধা মুখোপাধ্যায়ের সিঁথির শুচিতায় নির্ঝরিত সিঁদুরের লাল রেখাঙ্কনখানা। সত্যি অড়ুরাগবতী সন্ধ্যার সুবলয়িত হাতে ধরা সোনার দীপবর্তিকার রূপাভায়—দারুণভাবে ঝল্‌সিয়ে উঠেছে পলাশ-সিঁথির ঐ লাল দাগ। রাধা বিকেলের প্রসাধনেতে আরো গাঢ় ক'রে সিঁথির লাল রেখাখানাকে এঁকেছে—মনেরই এক হঠাৎ সুখের উল্লাস ভরা ঊর্ম্মি-মুখর আহ্বানেতে। সত্যি আজ কিছু আগে রাধার দেহ ও মনে এক অনাবিল আনন্দ ও অপার খুশীর আমেজে নেচে উঠেছিল, ডগমগিয়ে। যদিও এত আনন্দের উৎসটুকু এসেছিল এক সংকটমুখর অবস্থার দুশ্চিন্তাটুকু রাধার মন থেকে পুরোপুরি মুছে যাওয়ায়।—বিকেলের আগেই আজ বাড়ীতে ডাক্তার এসেছিলেন। আর আজই তিনি জানিয়ে গেলেন দুশ্চিন্তা থেকে পরম এক মুক্তির জগতে—রাধাকে পৌঁছে দিয়ে। জানানোটা এই যে—আর কোন ভয় নেই রঞ্জনের জন্য। বিন্দুমাত্রও আর নেই কোন শঙ্কা। এত বড় মুক্তির আস্বাদন রাধা যেন আজ এই প্রথম করলো অনুভব। মনেতে আর দেহেতে।—কেন না—বাসন্তী বছরগুলো গুনে গুনে এই কিছু দিন আগে—পঁচিশের অঙ্গনে দাঁড়িয়ে সুরভিত যৌবনেরই দেশের 'রজত জয়ন্তী'-খানা সেরে ওঠা—এই রঞ্জন মুখোপাধ্যয়ের জন্যই যে সিঁথির ওপরে টানা এক লাল শুচিতার আলপনায় শোভিতা করেছে—রাধা মুখোপাধ্যায়ের বধূ-স্বত্বা।—সত্যি রঞ্জনের দেহ-মনের পরম অকুতি আর চরম পরিতৃপ্তির পরিপূর্ণতার সঙ্গে—সাত পাকে পরিণীতা রাধা—আজ প্রিয়ার গরিমায় সুবিনীতার মতো হৃদয়ঙ্গম করলো—এই অশেষ স্বস্তির কথাটিকে। রাধা জানতো—তার একান্ত আপন এই প্রিয়তমের এক কঠিন অসুখে পড়ার কারণটা ছিল—সাধ্যের চাইতে করা ওরই অতিরিক্ত পরিশ্রম। সেই থেকে অসুখ বাঁধানোর পর আজ পর্য্যন্ত দীর্ঘ দু'মাস ধরে ভুগেছে। এখন কাজের মধ্যে শুধু বিশ্রাম করা ছাড়া আর অন্য কোন কিছু করণীয় নেই রঞ্জনের পক্ষে।—রাধার সাক্ষাতে, আর তারই প্রিয় সমীপেতে— ডাক্তার আজ তাই নির্দেশ ক'রে গেছেন।

—সত্যি বড় দুরন্ত স্বভাবের এই রঞ্জন। ও দু মাস আগে ত' তাই ছিল। তবে আজ আর যুবক রঞ্জনের শরীরী যৌবনের কোথাও নেই সেই শক্ত ধাচের দুরন্তপনার লিপ্সা—যারদৌলতে আবার ও আগের মতনই হয়ে উঠতে পারে—

দুর্দম। অসুস্থ দয়িতের বিছানাটির কাছে, এই দীর্ঘ দু'মাসের রাত-দিন ধরে ব'সে থাকারই উৎকণ্ঠা জড়ানো প্রতীক্ষা থেকে—মুক্তি পাবার আনন্দে উৎফুল্লা রাধা আজ এই শুক্লপক্ষের সন্ধ্যায় একটু সময়ের জন্য—রঞ্জনের টানা টানা দুটি চোখের মধুর অথচ দুর্বলে করুণচাহনির কাছ থেকে সরে এসে বসেছিল—বাগানের মধ্যেকার এই পলাশ গাছের নীচেতে।—রঞ্জনের সম্বন্ধে ও-কথা তার মনে পড়লো—ঐ ভাবে বসে থাকা অবস্থায়।

সবুজ-নরম ঘাসের জাজিম। তার ওপরে শুকসন্ধ্যা রূপোলী আভায় মাতমাতি লাগিয়েছে। এমন মুহূর্তের আনন্দ-বিহ্বল মুখরতার মধ্যে বসে থেকেও—জোর ক'রে চোখ ছাপিয়ে গাঢ় রেখায় মুক্তো ফোটানো জল বেরিয়ে এলো—রাধা মুখোপাধ্যায়েরই যৌবন দেহকে বেপমান করার জন্য।—সত্যিই ত' তার চাইতে মাত্র এক বছরের বড় এই রঞ্জন—গত দুটি মাস ধরে কত ব্যথাই না দিতে পারলো আপনারই বধূ নামেতে অভিষিক্তা এই প্রিয়াকে! কঠিন অসুখটা রঞ্জন বাঁধিয়ে নিজে যেমন ভোগ কোরল অশেষ কষ্ট—তেমনই ভাবে তার থেকেও বেশী কষ্ট দিয়ে কাঁদিয়েছে সে তার এই রাধাকে। ঠিক পুরোপুরি একটি বছর আগে—এই সুচরিতা বরকন্যাকে পরিণীতা করেছিল রঞ্জন—বেশ কয়েকটি মধুক্ষরা বাসন্তী-বছরেরই প্রণয় পরম্পরার পথেতে—জীয়নকাঠির অনুসন্ধান পাওয়ানো—পরিণয়ের শুভযোগযোগেতে। পারস্পরিক সহযোগিতায় সলাজ থেকে—নিলাজ-মিথুনের প্রতিটি যৌবনাভূতির লহরে লহরে। আর তারই ভাল লাগা ভালোবাসাবাসিতে। তাই কঠিন অসুখে পড়ায়—প্রিয়র যৌবনান্বিত ভালোবাসার প্রাণ নিয়ে না জানি কখন কী অঘটন ঘটে যায়—এই তেমন কিচুরই শঙ্কার টানাপোড়েনে পড়ায়। রাধার ভয়ে বিহ্বল রূপ তাকে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদিয়েছে। চোখের সে জলে কপোলের লাল আভাকে ভিজিয়েছে বারে বারে।—এই অবস্থায় অনেক সময়—রঞ্জনের আদুরে মায়ের কাছে ধরা পড়ে যাওয়ার পর তাঁরই বুকেতে মুখ লুকিয়ে—ছোট্ট এক মেয়ের মতন তখন খালি সান্ত্বনা খুঁজেছে প্রায়ই—এই মঞ্জুলা রাধা।

একমাত্র আত্মজ এই রঞ্জনের মা তাঁর পরম-সুন্দর মহীয়সী 'জননী'র গরিমায় শুধুমাত্র আপন সন্তানকে নয়—তাঁর পুত্রবধূ, এই সুচিস্মিতা দেহ-মনের মঞ্জুলা রাধাকেও—সন্তানাধিক রূপে ভালবাসার স্নেহলোকে বেঁধেছেন। তাই আজও এমন মায়েরই শান্তির নীড় থেকে খুঁজেফেরা সান্ত্বনা পেয়েছে রাধা—এই কিছু সময় আগে। আজ, এই শুকসন্ধ্যায় বাগানেতে পলাশ গাছের নীচে ঘাসের মখমলে বসে থেকে, তারই অশেষ খুশীয়াল গমক থেকে রাধার রক্তিম অধরের

পুলকভরা হাসি—সুন্দর ঝলক ছড়ালো। মনে করলো সে ওরই মধ্যে—রঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের এই কঠিন অসুখ নিয়ে এর পর থেকে আর কোন ভয়ের কারণ নেই। ডাক্তার ত' আজ বাড়ীতে এসে দিয়ে গেছেন—সুন্দর মতন এমন এক তৃপ্তিরই—পরম স্বস্তির অভিমতটিকে।

সত্যি অসুখ থেকে আজ ভাল হয়ে গেছে রাধার প্রিয়তম, এই রঞ্জন। ও নিজে থেকেই আজ জোর করেছিল রাধাকে একটু বাইরের খোলা আলো-বাতাস আর আকাশের রূপ দেখে ঘুরে ফিরে আসার জন্য।—আর রোজকার মতো আজকেও মা তাঁর ছেলের কাছ থেকে, আর তাঁর অসুস্থ ছেলেরই সেবাযত্নের কারুকাজ থেকে—পুত্রবধূকে বলেছিলেন, একটু বাইরে থেকে বেড়িয়ে অসবার জন্য।—কিন্তু আজ রঞ্জনও ওর জন্য যখন তাই চেয়েছিল, তখন আর বেরুব না বলে—রাধা আজ অমত করতে পারে নি।

এমনিই কথা মতো রাধা তখন বাইরে ঘুরে আসার জন্য বেরুচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ রঞ্জনের মা এসে তাঁর নিজের চোখে ধরা পড়া—লাল পাড়, সাদা তাঁতের আবরণে জড়ানো রাধার প্রসাধনহীন রূপখানা দেখে, তখনি কাছে টেনে নিয়ে আদর করে বলেছিলেন মৃদু ছন্দে—না, না এমনভাবে কিন্তু তোমার বাইরে বেরুনো চলবে না। লক্ষ্মীটি, আজ একটু সাজ না করলে কিন্তু আমি সত্যি তোমার উপর রাগ কোরব। রাধা মা, লক্ষ্মী মেয়ে, আমার কথা রেখো, কেমন?

শেষ পর্য্যন্ত সাজতে হয়েছিল রাধাকে কথামাফিক। রঞ্জনের মা যে ভাবে আদরে আদরে পুত্রবধূর ওপর সাজবার ফরমায়েশখানা করেছিলেন—তাইতে সাজ কোরতে কোরতে কিন্তু ভালোও লেগেছিল তখন রাধার। খুবই। অশেষে-বিশেষে।

তারপর থেকে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক হয়ে গেছে। তখনও খোলা আকাশের সীমাহীন নীলেতে-নির্জন সামীয়ানার নীচে বসে আছে রাধা সবুজ জাজিমের নরম ভাবের মধ্যে। তার অলক্তক রঞ্জিত পা দু'খানা ছড়িয়ে রেখে। পায়ে পরা সাদা ভেলভেটের স্ট্র্যাপ দেওয়া চটিজোড়া চক্চক্ করছে সবুজের মধ্যে। মাথার ওপরের পলাশ গাছের পাতা ও ফুলের এধার-সেধার দিয়ে উপছে পড়া শুকসন্ধ্যার রূপোলী আলোর মধ্যে সৌন্দর্য্যকে চয়নের জন্য স্নান করেছিল—রাধার মধুক্ষরা দেহের যৌবনেতে সবুজ ভাবেরই প্রকটিত সজীবতায় ভরা—সহাস উচ্ছলতাগুলো।

অনেকটা সময় কেটেছে। এভাবে একলাচুপ করে বসে থাকা আর ভাল লাগল না। তা ভেবে, আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়ালো রাধা। সঙ্গে সঙ্গে তার

দেহের মধ্যেও খেলে গেল একটা নাচের ছন্দ, ঠিক উঠে দাঁড়ানোর তালে তালে। সবুজ ঘাসেতে পড়ে থাকা সাদা ভেলফেটের স্লিপারে পা গলিয়ে পরে নিয়ে, হাঁটা আরম্ভ করলো—আনন্দ আর খুশীতে ডগ্‌মগিয়ে। হাতের মুঠোয় ভর্তি করে নিয়েছে—শুকসন্ধ্যার আমেজ নিয়ে ঝরে পড়া কিছু পলাশ ফুল। বাগানের ঘুটিং বাঁধানো হলদে কাঁকরের পথ দিয়ে চলতে চলতে, বাড়ীর পেছন দিকটায় এসে দাঁড়ালো। দো'তলা থেকে রঞ্জনের ঘরের আলো কাঁচের জানালা ভেদ ক'রে বাইরে বেরুচ্ছে। তাই দেখে রাধার মন বলল—মা'র আদর ঢালা সেবা আর যত্নের কাছে এখন সত্যি বেশ আরামেতে আছে—তারই সুখ আর খুশীর অপার প্রাপ্তি—এই রঞ্জন। শান্ত আর অতি বাধ্য ছেলের মতো নিশ্চয় ছোট্ট এক শিশু হ'য়ে—ও খালি আদর পেয়ে আবদার করছে মায়ের কাছে। হয়তো বোধ হয় ঘুমিয়েই পড়েছে তার রঞ্জন। আজও যা দুর্বল হয়ে আছে রঞ্জনের শরীরখানা!—তা ভাবতেই রাধার ডাগর ডাগর কাজল দিঠির কানায়—মুক্তোর মতো জলকণা জমা হলো। তখনি হাতের পলাশ ফুলের নরম ভাবের মধ্যে চোখ দুটিকে চেপে ধরলো, আর সেই সঙ্গেই অনুভব করলো ও—একটা বড় বেশী খুশীর লাজহরণ করা কথাকে। রাধা মনে মনে ভাবলে গত দু'টো মাসের লক্ষ কোটি পল-অনুপল ধরে ধরে—রঞ্জন কম কষ্ট দেয় নি রাধাকে!—তবু, তবু, দুরন্ত রঞ্জন তাকে যে রকম ভাবে গভীরেতে নিয়ে ভালবাসতে চায়,—তার জন্য নেই সত্যি অন্য কোন তুলনা। ভারী দুষ্টু তার এই প্রিয়তমটি। রঞ্জনের দুষ্টুমিপনার কাছেতে—এই দু'মাস আগেতেও কম নাজেহাল হতে হয় নি, ওরই প্রিয়া-স্ত্রী রূপে রাধাকে—কী সময়ে, কী অসময়ে!—এই দু'মাস আগের কথা ভাবলো রাধা—তখন সারাদিনের মধ্যে, আর সারা রাতের ত্রিযামা মুহূর্ত তিনটি ধরে যতবার ক'রে রঞ্জন তার রাধাকে একান্ত কাছের অতি ঘনিষ্ঠতার মধ্যে পেতো—ঠিক ততবারই, রঞ্জন তার প্রিয়ার রূপস্নিগ্ধ মুখের লাল ঠোঁটে, মদালসা চাহনি ঝরানো কাজল কালো চোখেতে, আরক্তিম কপোলে—আপনার তৃষিত করা অধরের মধুময় বর্ষণেরই পরশ-ধারায় এঁকে দিয়ে যেতো—অগণিত ভেজা ভেজা দাগের ওপরে, লাজ মাখিয়ে। এক একদিন রঞ্জনের এই দুরন্ত ভালোবাসার প্রতীক চিহ্নগুলো নিলাজ স্বাক্ষরে নেমে আসতো—রাধার চোখ থেকে, গালের পেলবতা ছুঁয়ে-ছুঁয়ে লাল হাসির গমক ভরা অধর যুগলেতে।—তারপর সেখান থেকে প্রিয়ার জন্য তারই প্রিয়তমর অধরের ছন্দমুখরিত লাজহরণ করা সমীক্ষা—সিক্ততা ভরানো কারুকাজ সমাধা করাতো দয়িতার গলার নীচে, সুমসৃণতায় ঝকমকানো কাঁধেতে, দেহী সুরভির কোন কোন যৌবন-ঘন বাঁকেতে। সেখানের

সবুজ সজীবতাকে ঢেলে সলাজে মধুর করাবারই জন্য। কোন কোন মুহূর্তে শেষ পরিক্রমায়, অধরের সমীক্ষা রঞ্জনের ঠোঁটে রেঙে ওঠা লাজহর ছোঁয়াচের সুন্দর মাদকতা নিয়ে পৌঁছাতো—রাধার রেশমী আবরণে ভরা সলাজেতে নিলাজ হয়ে থাকা—নম্র পেশলতায় আরাম ঝরানো বুকের দুই সুকঠিন সৌন্দর্য্যের আর মাধুর্য্যের মধ্যে।—প্রিয়তমর এমন ধারার অধর-সমীক্ষার কারুকাজের ভেতরে পাওয়া নানান রভসে—রাধার দেহী সুখ ও মনের খুশীগুলো—আনন্দ বৈচিত্র্যেরই তৃপ্তিধারায়—শুধু মধু আর মধুময়তায় ঋতায়ত থাকাকালীন পাগলপারা হয়ে উঠলেও—অমন রূপে-রসে-সৌগন্ধে আবেশিত অবস্থার মধ্যে থেকেই, এক একদিন বাধ-শূন্য হয়ে-আনন্দাতিশয্যের টানাপোড়েনে—অঝোর ধারায় কেঁদে ফেলেছে—এই সুস্মিতা রাধা। তার সেই কান্নার রূপ ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়তো—যৌবনান্বিত দেহরাগের প্রতিটি লাজ ভরা বাঁকে বাঁকে। কাজলে মাদলসা চোখের ঐ জল পরম সুখের কারণ হিসাবে শেষবারের মতো ঝরিয়ে বলতো রাধা তার রঞ্জনকে—এই, এই রঞ্জন, কথা শোন লক্ষ্মীটি। ছিঃ, দিনের বেলাকার সূর্য্যরূপের—এই চারধার আলোয় আলোয় আনচানানো সাজের মধ্যে আর ক'রো না এমনটি। সূর্য্য ত' দেখছেনই। তার সহদোর আলোও দেখছেন। তবু, তবু, কে না কে জানা-শোনা কেউ কখন না জানি দেখে ফেলবে—এ সব। ধ্যাৎ, ভারী দুষ্টু তুমি! এই লক্ষ্মীটি রঞ্জন, বাব্ বা, অনেক দস্যিপনাই ত' সমাধা করালে তোমার এই লক্ষ্মী মতন মেয়েটির ওপরে।—হ্যাঁ, সত্যি বলছি রঞ্জন, যদি লক্ষ্মী মেয়ে না হই তা হ'লে কী আর তুমি আমায় তোমার দুরন্ত দুষ্টুপনার কাছে কেড়ে নিয়ে—পারতে কী আর এমনভাবে নাজেহাল করিয়ে, বারে বারে এই রাধারই দেহের নানা জায়গার রূপকে—নিলাজ করানোর কাজটা? ও ভাবে সুখ দিয়ে সুখেরই জন্য চোখের জল ঝরাতে?—উঃ, উঃ, ছাড়ো বলছি। ঘাট হয়েছে। আর বলবো না কো। এই তবু, তবু, দস্যিকে আমি দস্যিই বলবো। দুষ্টুকে বলবো দুষ্টু। আচ্ছা, আচ্ছা,—সত্যি আর কিছুটি বলবো না।।—কিন্তু, কিন্তু—শোন রঞ্জন—আজ থাকুক এ সময়ের জন্য এ পর্য্যন্তই। কেমন রাজী?—

সত্যি এত সব আদর মাখানো, আর কাটা কাটা ভাবে সাজানো কথা—রাধার স্মিতা অধরে ঝলমলাতে দেখলে পরে, আর অন্য কোন কিছুটি দস্যিপনা কোরত না রঞ্জন।—কিন্তু এত কথা না বললেও রেহাই পেয়ে যায় রাধা, সময়ে সময়ে। নিজে প্রণয়-ঋতুর কারুকাজ ফোটাবার জন্য প্রিয়র ভূমিকায় অত বেশী দুরন্ত স্বভাবের হওয়া সত্ত্বেও—মধুরিকা রাধার ডাগর ডাগর কাজল চোখের কিনারতে, মুক্তোর মতো জল জমা হ'তে দেখলে,—আর শুচিস্মিতা রাধার লাল

ঠোঁট দুটির মধ্যে কান্নার মৃদুল কাঁপনরেখাকে ফুলে ফুলে দোদুল হতে দেখলেই কিন্তু—পলকের মধ্যে হয়ে যেতো উধাও—রঞ্জনের সব রকম দুষ্টুমিগুলোর—দুরন্ত রূপটি।

পঁচিশের সজীব বসন্তে মুখর—রঞ্জন মুখোপাধ্যায় তখন তার প্রিয়াকে বুকেতে বন্দী রাখা অবস্থাতেই—সে সময়ের মতো যবনিকাপাত করাতে গিয়ে—রাধার লাল লাল ঠোঁটের কানায় কানায় উপ্‌ছে থাকা কান্নার কাঁপা কাঁপা ছবিখানাকে, একটা সঘন চুমার মধ্যে ঢেকে দিয়ে বলতো রঞ্জন—এই রাধা, এই মিষ্টি মেয়ে, ভারী চালাকি পেয়েছো, তাই না? ইচ্ছে করেই তুমি কেঁদে ফেল, যাতে চোখের জল দেখলেই আমি তোমাকে ছেড়ে দেই, তাই কী? এই, এই রাধা, বল, তাই ত' ঠিক?—বলতে বলতে, রাধার আঁচলের প্রান্তখানা হাতে নিয়ে—তাই দিয়ে রঞ্জন তার প্রিয়ার চোখের জল দিত মুছিয়ে।

ও কথারই রেশ ধরে রাধা বলতো—ঈষ্। চালাকি খাটাব কেন? আমি ত' আর তোমার মতো দস্যি ছেলে নই, বাব্‌বা!

এমন কথাটা বলে প্রিয়র বুকের সুখঝরা বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে সরে যাবার আগে অতর্কিত ভাবে রঞ্জনের শরীরের কোন না কোন জায়গায় সজোরে একটা চিমটি কেটে—দ্রুত যেতো পালিয়ে। যেতো তারপর থেকে অনেকক্ষণের জন্য হারিয়ে। আর এক পলকও কাছে-পিঠে থাকতো না সে দাঁড়িয়ে।

ওর শরীরের যেখানটায় রাধা চিমটি কেটে পালিয়েছে সেখানটায় রঞ্জন হাত বুলাতে বুলাতে বলত দ্রুত পালিয়ে যাওয়া রাধাকে শুনিয়ে শুনিয়ে—আচ্ছা, ঠিক আছে। বেশ, ভাল কথা, এখনকার মতো তা' হলে সত্যিই পালিয়ে যাচ্ছ। কিন্তু যাবার আগে এটাও জেনে যাও এই দুষ্টু মেয়ে, যে, আজ রাতে এর মজাখানা তোমায় টের পাইয়ে ছাড়বো। বুঝলে নিশ্চয়? তখন ভালভাবেই বুঝবে যে এর শাস্তি কী হতে পারে, আর না পারে!

—কিন্তু এ সবই ত' হ'ল রাধা সমীপেতে—রঞ্জনেরই প্রণয় রীতিকার বিশেষ মতন দুরন্তমুখর ভালোবাসাবাসিরই সমীক্ষা—যা অন্তত অজ থেকে দু দুটো মাস আগেকার—রাধা-রঞ্জনের দাম্পত্য-রূপ-বিচিত্রারই সাজঘরের সলাজে, আর নিলাজে ছিল মুখরিত করা এক ইতিহাস! এ্যাড্‌ভেঞ্চারাস্ প্রাইভেসি অফ্ দি কাপ্‌ল! (Adventurous privacy of the couple). ও ত' হলো পুরোপুরি পরিণয়ের রূপকথার দেশেতে পৌঁছে দুটি মন জানাজানির,—আর দুটি দেহ জানাজানির ইতিহাস।—সর্বোপরি পারস্পরিক বোঝাবুঝির, অর্থাৎ মিউচ্যুয়াল্

আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিঙ্গের শেষাশেষি—প্রিয় ও প্রিয়ার দম্পতি-রূপারূপ যে সুন্দরের ভাবে, মধুরের বিভাবে, আর সুখের অনুভাবেতে আর খুশীর অভিমানেতে—এক মন থেকে আরেক মনের সাথে গভীর মোকাবিলায় পৌঁছে—যখন এক দেহ আরেক দেহেরই—অজানা আর অদেখা যৌবন-গাঢ় সবুজতাকে লাজাঞ্জলির মধ্যে দিয়ে ঐ "এ্যাড্‌ভেঞ্চারাস প্রাইভেসি"রই জন্য হ'য়ে উঠতে চাইত—নিলাজেতে সুন্দর। নিলাজেতে মধুর। নিলাজেতে মহৎ। আর নিলাজেতে পবিত্র। —এ সবই ছিল ঐ দুটি মাস আগেকার ইতিকথা।—এ ব্যাপারে সে সব দিনের রঙীন সন্ধ্যাগুলো, আর ততোধিক রঙীন ত্রিযামা-রাতগুলোর মধ্যে—মাদকতা আহ্বান করা প্রণয়-বিচিত্রারই চিত্রবিচিত্রতার আবেশিত মুহূর্তগুলোকে রঞ্জনের সুখের জন্য, আর নিজের চরম খুশীর জন্য—প্রিয়া রাধা হৃদয়ের সূক্ষ্ম-অন্তস্থল থেকে অভিনন্দিত করাতে পেরেছিল পরম রভসের চরমানন্দ নিয়ে—প্রিয়কে নিজের কাছে উজাড় ক'রে পেতে দিয়ে। ও নিজেও ততোধিক তা পাওয়ায়। এ সম্পর্কে সুবিনীতা রাধার ছিল এক তৈরী মন। পরিণয়ের আগেই শ্রীমতী মারী স্টোপস্-এর একটি বই থেকে রাধা এটাই গভীর ভাবে অনুধ্যান করেছিল যে—"The central fact of the marriage bed distinguishes the relation between husband and wife from that between friends."

সুরভিত দাম্পত্য ঘেরা যৌবনায়নী রূপমহালের ত' ওটা ছিল দু'মাস আগের ইতিহাসের—প্রণয়কথা।—কিন্তু আজ দু'মাস পরেকার কথা অন্য রকমে, আর অন্য রীতির ঋতুময়তায় উঠেছে সেজে। উঠছে রেঙে। ঊর্ম্মিমুখর হয়েছে গানে-নাচে-তানে। একটা সুসমঞ্জস্ মধুক্ষরা রিদ্‌ম্ ধরে—রাধা ও রঞ্জন নতুন ক'রে আরেকটা পরিণয়ের সুস্নিগ্ধতায় হয়ে উঠেছে বিহ্বলিত। কুসুমিত। রূপাভায় স্নাত।

এ সবই আজ দু মাস পরেতে—রাধার ভাবনায় ঝড়ের মতন উতাল হয়ে দিয়েছে দেখা। এলোমেলো অনেক ভাবনাই আজ শুক-সন্ধ্যায় তার মনেতে আসছে আর যাচ্ছে। তেমনি এলো করা রেশ থেকে রঞ্জনের প্রণয়-প্রকাশের ঐ দুরন্ত-স্বভাব সম্পর্কে—রাধা আরেকবার সায় না দিয়ে পারল না যে—প্রিয়র অমন সব দুরন্তপনাগুলো কিন্তু প্রিয়াস্ত্রীদের আবহমানকালের সবিশেষ কারণ-জড়ানো আগ্রহের, আর আকাঙ্ক্ষার অশেষ অনেক কিছু বলেই—রাধা মনে মনে কিন্তু একান্ততায় ভালো লাগিয়েছিল। কেন না ভলোবাসারই যে নিখুঁত এক প্রকাশ হোল—ও-সব। নিজের নিজের প্রিয়দের বরাবরই—তাদের প্রিয়ারা এ-ব্যাপারে না জানিয়ে পারে না ইচ্ছারই প্রখরতা জড়ানো অনিচ্ছাকে,—আর না

দেখিয়ে পারে না—বাধা দেওয়াটাকে! ও কথা ভাবা প্রসঙ্গে রাধার মনে পড়লো—বিদেশী লেখিকা রেনী ম্যাকেনড্রু-এর "লাইফ্ লঙ্ লাভ্" নামী ছোট বইখানাতে সুন্দর করেই লেখা আছে,—".....mutuajl and playful little smacks could not be called abnormal. ....Fashions and times change, but the emotion of love goes on for ever; if it were not so the human race would perish. Men die, but their love is immortal. Research in regard to inheritance has proved this beyond all doubt. Nature, through physical love, passes something on for ever. ....Inherent in all men is the desire to chase and capture; in all women the desire to be pursued and caught. "You can't catch me," says the girl to her boy friend. ..."Can't I?" says he, as he chases her across the meadow. ...."I won't let you kiss me," she tells him, when caught, knowing that the kiss will be all the more pleasurable and passionate after the struggle. In the words of Ovid, "Women often wish to give unwillingly what they really like to give."

ওপরের কথাগুলোর যথার্থতা অনুধাবন করা—রাধা নিজের প্রণয়-ব্যাপারে পুরোপুরি রকমেই করতে পেরেছিল। তাই ও কথা ভাবার সাথে সাথে মূঠে মুঠো লজ্জায় কুঙ্কুমিত হয়ে উঠলো তার যৌবনে বিভাসিত দেহের রূপতরিঙ্গমা।—প্রিয়া হয়ে রাধা যৌবনের অয়ন ধরে ভালোবসার সায়রে সাঁতার দিতে গিয়ে বুঝেছিল যে—নিখিল প্রিয়ার সঙ্গে পুরুষের ইচ্ছার পরিপূর্ণতায় এসে—তখন তার জন্য আর "হ্যাঁ" না বলে—তারই উত্তরে "না" জানানোটাই হ'ল এক মস্ত ধারারই—মেয়েলি রীতিকা! যাক্ সে সব কথার কথা!

শেষ পর্য্যন্ত রাধার মন রঞ্জনের কথায় এই মুহূর্তে ভাবাকুল হয়ে উঠলো। —সত্যি দু মাস অন্তে তার মনের অনিন্দ্য সুখ—এই রঞ্জন পুরোপুরি যে হয়েছে—রূপান্তরিত। এখন তারই রাধা যা আগ্রহে, আকাঙ্ক্ষায় করতে বলবে তার প্রিয়াল খুশীকে,—তাই এখন সানন্দে করতে চাইবে রঞ্জন। অবশ্য তাই বলে রাধা তার অসুস্থতা থেকে সেরে ওঠা রঞ্জনকে কখনো নিজে থেকে কোন রকম কষ্ট বা ব্যথা পেতে দেবে না।—ঐ কথাটা মনের মধ্যে আনচান করাতে করাতে হাতের পলাশ ফুলগুলোর টকটকে লাল রঙের দিকে তাকালো। শুক্লপক্ষের সন্ধ্যায় তার রঙ আরো গাঢ় ভাবেতে ঝক্‌মক্ করছে রাধার সুবলয়িত পেলবতায় মসৃণ থাকা হাতের মুঠোয়। দু হাতের বালা আর চুড়ির রূপাভা ঝলস্ তুলছে স্বর্ণাভা ছড়িয়ে, আর ছিটিয়ে। তাই একটু দেখলো রাধা অপলক চোখের মুগ্ধতায় ভরিয়ে।

অমন একটা মোহাবেশে জড়ানো মন নিয়ে ধীর পায়ে চলতে চলতে এক সময় বাড়ীর ভেতরে এলো। সোজা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে চলল উঠে। ওপরে উঠবার সময় আনমনা থাকায় রাধা খেয়াল করল না যে, সিঁড়ির ধাপে ধাপে এক একটা ক'রে পা ফেলার তালে তালে ভেসে উঠেছিল স্লিপারের শব্দ। তা শুনতে পেয়েই দো তলার ঘর থেকে ঝোলানো ছাই রঙা রেশমী পর্দা সরিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন—রঞ্জনের মা। যে ঘর থেকে তিনি বেরিয়ে এলেন হাসি হাসি মুখ নিয়ে—সেখানতেই আজ সন্ধ্যার আগে দু মাস পর ঘর পালটিয়ে—রঞ্জন পুনরায় থাকতে এসেছে। অসুখের জন্য অন্য ঘরে তাকে ডাক্তারের নির্দেশ মতো রাখা হয়েছিল। আজ সুস্থ সে। তাই এই ঘরটিতেই ফিরেছে সে পুনরায়। —অর্থাৎ এই ঘরটিতেই রাধা বধূ হয়ে এসে রঞ্জনের সাথে যাপন করেছিল—ফুল আর ফুল দিয়ে সাজানো বিছানাটির আরামের মধ্যে অবগাহন করিয়ে—যৌবনের কুমারত্ব থেকে লাজ অপহরণকারক—সেই প্রথম রিমঝিম করা আর ঝিলিমিলি ভরা ত্রিযামা রাতটাকে।—সে কথাকে ভুলে বিস্মৃতির ঘরে ফেরত পাঠানো যায় না কোন রকমেই! একথা রাধাও জানে। আর জানে রঞ্জনও। তাই ওরা দু জনই মনে মনে চেয়েছিল সেদিনের ঐ ঘরটিতেই ফিরে গিয়ে—আবার লাজ ভরা শয্যার মধ্যেতে—এতদিন পরে করাবে—নতুন এক রূপের ধ্যানে মেতে—আনকোরা ফুল দিয়ে সাজানো বিদিশার তৃপ্তিভরা ঘুমের দেশেতে পাড়ি জমানোর পালা!

যৌবনান্বিত কৌমার্য্য থেকে লাজ হরণকারী—ঐ ঘরটির ভেতরের সুন্দর সুন্দর সাজানো-গোছানো জিনিসের মধ্যে—রাধা ও রঞ্জনের যত কিছু নিলাজ আকাঙ্ক্ষা পেয়েছিল স্বতঃস্ফূর্ততা—এই তারই বড় বেশী প্রকট সাক্ষী হয়ে আছে—গোলাপী সিল্কের আচ্ছাদনে ঢাকা ডানলোপিলোর পালঙ্কখানা! ও ঘরের সব কিছুই রূপসজ্জা নিয়ে ফুটে থাকে রাধার হাতের ছোঁয়ায়।—আজ সেই ঘরেতেই দু মাসের ছন্দপতনের পর প্রবল আগ্রহকে দোলায়িত ক'রে ঐ বিছানারই লাজ কেড়ে নেওয়া সুখাতিশয্যের মধ্যে—রাধা ও রঞ্জন—দু জন আজই পাবে ফিরে পরস্পর ভাবে দু'জনাকেই। হয় রাধা, আর না হয় রঞ্জন—আর না হয় ত' ওরা দু'জনেই—যুগপৎভাবে সাজাবে আর রাঙাবে—ওদেরই দাম্পত্য-বাসরের মিথুনে নিলাজিত লগ্নটিকে।

ঐ ঘরের ঝকঝকে আর তকতকে রূপসজ্জার মতোই আপন মুখেতে ঝলমল করা হাসির গমক নিয়ে—রঞ্জনের মা এসে দাঁড়ালেন রাধার মুখোমুখী হোয়ে। তৃপ্তির ঐ হাসিতে অরো মুখর হয়ে বললেন মা—এসো রাধা মা,—এখন রঞ্জন

একটু ঘুমিয়ে পড়েছে। চল, এ সময়ে গিয়ে তুমি খেয়ে-দেয়ে নেবে।

লাজুক দৃষ্টিতে মা'র দিকে তাকিয়ে বলল রাধা—না মা, এখন থাক। খেতে ইচ্ছে করছে না কোন রকম। পরে খাব এক সঙ্গে। কোন অসুবিধা করলাম না ত', মা?

—আমার পাগল মেয়ে কোথাকার! তোমার পরে খাওয়া নিয়ে মায়ের আবার অসুবিধাটা কি হবে শুনি? বেশ ত', তোমার যখন ইচ্ছা করবে তখন না হয় খেয়ে নেবে। আমি ত' আছি, আমার এই লক্ষ্মী মা'টির জন্যে।

ব্যবহারে রাধার প্রতিও রঞ্জনের মা হলেন খুবই আদুরে। পুত্রবধূ আজ তাঁর কাছে কন্যাধিক। মায় সন্তানাধিক। সেই নিরিখেই কথা শেষে আদর ক'রে রাধার কপোলে স্নেহের চুমা দিয়ে মা বললেন—বুঝেছি। নিজের জিনিসকে বেশী সময় ধরে চোখের আড়াল ক'রে রাখতে আর ভাল লাগছে না, তাই কিনা? দুষ্টু মেয়ে, এ বাড়ীর বৌ হয়ে এসে অবধি তুমি আমার কাছ থেকে রঞ্জনকে নিজের কাছাটিতে কেড়ে নিয়ে রেখেছে আটক ক'রে। সত্যি বলছি, তুমি আমায় রেহাই দিয়েছো অমন দুষ্ট ছেলের হাত থেকে। তুমি তাই আজ আমার লক্ষ্মী মেয়ে। যাও মা, ওপরে রঞ্জনের কাছে গিয়ে বসো তা' হ'লে। আর শোন, আমি কিন্তু আর ওপরে আসছি না। তাই তুমি খাবার সময় নীচে এসো, কেমন?—বলতে বলতে আর হাসতে হাসতে, মা সিঁড়ি দিয়ে তরতর ক'রে নেমে গেলেন এক তলায়।

মা নেমে যাওয়ার একটু পরে হাতের পলাশ ফুলগুলোর টাটকা লাল রঙের দিকে তাকাতে তাকাতে মাথা নীচু রেখেই শোবার ঘরের সামনে এলো রাধা। কয়েকটা পলকের জন্যে দাঁড়ালো একটু। হাতের পলাশগুচ্ছের নম্রতার মধ্যে নিজের মুখের বাম দিকখানা দিয়ে একটু ঘষে নিল। পরমুহূর্তেই পর্দা সরিয়ে ঘরের ভিতরে এলো। ঘরেতে তখন মৃদু আলো। তারই মধ্যে দেখতে পেল রাধা—ভেলভেটের আবরণ দেওয়া পালঙ্কের মাঝখানটিতে তার রঞ্জন কুঁকড়ে-মুকড়ে শুয়ে আছে। আর দেখালো—তার প্রিয়র চোখে-মুখে ফুটে রয়েছে এক অসহায় শিশুর মতন ভয়-কাতরে রূপখানাকে। তাই দেখে রাধার মনে হ'ল—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে রঞ্জন যেন তার প্রিয়াকেই অতি কাছের ঘনিষ্ঠতায় পাওয়ার জন্য খুঁজছে বিছানার চার পাশেতে। দুটি মাস আগে ত'—এই 'গ্লসি' ভেলভেটিনে ঢাকা বিছানার দোদুল করানো, আরাম ভরা নির্ঝরটির মধ্যে শুয়ে শুয়ে—একজন আরেকজনার মুখে মুখ, বুকে বুক ছুঁইয়ে—দু' ধারার যৌবনাঙ্কিত বিচিত্রতায় সাজানো—সেই শারীরী মধুরিমা ভরা কবোষ্ণতার মধ্যেকার আবেশে আর রভসে—পড়তো ঘুমিয়ে! সেই দু'মাস ধরে, সবে মাত্র গত কালকার

রাতখানা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত—সুন্দর আর সলাজে থাকা নিলাজ-চঞ্চল দাম্পত্য-বিভাবটি হয়েছিল অমিত্রাক্ষর। বন্ধ ছিল প্রিয়ার মধ্যে অনুসন্ধান করা—প্রিয়তমর অসম আগ্রহ-রাঙানো সেই মিথুনবাসরকে সাজাবার জন্য—প্রতিটি রুচিরা ভরা সন্ধ্যার—অনুরাগে ছড়ানোর কারুকাজ।—

কিন্তু ও ভাবে বন্ধ করে রাখার মধ্যে হারিয়ে যাওয়া ছন্দখানা আবার হোল আজ মিতাক্ষরা—এই আজকেরই রিমঝিমানো শুকসন্ধ্যার ঝলমলানির মধ্যে। আজ সত্যি সেদিনের হঠাৎ জাগা কারণ থেকে ধূপ-বিভাসিত যৌবনেতে বিরতি নেওয়া মিথুনের মাদক শুচিতা—এই সন্ধ্যায় পুনরায় প্রস্তুত হয়েছে সুন্দর সুন্দর দুটি সবুজ দেহ আর মনের আঙ্গিনা থেকে— রাধাতে ও রঞ্জনেতে— লাজশয্যার মিতাক্ষরা মিতালি সমেত।—রাধার মনে খুশী উছলে উছলে উঠলো এই ভাবনায় যে,—দুটি মাস আগের মতো আজ আবার রঞ্জন অধিকার পাচ্ছে—তারই লীলাসঙ্গিনী, এই মিষ্টি রাধার নরমে আর পেশলে সপ্রগল্ভিত যৌবন-দেহকে—নিজের বুকের আরামের মধে কঠিন ভাবে বন্দী রেখে—হাতের আর পায়ের বাঁধন দিয়ে ঘনিষ্ঠতম তাপের সাথে জড়িয়ে নিয়ে রূপকথার দেশেতে পৌছে—ঘুমাবার জন্য। —আর এতে রাধারও সুখের শেষ নেই। সেও আজ এই মধুর সন্ধ্যায় রঞ্জনকে তার আরাম-ঝরা বুকের দরিয়ায় আরও গাঢ় ভাবে আপীনতার ছোঁয়ায়—রাখবে ধরে বিছানার মধ্যে পেয়েও কিন্তু—বুকে বুক আর মুখে মুখ ছুঁইয়ে ঘুমিয়ে পড়বে না রাধা—এই আজকের রুমঝুম সন্ধ্যায়। নিজে তাই সন্ধ্যা থেকে জাগবে ত্রিজামা রাত পর্য্যন্ত। তবে রঞ্জনকে রাখবে না জাগিয়ে। আজ তাকে রাধা—আদরে আদরে সুখী করিয়ে ঘুম পাড়াবে। নিজের লাল অধর থেকে বাদল ধারায় ঝরানো মধুরিমা পরশের সিক্ততায়, নরম পেশলতায় লাজহর বুকের পীন-কঠিনতা ভরা ছোঁয়াচে দেওয়া আরাম নির্ঝরে,—আর যৌবন আঁকা সমস্ত অঙ্গরুচির উষ্ণতাকে ঢেলে দিয়ে—রাধা তার আদরের রঞ্জনকে দেহে আর মনে—পুলকে পুলকে রাঙিয়ে দেওয়াকে।

রাধা তাই ভাবতে ভাবতে পালঙ্কের কাছে এগিয়ে এলো ধীরে আর স্থির পদক্ষেপ। দাঁড়িয়েছে বিছানারই কাছটি ঘেঁষে। আর পলকহীন চোখের ভেতর থেকে মধুরে মধুর আকাঙ্ক্ষার ছবি ফুটিয়ে তুলে দেখছে রঞ্জনকে। রাধার দেহ আর মন—এই দুয়েরই হাজার রকম—সুখ আর খুশী আর আহ্লাদ হলো—সুন্দরকান্তি এই রঞ্জন।

রাধা দেখছে—তার রঞ্জন বেশ আরাম পেয়েই এখন ঘুমুচ্ছে। তার প্রেমময় ভাসা ভাসা চোখ দুটির সুন্দর রূপটুকুন ঘুমের তৃপ্তিতে আছে শান্ত হয়ে। আর

তারই মধ্যে ফুটে আছে এক মৌন ভাষা। তা সত্যি তৃষার লাল লাজেতে ভরা ও মধুরেতে জড়ানো ছন্দ। ওরই মধুরা লীলা-সঙ্গিনী হওয়ায় রাধার পক্ষে অমন ভাষার পাঠোদ্ধার করাটা সহজেই হ'ল। রঞ্জনের চোখ ছাড়িয়ে এবার রাধার দৃষ্টি পড়লো প্রিয়র মুখেতে। দেখলো—ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় ওর মুখের হাসিটি বেশী রকম শুচিতায় আছে মুখর হয়ে। আর তারই মধ্যে আছে আরেক রকমেরই একটি জোরালো ভাষার মুর্ছনা!—যা—শুচিস্মিতে আছে মুখর হয়ে। আর তারই মধ্যে আছে আরেক রকমেরই একটি জোরালো ভাষায় মূর্ছনা!—যা—শুচিস্মিতা রাধার বেপথুমনা হ'য়ে ওঠা লাল অধরযুগলের ভেতর থেকে বাধাহীন বন্যা হোয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া—থরে থরে সাজানো চুম্বনগুলোকে জানাচ্ছে—প্রিয়রই অধরসমীক্ষার আহ্বানে সাড়া দিয়ে, বাদুলে বর্ষণ হোয়ে—আপনার লাল লাল নরম ঠোঁট দু'খানা নিয়ে লুটিয়ে পড়ে—চুমার আলপনা আঁকাবার জন্য।

দেখতে দেখতে তাই আনন্দের উচ্ছলতায় ভেসে গেল রাধা বাধা-ভাঙ্গা নদীর মতো। আরো বেশী ক'রে আনন্দ উছ্‌লে উঠলো—যখন দেখতে পেল—তার এই কিছু সময়ের অনুপস্থিতিতে রঞ্জনও বেশ সুন্দর করেই করেছে—আপন দেহের সাজ-গোজ। আদুরে মা যে নিজেই তাঁর সন্তানাধিকা এই রাধার—ভালোলাগার আর ভালোবাসার সুজন প্রিয়াকে একটু প্রসাধন করাতে সাহায্য করেছিলেন—ওতে কোন সন্দেহ নেই আর এখন। রাধা বুঝতে পারলো—মা নিজের স্নেহ ঝরানো হাতে আপন আত্মজ রঞ্জনের মাথায় শুকনো হ'য়ে থাকা চুলেতে ভাল ক'রে ভেসেলিন পমেড্ মাখিয়ে নরম করার পর—তা ব্যাক্ ব্রাশ ক'রেই আঁচড়িয়ে দিয়েছেন। অনুভব করলো—সুগন্ধে ভুরভুর করা পণ্ডস্ পাউডারের সাদা পরাগের প্রলেপ মাখিয়ে তা নরম পাফ্ দিয়ে ঘষে নেওয়ার দরুণ—রঞ্জনের হাসি হাসি সুন্দর মুখখানাকে দেখাচ্ছে বড় বেশী ঝক্‌ঝকে। তার মধ্যে কোথাও ফুটে নেই দুর্বল কোন দেহ-মনের এক বিন্দু প্রকাশ। তা ছাড়াও দেখলো রাধার চোখের মদালসা ভরা ভালোবাসার দিঠিখানা—রঞ্জনের দুপুরে পরা গায়ের জামাখানাকেও বদলানো হয়েছে আজ। নয়নাভিরাম গাঢ় ক্রীম-কালারের রেশমে তৈরী একটি শার্ট গায়ে দিয়েছে। বুকের ওপরে সোনার বোতামগুলো মৃদু আলোর পরশেতে করছে ঝিকিমিকি।—তাই দেখে দেখে রাধার যৌবন-সবুজ দেহ থেকে আনন্দের পুলক উপছে পড়লো অপূর্ব এক খুশীর রূপবিভোরতারই সহাস মূর্ছনায় কেঁপে যাওয়ায়।—সত্যি মা কত ভালবাসেন তাঁর একমাত্র এই ছেলেকে! আর তার চাইতেও বেশী রকমেই ভালবাসেন এই পুত্রবধু—রাধাকে! রঞ্জন আর রাধা—দু জনেই আজ মায়ের এক বিরাট আনন্দেরই

অশেষ প্রতিভূ।—রাধা তাই জানে। তাই বোঝ অনুভবে। অনুভাবেতে। অনুরাগেতে।

ও ভাবেতে রঞ্জনের যৌবন-সবুজ দেহেতে সাজানো প্রসাধনখানা দেখতে দেখতে— মঞ্জুলা রাধা তাকালো আপন অঙ্গরুচিকে শোভিত করা সজ্জারূপের প্রতি। সত্যি আজকের এই ঝুমুঝুমু কাকলিমুখর সন্ধ্যারই মতো নিজের যৌবনান্বিত সৌন্দর্য্যকে— নির্ঝরিত মুঠো মুঠো মাধুর্য্যকণার ভেতর দিয়ে সাজিয়েছে—বড় বেশী রুচিরা ভরা মায়ারাগে। পরনে দামী কাশ্মিরী রেশমের ঝক্‌মক করা শাড়ী। সঘন লাল রঙ্‌ তার। সমস্ত শাড়ীটার জমিন ধরে ভর্তি করা সোনালী বুটিতে। আর সরু পাড় ও চওড়া আঁচলখানাও করছে ঝলমল— সোনার জরিতে।— ঐ সোনালী আভার রাঙা আঁচলখানাকে সামনে টেনে নেওয়ায়—রাধার কোমরে রয়েছে তা গোঁজা। আর মোলায়েম "স্লিপি" সাটিনের ঘিয়ে রঙ ব্লাউজখানা শাড়ীর ঐ রক্তিমাভার মধ্যে সূর্য্যের মতো হয়েছে আলোকিত— সেখানকার অপার রূপ-মাধুর্য্যধারাকে বিভাসিত করাবার জন্য। ব্লাউজের আঁট-সাঁট গঠন সুচরিতা রাধার মনোলোভা হয়ে থাকা ঐ ঋতুময় বিচিত্রায় ভরাট বুকের— পেশলে সুউঁচু রূপসী স্নিগ্ধতাকে বড় বেশী সুষমে ক'রে রেখেছে প্রকটিত। সেখানের কঠিন বাঁধন পাওয়া ক্রীম-কালারের ঝলমলানি ছাপিয়ে—সুষমায়িত অভ্যন্তরের পীনোদ্ধতায় স্ফূর্ত শৈল্পিক সৌন্দর্য্য—ছড়াচ্ছে বড় বেশী নিলাজ হওয়া পলাশেরই সঘন লাল রঙ্‌কে।—তাই দেখে দেখে মুহূর্তের জন্য—রাধার ঐ মধুরা প্রিয়ার পরিচিতিতে— মৃদুল ছন্দেতে আর লাজেতে ম্লান হয়ে পড়া—বিহ্বলতা মাখিয়ে গেল।

দাঁড়িয়ে থেকে থেকে আর অযথা সময় নষ্ট করতে চাইল না রাধা। কেন না,—বিলম্বে হারিয়ে ফেলতে চায় না—বিদিশার ঘন রঙ্‌ মাখা এই শুকসন্ধ্যাটিকে। হঠাৎ আলোর ঝলক তুলে তাই রাধা কাছে এসে ঝুপ্‌ ক'রে বসে পড়লো বিছানায়। বসে পড়ে পলক না ফেলেই রঞ্জনের বুকেতে, শার্টের বোতাম খুলে নিজের শীতল হাতের নরম ছোঁয়া রেখে—অনুভব করতে চাইলে প্রিয়র দেহের মধ্যে ক্লান্তিজনক কোন তাপ অবশিষ্ট অছে কি না,—তাই জানতে। ওভাবে রাধা, অনুভব করলো সেখানে থেকে একটা শ্রান্তি ভরা, স্বস্তি দেওয়া বিহ্বলতাটি। না, সত্যি এখন আর তার দেহে নেই কোন কষ্টের প্রকাশ!—তাই ভেবে রাধা হাতের পলাশগুলোকে বিছানার ওপরেতে বালিশের আশে-পাশে ছড়িয়ে দিয়ে রাখল। কোমরে বাঁধা আঁচলখানাকে আলগা ক'রে বিছানার মোলায়েম রূপের ওপরে লুটিয়ে দিল। আরো কাছের তাপ ঘেঁষে বসে কোলের ওপরে তুলে নিল রঞ্জনের

মাথাখানা। দেখলো—প্রিয়র ঘুমিয়ে থাকা মুখে-চোখে উপছে পড়েছে মধুর সুতৃপ্তির কোন বিরাট প্রাপ্তি! কোন নিলাজ ভরা সুখের অসম ব্যাপ্তি! ঘুম ভাঙ্গলো তখনি রঞ্জনের। প্রিয় তাই না জেগে পারলো না,—একান্ত আপনার লীলা-চঞ্চল উর্ম্মিমালায় রাঙানো এই মধুরিকা রাধার—সবুজে-সজীব সুদীর্ঘ চব্বিশটা বছরেরই বাসন্তী-মাদকতা ছড়ানো মাতাল ছোঁয়াচাখানাকে পাওয়ায়।

"এই। এই রাধা। আমার দুষ্টু। আমার মিষ্টি।"—বলতে বলতে আর হাসতে হাসতে রঞ্জন তার প্রায় দুর্বল দুটি হাতের বাঁধন দিয়ে রাধার পিঠ পর্য্যন্ত গভীর আশ্লেষ থেকে জড়িয়ে ধরলো।

"রঞ্জন। এই, শোন। আমার দুষ্টু! বলি, এখন শরীর ভাল আছে ত'? ভাল লাগছে ত'? এই লক্ষ্মীটি, কৈ আমায় মুখ ফুটে বল একবারটি?"—ও কথা বলা শেষ করেই সপ্রগল্‌ভিতা রাধা প্রিয়ার খুশীময়তায় ঝল্‌মলে হ'য়ে সজোরে রঞ্জনের শুচিস্মিত মিষ্টি মুখখানাকে— নিজের গাঢ় যৌবনে খোদিত করা রূপঝরা বুকেরই পেশলিত মাধুর্য্যধারায়—নরম-সলাজ আবেশের মধ্যে টেনে এনে আটকালো। নিজের মাথা রঞ্জনের মুখের কাছে নামিয়ে এনে তার পমেডের সৌগন্ধ ভরা চুলের মধ্যে—আপনার সুস্মিতা মুখের হাসির গমক ছুঁইয়ে রেখে, আদর করে করে বলল রাধা—"এই দুষ্টু ছেলে! কি বলবে, বল।"

—"শোন রাধা। আমার শরীর আজ সত্যি ভাল হয়ে গেছে। একটুও খারাপ লাগছে না। এই দুষ্টু! বুঝলে, তোমারই জন্য কিন্তু।"

কাজল চোখের পাতা বুজিয়ে রাধা বলল—"সত্যি? সত্যি? সত্যি?"

—"হ্যাঁ। হ্যাঁ। হ্যাঁ। এই তিন সত্যি করেই বলছি।" প্রিয়াকে জড়িয়ে ধরা হাতের বাঁধনকে আরো শক্ত করাতে করাতে বলল রঞ্জন।

কাটা কাটা গলার আদুরে সুরে রাধা বলল—"কিন্তু রঞ্জন, তা আমি কেমন ক'রে বুঝবো বল? তুমি যদি নিজে থেকে আমায় তা বুঝিয়ে না দাও?"

—"উঃ। ভারী দুষ্টু। না গো না, রাধা হোল আমার ভারী মিষ্টি মেয়ে। এই, তাই না?"

কথা থামালো রঞ্জন। আর তখনি প্রিয়া রাধার—সুষম সৌন্দর্য্যে নিটোল ব্যাপ্তি নেওয়া বুকের লজ্জাখানা—এক না জানা দারুণ পুলকের শিহরে শিহরে কয়েকবার রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলো। এই শিহরেরই তালে তালে মিল রেখে— রাধা তার প্রিয়তমের সুন্দর আবদারের জন্য—রঞ্জনের মুখখানাকে আরো শক্ত ক'রে আপন বুকের আশ্রয়ে বন্দী করালো। রঞ্জনের প্রণয়তৃষা ভরা হাসির ঝরনায় কাঁপা মুখ থেকে প্রিয়ার দেহের ছান্দসী লাজখানাকে কেড়ে নিতে চাওয়া—

অধরেতে থরে থরে সাজানো সমীক্ষার কারুকাজ—রাধার রূপসী বুকের সমস্ত রকম লজ্জাকে অপহরণ ক'রে নিয়েছে—যুবকেরই সবুজ-ঘরের চাহিদা পরিপূরণ মানসে। শুচিস্মিতা রাধার চব্বিশটা বসন্ত-কুঙ্কুমিত বছরের টানে টানে কোন এক রূপদক্ষ শিল্পীর হাতের সূক্ষ্মতম কারুশিল্প হ'য়ে প্রস্ফুটিত সেই নিটোল যৌবনে সিঞ্চিত বুকের—দু'ধারার রূপাতিরিক্ত পীনোদেশের ওপরকার ঘিয়ে রঙীন "স্লিপ" সাটিনের জায়াগায় জায়গায় রঞ্জনের প্রণয়-বিহ্বল অধর থেকে—থরে থরে সাজানো উষ্ণ পরশের অবিরাম ভাবে ঝরে পড়া বৃষ্টির বাদুলে ধারায়—তুলেছে ভিজিয়ে। প্রিয়র সুখ আরাম ঝরালো রঞ্জন থেকে—আপন প্রিয়ারই দেহ-সায়রের প্রতিটি অণুতে অণুতে। আর সেই ভাবের বিভাব থেকেই নিজের যৌবনাঙ্কিতে শরীরের প্রতিটি পরমাণুতে ফিরিয়ে আনালো—প্রিয়া রাধার দেহী-রূপতরঙ্গিমার লীলাচঞ্চল প্রাণকণিকার সঞ্চারিণী শক্তিটিকে। রাধাও তাই প্রিয়র সুস্মিত অধরে, টানা টানা চোখে, গালে কপালে ভালোবাসার প্রতিদানী অভিজ্ঞানকে স্বাক্ষরিত না করিয়ে ছাড়ালো না।

এই শুকসন্ধ্যায় আজ রাধার তপস্যা হোল—আপনার এই দুষ্টু রঞ্জন,—এই মিষ্টি রঞ্জনের কঠিন অসুখ থেকে সেরে ওঠা শরীরের মধ্যে—কোথাও লুকিয়ে থাকতে দেবে না—এক কণামাত্র দুর্বলতাকে পর্যন্ত!—তাই মিষ্টি ডাকে আহ্বান জানিয়ে রাধা বলল—"এই।"

প্রিয়ার পেশল বুকের নির্ঝরিত আরাম দরিয়ায় মুখ রেখেই বলল রঞ্জন—"কি?"

রাধা তার কাজল চোখ থেকে ঠিকরে পড়া খুশীর রঙ্ ঝরিয়ে বলল—"তুমি সুখী হয়েছ কি? তুমি খুশী হয়েছ কি? বল, আর কোন কষ্ট নেই ত'?" ঠিক একটুও নেই। সত্যি বলছি।"—বলল রঞ্জন।

জিজ্ঞাসা করলো রাধা—"কিন্তু, কিন্তু, এই রঞ্জন, শোন। এখনও ত' জানা হোল না এটা যে, এই সুখেতে আর এই খুশীতে তুমি কি তোমার এই দুষ্টুমতি রাধার কাছ থেকে পেয়েছো অশেষ আরামের রূপ-ঝরনাটির অনুসন্ধান? পেয়েছো কি তারই জীবনকাঠির খোঁজখানা?—এই মানে, এই তোমারই জন্য আমার মধ্যে? কি গো বলবে না? আর জানাবে না?—আমার সুখ! আমার খুশী!"

তৃপ্তিনির্ঝর হাসির গমকে ডগ্ মগিয়ে বলল রঞ্জন—"এই রাধা। এই মেয়ে। এই মিষ্টি। তুমিই আগে নিবেদন কর, আমারও তরফের ঐ একই রকমের করা প্রশ্নের উত্তরখানা? কি গো, অত হাসির মূর্ছনায় যে হারিয়ে যাবে তোমার কথা! এই। বল রাধা।"

আনন্দে-হাসিতে-তৃপ্তির রভসে নাচের ছন্দ তুলে বলল রাধা—"হ্যাঁ। মধুর, আমি সুখী তোমার মনের মধ্যে। হ্যাঁ। সুন্দর, আমি খুশী তোমার দেহের মধ্যে। হ্যাঁ। আর দেহেতে ও মনেতে এক হয়ে আমারই জন্য আমার আবহমানকালের তৃপ্তির আবেশকে আনিয়াছো তুমি। হ্যাঁ, তুমিই রঞ্জন। শুধু তুমি। এই রঞ্জন, শোন, এই একটা কিন্তু, মানে আর কি—

—"এই। এই রাধা। কিন্তু! আবার একটা কিন্তুর কেন প্রশ্ন তুলছো এমন মঞ্জুল মুহূর্তটিতে?"—বলে জিজ্ঞাসু চোখেতে তাকালো রঞ্জন।

কথায় আদরের সুর ঢেলে বলল রাধা—"বলছিলাম কি, শোন, এই রঞ্জন! বলছিলাম যে, গত দুটি মাস ধরে তুমি আমায় কম কাঁদাও নি, সে সব কথা কি আজ মনে পড়ছে? মনকে দোলা দিচ্ছে কী আমারই জন্য? আমারই অভিমান করা চোখের জলের জন্য?"

—"হ্যাঁ। নিশ্চই। ভুলবো কেন! মনে দোলা দিচ্ছে ঠিকই।" রঞ্জন নিবেদন কোরল প্রিয়াকে।

একটা স্বস্তির প্রকাশ থেকে রাধা বলল—"তুমি কি জান রঞ্জন, আমার মনেতে থেকে যাচ্ছে একটা কিন্তু তবুও। তুমি এত বেশী দুষ্টুমিটাই না করতে পার; বাব্ বা, ভাবলে পরে মনে জাগে আবার একটা ভাবী ভয়েরই কথার। এই কিন্তুটা হ'ল এই যে,—এখন ত' সত্যি সুস্থ হয়েই সেরে উঠেছো অসুখ থেকে। তবে কি জান, ভয়টা এই যে,—তুমি, হ্যাঁ, তুমি পুনরায় আবার আরেকটা অসুখ বাঁধিয়ে বসবে না ত' আবার? এই, এই লক্ষ্মী ছেলে, কথা দাও তোমার এই দুষ্টু রাধাকে, যে—অসুখ আর কখনো বাঁধাবে না? আর অসুখ বাঁধিয়ে আমাকে কাঁদাবে না? ওগো বল।"

দারুণ তৃপ্তির হাসিতে ভেঙ্গে পড়ে রঞ্জন বলল—"না গো, না। শোন রাধা, কথা দিচ্ছি। আর কখনো নয়। তবে কি জান, তুমি আমায় নজরে নজরে রেখো—আর রেখো আদরে আদরে—দেখবে আমি তা' হলে তোমার পাহারায় পাহারায় থাকবো ভালোই। অসুখ-বিসুখ কিছুই আর পারবে না আমায় ছুঁতে! কি রাজী?"

এমন কথা বলতে বলতে—দু' জনেই দু' জনকে প্রণয়ের সুরীতিকা ধরে পরিক্রমা কোরতে কোরতে কথা দিল—স্বস্তির আর শান্তির আর পরম এক আশ্বাসের!

রঞ্জন তখনো প্রিয়ার নির্ঝরে প্রবাহিত বুকের আরাম ভরা কুঙ্কুমিত আশ্রয়ে নিশ্চুপ থাকার জন্য একটু চোখ বন্ধ করে—ছিল আবেশে বিহ্বলপ্রায়। রাধাও

তখন প্রিয়র মাথার ওপরে হেলে পড়ে—ঘন কালো কেশের পমেড-সুরভির মধ্যে নিজের শুচিতা রাঙা মুখখানা চেপে রেখে সুখাবেশেতে—নিজের দুটি চোখ রাখতে চাইলো বুজিয়ে। কয়েকটা পলক পরে যুগপতে দু জনাই নিজের নিজের টানা টানা চোখ জোড়ার কাছে অপার এক সুখের হাতছানিতে চাহনি নিয়ে খুলে ধরলো। নিশ্চুপ হয়ে দু জনাই দেখতে লাগল পরস্পরকে—এক পরম আকস্মিকের আহ্বানে। এক পরম নিভৃতের মোহাবেশে।

একে দেখছে তারই অপর স্বত্বা—সেই আরেককে। তা' না দেখলে যে—অপূর্ণ থেকে যায় দাম্পত্য-রীতির মিলন-বাসরেতে করা—শুভদৃষ্টির অভিবাদন থেকে আমন্ত্রণ করানো—মিথুন-সাজের।—তাই যুগপতে তা রাধাও দেখছ। আর রঞ্জনও দেখছে। মাঝে মাঝে চোখ মেলে তাকিয়ে তাকিয়ে। রাধা দেখছে তার আত্মার পরম জন—রঞ্জনকে—এই যে রঞ্জন তারই সুমধুরিকার দেহদেউলে পুষ্পিত করাবার অধিকারে অভিষেক পেয়ে গেছে নতুনেরই সৃষ্টির মাদকতায়—বধূর "Privacy"-কে করার জন্য স্রষ্টার ভূমিকায় "glorious" —ঠিক তেমন করেই রঞ্জনও দেখছে তার হালদিতা-শক্তিরূপী বধূ রাধাকে, যে রাধার যৌবনের দোসর হয়েই রীতি নিয়ে ঋতুতে ঘেরা যৌবনায়নী সৃষ্টি-সুখের উল্লাস ভরিয়ে—হয় ত' যে কোন মুহূর্তে—প্রিয়তমের সবুজ দেহ থেকে ধার চাইবে—একটি টাটকা তাজা রক্তকণিকাকে নিজেরই যুবতী মনের প্রজায়নী ঋতায়ন সমেত! লালে বিভূষিতা এক পুষ্প-চয়নী যুবতীত্বকে মাধুরীস্নাত সৃষ্টিরই এক কুট্রিম করবারই অভিলাষে।

ও কথারই গভীরে লীন থাকা অনেক কিছুকে ভাবতে ভাবতে—রাধা ও রঞ্জন—দু জনাই কোরছে উপভোগ—আজকের এই সোনায়-রূপোয় আলোক-ঝরা হ'য়ে ওঠা শুকসন্ধ্যাটিকে। আজকের এই সন্ধ্যা আপনারই প্রভাবে অনুরাগবতীর অবগুণ্ঠনের মধ্যে—ওদের করাতে পেরেছে বিভূষিতা। তাই বারে বারে তারা শুক্লপক্ষের রিমঝিম করা সন্ধ্যার সোনালী বাতিদানের প্রজ্জ্বল বহ্নি-বলয়কে সাক্ষী রেখে—তারা দুজনাই মাখছে প্রকৃতির এক অনাবিল আশীষধারাকে।—ওরই বিভাবের বিকাশের মধ্যে ওরা দেখছে মুঠো মুঠো পলাশ ফুলকে। পলাশেরই রঙেতে রাঙা—মুঠো মুঠো লজ্জাকে।

প্রিয় রঞ্জন ও প্রিয়া রাধার উপস্থিতি একদিকে।—আর একদিকে শোভিত হয়ে আছে সোনালী সন্ধ্যার রিমঝিমানো ঝিলিমিলি রূপ ও তাইতে আরো গাঢ় হ'য়ে রাঙা পলাশ ফুলেদের বর্ণসমারোহ।—সবে মিলে-মিশে তারা তখন হয়ে পড়েছে একাকার। এক দেহে, আর একই মনের ও অবস্থার—অস্তিত্বে আর

স্থিতিতে লীন।

শুধু একটি মেয়ে। নাম রাধা। বয়েসেরই দিক থেকে বসন্তে বসন্তে সাজানো যৌবনেরই সাজঘরের সে হোল এক মধুরা যুবতী। এক সপ্রগল্‌ভিতা লাজবতী। —এই সেই-ই ত' হ'ল পলাশ ফুল।—কেন না—লজ্জা দিয়ে প্রিয়ার সলাজুকা রূপখানাকে ও-ই পারবে—নিজের ক'রে কেড়ে নিতে।—তাই ওর বিভাস লুকানো আছে পলাশের লালেতে।

আর তাই লাজহরা হয়ে দুষ্টু পলাশের রঙ্ মাখলো মিষ্টি সন্ধ্যা।—আর তাই পলাশ তারই সন্ধ্যার কাছ থেকে রিমঝিম ছন্দে ছন্দে মিতালি পাতিয়ে—গৌরব পেল।

আদর করাতে করাতে রঞ্জন তাই শুধায় প্রিয়াকে—"কী?"

—"এই। এই।"—শুধু এইটুকুন জানাতে জানাতেই মঞ্জুলা রাধা লাল পলাশ ফোটানোর মতো অধর-সমীক্ষায় মাতোয়ারা থেকে—ঠিক ঠিক পেয়ে যায়—শীতের প্রার্থনারই মতন বসন্তেরই হলাদিত রাখা—উত্তরখানাকে।

—১৪ জানুয়ারী, ১৯৬০